

চার ইমামের জীবনী

মাওলানা মতিউর রহমান

জামেয়া আরাবিয়া ফরিদাবাদ, ঢাকা



www.e-ilm.com

মোহাম্মদী লাইব্রেরী

চকবাজার, বাংলাবাজার, ঢাকা

www.e-ilm.weebly.com

প্রকাশকঃ

মোহাম্মাদ আশিক উল্লাহ

মোহাম্মাদী লাইব্রেরী

চকবাজার, ঢাকা- ১২১১

ফোনঃ ৭৩১৫৮৫০

(সর্বস্বত্ব প্রকাশকের)

হাদিয়া : ১৮৫.০০ টাকা মাত্র

মুদ্রণেঃ মোহাম্মাদী প্রিন্টিং প্রেস

৪৯, হরনাথ ঘোষ রোড, ঢাকা- ১২১১

পরিবেশনায়

মোহাম্মাদী লাইব্রেরী

চকবাজার, ঢাকা- ১২১১

ফোন- ৭৩১৫৮৫০

মোহাম্মাদী লাইব্রেরী

ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড)

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবাইল- ০১৭১৫১২৬২৩৬

সূচীপত্র

বিষয় :	পৃষ্ঠা :	বিষয় :	পৃষ্ঠা :
বিকাহ শাস্ত্রের সংকলন	১	ইমাম আবু হানিফা এবং	
ফিকাহবিদ ছাহাবীগণ	১	ইলমে হাদীছ	২৭
ফিকাহবিদ তাবেয়ী ও তাবে		ইমাম সাহেবের হাদীছ	
তাবেয়ীগণ	২	সম্পর্কিত জ্ঞান	৩১
আসহাবে হাদীস ও আসহাবে		আবু হানিফা ছিলেন ইমাম	
ফিকাহ	৫	আযম বা মহা ইমাম	৩২
ফিকাহ সংকলন	৬	সমকালীনদের অভিযোগ	
ফিকাহ এর চার কেন্দ্র	৭	গ্রহণযোগ্য নয়	৩৪
মাযহাব চতুষ্টয়ের বিকাশ		হাদীছের কয়েকজন শায়খের	
বৃত্তান্ত হানাফী	৯	তালিকা	৩৭
হানাফী মাযহাব	৯	হাদীছের রেওয়াজেত ক্রম	
ফিকাহ এবং হাদীছ	১০	হওয়ার কারণ	৩৭
ফিকাহে হানাফীতে সহীহ		অল্প সংখ্যক হাদীছ বর্ণনার	
হাদীছের সাদৃশ্য	১১	অপবাদ খণ্ডন	৩৯
মালেকী মাযহাব	১১	মিথ্যা নবী হতে নবুওয়াজেতের	
শাফেয়ী মাযহাব	১২	আলামত চাওয়া কুফর	৬১
হাম্বলী মাযহাব	১২	ফতোয়ায় সতর্কতা	৬২
বর্তমান যুগে মাযহাব চতুষ্টয়ের		ইমাম সাহেব কর্তৃক জনৈক	
অনুসারীদের তালিকা	১৩	কাযীর ভ্রম সংশোধন	৬৩
ইমাম আযম আবু হানীফা		অনুরূপ আরেকটি ঘটনা	৬৫
নোমান বিন ছাবেত		ইমাম সাহেবের ফিকহী উসূল	৬৬
কুফী (রহঃ)	১৫	আবু হানিফার (রহঃ)-এর	
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি		ফিকাহ সম্বন্ধে ইমামগণের মত	৬৯
ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী	১৮	অন্যান্য ইমামগণের দৃষ্টিতে	
জনৈক বুযর্গের স্বপ্ন	২০	ইমাম সাহেবের মর্যাদা	৭০
যিন্দিক, মুলহিদ এবং বাতিল		ইমাম আবু জাফর সাদেক এবং	
সম্প্রদায়ের সাথে মুকাবিলা	২৪	ইমাম আবু হানিফা	৭১
চিত্তাধারার পরিবর্তন	২৪	শরীয়ত সংকলন	৭১
ইমাম হাম্মাদ আবি সূলাইমানের		আবু যুহরা মিসরীর রায়	৭২
দরসী হালকায়	২৫	দরস তাদরীস বা শিক্ষাদানের	
ইমাম শাবীর সাথে মুলাকাত	২৮	হালকা	৭৭

বিষয় :	পৃষ্ঠা :	বিষয় :	পৃষ্ঠা :
ইমাম সাহেবের দৃষ্টিতে হাদীছ ও ইজতিহাদ	৮৬	স্বভাবগত চরিত্র এবং ব্যক্তিগত জীবন	১১৫
ইমাম সাহেবের মজলিসে জ্ঞানী-গুণীদের সমাবেশ	৯৩	ইমাম সাহেবের মেধা, তীক্ষ্ণজ্ঞান ও অনুভূতির কয়েকটি দৃষ্টান্ত	১২০
উল্লেখযোগ্য ছাত্রবৃন্দ	৯৪	রচনা জগতে ইমাম সাহেবের খ্যাতি	১৪১
একই মাসয়ালায় বিভিন্নমুখী দলীল	৯৫	অবয়ব	১৪৫
ইমাম আবু ইউসুফের অনুতাপ	৯৬	পোষাক-পরিচ্ছদ	১৪৫
ইমাম সাহেবের জীবনের একমাত্র আদালতী ফয়সালা	৯৭	চালচলন এবং কথাবার্তা	১৪৫
বদান্যতা ও দানশীলতা	৯৭	জেলখানায় বিষপানে মৃত্যু	১৪৫
শাগরেদের জন্য ইমাম সাহেবের আর্থিক সাহায্য	১০০	সন্তান-সন্ততি	১৪৮
শাগরেদদের হিম্মৎবর্ধক কয়েকজন বিশিষ্ট শাগরেদের নাম	১০১	ইমাম সাহেবের জ্ঞানসূলভ কয়েকটি বাণী	১৪৮
রেশমের কারখানা	১০২	রাজনৈতিক জীবন	১৬০
রেশমী কাপড়ের দোকান	১০৩	ইমাম মালেক বিন আনাস আছবাহী (রহঃ)	১৭৪
ক্রয়-বিক্রয়ে সততা এবং পরিচ্ছন্নতা	১০৫	বাসস্থান, জন্ম এবং বাল্যকাল	১৭৫
তাকওয়া ও খোদাভীরুতা, সন্দেহযুক্ত খাদ্য পরিহার	১০৬	হাদীছ শিক্ষার পূর্বে কাপড়ের ব্যবসা	১৭৬
জনৈক অগ্নিপূজকের ইসলাম গ্রহণ	১০৬	ইমাম সাহেবের শায়খ নির্বাচন	১৭৭
ঘরের ছায়া ছেড়ে রৌদ্রে গিয়ে অবস্থান	১০৭	বৈশিষ্ট্য	১৭৯
জনৈক বাঁদীর ইমাম সাহেবের ব্যাপারে মন্তব্য	১০৮	শায়খ নির্বাচন	১৭৯
ঋণ গ্রহীতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা	১০৮	বাল্যকালে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ এবং রবীয়ার দরসে অংশ গ্রহণ	১৮৪
ইবাদত এবং রিয়াযাত বা সাধনা	১০৯	ইবনে উমরের (রাঃ) মাওলা	১৮৪
ইমাম সাহেবের মুনাযাত	১১২	নাফে' এবং আব্দুর রহমানের শিষ্যত্ব	১৮৪
ইলমের সাথে আমল প্রয়োজন	১১৩	ছাফওয়ান বিন সুলাইমানের শিষ্যত্ব	১৮৫
মায়ের সেবা	১১৪	ইবনে শিহাব যুহরীর দরসী	১৮৬
		হলকায়	১৮৬
		মদীনা মুনাওয়ারায় দ্বীনি এবং ইলমী কেন্দ্র	১৮৭

বিষয় :	পৃষ্ঠা :	বিষয় :	পৃষ্ঠা :
ছাত্রজীবনে আর্থিক সংকট	১৮৮	ইমাম মুহাম্মদ বিন ইদ্রীস	
কয়েকজন প্রসিদ্ধ শায়খ এবং		শাফেয়ী (রাহঃ)	২২৮
উস্তাদ	১৮৯	ইমাম মালেকের (রহঃ) দরসী	
ইরাকী শায়খ	১৯০	মজলিসে	২৩০
দরস ও ইফতার আসনে	১৯১	ইয়ামানে সফর এবং সেখানকার	
ইমাম মালেকের শিক্ষা মজলিস	১৯২	শাসনকর্তা নিয়োজিত হওয়া	২৩২
মালেকী ফিকহ	১৯৩	বাগদাদে ইমাম মুহাম্মদের (রহঃ)	
সরকারী ঘোষণা	১৯৪	দরসী মজলিসে	২৩৩
মাসআলার ব্যাপারে ইমাম		বাগদাদে ইমাম সাহেব থেকে	
সাহেবের অনড়তা	১৯৪	ইমাম আহমদ বিন হাম্বল এবং	
জবাবে চিন্তা এবং অনুসন্ধিৎসা	১৯৫	অন্যান্য আহলে ইলমের	
ইমাম সাহেবের গুণ-গরিমা	১৯৬	ইলম গ্রহণ	২৩৫
আত্ম-সম্মানবোধ	১৯৭	কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষক	২৩৬
উলামাদের প্রতি শ্রদ্ধা	১৯৮	মিশর সফর এবং ইবনে আব্দিল	
ইমাম সাহেবের দরসের পদ্ধতি	১৯৮	হাকীমের সাথে বিশেষ সম্পর্ক	২৪১
দরসী মজলিসে খলীফার পুত্র	১৯৯	আকওয়ালে কাদীমা এবং	
দরসী মজলিসে জৈনিক আলেম	২০০	আকওয়ালে জাদীদা এর রাবী	২৪৩
শ্পেনীয় এক তালেবে ইলম	২০১	ইমাম সাহেবের ফেকহী মায়হাব	২৪৩
শিষ্য এবং ছাত্র, ফিকাহ এবং		ফতোয়া দেয়ার অনুমতি লাভ	২৪৫
ফতোয়া	২০২	জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা	২৪৬
ফতোয়ায় বিশেষ সতর্কতা	২০৪	ইমাম আহমদ বিন হাম্বল	
সফলদের ইত্তেবা এবং বেদআতের		শায়বানী বাগদাদী (রহঃ)	২৫১
প্রতি ঘৃণা	২০৫	আত্মবিশ্বাস, তর্ক শাস্ত্রে বুৎপত্তি	২৫৫
যুহদ, তাকওয়া ইবাদত এবং		আহমদ বিন হাম্বলের বিরোধিতা	২৫৭
রিয়াযত	২০৭	ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের	
ইমাম সাহেবের গুণ ও স্বভাব		অভিমত	২৫৮
চরিত্র	২০৮	জ্ঞান-বুদ্ধি এবং বিচক্ষণতা, তীক্ষ্ণ	
সমকালীন হাদীছ ও ফিকাহ-		বুদ্ধির একটি প্রমাণ	২৫৯
বিদগণের দৃষ্টিতে ইমাম সাহেব	২১৩	অল্পেতুষ্টি, সৎচরিত্রতা এবং	
জ্ঞানের বাণী	২১৭	সরলতা	১৬৮
রচনা	২২০	ইবাদত, রিয়াযত, যুহদ এবং	
মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেক	২২০	তাকওয়া	২৭০
ইত্তিকাল	২২৬	সুন্নতের বাপন্দী	২৭১

বিষয় :	পৃষ্ঠা :	বিষয় :	পৃষ্ঠা :
বুয়ুর্গদের প্রতি আদব শ্রদ্ধা ও বিনয়	২৭২	ছাত্রদের মর্যাদা এবং সুখ-শান্তির প্রতি লক্ষ্য	৩০৮
হুবেব আলী এবং শিয়া মতবাদ গ্রহণের অপবাদ	২৭৩	মানুষের অন্তরে তাঁর ভয়ভীতি	৩০৯
ইমামগণ এবং সমসাময়িকদের রায়	২৭৫	তার মত এবং মন্তব্য লিখায়	৩১০
কারামত, অবয়ব ও গঠন প্রকৃতি	২৭৭	নিষেধাজ্ঞা	৩১১
জ্ঞানসূলভ বাণী	২৭৭	তার ছাত্র ও শিষ্য	৩১১
কাব্যনিপুনতা	২৮৪	সিন্দুর এক উস্তাদ এবং দু'	৩১২
মৃত, সন্তান-সন্ততি	২৯০	শাগরেদ	৩১২
ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর জন্ম	২৯১	উস্তাদ মাশায়েখ এবং সমসাময়িকদের দৃষ্টিতে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল	৩১৫
হুযুর (সাঃ)-এর শাফায়াত	২৯১	ইমাম সাহেবের ফতোয়া এবং মাসয়ালার সংকলন	৩২০
ইমাম আহমদ বিন হাম্বল আশশায়বানী আলবাগদাদী .	২৯২	হাম্বলী মায়হাব প্রসার লাভ না করার কারণ	৩২২
রহমাতুল্লাহি আল্লাইহি জন্ম এবং বাল্যকাল, প্রাথমিক শিক্ষা	২৯৩	যুহদ এবং তাকওয়া	৩২২
হাদীছ শিক্ষা এবং শিক্ষা সফর	২৯৪	জীবিকা নির্বাহ	৩২৭
শিক্ষা জীবনে বাধা-বিপত্তি ও অভাব অনটন	২৯৭	হাদিয়া তোহফা পরিহার	৩২৮
আমরণ শিক্ষা	২৯৯	কায়ীর পদ প্রত্যাখ্যান	৩২৯
হাদীছের উপর আমল	৩০০	খাদ্য এবং পোশাক	৩৩০
শিক্ষকদের দৃষ্টিতে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল	৩০০	ইবাদত এবং রিয়াযত	৩৩১
ইমাম সাহেবের শায়খ ও উস্তাদবর্গ	৩০১	হজ্জ এবং যিয়ারত	৩৩২
উস্তাদ, শায়খ এবং বড়দের সম্মান	৩০৩	খলকে কোরআনের ফিৎনা এবং ইমাম আহমদ	৩৩২
হাদীছ বর্ণনা এবং ফতোয়া	৩০৪	ইমাম সাহেবের বন্দীদশা এবং তাঁর উপর অত্যাচার	৩৩৪
শায়খদের জীবদ্দশায় তাঁদের বর্ণিত হাদীছ বর্ণনা না করা	৩০৫	ইমাম সাহেবের পক্ষ হতে ক্ষমা প্রদর্শন	৩৩৬
যুবাকালে প্রসিদ্ধি	৩০৫	ফিৎনার সমাপ্তি	৩৩৭
মজলিসে দরস	৩০৬	ইত্তিকাল	৩৩৯
মজলিসে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা	৩০৭	সন্তান-সন্ততি	৩৪৩
		ইমাম আহমদ (রহঃ)-এর ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্ব	৩৪৪
		রচনাবলী, কতিপয় জ্ঞানের বাণী	৩৪৫

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَعَلَى
آلِهِ الطَّاهِرِينَ وَصَحَابَتِهِ أَجْمَعِينَ

ফিকাহ শাস্ত্রের সংকলন

রাসূলে কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় শরয়ী আহকামের একমাত্র অবলম্বন ছিল কোরআন ও সুন্নাহ। তবে অপ্রামাণ্য বিষয়ে রাসূলে কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভিমতের সাথে ছাহাবায়ে কেরামের অভিমতও স্থান পেত। বিশেষ করে খোলাফায়ে রাশেদীন বিভিন্ন দ্বীনি বিষয়ে হযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পরামর্শ দিতেন।

ফিকাহবিদ ছাহাবীগণ

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিরোধানের পর এবং ওহীর ধারা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর শরয়ী মাসায়েল ও দ্বীনি সম্পর্কিত বিষয়ে কোরআন ও সুন্নাহের পরে ছাহাবায়ে কেরামই ছিলেন কেন্দ্রবিন্দু। এ বিষয়ে ঐ সমস্ত ছাহাবীর রায় ও পরামর্শ গৃহীত হত যাঁরা ইলমী জগতে প্রসিদ্ধ ও উল্লেখযোগ্য ছিলেন।

ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যাঁরা দ্বীনি মাসায়েলের ব্যাপারে নির্ভরযোগ্য বিবেচিত হতেন, যাঁরা কোরআন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত ছিলেন। নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে কোরআন শিখেছেন এবং বুঝেছেন এবং রহিত ও অরহিত আয়াত সম্বন্ধে অবগত ছিলেন, তাঁরাই কুররানামে অভিহিত হন। এ খেতাবটি আলেম ও গায়ের আলেমকে পার্থক্য করে দিত। তদানীন্তনকালে যাঁরা ফতোয়া প্রদান করতেন তাঁদের সংখ্যা ছিল প্রায় একশত ত্রিশ। এঁদের মধ্যে পুরুষ মহিলা উভয় শ্রেণীই অন্তর্ভুক্ত ছিল। তন্মধ্যে সাতজনের ফতোয়া ছিল অধিক পরিমাণে। তারা হচ্ছেন, ১। হযরত ওমর বিন খাত্তাব (রাঃ) ২। হযরত আলী (রাঃ) ৩। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) ৪। হযরত আয়েশা (রাঃ) ৫। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) ৬। হযরত

আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) ৭। হযরত ছাবেত (রাঃ)। এঁদের ফতোয়া এত বেশী ছিল যে সেগুলো একত্র করা হলে বিরাট কলেবর বিশিষ্ট কিতাবে পরিণত হয়ে যাবে।

আর ফতোয়ার সংখ্যাধিক্যের অনুপাতে দ্বিতীয় পর্যায়ে ছিলেন তেরজন ছাহাবী। তাঁরা হচ্ছেন ১। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) ২। হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) ৩। হযরত আনাস (রাঃ) ৪। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) ৫। হযরত আবু হোরাযরা (রাঃ) ৬। হযরত উসমান (রাঃ) ৭। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) ৮। হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রাঃ) ৯। হযরত আবু মুনা আশয়ারী (রাঃ) ১০। হযরত সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ) ১১। হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) ১২। হযরত জাবের (রাঃ) ১৩। হযরত মুয়ায (রাঃ)। এঁদের ফতোয়া একত্র করা হলেও ছোট ছোট কিতাবে পরিণত হয়ে যাবে। হযরত তালহা (রাঃ), হযরত যুবায়ের (রাঃ), হযরত আব্দুর রহমান বিন মাসউদ (রাঃ) প্রমুখও এই দ্বিতীয় স্তরের অন্তর্ভুক্ত। এঁদের ছাড়া আরো অনেকে ফতোয়া প্রদান করতেন তবে তাঁদের ফতোয়ার সংখ্যা তুলনামূলক কম ছিল।

ফিকাহবিদ তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীগণ

ছাহাবায়ে কেলামের পর তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীগণের মধ্যে কারা কোথায় ফতোয়া দান করতেন সে সম্বন্ধে আল্লামা ইবনে কাইয়েম আলোচনা করেছেন। তারই সার সংক্ষেপ নিম্নে প্রদত্ত হল।

মদীনা মুনাওয়ারা

মদীনা মুনাওয়ারায় সাতজন ব্যক্তি ফতোয়া ও ফিকাহশাস্ত্রে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁদের ফতোয়া অধিক নির্ভরযোগ্য ছিল। তাঁরা হচ্ছেন- ১। সাঈদ ইবনে মুসাইয়েব ২। ওরোয়া ইবনে যুবায়ের ৩। কাসেম ইবনে মুহাম্মদ ৪। খারেজা ইবনে যায়েদ ৫। আবু বকর ইবনে আব্দুর রহমান ৬। সুলায়মান ইবনে ইয়াসার ৭। উবায়দুল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ।

এঁদের সমকালীন লোকদের মধ্যে আরো কিছু লোক ফতোয়ার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন, আবান, উসমান, সালেম, নাফে, আবু সালামা, আলী ইবনে হোসাইন ও যয়নুল আবেদীন। এঁদের পরে যাঁরা মদীনায় মুফতী হিসাবে পরিচিত ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন, আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ, হোসাইন ইবনে মুহাম্মদ, জাফর ইবনে মুহাম্মদ, আব্দুর রহমান ইবনে কাসেম, আবু বকর, মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদের, মুহাম্মদ ইবনে শিহাব যুহরী প্রমুখ।

মক্কা মুকাররামা

মক্কা মুকাররামায় যাঁরা ফতোয়া ও ফিকাহ শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন, আতা ইবনে আবিরাবাহ, মুজাহিদ, উবায়দ ইবনে উমায়ের, আমর ইবনে দীনার, আব্দুল্লাহ ইবনে আবি মুসায়িকা, আব্দুর রহমান ইবনে মুসাবেত ও ইকরামা।

এঁদের পরে যাঁরা ফতোয়া প্রদান করতেন তাঁরা হচ্ছেন আবুয যুবায়ের মক্কা, আব্দুল্লাহ ইবনে খালেদ ও আব্দুল্লাহ ইবনে তাউস। এঁদের পরে আব্দুল মালিক বিন আব্দুল আযীয ও সুফিয়ান ইবনে উয়াইন। এঁদের পরে মুসলিম ইবনে খালেদ যানজী, সাদ্দ ইবনে সালেম ফতোয়া প্রদান করতেন। তাঁদের পরে ইমাম শাফী, আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের প্রমুখ ব্যক্তিবর্গও ফতোয়া ও ফিকাহের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন।

বসরা

বসরায় যাঁরা ফতোয়ার কাজে প্রসিদ্ধ ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন উমর ইবনে সালামা, আবু মরিয়ম হানাফী, কাব ইবনে আসওয়াদ, হাসান বসরী, আবু কেলাবা, মুসলেম ইবনে ইয়াসার, আবুল আলিয়া, হোমায়দ ইবনে আব্দুর রহমান, মুতার রাফ ইবনে আব্দুল্লাহ, যুরারা ইবনে আবি আউফ ও আবু বুরদা। এঁদের মধ্যে হাসান বসরী পাঁচশত ছাহাবী হতে হাদীছ ও ফিকাহ লাভ করেছেন। আলেমগণ তাঁর ফতোয়াসমূহ বিরাট বিরাট সাতটি কিতাবে সংকলন করেছেন।

উপরোক্ত স্তরের বিয়োগান্তে যাঁরা বসরায় ফতোয়া প্রদান করতেন তাঁরা হচ্ছেন আবু আইয়ুব সাখতিয়ানী, সুলায়মান তাইমী, আব্দুল্লাহ ইবনে আউফ, ইউনুস ইবনে উবায়দ, কাসেম ইবনে রবীয়া, খালেদ ইবনে আবি ইমরান, আশ আছ ইবনে আব্দুল মালিক কাতাদা, হাফস, ইবনে সুলায়মান, কাযী ইয়াস প্রমুখ।

কুফা

কুফায় ফতোয়া ও ফিকাহশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ ছিলেন আলকামা ইবনে কায়েস, আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ নাখয়ী, আমর ইবনে শুরাহবীল হামদানী, মাসরুক, উবায়দা সালামানী, কাযী শুরাইহ ইবনে হারেছ, সোয়ায়েদ ইবনে গাফলাম, হারেছ ইবনে কয়েছ, আব্দুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ, আব্দুল্লাহ ইবনে উতবা, খায়ছামা ইবনে আব্দুর রহমান, সালামা ইবনে সুহায়ের, মালেক ইবনে আমের,

আব্দুল্লাহ ইবনে শাখবারাহ, যিররিরনে হোবায়েশ, খাল্লাস ইবনে আমর, আমর ইবনে সায়মুন আউফী, হাম্মাম ইবনে নেহায়েছ, হারেছ ইবনে সোয়ায়েদ, ইয়াযীদ ইবনে মুয়াবিয়া, রবী ইবনে খায়ছাম, উতবা ইবনে ফারকাদ, সেলা ইবনে যুফার, শারীক ইবনে হাম্বল, আবু ওয়ায়েল উবায়েদ ইবনে নাদলা।

এসব মুফতী ও মুজতাহিদ বিশিষ্ট তাবয়ীগণের মধ্যে গণ্য ছিলেন। এঁরা হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর বিশিষ্ট শাগরেদ ছিলেন। ছাহাবায়ে কেলামের যমানায় এঁরা ফতোয়া দিতেন। ছাহাবায়ে কেলাম তাঁদের একাজের অনুমতিও দিতেন।

এঁদের অধিকাংশই হযরত উমর (রাঃ) এবং হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট থেকে ইলম হাসিল করেছেন। আমর ইবনে মায়মুন হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রাঃ)-এর বিশেষ শাগরেদ ছিলেন। হযরত মুয়ায (রাঃ)-এর ইত্তিকালের পর তাঁরই উপদেশক্রমে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর শরণাপন্ন হন।

কুফার ফিকাহবিদগণের মধ্যে আরো উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গ রয়েছেন। যেমনঃ হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর দুই পুত্র আবু উবায়দা ও আব্দুর রহমান, আব্দুর রহমান ইবনে আবি লায়লা, মায়সারা ও যাহান। এঁদের পরে আবির্ভূত হন ইব্রাহীম নাখয়ী আমের মা'বী, সাঈদ ইবনে জুবায়ের, কাসেম ইবনে আব্দুর রহমান, আবু বকর ইবনে আবি মুসা, মুহারির ইবনে দীহার, হাকাম ইবনে উতবা, জাবালা ইবনে সুহায়েম প্রমুখ।

এঁদের পরে যাঁদের আগমন হয়েছে তাঁরা হচ্ছেন হাম্মাদ ইবনে আবি সুলায়মান, সুলায়মান ইবনে মু'তামির, সুলায়মান আমাশ, মিসআর ইবনে কুদাম প্রমুখ। এঁদেরই শিষ্য স্বরূপ আগমন করেছেন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান, আব্দুল্লাহ ইবনে শুবরুমা, সাঈদ ইবনে আশওয়া, কাযী শরীক, কাসেম ইবনে মান, সুফিয়ান ছাওরী, ইমাম আবু হানীফা, হাসান ইবনে সালেহ।

এঁদের পর কুফায় যে ফিকাহবিদগণের আবির্ভাব ঘটেছে তাঁরা হচ্ছেন হাফস ইবনে গিয়াছ, ওকী ইবনে জাররাহ। ইমাম আবু হানীফার শিষ্যবর্গ তথা কাযী আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ ইবনে হাসান শায়বানী, যুফার ইবনে ছায়েল, হাম্মাদ ইবনে আবি হানীফা, হাসান ইবনে যিয়াদ, কাযী আফিয়া, আসাদ ইবনে হাঃ কাযী নূহ ইবনে দারবাজ, ইমাম সুফিয়ান ছাওরীর শিষ্যবর্গ আশযারী : ইবনে ইমরান, ইয়াহ ইবনে আদাম প্রমুখ।

সিরিয়া

সিরিয়ায় তাবেয়ীগণের মধ্যে যাঁরা ফিকাহবিদ ছিলেন তাঁরা হচ্ছেন আবু ইদ্রীস খাওলানী, শুরাহবীল ইবনে সামত, আব্দুল্লাহ ইবনে আবি যাকারিয়া খুযায়ী, কাবীসা ইবনে মুয়ায়েব খুযায়ী, হান্দান ইবনে উমাইয়া, সুলায়মান ইবনে হাবীব মুহারেবী, হারেছ ইবনে উমাইয়া যুবাইদী, খালেদ ইবনে মাদান, আব্দুর রহমান ইবনে গানম, আশআরী, জুবায়ের ইবনে নুকায়ের, মাকহুল শামী, উমর ইবনে আব্দুল আযীয, রাজা ইবনে হায়ওয়া, হুদায়ের ইবনে কুরাইব। খেলাফতের আব্দুল মালিক ইবনে মারওয়ানও তাঁদের মধ্যে গণ্য ছিলেন।

এঁদের পরে সিরিয়াতে মুফতী হিসাবে পরিচিত ছিলেন কাযী ইয়াহয়া ইবনে হামযা, আবু আমর আব্দুর রহমান আউযায়ী, ইসমাসীল ইবনে আবি মুহাজির, সুলায়মান ইবনে মূসা উমাবী, সাঈদ ইবনে আব্দুল আযীয।

উপরোক্ত স্তরের পরে সিরিয়াতে ফতোয়া দানের কাজ করেছেন মাখলাদ ইবনে হোসাইন, ওলীদ ইবনে মুসলিম, আব্বাস ইবনে ইয়াযীদ, শোয়ায়েব ইবনে ইসহাক, আবু ইসহাক ফায়ারী প্রমুখ।

মিশর

মিশরের মুফতী হিসাবে পরিচিত ছিলেন ইয়াযীদ ইবনে আবি হাবীব, বুকায়ের ইবনে আব্দুল্লাহ, আমর ইবনে হারেছ, লয়েছ ইবনে সাদ, উবায়দুল্লাহ ইবনে আবি জাফর প্রমুখ।

উপরোক্ত স্তর অতিক্রান্ত হয়ে গেলে মিশরে ফতোয়া প্রদানের কাজ করতেন ইমাম মালেকের শিষ্যবৃন্দ তথা মুযানী, বোয়াইতী, ইবনে আব্দুল হাকাম প্রমুখ।

উল্লেখিত স্থানসমূহ ছাড়াও ইয়ামেন, উন্দুলুস (স্পেন), বাগদাদ প্রভৃতি স্থানেও বহু মুজতাহিদ ও মুফতী ছিলেন। মুসলমানরা ফতোয়া এবং দ্বীনি বিভিন্ন মাসায়েলের ব্যাপারে তাঁদের শরণাপন্ন হতেন।

আসহাবে হাদীছ ও আসহাবে ফিকাহ

খেলাফতে রাশেদার পর উলামায়ে দ্বীনের জন্য কুররা খেতাবের পরিবর্তে অপর দুটি খেতাবের সূচনা হয়। কিছু সংখ্যক সাহাবায়ে কেলাম এবং তাঁদের শাগরিদদের প্রধান লক্ষ্য ছিল হাদীছের শব্দ ও সনদের প্রতি এবং হাদীছ লিপিবদ্ধ করার প্রতি তাঁরা হাদীছের শব্দ সংরক্ষণ এবং হাদীছের বাহ্যিক অর্থকেই অধিক গুরুত্ব দিতেন। তাঁরা আহলে হাদীছ বা আসহাবে হাদীছ নামে অভিহিত ছিলেন। পক্ষান্তরে অপর কিছু সংখ্যক সাহাবায়ে কেলাম এবং তাঁদের

শাগরিদগণের প্রধান লক্ষ্য ছিল হাদীছের অর্থ ও মর্মের প্রতি। বাহ্যিক অর্থের চেয়ে উদ্দেশ্যের প্রতি অধিকতর দৃষ্টি রাখতেন। নতুন নতুন শরয়ী মাসায়েরের ক্ষেত্রে অন্যান্য দলীল প্রমাণেরও সাহায্য গ্রহণ করতেন। তাঁরা আহলে রায় বা আহলে ফিকাহ নামে অভিহিত ছিলেন। তাঁদের কেন্দ্র ছিল ইরাকের কুফা নগরী। তাঁদের শিষ্যবর্গই পরবর্তী যুগে এসে দারা বিশ্বে কিতাব-সুন্নাহ ও ফিকাহ-ফতোয়ার বিস্তার ঘটান।

ফিকাহ সংকলন

হযরত উমর ইবনে আব্দুল আযীয (রহঃ) তাঁর শাসনামলে হাদীছ সংকলনের প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং গুরুত্ব সহকারে একাজ শুরু করেন। হাদীছের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিতাবের স্থলে বড় বড় কিতাবের প্রচলন হয়। পরবর্তীতে বনি উমাইয়্যার যুগেও সংকলন ধারা অব্যাহত থাকে। বনি আব্বাসিয়্যার প্রাথমিক যুগ হতেই অন্যান্য ইলমেব প্রতি অধিক মনোযোগ দেয়া হয়। সর্বসাধারণের মধ্যেও ইলমী ঝাঁক বৃদ্ধি পায়। আরবী ভাষায় নতুন নতুন ইলম ও শাস্ত্রের ভাষান্তর হয়। সেকালে সমগ্র ইসলামী বিশ্বে তাবেয়ীন এবং তাঁদের শাগরেদগণ ছড়িয়ে ছিলেন। সর্বত্র দ্বীনি ইলমের চর্চা হচ্ছিল। তাই ইলমে দ্বীন অগ্রগতি লাভেরও সুযোগ হয়ে উঠেছিল।

হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে তথাকার ইমামগণ ফিকাহ শাস্ত্রের ধারা অনুযায়ী হাদীছের কিতাব লিখেন। যেমন, মদীনা মুনাওয়ারায় ইমাম মালেক (রহঃ), মক্কা মুকাররমায় ইবনে জুরাইজ (রহঃ), বসরায় রবী ইবনে সাবীহ (রহঃ), কুফায় সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ), সিরিয়ায় আউযায়ী (রহঃ), ওয়াসতে-এ-হোশায়েম (রহঃ), ইয়ামনে মা'মার (রহঃ), রাইশহরে জারীর ইবনে আব্দুর হামীদ (রহঃ), খোরাসানে আব্দুল্লাহ ইবনে মোবারক (রহঃ) প্রমুখ ইমামবর্গ স্ব স্ব কিতাব রচনা করেন।

এটা ছিল মুহাদ্দিসগণের ফিকাহ শাস্ত্রের ধারা অনুযায়ী হাদীছ সংকলনের অবদান। এ যুগেই ফিকাহ শাস্ত্রের ইমামগণ কুফায় ফিকাহ শাস্ত্রের সংকলন আরম্ভ করেন। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এবং তাঁর শিষ্যবর্গ তথা ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম যুফার প্রমুখ দুনিয়ার বুকে সর্বপ্রথম ফিকাহে ইসলামীর সংকলন করতঃ এক স্বতন্ত্র শাস্ত্রের রূপ দেন। ইঁহারা কোরআন, হাদীছ, কেয়াস এবং ইজমার সমন্বয়ে প্রায় পাঁচ লক্ষ মাসআলা সুবিন্যস্ত করেন। তাই ইমাম শাফী (রহঃ) বলেন, সমগ্র জাতি ফিকাহ এর ব্যাপারে ইরাক বাসীদের কাছে ঋণী। আর সমগ্র ইরাকবাসী কুফাবাসীদের কাছে ঋণী। আর

সময় কুফলানগী ইমাম আবু হানীফার কাছে ঋণী। শুধু তাই নয় ফিকাহ শাস্ত্রের নানা উসূলে ফিকাহ বা ফিকাহ বিধি এবং সংকলণ সর্বপ্রথম ইমাম আবু হানীফা এবং তাঁর শিষ্যবর্গই করেছেন।

ফলকথা, হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে ফিকাহবিদগণ এবং হাদীছবিদগণ স্ব স্ব শ্রেণীতে বিধান ও মূলনীতির আলোকে মাসআলাসমূহ উৎঘাটন করেন এবং হাদীছ সংকলন করেন। শিষ্যরাও তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে হাদীছ ও ফিকাহ শাস্ত্রের সংকলন করেন।

স্মর্তব্য যে, মুহাদ্দিছগণ ইজতেহাদ এবং কেয়াসের অস্বীকার করেন না। তবে হাদীছের প্রতি তাদের অধিক দৃষ্টি ছিল এবং যতদূর সম্ভব হাদীছের বাহ্যিক অর্থের প্রতি আমল করার চেষ্টা করতেন। এমনিভাবে ফকীহগণও হাদীছের অস্বীকার করতেন না বরং তাঁরা কোরআন এবং হাদীছ থেকেই মাসআলা উৎঘাটন করতেন। বরং সমস্ত কোরআন ও হাদীছের প্রতি দৃষ্টি রেখে মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ণয় করতঃ তার উপর অধিক গুরুত্ব দিতেন।

ফিকাহ এর চার কেন্দ্র

ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে যে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় দ্বিনি আহকামের অবলম্বন ছিল অহী এবং নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাজ ও উক্তি। এরপর ছাহাবা ও তাবয়ীগণের যুগে ইলমের বাহকগণ হেজায, সিরিয়া, মিশর, ইরাক প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে পড়েন। তাঁদের ফিকাহবিধি এবং ফতোয়ার মধ্যে পরস্পরের কিছুটা পার্থক্য ছিল।

হেজাযের আলেমগণ হাদীছের সনদ (রাবী পরস্পরা) ও মতন (মূল হাদীছ) এর ক্ষেত্রে অধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁদের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব ইমাম মালেক (রহঃ) ‘মুয়াত্তা মালেক’ নামক হাদীছের কিতাবখানা ফিকাহ শাস্ত্রের পূর্ণ ধারা অনুযায়ী সংকলন করেছেন।

আর ইরাকের আলেমগণ হাদীছের বর্ণনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। এমনকি তারা কোন মাসআলার ব্যাপারে قال رسول الله صلى الله عليه وسلم “রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন” এর পরিবর্তে তাদের দিকে সম্বন্ধ করে বলতেন। যাতে হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগেনে নাই এমন কোন বিষয়ের সম্বন্ধ তার প্রতি না হয়। এটা ছিল হাদীছ বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁদের একান্ত সতর্কতার পরিচয়। তাঁদের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিত্ব

ছিলেন ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) যিনি আপন শাগরেদগণকে নিয়ে ফিকাহ এবং উসূলে ফিকাহ (ফিকাহবিধি) শাস্ত্রকে সুবিন্যস্ত করেন।

এ দুজন ইমামের পরবর্তী স্তরে হেজাযী আলেমগণের মধ্যে ইমাম মুহাম্মদ বিন ইদ্রীছ শাফী (রহঃ) ফিকাহবিদ হিসাবে শীর্ষস্থানে আসীন হন। যিনি মক্কা-মদীনার মুহাদ্দিছগণের নিকট হাদীছ শিক্ষা গ্রহণ করেন। আর ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর শাগরেদগণের নিকট বিশেষ করে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর নিকট ইলমে ফিকাহ শিখেন। ফলকথা তিনি উভয় কেন্দ্র থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতঃ উভয় ধারা সমন্বয়ে স্বতন্ত্র ফিকাহ উদ্ভাবন করেন।

ইমাম শাফী (রহঃ)-এর পর ফিকাহ এর ময়দানে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)-এর আগমন হয়। তিনিও একটি স্বতন্ত্র ফিকাহ উদ্ভাবন করেন যার যোগসূত্র ছিল হেজাযী মুহাদ্দিছগণের ইলমী ধারার সাথে। তাই তাঁর মাযহাবের অধিকতর সম্পর্ক ছিল হাদীছের বাহ্যিক শব্দের সাথে। তবে ইমাম দাউদ জাহেরীর ন্যায় চিন্তা ও রায়কে একবারে উপেক্ষা করেননি।

উপরে বর্ণিত ইমাম চতুষ্টয়ের ফিকহী মাযহাব প্রবর্তিত হওয়ার আগে প্রত্যেক এলাকার লোক ফতোয়া ও মাসআলার ক্ষেত্রে স্থানীয় মুফতীগণের অনুসরণ করতেন। এমনকি এক এলাকার ফতোয়া অন্য এলাকায়ও প্রচলিত ছিল।

ফলকথা, ইমাম চতুষ্টয়ের ফিকহী মাযহাব প্রচলিত হওয়ার পূর্বে একাধিক ফকীহ এর ফিকাহ ও ফতোয়া প্রচলিত ছিল। যাঁদের ফিকাহ ও ফতোয়া তখন প্রচলিত ছিল তাঁরা হচ্ছেন, ইমাম সুফিয়ান ছাউরী (রহঃ), ইমাম হাসান বসরী (রহঃ), ইমাম আউযায়ী (রহঃ) প্রমুখ। এঁদের মাযহাব তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। এরপর লোপ পেয়ে যায়। তবে ইমাম দাউদ জাহেরীর মাযহাব ৮ম শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। তারপর এ মাযহাবও বিলুপ্ত হয়ে যায়। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে খালদুনের বর্ণনা অনুসারেও উক্ত মাযহাব ৮ম শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। এ মাযহাবের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এতে শুধু হাদীছের বাহ্যিক শব্দ দ্বারা যা বুঝা যেত তা-ই গ্রহণ করা হত, কেয়াস বা যুক্তির সহযোগীতা নেয়া হত না।

উপরোক্ত মাযহাবসমূহ ছাড়া ইসহাক ইবনে রাহওয়াই, ইবনে জারীর, সুফিয়ান ইবনে উয়ায়না, লায়েছ ইবনে সাদ প্রমুখ ফকীহগণের মাযহাবও প্রচলিত ছিল। কিন্তু এসব মাযহাবই এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত প্রচলিত থাকার পর বন্ধ হয়ে যায়। পরিশেষে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের দ্বীনি মাসায়েলও

ফতোয়া সংক্রান্ত বিষয় ইমাম চতুষ্টয়ের চার মাযহাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। যেহেতু কোন এক মাসআলার ব্যাপারে একই মাযহাবের অনুসরণ করা যেতে পারে তাই আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের আলেমগণ এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন সর্ব সাধারণ মুসলমানদেরকে এ চার মাযহাবের যে কোন একটি মাযহাব অবলম্বন করতে হবে। এরূপ করার কারণ হল, যাতে ব্যক্তি স্বার্থে কেউ কোন মাসআলা গ্রহণ করতে না পারে। নচেৎ এক মাযহাবের অনুসারী এ মাযহাবের কোন মাসআলা তার স্বার্থ বিরোধী হলে অন্য মাযহাবের মাসআলা গ্রহণ করে নিবে। এটা দ্বীনের লক্ষ্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তাঁদের মাযহাবের অনুসরণ করার অর্থ প্রকৃতপক্ষে কোরআন ও সুন্নাহরই অনুসরণ করা। কারণ সাধারণ লোকের পক্ষে সরাসরি কোরআন ও হাদীছ হতে মাসআলা উদঘাটন করা এবং সমস্ত কোরআন এবং হাদীছের সাথে সামঞ্জস্য বিধান রক্ষা করে আমল করা সম্ভব নয়। তাই সাধারণ লোকের জন্য বর্ণিত চার মাযহাবের যে কোন এক মাযহাব অবলম্বন করা একান্ত প্রয়োজন।

মাযহাব চতুষ্টয়ের বিকাশ বৃত্তান্ত হানাফী মাযহাব

এটা আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের সর্বপ্রথম ও প্রধান ফিকহী মাযহাব; যার প্রবর্তক ইমাম আবু হানীফা নোমান ইবনে ছাবেত কুফী (রহঃ)। সর্বপ্রথম কুফা নগরীতে এ মাযহাবের সূচনা হয়। অতঃপর ইরাকের বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর ধীরে ধীরে পৃথিবীর অন্যান্য দূর-দূরান্ত দেশেও বিস্তৃতি লাভ করে। অল্প সময়ের মধ্যেই মিশর, সিরিয়া, রোম, বলখ, বোখারা, ফরগানা, পারস্য, ভারত ইয়ামেন প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর তত্ত্বাবধানেই তার চল্লিশজন শিষ্য হানাফী ফিকাহকে সুবিন্যস্ত ও লিপিবদ্ধ করেন। তন্মধ্যে ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম যুফারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হানাফী ফিকাহ প্রসারের ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর শিষ্য ইমাম আসাদ ইবনে উমরের বিশেষ শ্রম রয়েছে। ইমাম আবু ইউসুফ খলীফা হারুনুর রশীদের শাসনামলে কাযীউল কুযাত বা প্রধান বিচারপতির দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। বিধায় তাঁর মাধ্যমেও এ মাযহাব দেশের সর্বত্র বিস্তার লাভ করে। ইমাম আবু মুহাম্মদের মাধ্যমে হানাফী ফিকাহ আফ্রিকায় পৌঁছে যায়। অতঃপর আসাদ ইবনে ফুরাত তথাকার কাযী বা বিচারপতি নিযুক্ত হওয়ার

দরুন জাঁকজমকের সাথে প্রসার লাভ করে। চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত সেখানে হানাফী মাযহাবেরই প্রাধান্য ছিল। ৪৫৩ হিজরীতে সেখানে মায ইবনে বাদীসের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তিনি মালেকী মাযহাব চালু করেন।

চতুর্থ শতাব্দীর বিখ্যাত পর্যটক মুকাদ্দেসী বাশশারীর বর্ণনামতে সেকালে ইয়ামেন এবং সানুআয়ও হানাফী মাযহাব প্রচলিত ছিল। এছাড়াও অধুনালুপ্ত রাশিয়ান ব্লকের বহু এলাকায় হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট বিশিষ্ট আলেম ছিলেন এবং তাঁদের মাধ্যমে সেসব এলাকায় হানাফী ফিকাহ চালু ছিল। বর্তমানে পাক-ভারত, বাংলাদেশে বলতে গেলে এক চেটিয়া হানাফী মাযহাবেরই অনুসারী রয়েছে।

এসব দেশে বিপুল সংখ্যক মাদ্রাসা ও বিজ্ঞ আলেম থাকায় এসব অঞ্চলে হানাফী মাযহাবের ভিত অত্যন্ত মজবুত।

ফিকাহ এবং হাদীছ

ফিকাহর মজলিস এবং হাদীছের মজলিসে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। বরং ফিকাহর মজলিসে সবকিছুর সমাবেশ ঘটে। ফিকাহর জন্য হাদীছের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কারণ মুজতাহিদ যখন হাদীছের শব্দ নিয়ে আলোচনা করেন, তখন হাদীছের অর্থের গুরুত্ব সর্বাধিক থাকে, পক্ষান্তরে মুহাদ্দিছগণের নিকট হাদীছের শব্দই মুখ্য উদ্দেশ্য থাকে। একজন মুহাদ্দিছের জন্য ফকীহ বা মুহাদ্দিছ হওয়া শর্ত নয়। পক্ষান্তরে একজন ফকীহর কোরআন হাদীছ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে।

‘হিদায়া’ নামক কিতাবে উল্লেখ রয়েছে— “মুজতাহিদকে এমন হাদীছবিদ হতে হবে যার ফিকাহ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান রয়েছে যেন তিনি হাদীছের অর্থ অনুধাবন করতে পারেন। তাকে ফিকাহবিদ হওয়ার সাথে সাথে হাদীছ সম্বন্ধেও জ্ঞান রাখতে হবে। যেন তিনি কiyাসের উপর নির্ভরশীল না হয়ে পড়েন।”

একজন ফকীহকে সমস্ত নূসূস বা মাষ্ট নির্দেশাবলীর সামনে রাখার সাথে সাথে ঘটনার প্রতিও সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখতে হবে। যেন শরীয়তের মধ্যে কোনরূপ বিকৃতি না আসে।

ধর্মীয় বিষয়ে যাদের সামান্য জ্ঞানও রয়েছে তাদের নিকট একথা স্পষ্ট যে হাদীছ ব্যতীত ফিকাহবিদ হওয়া যায় না, কেউ যদি এরূপ ধারণা করে থাকে যে হাদীছ ব্যতীত ফিকাহবিদ হওয়া যায় তবে বুঝতে হবে, তার জ্ঞানে ত্রুটি রয়েছে।

ফিকহে হানাফীতে সহীহ হাদীছের সাদৃশ্য

মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (রহঃ) বলেন,

এ ফকীরের নিকট প্রকাশ পেয়েছে যে ইলমে কালামের বিরোধমূলক বিষয়গুলোতে হানাফীমত নির্ভূল এবং বিরোধমূলক ফেকহী মাসায়েলের অধিকাংশ মাসয়ালায় হানাফীমত নির্ভূল।

শাহ ওলীউল্লাহ (রহঃ) বলেন,

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছেন, হানাফী মাযহাবে উত্তম পথ রয়েছে এবং তা ইমাম বুখারীর (রহঃ) সময়ে যে সব হাদীছ সংকলিত হয়েছে তার সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ।

উপরোল্লিখিত উদ্ধৃতি দুটি যদিও কাশফের কিন্তু নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান বলেন, যদি দু ব্যক্তির কাশফ একরূপ হয় তবে তা সত্য হওয়ার সম্ভাবনা বেশী।

হানাফী মাযহাবের মাসয়ালাগুলো একদিকে যেমন যুক্তিযুক্ত অপরদিকে সেগুলো কোরআন হাদীছের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ বাস্তব সত্যকে তখনই মেনে নেয়া যেতে পারে যখন ইমাম সাহেব হাদীছ সম্পর্কে সম্পূর্ণজ্ঞাত-এ সত্য মেনে নেয়া হবে।

মালেকী মাযহাব

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের দ্বিতীয় মাযহাব হচ্ছে মালেকী মাযহাব। এর প্রবর্তক ইমাম মালেক ইবনে আনাস (রহঃ)। উক্ত মাযহাবের আবির্ভাব হয় মদীনাতে। এখান থেকেই প্রথমে হেজায়ে তারপর ধীরে ধীরে মিশর, সিরিয়া, এসরা, আফ্রিকা, স্পেন, সুদান, খোরাসান, ইয়ামেন, নিশাপুর, পারস্য, রোম প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে পড়ে। তদানীন্তন কালে মিশরে ইমাম মালেক (রহঃ)-এর শাগরেদ তুলনামূলক অধিক ছিল। তাই তাদের মাধ্যমে সেখানে উক্ত মাযহাব প্রথমে প্রসার লাভ করে। এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী অবদান ছিল ইমাম আবদুর রহমান বিন খালেদের।

চতুর্থ শতাব্দীতে ইরাক, আহওয়ায়, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে মালেকী মাযহাবের বেশ প্রভাব ছিল। অনুরূপভাবে স্পেনেও উক্ত মাযহাবের প্রভাব ছিল। স্পেনে প্রথমতঃ ইমাম আউযায়ীর মাযহাব চালু ছিল। তারপর মদীনা থেকে নাম মালেক (রঃ) এর শিষ্যবর্গ সেখানে গিয়ে মালেকী মাযহাব চালু করেন।

শাফেয়ী মাযহাব

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের তৃতীয় মাযহাব হচ্ছে শাফেয়ী মাযহাব। এর প্রবর্তক ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদ্রীস শাফেয়ী (রহঃ)। উক্ত মাযহাবের সূচনা হয় মিশরে। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর অধিকাংশ শিষ্য মিশরেই ছিলেন। তারপর ইরাকেও উক্ত মাযহাব প্রচলিত হয়। তৃতীয় শতাব্দীতে শাফেয়ী মাযহাব হেজাজ, খোরাসান, তুরান, সিরিয়া, ইয়ামেন, পারস্য, ভারত, আফ্রিকা স্পেন প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে পড়ে। তবে এসব দেশে শাফেয়ী মাযহাবের পাশাপাশি অন্যান্য মাযহাবও প্রচলিত ছিল। মিশরে প্রথমে হানাফী ও মালেকী মাযহাবের প্রাধান্য ছিল। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) সেখানে পৌঁছার পর শাফেয়ী মাযহাব প্রাধান্য বিস্তার করে ফেলে। সিরিয়াতে প্রথমে ইমাম আউযায়ীর মাযহাব প্রচলিত ছিল। ইমাম আবু যুরআ মিশর থেকে সিরিয়াতে যাওয়ার পর দামেশকের কাযী নিযুক্ত হন এবং সেখানে শাফেয়ী মাযহাব চালু করেন। এরপর অন্যান্য কাযীরাও উক্ত মাযহাব অবলম্বন করেন।

ইমাম সাখাবী উল্লেখ করেন, মারব এবং খোরাসানে আহমদ বিন সাইয়্যার শাফেয়ী মাযহাব বিস্তার করেন। তারপর হাফেজ আবদান ইবনে মুহাম্মদ মারওয়ায়ী আরো সম্প্রসারিত করেন। আল্লামা ইবনে আছীরের বর্ণনা অনুযায়ী ইয়াকুব ইবনে ইউসুফের শাসনামলে আফ্রিকায় শাফেয়ী মাযহাব প্রাধান্য পায়। বিভিন্ন এলাকায় শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী কাযী নিযুক্ত করা হয়। এভাবে সেখানে শাফেয়ী মাযহাব ছড়িয়ে পড়ে।

হাম্বলী মাযহাব

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের চতুর্থ ফিকহী মাযহাব হচ্ছে হাম্বলী মাযহাব। এর প্রবর্তক ইমাম আহমদ ইবনে মুহাম্মদ হাম্বল শায়বানী (রহঃ)। এ মাযহাবের কেন্দ্রস্থল ছিল বাগদাদ। এর প্রসার অন্য তিন মাযহাবের তুলনায় কম ছিল। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লাদুন এর কারণস্বরূপ উল্লেখ করেছেন যে, ইজতেহাদের সাথে হাম্বলী মাযহাবের সম্পর্ক ছিল না বরং এর ভিত্তি ছিল বাহ্যিক হাদীছের উপর। তাই এ মাযহাবের বিস্তার কম ঘটেছে।

ইবনে কারহুন বর্ণনা করেন, হাম্বলী মাযহাব বাগদাদ থেকে বের হয়ে সিরিয়ার অধিকাংশ শহরে ছড়িয়ে পড়ে। সপ্তম শতাব্দীতে এ মাযহাব মিশরে প্রবেশ করে। ইমাম আব্দুল গনি মুকাদ্দেসী সর্বপ্রথম এ মাযহাব মিশরে পৌঁছান। এছাড়া আরো কিছু এলাকায় উক্ত মাযহাবের অনুসারী ছিল তবে নজদ ছাড়া অন্য কোথাও এ মাযহাবের পূর্ণ প্রাধান্য ছিল না।

বর্তমান যুগে মাযহাব চতুষ্টয়ের অনুসারীদের তালিকা

আল্লামা আহমদ তাইমুর নামক জনৈক বিশেষজ্ঞ (আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পূর্বে) তাঁর স্বরচিত ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন, বর্তমান যুগে মাযহাব চতুষ্টয়ের অনুসারী কোথায় কি পরিমাণ রয়েছে তার সঠিক তালিকা দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। তবে মাগরেব, তিউনিসিয়া, আলজিরিয়া এবং কয়েকটি আফ্রিকান দেশে মালেকী মাযহাবের প্রাধান্য। অবশ্য হানাফী মাযহাবের অনুসারীও কিছু রয়েছে। সুদানে অধিকাংশ মালেকী মাযহাবের অনুসারী। তবে হানাফী মাযহাবের অনুসারীও যথেষ্ট রয়েছে। মিশরে রাষ্ট্রীয় মাযহাব হানাফী। তবে হাম্বলী মাযহাবের অনুসারীও কিছু রয়েছে।

সিরিয়ার অধিকাংশ মুসলমান হানাফী, এক চতুর্থাংশ শাফেয়ী আর এক চতুর্থাংশ হাম্বলী। ফিলিস্তীনে শাফেয়ী মাযহাবের প্রাধান্য। কিছু হানাফী এবং মালেকীও রয়েছে। ইরাকে হানাফী মাযহাবের প্রাধান্য। সেখানে কিছু কিছু শাফেয়ী, মালেকী এবং হাম্বলীও রয়েছে। তুরস্ক ও আলবেনিয়াতে হানাফী মাযহাবের প্রাধান্য। কুর্দিস্তান এবং আরমিনিয়াতে শাফেয়ী মাযহাবের প্রভাব রয়েছে। পারস্যের মুসলমানদের মধ্যেও বেশীর ভাগ শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারীই রয়েছে। হানাফী মুসলমানও কিছু রয়েছে। আফগানিস্তানে হানাফী মাযহাবের প্রাধান্য রয়েছে। শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের অনুসারীও কিছু সংখ্যক রয়েছে।

পশ্চিম তুর্কিস্তান, বোখারা, তাশকন্দ, উজবেকিস্তান, কাজগিরিয়া, কাযাকিস্তান, আজারবাইজান, প্রভৃতি দেশের মুসলমান হানাফী মাযহাবের অনুসারী। পূর্ব তুর্কিস্তানের মুসলমানও হানাফী। সাথে সাথে কিছু শাফেয়ীও রয়েছে।

ভারতে শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারীই অধিক। তবে বর্তমানে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে হানাফী মাযহাবেরই প্রাধান্য।

শ্রীলংকা, মালদ্বীপ, ফিলিপাইন, থাইলেণ্ড, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে অধিকাংশ মুসলমান শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী।

যুক্তরাষ্ট্রের ব্রাজিলের মুসলমানগণ হানাফী মাযহাবের অনুসারী। তবে যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য এলাকায় বিভিন্ন মাযহাবের অনুসারী রয়েছে।

হেজাযে শাফেয়ী এবং হানাফী মাযহাবের প্রাধান্য রয়েছে। অবশ্য গ্রামাঞ্চলে হানাফীদের পাশাপাশি মালেকী মাযহাবের অনুসারীও রয়েছে। নজদের মধ্যে হাম্বলী মাযহাবের প্রভাব রয়েছে। ওমানে হাম্বলী এবং শাফেয়ী উভয় মাযহাবের অনুসারী বিদ্যমান। কাতার, বাহরাইন ও কুয়েতে মালেকী মাযহাবেরই প্রাধান্য।

উপরোক্ত পরিসংখ্যান আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পূর্বেকার। বর্তমানে ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা এবং এশিয়া মহাদেশেরও বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন মাযহাবলম্বী রয়েছে।

ইমাম আযম আবু হানীফা নো'মান বিন ছাবেত কুফী (রহঃ)

নাম ও বংশ পরস্পরা : তাঁর নাম এবং বংশ পরস্পরা এরূপ, ইমাম আযম আবু হানীফা নো'মান বিন ছাবেত বিন নো'মান বিন মারযুবান আত্‌তায়মী আল-কুফী (রহঃ)। কেউ কেউ তাঁর দাদার নাম যোত্বা বিন মাহ বর্ণনা করেছেন। এর কারণ এই যে ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পূর্বে নো'মানের নাম ছিল যোত্বা এবং মারযুবানের নাম ছিল মাহ। ইনি পারস্যের একটি এলাকার হাকেম ছিলেন। হাকেম বা প্রশাসককে মারযুবান বলা হয়। কারো কারো ধারণা এরূপ যে, যোত্বা শব্দটি 'যুক্ত' শব্দের আরবীরূপ, এর অর্থ জোতদার বা কৃষক। অবশ্য এ ধারণাটি ভিত্তিহীন। নো'মান বিন মারযুবান কাবুলের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। হযরত আলী (রাঃ)-এর খিলাফতকালে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং তিনি কুফায় আগমন করেন এবং সেখানেই বসতি স্থাপন করেন। হযরত আলী (রাঃ)-এর সাথে এ পরিবারের বিশেষ সম্পর্ক ছিল।

ইমাম সাহেবের পৌত্র ইসমাঈল বলেন, আমার নাম ইসমাঈল বিন হাম্মাদ বিন নো'মান বিন ছাবেত বিন নো'মান বিন মারযুবান। আমরা ফার্সী বংশোদ্ভূত। আল্লাহর কসম! আমাদের পরিবার কখনও কারো দাস ছিল না। আমার পিতামহ আবু হানিফা ৮০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। আমার প্রপিতামহ বাল্যকালে হযরত আলীর (রাঃ) খিদমতে গিয়েছিলেন। তিনি তার জন্ম এবং তার বংশের জন্য মঙ্গল কামনা করে দোয়া করেন। আমরা মনে করি তাঁর এই দোয়া আল্লাহ তাআলা কবুল করেছেন। একবার নববর্ষের উৎসবে নো'মান বিন মারযুবান হযরত আলী (রাঃ)কে ফালুদা দ্বারা আপ্যায়ন করেছিলেন। তিনি বললেন, প্রতিটি দিনই আমাদের নববর্ষ। এক বর্ণনামতে এ ঘটনা মেহরাজন নামক উৎসবের সাথে সম্পৃক্ত।

বনীতায়মুল্লাহ বিন ছা'লাবা গোত্রের সাথে বন্ধুত্বঃ এ পরিবারটি কুফার একটি সম্মানিত গোত্র বনী তায়মুল্লাহ বিন ছা'লাবার সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে

তায়মী নিসবত সম্বন্ধ দ্বারা পরিচিত হয়। ভদ্রতা এবং আভিজাত্যের কারণে এ গোত্রের সদস্যদেরকে ‘মাসাবীহ্‌যুলাম’ বা ‘অন্ধকারে প্রদীপ’ বলা হত।

ইমাম সাহেবের ছাত্রদের মধ্যে আবু আব্দুর রহমান বিন আব্দুল্লাহ বিন ইয়াযীদ আলমুকরী আলমক্কী একজন উল্লেখযোগ্য মুকরী এবং মুহাদ্দিছ ছিলেন। ইনি বসরা কিংবা আহওয়াযের কোন এলাকার বাসিন্দা ছিলেন। হযরত উমর (রাঃ)-এর বংশের সাথে তার বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল।

ইমাম ত্বাহবী (রহঃ) তার ঘটনা এরূপ উল্লেখ করেন, আমি যখন ইমাম আবু হানিফার (রহঃ) খিদমতে উপস্থিত হলাম, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? আমি বললাম, আমি এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তাআলা ইসলাম ধর্ম গ্রহণের তৌফিক দিয়ে অনুগ্রহ করেছেন। এতে ইমাম সাহেব বললেন, তুমি এরূপ বলো না। বরং এ গোত্রগুলোর কারো বন্ধুত্বে এসে যাও এবং তাদের দিকে সম্পর্কিত হয়ে যাও। আমিও এরূপ ছিলাম।

ইমাম ত্বাহবীর (রহঃ) ছাত্র হাফিয় ইবনে আবি আওয়াম “ফাযায়েলু আবি হানিফা ওয়া আসহাবীহী” নামক কিতাবে লিখেন যে, ইমাম সাহেব আরও বলেছেন যে “আমি তাদের সত্যবাদী পেয়েছি।”

বনী তায়মুল্লাহর আভিজাত্য এবং ভদ্রতার কারণে ইমাম সাহেবের পরিবার ছাড়াও আরো কয়েকটি জ্ঞানসমৃদ্ধ দ্বীনি পরিবার এবং ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলেন। এদেরই মধ্যে ছিলেন ‘ইলমে কিরআতের প্রসিদ্ধ ইমাম আবু আম্মারা হামযা বিন হাবীব বিন আম্মারা যাইয়্যাৎ আলকূফী আততায়মী - যার সম্পর্কে ইমাম সাহেব বলেছিলেন, ‘হামযা লোকদেরকে কোরআন এবং ফারায়েয শিখতে বাধ্য করেছে।”

এ সকল উদ্ধৃতি দ্বারা সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, ইমাম সাহেবের পরিবার বনী তায়মুল্লাহর দাস ছিলেন না বা তাদের হাতে ইসলাম গ্রহণও করেননি। বরং অন্যান্য অনারব নও মুসলিম পরিবারের মত এ পরিবারটিও একটি অভিজাত গোত্রের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে তাদের সাথে সম্বন্ধযুক্ত হয়েছিল।

এ বর্ণনাটি সম্পূর্ণ অমূলক যে, ইমাম সাহেবের পিতাকে কাবুল হতে বন্দী করে কুফায় আনা হলে বনী তায়মুল্লাহর এক মহিলা তাকে ক্রয় করে মুক্ত করে দেন। অথবা তার পিতামহ ঐ গোত্রের দাস ছিলেন। তদ্রূপ একথাটিও ভিত্তিহীন যে, আরবী বংশোদ্ভূত। সম্ভবতঃ এ কথাটি যারা তাকে অনারব দাস বলত তাদের জবাবে বলা হয়েছে।

বাসস্থান এবং ব্যবসাস্থল : হযরত উমর (রাঃ)-এর নির্দেশ এবং পরামর্শক্রমে ১৭ হিজরীতে হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) কুফায় বসতিস্থাপন করেন। শহরের মধ্যখানে জামে মসজিদ এবং প্রশাসন ভবনের ভিত্তিস্থাপন করেন। এর পূর্বদিকে ইয়ামানী গোত্রসমূহ এবং পশ্চিম দিকে হিজাজের নাযারী গোত্রসমূহের বসতি ছিল। উক্ত এলাকার মাঝখানে ময়দান ছিল। এরই মধ্যে ছিল জামে মসজিদ এবং প্রশাসন ভবনের ইমারত। ঐ ময়দানের একপার্শ্বে হযরত আমর বিন হুরাইছ স্বীয় বাড়ী নির্মাণ করেছিলেন। এ কারণে ঐ এলাকাকে রিকাকে আমর বলা হত। সেখানে তার সন্তানদের আধিপত্য ছিল। পরে সেখানে সরকারী শাসকগোষ্ঠি এবং কর্মচারীগণ বসতি স্থাপন করেন। ফলে এলাকাটি ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় পরিণত হয়। ঐ স্থানেই ছিল ইমাম সাহেবের পরিবারের দোকান। বসতবাড়ীও এরই সন্নিকটে পূর্ব এলাকায় ছিল- যেখানে ইয়ামানী গোত্রসমূহ বসতি স্থাপন করেছিল। তাদেরই মধ্যে ছিল বনী তায়মুল্লাহ বিন ছালাব- যারা ইয়ামানী গোত্রসমূহের সাথে সম্বন্ধযুক্ত ছিল। ইমাম সাহেবের পরিবার তাদেরই বন্ধুত্বে ছিল। সম্ভবতঃ ঐ গোত্রের নিকটেই তাদের বসতবাড়ী ছিল। এর সমর্থন এ ঘটনা থেকে পাওয়া যায় যে, ইমাম শাবী যিনি ইমাম সাহেবের প্রধান শায়খ এবং শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন এবং তার সম্পর্কও ইয়ামানী গোত্রের সাথে ছিল তিনিও কুফার পূর্ব এলাকায় বাস করতেন। একবার যুবাকালে ইমাম সাহেব ঘর থেকে দোকানের দিকে যাবার সময় ইমাম শাবীর দরসগাহের সামনে দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছিলেন। ইমাম শাবী তাকে নিকটে ডেকে এনে ইলমে দ্বীন অর্জন করার উপদেশ দেন যার বিস্তারিত বর্ণনা পরে আসছে।

জন্ম এবং বাল্যকাল : খলীফা আব্দুল মালেক বিন মারওয়ানের খিলাফতকালে ৮০ হিজরীতে কুফার পূর্বাঞ্চলে ইমাম সাহেব জন্মগ্রহণ করেন। এটা কুফায় বসতি স্থাপনের ৬৬-৬৭ বৎসর পরের ঘটনা। তখন সাহাবায়ে কিরাম এবং তাবেঈনদের আধিক্য ছিল। তাদের কারণে কুফার আনাচে কানাচে শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। চারিদিকে দ্বিনি এবং ইলমী মজলিস বসত। এমনি এক পরিবেশে ইমাম সাহেব বোধসম্পন্ন হন। জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম ছিল রেশমী কাপড়ের ব্যবসা। কুফার জামে মসজিদের সন্নিকটে হযরত আমর বিন হোরায়েছ (রাঃ)-এর বরকতময় স্থানে ছিল তাঁর দোকান।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী

ইমাম আযম আবু হানিফা (রহঃ)-কে আল্লাহ তাআলা যে জ্ঞানের পূর্ণতা, ইজতেহাদের যোগ্যতা, কোরআন এবং হাদীছের অগাধ জ্ঞান দান করেছেন, তা যেন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভবিষ্যৎবাণীকে বাস্তবরূপ দেয়ার জন্যই করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

عن ابى هريرة قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ نزلت سورة الجمعة ملما نزلت واخرين منهم لما يلحقوا بهم قالوا من هؤلاء يا رسول الله وفيما سلمان الفارسي قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كانن الايمان عند الثريا لناه رجال من هؤلاء *

অর্থঃ হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) রেওয়ায়েত করেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত ছিলাম। সে সময়ে সুরায়ে জুম'আ অবতীর্ণ হয়। যখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম *واخرين منهم* এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন, উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ অপর লোকেরা কারা যারা আমাদের সাথে এখনও মিলিত হয়নি? রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দেননি। তাঁকে সে প্রশ্ন দু তিনবার করা হলে তিনি সালমান ফারসীর কাঁধে হাত রেখে বললেন, যদি ঈমান 'ছুরাইয়া' তারকার নিকটও হত তবুও এদের থেকে কেউ কেউ তা পেত।

উপরোক্ত হাদীছটি বুখারী, মুসলিম এবং তিরমিযী শরীফে উল্লেখ রয়েছে। মুসনাদে আহমদের বর্ণনায় এরূপ রয়েছে-

• ইলম যদি ছুরাইয়া তারকার নিকটও হত পারস্যের কেউ কেউ অবশ্যই তা পেত।

হাফেয জালালুদ্দীন সুয়ুতী (রহঃ) বলেন যে, এ হাদীছে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ এ কথা স্পষ্ট যে, ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর সময়ে ফিকাহ এবং ইলমী মর্যাদায় কেউ তাঁর সমকক্ষ হতে পারেনি। এমনকি কেউ তাঁর ছাত্রদের সমপর্যায়ও পৌছতে পারেনি।

ইলমে হাদীছের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী প্রত্যেকেই এ বিষয়ে অবগত যে অধিকাংশ মুহাদ্দেছীনদের মতে এ ভবিষ্যৎবাণী ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর ক্ষেত্রেই সঠিকভাবে প্রযোজ্য।

হাফেয জালালুদ্দীন সুয়ুতী লিখেন যে, 'সুসংবাদের বিষয়ে এ হাদীছটি নির্ভরযোগ্য।'

শাহ ওলীউল্লাহ (রহঃ) লিখেন, এ হাদীছ নিয়ে একদিন আমরা আলোচনা করলাম। আমি বললাম, ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) সুসংবাদের অন্তর্ভুক্ত। কারণ ইলমে ফিকাহর প্রসার তাঁর মাধ্যমেই ঘটেছে। তাঁর দ্বারা অনেকেই সংশোধন হয়েছেন। বিশেষ করে এ সময়ে সারা মুসলিম বিশ্বে বাদশাহও হানাফী, কাযীও হানাফী এবং (মুদাররিস) শিক্ষকগণও হানাফী।

নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান লিখেন, ইমাম আবু হানিফাও এ হাদীছের অন্তর্ভুক্ত এবং পারস্যের (অনারব) সকল মুহাদ্দিছগণও।

উপরোল্লিখিত হাদীছের দৃষ্টিতে দেখা যায় যে, ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি স্পষ্ট মো'জেযা। ইবনে হজর হাইছমী (রহঃ) 'আল খাইরাতুল হিসান' নামক কিতাবে লিখেন-

"এটা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্পষ্ট মো'জেযা যে তিনি ভবিষ্যতের ঘটনা সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন।"

সুতরাং ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর অস্তিত্ব রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত সত্য হওয়ার প্রমাণ। কাজেই ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) কে অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। কারণ তাঁকে অস্বীকার করা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণী অস্বীকার করার নামান্তর। হাদীছ শরীফে من ابناء فارس অনারব শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। অনারবদের মধ্যে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিত্ব নেই, যাকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যৎবাণীর সঠিক প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

তাই প্রত্যেক মুসলমানকে ইমাম আবু হানিফার ব্যক্তিত্ব ও মহত্ব স্বীকার করতে হবে।

হাফেজ আব্দুল আযীয বিন মায়মুন (রহঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ইমাম আবু হানিফাকে মহব্বত করে সে সুন্নী আর যে তাঁকে ঈর্ষা করে সে বিদআতী।

জৈনিক বুয়র্গের স্বপ্ন

মুসাদ্দাদ বিন আদ্রির রহমান আল বসরী বর্ণনা করেন, আমি একবার রুকন এবং মাকামের মধ্যবর্তী স্থানে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। স্বপ্নে দেখতে পেলাম যে, জৈনিক বুয়র্গ এসে আমাকে বলছেন, তুমি এ স্থানে ঘুমিয়ে পড়েছ? অথচ এটা এমন স্থান যেখানে দোয়া করলে আল্লাহ তাআলা তা কবুল করে নেন। আমি অতি তাড়াতাড়ি ঘুম হতে জাগ্রত হয়ে গুরুত্ব এবং আগ্রহ সহকারে মুসলমানদের জন্য দোয়া করতে লাগলাম। দোয়া করতে করতেই আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। এবার স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যিয়ারত আমার নসীব হল। আমি আরজ করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কুফায় বসবাসকারী নু'মান নামক লোকটি সম্বন্ধে আপনি কি বলেন? আমি কি তার থেকে ইলম অর্জন করব? হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, হ্যাঁ, তার থেকে ইলম হাসিল কর এবং সে অনুযায়ী আমল কর। কারণ সে ভাল লোক।

আমি যখন ঘুম হতে জাগ্রত হলাম তখন ফজরের আযান হয়ে গেছে। খোদার কসম! ইতিপূর্বে ইমাম সাহেবকে আমি সবচেয়ে খারাপ লোক মনে করতাম। তাঁর সম্পর্কে এরূপ খারাপ ধারণা পোষণ করার কারণে এখন আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

জৈনিক সাহাবীর যিয়ারত এবং তাঁর থেকে রেওয়াজেতঃ- বাল্যকালে ইমাম ছাহেব হজ্জ মৌসুমে মক্কা মুকাররমায় জৈনিক ছাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ বিন হারিছ (রাঃ)-এর যিয়ারত করেন এবং তাঁর নিকট থেকে এটি শ্রবণ করে তার স্বর্ণনা করেন। মুসনাদে আবি হানিফার আল ইলম অধ্যায়ে উল্লেখ রয়েছে।

ইমাম আবু হানিফা বলেন, ৮০ হিজরীতে আমার জন্ম হয়। ১৬ বৎসর বয়সে ৯৬ হিজরীতে পিতার সাথে হজ্জে গমন করি। যখন মসজিদে হারামে প্রবেশ করলাম একটি হালকা দেখতে পেলাম। আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কার হালকা? তিনি বললেন, এটা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছাহাবী আব্দুল্লাহ বিন হারিছ (রাঃ)-এর হালকা। অতঃপর আমি তাঁর নিকটবর্তী হয়ে তাঁকে এ কথা বলতে শুনলাম “আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করে, আল্লাহ তাআলা তার প্রয়োজন মিটিয়ে দেন এবং ধারণাতীতভাবে আল্লাহ তাআলা তাকে রিযিক দিবেন।”

‘জামিউ বয়ানিল ইলম’ নামক কিতাবে ইবনে আব্দুল বারর এবং ‘আখবারু

আবি হানিফা ওয়া আসহাবীহী' নামক কিতাবে কাযী আবু আদিল্লাহ ইমাম সাহেবের বর্ণনা এরূপ উল্লেখ করেন, ৯৬ হিজরীতে ১৬ বৎসর বয়সে আমি আমার পিতার সাথে হজ্জ আদায় করতে গেলাম। দেখলাম, লোকেরা এক বুয়ুর্গের নিকট সমবেত হয়ে আছে। আমি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করলাম ইনি কে? তিনি বললেন, ইনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন ছাহাবী। এর নাম আব্দুল্লাহ বিন হারিছ (রাঃ)। আমি জিজ্ঞেস করলাম, “তঁার নিকট কি আছে যার কারণে লোকেরা তঁার পাশে জমায়েত হয়ে আছে? তিনি বললেন, তঁার নিকট হাদীছ আছে যা তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শ্রবণ করেছেন। আমি বললাম আমাকে সামনে এগিয়ে দিন যেন আমিও শুনতে পারি। তিনি আমার সম্মুখ থেকে ভিড় সরিয়ে দিতে লাগলেন। যখন আমি তঁার নিকটবর্তী হলাম তখন তিনি বলছিলেন, “আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, (এস্থলে পূর্বে হাদীছ বর্ণনা করলেন।)

হযরত আব্দুল্লাহ বিন হারিছ (রাঃ) মিশরে বাস করতেন। ৮৫, ৮৬, অথবা ৮৭ হিজরীতে তঁার ইন্তেকাল হয়। সুতরাং এ ঘটনা অন্য কোন আব্দুল্লাহ বিন হারিছের হবে। ইবনে হজর ‘আল-ইসাবা নামক গ্রন্থে আব্দুল্লাহ বিন হারিছ নামের ১৮-১৯ জন ছাহাবীর উল্লেখ করেন।

‘জামি’উ বয়ানিল ইলম’ কিতাবে ইমাম সাহেবের বর্ণনায় এ শব্দগুলো রয়েছে

“আমি আমার পিতার সাথে ৯৩ হিজরীতে হজ্জ আদায় করি তখন আমার বয়স ছিল ১৬ বৎসর।”

আমাদের ধারণা, এ বর্ণনায় বৎসর গনণায় ভুল হয়ে গেছে। মূলতঃ বর্ণনাটি এরূপ হয়ে থাকবে।

“ আমি আমার পিতার সাথে ৮৬ হিজরীতে হজ্জ পালন করি। তখন আমার বয়স ছিল ৬ বৎসর।

এর সমর্থন পরবর্তী বর্ণনা দ্বারা পাওয়া যাচ্ছে।

অতঃপর আমি বললাম, আমাকে তঁার দিকে এগিয়ে দিন যেন আমি তঁার কথা শুনতে পারি। তিনি আমার সামনে এসে লোকদের সরিয়ে দিতে লাগলেন। এতে আমি তার নিকট পৌঁছে গেলাম। অতঃপর তাকে বলতে শুনলাম।

১৬ বৎসরের যুবক পিতার নিকট এ ধরনের আবদার করে না। আর পিতাও এমন ছেলের জন্য আগে বেড়ে রাস্তা পরিষ্কার করে না। মুহাদ্দিছগণ ছোট ছোট ছেলেদের কাঁধে চড়িয়ে হাদীছের হালকায় নিয়ে বসিয়ে দিতেন এবং তাদের হাদীছ শুনাতেন। পূর্বে এর প্রচলন ছিল। সুতরাং এ ঘটনা তাঁর বাল্যকালের হবে। এ ধরনের ভুল হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়। যেমন, সিন্ধুবিজয়ী মুহাম্মদ বিন কাসেম সম্পর্কে প্রায় সকল ইতিহাসবিদগণ উল্লেখ করেন যে, ৯৩ হিজরীতে সিন্ধু আক্রমণ করার সময় তার বয়স ছিল ১৭ বৎসর। অথচ এটা সম্পূর্ণরূপে ভুল। এ বয়স ছিল তার ঐ সময়ের যখন তিনি পারস্যের অধিনায়ক ছিলেন। সেখানে থেকে সরাসরি তিনি ৯২ হিজরীতে সিন্ধু বিজয়ের জন্য অভিযান চালান। তখন তার বয়স ছিল ২৬-২৭ বৎসর।

অন্যান্য ছাহাবায়ে কিরামের যিয়ারত এবং তাদের থেকে রিওয়ায়েতঃ চার ইমামের মধ্যে শুধুমাত্র ইমাম সাহেব কয়েকজন ছাহাবীর যিয়ারত এবং তাদের সাহচর্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেন। তিনি উল্লেখযোগ্য তাবেঈনদের মধ্যে গণ্য। তাঁর বাল্যকালে কূফায় কয়েকজন ছাহাবী জীবিত ছিলেন। যাঁদের যিয়ারত এবং সাক্ষাৎ দ্বারা মুসলমানগণ ফয়েযইযার (ধন্য) হচ্ছিলেন। তাঁর দোকানের মালিক হযরত আমর বিন হুরাইছ (রাঃ) স্বয়ং জীবিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যু হয় ৮৫ হিজরীতে। তখন ইমাম সাহেবের বয়স ছিল পাঁচ বৎসর। স্পষ্টতঃই তিনি কখনও কখনও দোকানে আসা-যাওয়া করতেন এবং এ বালকটি তাঁকে দেখে থাকবেন। এতদ্ভিন্ন অধিকাংশ জীবনী লিখক এতে একমত যে, বাল্যকালে ইমাম সাহেব হযরত আনাস বিন মালেক (রাঃ)কে দেখেছেন। হাফিয যাহাবী লিখেন যে, ৮০ হিজরীতে ইমাম সাহেবের জন্মের সময় ছাহাবাদের এক জামাত কূফায় বর্তমান ছিলেন। ইনশাআল্লাহ! তাঁদের যিয়ারতের কারণে তিনি তাবেঈনদের দলভূক্ত হবেন। নির্ভরযোগ্য সূত্রমতে প্রমাণিত যে, হযরত আনাস (রাঃ) কূফায় আগমন করলে তিনি তাঁর যিয়ারতে যান। হাফিয যাহাবী 'তায়কিরাতুল হুফায়' কিতাবে উল্লেখ করেন যে, হযরত আনাস (রাঃ) কূফায় আগমন করলে ইমাম সাহেব তাকে একবার দেখেছিলেন। 'আল ইবার' নামক কিতাবেও এর উল্লেখ করা হয়েছে। ইবনে নদীম লিখেন যে, ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) কয়েকজন ছাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন। ইবনে খাল্লিকানের বর্ণনানুসারে ইমাম সাহেব চারজন ছাহাবীকে জীবদ্দশায় পেয়েছিলেন। হযরত আনাস বিন মালেক এবং হযরত আব্দুল্লাহ বিন আবি আওফা কূফায়, হযরত সাহল বিন সাদ সায়েদী মদিনায়, এবং হযরত আবু তোফায়েল আমের বিন ওয়াছিলা (রাঃ) মক্কায় ছিলেন। ইমাম সাহেব এদের সাথে মিলিত হয়ে ফয়েয

লাভ করেন। তবে ইমাম সাহেব ছাহাবাদের এক জামাত থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, এ কথা প্রমাণিত নয়।

ইমাম সাহেব বলেন, হযরত আনাস (রাঃ) কূফায় আগমন করেন এবং নাখ্বা গোত্রের নিকট অবস্থান করেন। তিনি লাল খিযায ব্যবহার করতেন। তাঁকে আমি কয়েকবার দেখেছি।

হাফিয ইবনে হজর (রহঃ) তার ফতোয়ায় লিখেন, ইমাম আবু হানিফার জন্মের সময় ছাহাবাদের এক জামাত জীবিত ছিলেন। তিনি ৮০ হিজরীতে কূফায় জন্মগ্রহণ করেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আবি আওফা (রাঃ) তথায় অবস্থান করছিলেন। তাঁর মৃত্যু ৮৮ হিজরী অথবা এরও পরে হয়েছিল। ইবনে সাদ বর্ণনা করেন, ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) হযরত আনাস (রাঃ) কে দেখেছিলেন। এ দুজন ব্যতীতও অন্যান্য শহরে আরও ছাহাবী ছিলেন। কেউ কেউ ইমাম আবু হানিফার, ছাহাবাদের থেকে শ্রুত হাদীছগুলো কিতাবাকারে সংকলন করেছেন। কিন্তু সেগুলোর সন্দেহক্রটিমুক্ত নয়। নির্ভরযোগ্য মত এটাই যে, তিনি কোন কোন ছাহাবীকে দেখেছিলেন। ফলে তিনি তাবেঈনদের মধ্যে গণ্য। তাঁর সমকালীন ইমামদের মধ্যে অন্য কারো এ সৌভাগ্য হয়নি। যেমন সিরিয়ায় ইমাম আওয়ায়ী, বসরায় হাম্মাদ বিন যায়েদ এবং হাম্মাদ বিন সালমা মদীনায় মালেক বিন আনাস, মিশরে লাইছ বিন সাদ ছিলেন। কিন্তু তাঁদের এ সুযোগ হয়নি।

প্রথম জীবনেই ইমাম সাহেব পারিবারিক ব্যবসার সাথে সাথে বহু-মুনাযারা অর্থাৎ তর্কবিদ্যায় অনেক এগিয়ে গিয়েছিলেন। সমস্ত মেধা শক্তি ইলমে কালাম বা আকীদা শাস্ত্রে এবং যিন্দিক ও মুলহিদের সাথে মুনাযারা করার পিছনে ব্যয় করতেন। ফলে ধর্মীয় জ্ঞান তথা হাদীছ এবং ফিকাহর দিকে মনোযোগ দেয়ার সুযোগ ছিল না। ঐ সময়েই ইমাম শাবী তাঁকে ধর্মীয় জ্ঞান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, আমি তাঁদের (উলামা এবং মুহাদ্দিসীদের) মজলিসে কম আসা-যাওয়া করি।

এ কারণেই ঐ সময়েই হাদীছের প্রতি মনোযোগ কম ছিল এবং ছাহাবাদের থেকে হাদীছ বর্ণনা করার মর্যাদা লাভ হয়নি।

যিন্দিক, মুলহিদ এবং বাতিল সম্প্রদায়ের সাথে মুকাবিলা

ইমাম সাহেব খুবই মেধাবী, তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। যুবাকাল তিনি আনন্দের সাথে নিশ্চিত মনে কাটাচ্ছিলেন। তখন একদিকে ফিকাহবিদগণ এবং মুহাদ্দিসীনগণ স্বীয় দ্বীনি এবং ইলমী হালকায় হাদীছ বর্ণনায় এবং মাসয়ালা গবেষণায় ব্যস্ত ছিলেন। অপরদিকে অনারবদের সংমিশ্রণের ফলে বাতিল সম্প্রদায়গুলো ইসলামী আকীদা এবং চিন্তাধারার বিপরীত মুনায়ারায় লেগেছিল। স্বয়ং মুসলমানদের গোমরাহ সম্প্রদায়ের মধ্যে জাহুমিয়া, কাদরিয়া, জবরিয়া, খাওয়ারিজ, রাওয়াক্ফিয, প্রভৃতি দলের সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। এর সাথে সাথে মাজুসিয়াত, ছানুবিয়াত, সমুমানিয়াত, ইলহাদ, যান্দাকার চিন্তাধারা ডানা বিস্তার করছিল। এদের মুকাবিলায় উলামায়ে ইসলাম' ইলমে কলামের অস্ত্র নিয়ে এগিয়ে আসেন।

ইমাম আবু হানিফা এঁদের মধ্যেই একজন ছিলেন। যুবাকালে তিনি এ ময়দানে অবতরণ করেন এবং খোদা প্রদত্ত মেধা, তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং চিন্তাশক্তি দ্বারা ইসলামী আকায়েদ এবং চিন্তাধারার সঠিক ব্যাখ্যা দিয়ে যিন্দিক এবং মুলহিদদেরকে পরাস্ত করে দেন। এমনকি এ ব্যাপারে ইমাম সাহেবের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি স্বয়ং বর্ণনা করেন, প্রথম জীবনে আমি বহছ-মুনায়ারায় ব্যস্ত থাকতাম। ঐ সময়ে বসরা ছিল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বহছ-মুনায়ারার কেন্দ্র। তাদের সাথে বহছ করার জন্য বিশ্বাবের অধিক আমাকে সেখানে আসা-যাওয়া করতে হয়েছে। কখনও এক বৎসর আবার কখনও এর কম সময় সেখানে অবস্থান করতাম এবং খাওয়ারিজ ও হাশরিয়াদের সাথে মুনায়ারা করতাম। ঐ সময়ে ইলমে কলাম আমার নিকট সবচেয়ে উত্তম ইলম ছিল। এরূপ ধারণা করতাম যে এটাই দ্বীনের ভিত্তি। এতে দ্বীনের অনেক বড় খিদমত হচ্ছে।

চিন্তাধারার পরিবর্তন

ইমাম সাহেব বলেন, দীর্ঘকাল পর্যন্ত একে ইলমে দ্বীন মনে করে ইসলামের শত্রুদের মুকাবিলা করছিলাম। পরে ভেবে দেখলাম যে, ছাহাবায়ে কিরাম এবং তাবেঈনগণ আমাদের চেয়ে অধিক জ্ঞানী এবং অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন। তাঁরা তো কখনও বহছ-মুবাহাছার পিছনে পড়েননি। বরং ধর্মীয় বিষয়ে ঝগড়া-ঝাটি করা থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। তাঁরা শরয়ী বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা

ভাবনা করতেন। তারা ফিকাহর মাসয়ালা গবেষণায় নিমগ্ন থাকতেন। এর জন্য তাঁরা দ্বীনি এবং ইলমী হালকা কায়েম করতেন। আর দেখতে পেলাম যে, যারা ইলমে কালাম এবং তার বহু-মুবাহাছায় লিপ্ত তারা সলফদের অনুরূপ নয়।

ইমাম হান্নাদ আবি সুলাইমানের দরসী হালকায়

ইমাম সাহেব বলেন, আমাদের মজলিস ছিল হান্নাদ বিন আবি সুলাইমানের ফেকহী শিক্ষা মজলিসের সন্থিকটে। যখন আমি এসব চিন্তা-ভাবনার কারণে অস্থির ছিলাম তখন একদিন জনৈকা মহিলা আমাকে জিজ্ঞেস করল যে, কোন স্বামী তার স্ত্রীকে সন্নাত মুতাবেক তালাক দিতে চায়। তার পদ্ধতি কি? আমি অনুতপ্ত এবং লজ্জিত হয়ে ঐ মহিলাকে বললাম, তুমি হান্নাদ বিন আবি সুলাইমান থেকে জেনে নিয়ে আমাকেও জানিয়ে দিও। ঐ মহিলা তদুপই করল। আমার মনে এ ঘটনার প্রতিক্রিয়া এরূপ হল যে, আমি বললাম আমার ইলমে কালামের প্রয়োজন নেই। অতঃপর আমি জুতা তুলে নিয়ে হান্নাদের মজলিসে গিয়ে বসলাম। এরপর থেকে তাঁর দরসী হালকায় উপস্থিত হতে লাগলাম।

হান্নাদ বিন আবি সুলাইমান আমার আগ্রহ এবং একাগ্রতা দেখে বললেন, আবু হানিফা ব্যতীত অন্য কেউ আমার সামনে বসবে না। আমি এভাবে এক নাগাড়ে দশ বৎসর তাঁর খিদমতে থেকে ইলমে ফিকাহ শিক্ষা লাভ করি। মাঝে একবার খেয়াল হয়েছিল যে, নিজেই একটা দরসী হালকা কায়েম করি। কিন্তু পরে হান্নাদের হালকাতেই একাগ্রতা সহকারে শিক্ষা অর্জন করতে লাগলাম। এ সময়ে বসরা হতে তাঁর আত্মীয়ের মৃত্যু সংবাদ এল। তিনি আমাকে তাঁর আসনে বসিয়ে দিয়ে বসরায় চলে যান। সেখানে তিনি দু'মাস ছিলেন। এ সময় আমার নিকট নতুন নতুন মাসয়ালা এসেছিল যেগুলো সম্পর্কে হান্নাদ থেকে কিছুই শুনি নি। আমি সেগুলোর উত্তর দিয়ে লিখে রেখেছিলাম। সেগুলো সংখ্যায় ছিল ষাটটি। হান্নাদ বসরা থেকে এসে সে মাসয়ালাগুলো দেখলেন। চল্লিশটি মাসয়ালায় আমার সাথে একমত হলেন আর বিশটি মাসয়ালায় ব্যাপারে ভিন্নমত প্রকাশ করলেন। অতঃপর আমি কসম করলাম যে, হান্নাদের জীবদ্দশায় আমি তাঁর হালকা থেকে বের হব না। তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত আমি সেখানেই রইলাম।

ইমাম সাহেব থেকে একটি বর্ণনায় এরূপ রয়েছে যে, যখন আমি হান্নাদ বিন আবি সুলাইমানের দরস থেকে পৃথক হওয়ার চিন্তা-ভাবনা করছিলাম,

তখন বসরায় যাওয়ার সুযোগ হল। সেখানকার লোকেরা আমাকে মাসয়ালা জিজ্ঞেস করলে কয়েকটি মাসয়ালায় উত্তর দিতে পারিনি। এজন্য সংকল্প করলাম, হাম্মাদ জীবিত থাকাকালে আমি তাঁর থেকে পৃথক হব না। অতএব আঠার বৎসর পর্যন্ত তাঁর খিদমতে ছিলাম।

ইমাম হাম্মাদ বিন আবি সুলাইমানের মৃত্যু হয় ১২০ হিজরীতে। তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত ইমাম সাহেব তাঁর সাথেই ছিলেন। আর এ সাহচর্যকাল ছিল আঠার বৎসর। এ হিসেবে দেখা যায় ইমাম সাহেব তাঁর বাইশ বৎসর বয়সে ১০২ হিজরীতে তাঁর দরসে শরীক হন। এর পূর্বে তিনি ইলমে কалаম এবং বহছ-মুবাহাছার মাধ্যমে ইসলামের প্রতিরক্ষামূলক খিদমত করেন।

ইমাম সাহেব শুরুতে যখন হাম্মাদ বিন আবি সুলাইমানের নিকট গেলেন তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেন এসেছ? ইমাম সাহেব বললেন, 'ফিকাহ অর্জন করার জন্য।' হাম্মাদ বললেন, তুমি দৈনিক তিনটি মাসয়ালা শিখবে। এর অধিক নয়। ইমাম সাহেব তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করলেন। ফলে কিছুদিনের মধ্যে তিনি ফিকাহ শাস্ত্রে নজীরবিহীন যোগ্যতা ও খ্যাতি অর্জন করে ফেললেন।

ইমাম শাবীর সাথে মুলাকাত

যে সময় ইমাম সাহেব ইলমে কалаম এবং বহছ-মুবাহাছা থেকে আস্তাহীন হয়ে পড়ছিলেন, তখন আরও একটি ঘটনা ঘটে যা তাঁর সমস্ত মনোযোগ ইলমে দ্বীনের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছিল।

ইমাম সাহেবের বর্ণনাঃ একদিন আমি ইমাম শাবীর দরসগাহের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি আমাকে দেখে ডাক দিলেন। তাঁর নিকট উপস্থিত হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কার নিকট আসা-যাওয়া কর? আমি বললাম, আমি অমুক ব্যক্তির নিকট যাচ্ছি। ইমাম শাবী বললেন, আমার প্রশ্নের উদ্দেশ্য বাজারে আসা-যাওয়া নয়। বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে তুমি কোন্ কোন্ উলামার দরসী মজলিসে অংশ নাও। আমি বললাম, আমি তাদের নিকট আসা-যাওয়া কম করি। এতে তিনি বললেন, তুমি এরূপ করো না। তুমি ইলমে দ্বীন এবং উলামাদের মজলিসে আসা-যাওয়া কর। আমি তোমার মধ্যে জগ্ৰত চিন্তাশক্তি এবং চেতনা দেখতে পাচ্ছি।

ইমাম শাবীর একথা আমার অন্তরে প্রভাব ফেলল। ঐ সময় থেকেই বাজারে এবং দোকানে আসা-যাওয়া বন্ধ করে ইলমে দ্বীন অর্জনে লেগে গেলাম। ইমাম শাবীর কথায় আল্লাহ তাআলা আমাকে অনেক উপকৃত করেছেন।

ইমাম আবু হানিফা এবং ইলমে হাদীছ

ইমাম সাহেব প্রায় বাইশ বৎসর বয়স পর্যন্ত ইলমে কলাম এবং মুবাহাছার মাধ্যমে ইসলামের খিদমত করেন। এ বিষয়ে তিনি পূর্ণতা অর্জন করেন। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তিনি ইলমে দ্বীন থেকে বিশেষ করে ইলমে হাদীছ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। বরং এ সময়েও তিনি ইলমে হাদীছের মজলিসে উপস্থিত হয়ে মুহাদ্দিছ এবং শায়খদের থেকে হাদীছ গ্রহণ করতেন। অবশ্য ইলমে কলামে ব্যস্ততা বেশী থাকার কারণে ইলমে হাদীছের দিকে মনোযোগ কম ছিল। যেমন তিনি নিজেই ইমাম শাবীর নিকট বলেছেন ‘আমি উলামাদের নিকট আসা-যাওয়া কম করি।’

হাম্মাদ বিন আবি সুলাইমানের দরসী মজলিসে शामिल হবার পর ইমাম সাহেব রাত-দিন ইলমে দ্বীন অর্জন করায় লেগে গেলেন। ইমাম হাম্মাদের ফিকহী দরসে দৈনিক মাত্র তিনটি মাসয়ালা নিয়ে হাদীছের আলোকে আলোচনা হত। অবশিষ্ট সময়ে অন্যান্য উলামা এবং মুহাদ্দিছীদের মজলিসে আসা-যাওয়া করতেন।

ইমাম সাহেবের জীবনীকারগণ তাঁর হাদীছ শাস্ত্রের অনেক শায়খের নাম উল্লেখ করেছেন। আবু হাফস আল কবীরের নির্দেশে ইমাম সাহেবের শায়খদের তালিকা প্রণয়ন করা হয়। এতে তাঁর শায়খদের সংখ্যা চার সহস্রে উপনীত হয়। হাফিয় আবু বকর মুহাম্মাদ বিন উমর আল জুবালী তাঁর কিতাব ‘কিতাবুল ইনতিসার’-এর বিশেষভাবে ইমাম সাহেবের অনেক শায়খের আলোচনা করেছেন। শায়খ শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন ইউসুফ আস্সালেহী আদদামেশীকী ‘তাসহীলুস্‌সাবীল’ নামক কিতাবে ইমাম সাহেবের শায়খদের নাম উল্লেখ করেন। ‘উকুদুল জুমান’ কিতাবে ইমাম সাহেবের শায়খদের নাম আরবী বর্ণমালা হিসেবে গণনা করা হয়েছে। তাঁদের সংখ্যা ২৮০ এরও অধিক।

ফিকাহ শাস্ত্রে ইমাম সাহেবের প্রধান শায়খ হচ্ছেন ইমাম হাম্মাদ বিন আবি সুলাইমান। তদ্রূপ হাদীছ শাস্ত্রে তাঁর প্রধান শায়খ হচ্ছেন ইমাম শাবী। আল্লামা যাহাবী লিখেন— তিনি আবু হানিফার প্রধান শায়খ।

ফিকাহ এবং ইজতিহাদে ইমাম সাহেব চার ইমামের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। আর ফিকাহ এবং ইজতিহাদের ভিত্তি হল কিতাব এবং সুন্যাহ। এ দুটি বিষয় ছাড়া কোন আলেমই ফকীহ কিংবা মুজতাহিদ হতে পারেন না। অবশ্য তিনি (ফকীহ, মুজতাহিদ) হাদীছ রেওয়য়াত করার তুলনায় হাদীছ নিয়ে গবেষণা করা এবং তা থেকে মাসয়ালা উদঘাটন করার প্রতি অধিক মনযোগী হয়ে থাকেন। এজন্য

প্রত্যেক ফকীহ এবং মুজতাহিদের জন্য মুহাদ্দিছ হওয়া আবশ্যিক।

ইমাম আমাশ (রহঃ) ইমাম সাহেবের হাদীছের শিক্ষক ছিলেন। একবার ইমাম সাহেব তাঁর খিদমতে উপস্থিত হলে তিনি তাঁকে কয়েকটি ইলমী প্রশ্ন করলেন। তিনি প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর দিলেন। প্রতিটি উত্তরের পর ইমাম সাহেব জিজ্ঞেস করতেন তুমি এ উত্তরটি কোন দলীল দ্বারা দিচ্ছ? ইমাম সাহেব বলতেন আপনাই বর্ণিত হাদীছ দ্বারা উত্তর দিচ্ছি। অবশেষে ইমাম আমাশ বললেন, হে ফিকাহবিদগণ! তোমরা হচ্ছ চিকিৎসক। আর আমরা হচ্ছি ঔষধ বিক্রেতা।

ইমাম সাহেবের বিশিষ্ট ছাত্র কাযী আবু ইউসুফ বলেন, আমি হাদীছের ব্যাখ্যা এবং তার ফিকাহী গূঢ়তত্ত্ব সম্পর্কে আবু হানিফা হতে অন্য কাউকে অধিক জ্ঞাত দেখিনি। আমি কোন কোন মাসয়ালায় তাঁর সাথে মতভেদ করার পর চিন্তা করে দেখতে পেলাম যে, ইমাম সাহেবের মতটিই ঠিক। অনেক সময়ে ফিকাহর বিপরীত হাদীছের দিকে ঝুঁকে পড়তেন। কিন্তু পরে বুঝতে পারলাম যে, সহীহ হাদীছ সম্পর্কে ইমাম সাহেব আমার চেয়ে অধিক জ্ঞাত।

কাযী আবু ইউসুফ আরও বলেন, একদা আমাশ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার ফিকাহর উস্তাদ আবু হানিফা হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)-এর এ কথাটি কেন তরক করলেন যে, বাঁদীকে মুক্ত করে দিলেই সে তালাক হয়ে যায়। আমি বললাম—

এ হাদীছের কারণে যা আপনি আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, ইব্রাহীম আসওয়াদ থেকে, তিনি হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে রেওয়ায়েত করেছেন যে, বারীরা কে যখন আযাদ করে দেয়া হল তখন তাকে অধিকার দেয়া হয়েছিল। এ কথা আমাশ বললেন, বস্তুতঃ আবু হানিফা হাদীছের স্থান এবং মহল ভালভাবেই জানেন। এ বিষয়ে সদাসতর্ক। আবু হানিফার ইলমে হাদীছ এবং তা দ্বারা মাসয়ালা প্রমাণ করার ব্যাপারে তিনি বিশ্বয় প্রকাশ করলেন।

হাসান বিন সালেহ বর্ণনা করেন, হাদীছের নাসেখ (রহিতকারী) এবং মনসুখ (রহিতকৃত) যাচাই করার ব্যাপারে ইমাম সাহেব বড়ই সতর্কতা অবলম্বন করতেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর ছাহাবীদের যে হাদীছ, তাঁর হাদীছ গ্রহণের মাপকাঠিতে গ্রহণযোগ্য হত, তিনি সে হাদীছ অনুযায়ী আমল করতেন। কূফায় উলামায়ে কিরামের হাদীছ এবং ফিকাহ সম্পর্কে তিনি সম্যক অবগত ছিলেন। তিনি নিজ শহরের কার্যাবলী (তামামুল) অবলম্বন করতেন, যে সকল কার্যাবলীর উপর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু

মালাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত হয়েছে এবং কূফার উলামাদের নিকট যা পৌঁছেছে তা সম্পর্কে তিনি অবগত ছিলেন।

একবার মুহাম্মদ বিন ওয়াসে' আলখোরাসানী খোরাসান গমন করেন। লোকেরা তাঁকে কিছু ফিকহী মাসয়ালা জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, ফিকাহ তো কূফার যুবক আলেম আবু হানিফার শাস্ত্র। তারা বলল, তিনি তো হাদীছ জানেন না। সেখানে আব্দুল্লাহ বিন মুবারক উপস্থিত ছিলেন। তিনি একথা শুনে রাগান্বিত হয়ে বললেন, তোমরা কি করে বল যে, আবু হানিফা হাদীছ জানেন না? একবার তাঁকে ভিজা (কাঁচা) খেজুর শুকনো খেজুরের বিনিময়ে বিক্রি করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি তা বৈধ বলে ফতোয়া দিলেন। এর বিপরীত হযরত সাদের হাদীছ উল্লেখ করা হলে তিনি বললেন, এ হাদীছটি শায্ব। যায়দ বিন আবি আয়্যাশ রাবীর কারণে হাদীছটি গ্রহণযোগ্য নয়। যে ব্যক্তি এরূপ কথা বলে সে কি হাদীছ জানে না?

সুফিয়ান বিন উয়াইনা বলেন, সর্বপ্রথম আবু হানিফা আমাকে মুহাদ্দিছ বানিয়েছেন এবং হাদীছ রেওয়ায়েত করার জন্য বসিয়েছেন। ঘটনা হচ্ছে, আমি কূফায় গেলে আবু হানিফা সেখানকার উলামাদেরকে বললেন, আমরা বিন দীনারের হাদীছ সম্পর্কে সুফিয়ান বিন উয়াইনা সবচেয়ে অধিক জ্ঞাত। এরপর সেখানকার উলামাগণ পাশে সমবেত হয়ে গেলেন। আমি আমার বিন দীনারের হাদীছ বর্ণনা করলাম। স্মর্তব্য যে, আমরা বিন দীনার ইমাম আবু হানিফারও হাদীছের উস্তাদ ছিলেন। কিন্তু তিনি সুফিয়ান বিন উয়াইনাকে তাঁর হাদীছের সবচেয়ে বড় আলেম হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

আব্দুল্লাহ বিন দাউদ বলতেন, আবু হানিফার জন্য দোয়া করা মুসলমানদের উপর ফরয। কারণ তিনি তাদের জন্য সুনান অর্থাৎ হাদীছ এবং ফিকাহ সংরক্ষণ করে গেছেন।

সুফিয়ান ছাওরী বলেন, আবু হানিফা শুধুমাত্র সহীহ হাদীছ গ্রহণ করতেন। নাসেখ এবং মনসুখ হাদীছ সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন। নির্ভরযোগ্য রাবীদের থেকেই বর্ণনা করতেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ আমল এবং কূফাবাসীদের মতানুসারে আমল করতেন। একেই দ্বীন হিসাবে গ্রহণ করে নিয়েছেন। একদল তাঁকে বিদ্রূপ করেছে, বদনাম করেছে। এমন ব্যক্তিদের সম্পর্কে আমরা চূপ থাকি এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।

হাদীছ বর্ণনা করার ব্যাপারে ইমাম সাহেব বলতেন, শুধুমাত্র ঐ হাদীছই গ্রহণ করা উচিত, যা শ্রবণের সময় থেকে বর্ণনা করার সময় পর্যন্ত স্মরণ

রেখেছে। ইয়াহয়া বিন মায়ীন বলেন, আবু হানিফা নির্ভরযোগ্য রাবী। যা স্মরণ থাকে তা বর্ণনা করেন আর যা স্মরণ থাকে না তা বর্ণনা করেন না।

ইমাম সাহেবের ছাত্র আব্দুর রহমান মক্কী সম্পর্কে বিশর বিন মুসা বর্ণনা করেন, যখন তিনি আবু হানিফা থেকে রেওয়াজেয়ত করতেন তখন বলতেন শাহানশাহ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন।

একবার ইয়াহয়া বিন মায়ীন ছাওরীর ঐ হাদীছগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে- যেগুলো তিনি আবু হানিফা থেকে রেওয়াজেয়ত করেছেন তিনি বললেন,

আবু হানিফা নির্ভরযোগ্য রাবী। তাঁকে দুর্বল বলতে কাউকে শুনি নি। শোবা বিন হাজ্জাজ আবু হানিফাকে হাদীছ বর্ণনা করতে লিখেন। আর শোবার তুলনা শোবাই।

একবার আবু সাদ সানআনী ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন, সুফিয়ান ছাওরী থেকে হাদীছ বর্ণনা করার ব্যাপারে আপনার কি মত?

তিনি বললেন,

তুমি তাঁর হাদীছ লিখে রাখ। কারণ তিনি নির্ভরযোগ্য। তবে হারেছ শৈকে বর্ণিত আবু ইসহাকের হাদীছগুলো এবং জাবের জুফীর হাদীছগুলো লিখো না।

হাদীছের রাবীদের সমালোচনা সম্পর্কেও ইমাম সাহেবের মত বিভিন্ন কিতাবে রয়েছে। তাঁর একটি মত এরূপ-

‘আমি জাবের জুফী থেকে অধিক মিথ্যাবাদী এবং আতা বিন আবি রাবাহ হতে অধিক উত্তম কাউকে দেখিনি।’

ইমাম সাহেব ইলমে হাদীছের সকল উৎস থেকেই হাদীছ গ্রহণ করেছেন। একবার তিনি খলীফা আবু জাফর মনসুরের নিকট গমন করেন। সেখানে ঈসা বিন মুসা তাঁর সম্পর্কে বলেন, বর্তমান দুনিয়ায় ইনি সবচেয়ে বড় আলেম। আবু জাফর মনসুর জিজ্ঞেস করলেন আপনি কার নিকট থেকে ইলম অর্জন করেছেন? ইমাম সাহেব উত্তরে বললেন, হযরত উমর (রাঃ)-এর ইলম তাঁর শিষ্যদের থেকে, হযরত আলী (রাঃ)-এর ইলম তাঁর শিষ্যদের থেকে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর ইলম তাঁর শিষ্যদের থেকে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর ইলম তাঁর শিষ্যদের থেকে অর্জন করেছি। ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সময় তাঁর চেয়ে বড় দ্বিতীয়জন ছিলেন না। এ কথা শুনে আবু জাফর মনসুর বললেন, আপনি বড়ই নির্ভরযোগ্য এবং গ্রহণযোগ্য ইলম অর্জন করেছেন।

ইমাম সাহেবের হাদীছ সম্পর্কিত জ্ঞান

মক্কী ইবনে ইব্রাহীম (রহঃ) ছিলেন ইমাম সাহেবের ছাত্র। হাদীস এবং ফিকহ উভয়টিই ইমাম সাহেব হতে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। ইসমাঈল বিন বাশার বলেন, একবার আমি মক্কী ইবনে ইব্রাহীমের মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। তিনি আবু হানিফা (রহঃ) থেকে হাদীছ বর্ণনা করতে লাগলেন। এক ব্যক্তি বলে উঠল, ইবনে জুরাইজের কোন রেওয়াজাত বর্ণনা করুন। আবু হানিফার রেওয়াজাত আমাদের প্রয়োজন নাই।

এক কথা শুনতেই তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে উঠলেন। বললেন, 'তুমি আমার মজলিস থেকে উঠে যাও।' সে ব্যক্তি উঠে যাওয়া পর্যন্ত তিনি কোন রেওয়াজাত বর্ণনা করেন নাই।

শাদ্দাদ বিন হাকীম বলেন, আবু হানিফা হতে অধিক জ্ঞানী আমি আর কাউকে দেখি নাই।

মারুফ বিন হাস্‌সান বলেন, যে সমস্ত উলামার সাথে আমার সাক্ষাৎ ঘটেছে তাদের মধ্যে হতে কেউ ফিকহ, তাকওয়া, রিয়াজত, ইবাদতে ইমাম সাহেবের সমতুল্য ছিলেন না।

ইউসুফ বিন খালিদ বলেন, আবু হানিফা ছিলেন বিশাল সমুদ্র। তাঁর তুল্য কাউকে দেখিও নাই, শুনিও নাই।

খলফ বিন আইয়ুব বলেন, আবু হানিফা (রহঃ) ছিলেন এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব।

ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন, প্রথম প্রথম আমি ইবনে আবি লায়লার মজলিসে যেতাম। পরে ইমাম সাহেবের মজলিসে যোগ দিলাম। একবার ইবনে আবি লায়লার সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি ইমাম সাহেবের অবস্থা জিজ্ঞাসা করলেন। অতঃপর বললেন, তাঁর মজলিস ত্যাগ করো না। ফিকহ এবং ইলমে তাঁর সমতুল্য কাউকে আমি দেখি নাই।

খলফ ইবনে আইয়ুব বলেন, 'ইলম আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে মুহাম্মদ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসেছে। অতঃপর তা ছাহাবাদের মধ্যে বন্টন হয়েছে। তারপর তাবেয়ীনের মধ্যে বন্টন হয়েছে। এরপর আবু হানিফা এবং তাঁর শাগরেদদের মধ্যে।

আব্দুল্লাহ বিন মুবারক (রহঃ) বলেন, যদি আশংকা না হত যে, আমার প্রতি সীমালংঘনের অভিযোগ করা হবে তাহলে আমি আবু হানিফার উপর কাউকে

অগ্রগণ্য করতাম না।

আবু ইছমা বলেন, আমি আমার উস্তাদদের থেকে শিখা অনেকগুলো হাদীছ ইমাম সাহেবের সম্মুখে পেশ করলাম। তিনি প্রত্যেকটি হাদীছের প্রয়োজনীয় অবস্থা বলে দিলেন যে, অমুক হাদীছটি গ্রহণযোগ্য অমুকটি গ্রহণযোগ্য নয়। এখন আমার আফসোস হচ্ছে যে, সবগুলো হাদীছ তাঁকে কেন শুনালাম না।

আবু হানিফা ছিলেন ইমাম আযম বা মহা ইমাম।

ইব্রাহীম বিন তুহমান বলেন, আবু হানিফা প্রত্যেক বিষয়ের ইমাম ছিলেন।

আবু ইমাইয়াকে জিজ্ঞাসা করা হল ইরাক হতে আগত উলামাদের মধ্য হতে ফিকহ্ সম্বন্ধে অধিক অভিজ্ঞ কে? তিনি বললেন, আবু হানিফা। তিনিই ইমাম।

ইবনে মুবারক (রহঃ) বলেন, তৌমরা একথা কিরূপে বল যে, ইমাম আযম হাদীছ জানেন না।

অর্থাৎ যিনি অন্যান্য ইমামদেরও ইমাম তিনি হাদীছ জানবেন না তা কিরূপে হতে পারে?

মানাকেবে আবি হানিফা নামক কিতাবে বর্ণিত রয়েছে, ইমাম সাহেব বলেন, আমার নিকট কয়েক সিন্দুক হাদীছ সংরক্ষিত রয়েছে। তন্মধ্যে হতে প্রয়োজনীয় কিছু সংখ্যক হাদীছ প্রকাশ করেছি।

খলফ বিন আইয়ুব বলেন, আমি আলেমদের মজলিসে অংশগ্রহণ করতাম। তাঁদের কোন কথা বুঝে না এলে চিন্তা হত। আবু হানিফার নিকট জিজ্ঞাসা করলে তার সমাধান হয়ে যেত। এতে অন্তরে নূরের সৃষ্টি হত।

মুকাতিল বিন সুলাইমান (রহঃ) বলেন, আমি ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)কে ইলমের ব্যাখ্যা করতে শুনেছি। তিনি এত সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করতেন যে, অন্তর শীতল হয়ে যেত।

ফযল বিন মুসা বলেন, আমি ঘুরে ঘুরে হিজায এবং ইরাকের আলেমগণের মজলিসে অংশ নিতাম। কিন্তু ইমাম সাহেবের মজলিসে যে ফায়দা পেতাম অন্য কারো মজলিসে তা পেতাম না।

একদা ওকী (রহঃ)-এর মজলিসে একটি হাদীছ পেশ করা হল। হাদীছটির ভাবার্থ কঠিন ছিল। তিনি দাঁড়িয়ে গিয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, এখন লজ্জিত হয়ে কি ফায়দা হবে। কোথায় আছেন সে শায়খ (অর্থাৎ আবু হানিফা)

থাকে দিয়ে হাদীছটি বুঝিয়ে নেওয়া যেত।

একবার ইবনে মুবারক (রহঃ) ইমাম সাহেবের কক্ষের পাশে দাড়িয়ে বললেন, ইব্রাহীম নখয়ী এবং হান্নাদ বিন সুলাইমান মৃত্যুবরণ করার সময় তাঁদের যোগ্য প্রতিনিধি রেখে গিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা আপনাকে রহম করুন। আপনার যোগ্য প্রতিনিধি পৃথিবীর বুকে কেউ নাই। একথা বলতে বলতে তিনি হুঁ করে কাঁদতে লাগলেন।

ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলতেন, আমার আকাংখা এই যে, ইমাম সাহেবের একটি মজলিস আমার নসীব হোক। এর জন্য আমার অর্ধেক সম্পদ ব্যয় করতেও রাজী আছি।

আসমায়ী (রহঃ) এ আকাংখার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, কোন কোন মাসয়ালায় আমার দ্বন্দ রয়েছে। সেগুলো পরিষ্কার করে নেয়া দরকার।

ঐ সময়ে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর নিকট বিশ লক্ষ দিরহাম ছিল।

খাল্লাদ সকুনী (রহঃ) বলেন, একদিন আমি খুছাইব বিন মুয়াবিয়ার নিকট গেলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কোথা হতে এসেছি? আমি বললাম, আবু হানিফার নিকট হতে এসেছি। তিনি বললেন, খোদার কসম! তাঁর নিকট একদিন বসলে যেকোন উপকৃত হবে আমার নিকট একমাস বসলেও সেরূপ হবে না।

ওকী (রহঃ) মুহাদ্দেছগণকে লক্ষ্য করে বলতেন, তোমরা হাদীছ শিখছো অথচ তার মর্ম বুঝতে চেষ্টা করছ না। এতে তোমাদের দ্বীন এবং তোমাদের জীবন দুটোই বিনষ্ট হবে। আমার তো এ আকাংখা যে যদি আমি তাঁর ফিকহর দশভাগের এক ভাগও পেতাম।

একদিন তিনি মজলিসে উপস্থিত ছাত্রদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, ফিকহ ব্যতীত হাদীছ দ্বারা তোমাদের কোন ফায়দা হবে না। তোমাদের সম্বন্ধ সৃষ্টি হবে না। যদি না তোমরা ইমাম আবু হানিফার শাগরেদদের সাহচর্য অবলম্বন কর এবং তাঁরা তাঁদের মতের ব্যাখ্যা না করেন।

ইবনে মুবারক (রহঃ) বলেছেন, তোমরা এরূপ বলো যে, আবু হানিফার গায় বরং বলো হাদীছের ব্যাখ্যা।

ইউসুফ বিন খালিদ (রহঃ) বলেন, আমি বসরায় উছমান (রহঃ)-এর গিদমতে আসা-যাওয়া করতাম। সে সময় আমার ধারণা এল যে, আমার যথেষ্ট ইলম শিখা হয়ে গেছে। কিন্তু যখন ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর খিদমতে

উপস্থিত হলাম তখন আমার চোখ খুলল। বুঝলাম আমার কোন ইলমই শিখা হয় নাই।

শাদ্দাদ বিন হাকীম বলেন, যদি ইমাম আবু হানিফা এবং তাঁর শাগরেদদের দ্বারা আল্লাহ তাআলা আমাদের উপর ইহসান না করতেন তবে আমরা বুঝতে পারতাম না যে কোনটিকে অবলম্বন করব কোনটি করব না।

ইবনে মোবারক (রহঃ) স্বীয় শাগরেদদিগকে বলতেন, তোমরা হাদীছ এবং আছার আঁকড়ে ধর। তবে এর জন্য আবু হানিফার প্রয়োজন আছে কারণ তিনি হাদীছের অর্থ বুঝেন।

মুহাদ্দেহগণ বলতেন ইবনে মুবারক আবু হানিফা হতে বড় আলেম। এ কথা শুনে আবু সায়ীদ বিন মুয়ায বললেন, এ সমস্ত লোক রাফেযীর মত। তারা হযরত আলীকে স্বীয় ইমাম মানে অথচ স্বয়ং তাদের ইমাম যাদেরকে ইমাম হিসাবে মানে তারা তাঁদের ইমাম মানেন না। তদ্রূপ এরাও ইবনে মুবারককে নিজেদের ইমাম সাব্যস্ত করে। অথচ তিনি স্বয়ং যাকে নিজের ইমাম সাব্যস্ত করেছেন তারা তাকে ইমাম হিসাবে মানছে না।

সমকালীনদের অভিযোগ গ্রহণযোগ্য নয়

যেমনভাবে বিভিন্ন কিতাবে বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের বাণী দ্বারা ইমাম সাহেবের গুণাবলীর প্রকাশ পেয়েছে তদ্রূপ কোন কোন ব্যক্তি হতে ইমাম সাহেবের সমালোচনাও বর্ণিত হয়েছে। বিশেষ করে 'তারীখে বাগদাদ' নামক কিতাবে খতীবে বাগদাদী ইমাম সাহেব সম্বন্ধে সমালোচনামূলক কিছু কিছু মন্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে সেগুলোর ভিত্তিহীনতা এবং বাতুলতা প্রমাণ করা হচ্ছে।

ইমাম সম্বন্ধে যে সব সমালোচনামূলক মন্তব্য খতীবে বাগদাদী উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো এমন সব ব্যক্তির মন্তব্য ইমাম সাহেবের সাক্ষাৎ যাদের নসীব হয় নাই। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন রয়েছেন যারা ইমাম সাহেবের সমকালীন ছিলেন বটে তবে ইমাম সাহেবের সাথে তাদের সাক্ষাতের সুযোগ এবং সৌভাগ্য হয় নাই। আবার কেউ কেউ ইমাম সাহেবের সমকালীন ছিলেন না। শুনে শুনে ইমাম সাহেবের সমালোচনা করে কুৎসা গেয়ে বেড়িয়েছেন। কাজেই ইমাম সাহেবের ব্যাপারে তাদের কারো কথাই গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ তারা ইমাম সাহেবকে দেখাতে পান নাই। যদি দেখার সুযোগ হতো তবেই না ইমাম সাহেবের বিরোধিতা করা যেতো।

যারা ইমাম সাহেবের সমকালীন ছিলেন এবং ইমাম সাহেবের বংশগৌরব

এবং মান মর্যাদা দেখে তাঁর বদনাম গেয়ে বেড়িয়েছেন তাঁরা ছিলেন হিংসাপরায়ণ এবং ইমাম সাহেবের দুশমন। হিংসুকদের এ ধরনের কথা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।

সম্ভবতঃ এ ধরনের লোকদের কথাই এ হাদীছে বলা হয়েছে,

يأتى على امتى زمان يحسد الفقهاء بعضهم بعضا

আমার উম্মতের এমন এক সময় আসবে যখন ফকীহরা পরস্পরকে হিংসা করবে।

‘সিয়াকু আলামিনুবলো’ নামক কিতাবে আল্লামা যাহরীর কথা দ্বারা বুঝা যায় যে, সমকালীন সমালোচকদের কথা গ্রহণযোগ্য নয়।

ইবনে হজর মক্কী (রহঃ) ‘আলখাইরাতুল হিসান ফী মানাফেকে নু’মান’ নামক কিতাবে লিখেন, সমকালীন লোকদের পরস্পর সমালোচনা গ্রহণযোগ্য নয়। হাফেয ইবনে হজর এবং আল্লামা যাহরীও এ মত প্রকাশ করেছেন। বিশেষ করে বুঝা যায় যে, কোন শত্রুতার কারণে অথবা মাযহাবের কারণে সমালোচনা করা হচ্ছে। কারণ হিংসা হতে আল্লাহ যাকে হিফায়ত করেন সেই নিষ্কৃতি পেয়ে থাকে।

আল্লামা যাহরী বলেন, কোন একটি যুগের লোক হিংসা হতে নিরাপদে রয়েছে বলে আমি শুনি নাই।

তিনি আরো লিখেন, ‘তাজ সবকী তবাকাতে’ বলেছেন, মুহাদ্দেহগণের নিয়মানুসারে জরাহ (দোষ বর্ণনা) তা’দীলের (গুণের) উপর মুকাদ্দম (অগ্রগণ্য)। এটা দ্বারা এরূপ বুঝা না যে, সর্বক্ষেত্রে এ নিয়ম প্রযোজ্য। বরং সঠিক হল যার সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও দোষমুক্তি প্রমাণিত, যার গুণ বর্ণনাকারী অধিক এবং দোষ বর্ণনাকারী কম অধিকত্ব দোষ বর্ণনাকারী স্বীয় মাযহাব ও মত প্রচার সম্পর্কিত কোন স্বার্থও এর সাথে সংশ্লিষ্ট যাকে সে ক্ষেত্রে দোষ বর্ণনার প্রতি ক্রক্ষেপ করা হবে না।

এ সম্পর্কে ‘ফতহুল মুগীছ আদদাউল লামে’ ফী আ’য়ানেল মুনিততাসে’ মিনহাজুস্‌সুন্নাহ’ প্রভৃতি কিতাবেও আলোচনা করা হয়েছে।

এ বিষয়ে মোদ্দাকথা হল, সম-সাময়িক আলেমরা যদি একে অপরের সমালোচনা করে তবে লক্ষ্য করতে হবে যে, এর পিছনে কারণ কি? যদি দেখা যায় যে তার কারণ হচ্ছে হিংসা অথবা স্বীয় মাযহাব বা মত সম্পর্কিত কোন স্বার্থ কিংবা পার্থিব কোন উদ্দেশ্য। আর সমালোচনা করা হচ্ছে এমন ব্যক্তির

যার সততা ও ন্যায়পরায়ণতা প্রসিদ্ধ, যার পাপ হতে পূণ্য অধিক এবং তাঁর প্রশংসাকারীও বহুসংখ্যক তবে এমন লোকের সম্বন্ধে কোন সমালোচনাই গ্রাহ্য নয়। এ কারণেই সুফিয়ান ছাওরী ইমাম সাহেব সম্বন্ধে ইবনে আবি খিব ইমাম মালেক সম্বন্ধে, ইবনে মা'য়ীন ইমাম শাফেয়ী সম্বন্ধে, নাসাঈ আহমদ বিন সালেহ সম্বন্ধে এবং সাখাবী সূয়ুতী সম্বন্ধে যে মন্তব্য বা সমালোচনা করেছেন তা গ্রহণযোগ্য নয়।

তাবাকাতুশ্ শাফেয়ীয়া নামক কিতাবে ইমাম সুবকী (রহঃ) লিখেন, আবু যুরআ এবং আবু হাতেম ইমাম বোখারী (রহঃ) সম্পর্কে লিখেছেন যে, তিনি মতরুক (অর্থাৎ তার হাদীছ গ্রহণযোগ্য করা যায় না)। কিন্তু তাঁদের লিখা দ্বারা তিনি মতরুক হননি।

ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত রয়েছে, উলামাদের কথা শোন। কিন্তু অন্যের বিরুদ্ধে যে কথা বলে তা সত্য মনে করো না।

মালেক ইবনে দীনার বলেন, প্রতিটি বিষয়ে উলামাদের কথা গ্রহণ করা হবে। কিন্তু পরস্পরের বিরুদ্ধে যে কথা বলে তা গ্রাহ্য হবে না।

ইমাম সাহেবের সম-সমায়িক মুহাদ্দেছগণের মধ্য হতে যারা তার সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য করেছেন তাদের অধিকাংশই প্রাথমিক ভাবধারা হতে প্রত্যাবর্তন করেছেন। যেমন সুফিয়ান ছাওরী, আওয়ায়ী ওকী (রহঃ) প্রমুখ। তারা ইমাম সাহেব সম্বন্ধে যে সব বিরূপ মন্তব্য করেছেন এর দ্বারা ইমাম সাহেবের নিষ্কষুতা এবং নির্ভরযোগ্যতা আরো দৃঢ় হয়। কারণ তারা তাদের পূর্বের কথা তথা ইমাম সাহেব সম্বন্ধে বিরূপ মন্তব্য হতে প্রত্যাবর্তন করা এ কথাই প্রমাণ করে যে, তাদের নিকট পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, তারা ইমাম সাহেব সম্বন্ধে যেসব দোষারূপ করেছেন ইমাম সাহেব সেসব হতে পবিত্র।

ইমাম সাহেবের উপর তাদের; বরং সবার পক্ষ হতে এ অপবাদ ছিল যে, ইমাম সাহেব হাদীছ জানতেন না। হাদীছের বিপরীতে তিনি স্বীয় মত প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে যখন এঁরা তাঁর বিরোধীতা হতে প্রত্যাবর্তন করে ইমাম সাহেবের প্রশংসায় মেতে উঠলেন তখন এতে নিশ্চিতরূপে বুঝা গেল তাদের প্রদত্ত অপবাদগুলো ভিত্তিহীন।

এরপরও যারা এ মন্তব্য করেন যে, ইমাম সাহেব হাদীছ জানতেন না এবং তিনি হাদীছের বিপরীতে স্বীয় মতানুযায়ী আমল করতেন। পক্ষান্তরে তারা সুফিয়ান ছাওরী, আওয়ায়ী প্রমুখের উপর মিথ্যা বলার অপবাদ লাগাচ্ছেন।

অধিকন্তু, ইমাম সাহেবের (সমালোচকদের) সংখ্যা তাদীলকারীদের তুলনায় কম। তারা এদের তুলনায় মর্যাদাগত দিক থেকেও ছোট। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, ইমাম সাহেবের সমালোচনার কারণ ছিল হয় অজ্ঞতা অথবা হিংসাপরায়ণতা।

হাদীছের কয়েকজন শায়খের তালিকা

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ইমাম সাহেবের উস্তাদ এবং শায়খদের সংখ্যা অনেক বেশী। এখানে প্রধান প্রধান কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হচ্ছে।

আমের বিন শুরাহিল আল হিমযারী আল কুফী, হাম্মাদ বিন আবি মুগাইমান, মুসলিম আশআরী আল কুফী, আলকামা বিন মারছাদ আল হায়রামী আলকুফী, হাকাম বিন উতাইবা আলকুফী, আসেম বিন আবিন্নাজুদ আলকুফী, মালমা বিন কুহাইল আলহায়রামী আলকুফী, আলী ইবনুল আকমার আলকুফী, আতা বিন আবি রাবাহ আলমক্কী, সায়ীদ মসরুক ছাওরী, আবু জাফর বাকের মুহাম্মদ বিন আলী বিন হুসাইন, আদী বিন ছাবেত আনসারী আলকুফী, আতিয়া বিন সায়ীদ আওফী আলকুফী, আবু সুফিয়ান সাদী, আবু উমাইয়া আব্দুল করীম, আবু মুখারেক আলবসরী, ইয়াহয়া বিন সায়ীদ আনসারী, হিশাম বিন উরওয়া আলমাদানী, নাফে মাওলা ইবনে উমর আলমাদানী, আব্দুর রহমান বিন হুরমুয আল আরাজ আলমাদানী, কাতাদা, আমর বিন দীনার আলমক্কী, আবু ইসহাক সুবায়য়ী আলকুফী, মুহারিব বিন দিছার আলকুফী, হুয়াইছম বিন হাবীব সাওয়্যাফ আলকুফী, কায়স বিন মুসলিম আলকুফী, ইয়াযীদ বিন সুহাইব আলকুফী, আব্দুল আযীয বিন রফী আলমক্কী আলকুফী, আবু যোবায়ের মুহাম্মদ বিন মুসলিম আলমক্কী, মনসূর বিন মু'তামির আলকুফী, সুলাইমান বিন মেহরান আলআমাশ আলবসরী প্রমুখ।

হাদীছের রেওয়াজেত কম হওয়ার কারণ

যেহেতু ইমাম সাহেবের মূল বিষয় ছিল ফিকাহ এবং ইজতিহাদ, সেহেতু তিনি হাদীছের ব্যাপারে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করতেন। হাদীছ রেওয়াজেত করার চেয়ে সে ব্যাপারে গবেষণা করার প্রতি অধিক মনোযোগী ছিলেন। এ কারণে বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাঁর বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা কম মনে হয়। এ বিষয়টিকে অবলম্বন করেই পরশ্রীকাতররা তিলকে তাল করে পেশ করেছে। অথচ অধিক সতর্কতা অবলম্বন করার কারণে অন্যান্য ইমামগণের বর্ণিত হাদীছের সংখ্যাও তুলনামূলক কম। যেমন ইমাম মালেক (রহঃ)-এর বর্ণিত হাদীছের সমষ্টি

শুধুমাত্র তাঁর কিতাব মুয়াত্তা। হাদীছের অন্যান্য কিতাবের তুলনায় এ কিতাবটি নেহায়াতই সর্ক্ষিণ্ড। এর অর্থ এ নয় যে, ইমাম মালেক (রহঃ) হাদীছ জানতেন না। বরং তিনি হাদীছের বিষয়ে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করেছেন এবং অধিক হাদীছ বর্ণনা করা থেকে বিরত রয়েছেন।

ইবনে আবি হাতেম বর্ণনা করেন, আমি ইয়াহয়া বিন ময়ীনকে জিজ্ঞেস করলাম যে, ইমাম মালেকের হাদীছ কম কেন? তিনি বললেন, অধিক সতর্কতা এবং যাচাইয়ের কারণে এরূপ হয়েছে। স্বয়ং ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, আমি ইবনে শিহাব যুহরী থেকে অনেক হাদীছ শ্রবণ করেছি। কিন্তু সেগুলো আমি কখনও রেওয়াজেত করিনি। করবও না। এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, এগুলো অনুসারে আমল করা হয় না। ইমাম মালেক (রহঃ)-এর মৃত্যুর পর তাঁর কিতাবগুলো বের করা হলে দেখা গেল সেখানে ইবনে উমর (রাঃ)-এর অনেক হাদীছ রয়েছে। মুয়াত্তায় সেসব হাদীছ থেকে মাত্র দুটি হাদীছকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন, ইমাম মালেক (রহঃ) হাদীছের অংশ বিশেষে সন্দেহ হলে পুরো হাদীছটিই বাদ দিয়ে দিতেন। আব্দুল্লাহ বিন ওয়াহাব বলেন, মানুষের ইলম বৃদ্ধি পেতে থাকে আর হাদীছের ব্যাপারে ইমাম মালেকের ইলম কমতে থাকে। ঠিক তদ্রূপ ইমাম আবু হানিফা হাদীছের বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করতেন। এ বিষয়ে তিনি হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)-এর অনুসারী ছিলেন। যাঁর অবস্থা এই যে তিনি সহজে قال رسول الله صلى الله عليه وسلم বলতেন না। আর যখন এ বাক্য বলতেন, তখন শরীরে কম্পন এসে যেত এবং চেহারা বিবর্ণ হয়ে যেত। আর যেহেতু ইমাম সাহেব হাদীছ বর্ণনা হতে তাফাক্কুহ অর্থাৎ গবেষণাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং কোরআন ও হাদীছ থেকে মাসয়ালা বের করার পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, তাই আহকামবিশিষ্ট ঐ হাদীছের উপর জোর দিয়েছেন যেগুলো গবেষণা এবং ইজতিহাদযোগ্য। ইবনে শুবরুমা বলেন, হাদীছ কম বর্ণনা কর। ফকীহ হতে পারবে। হাসান বসরী বলেন,

ফিকাহ যার মজ্জাগত বিষয় না হবে, হাদীছ বর্ণনা দ্বারা তবে কোন ফায়দা নেই।

ফকীহ হওয়ার জন্য মুহাদ্দিছ হওয়া আবশ্যিক। যদি হাদীছ সম্পর্কে জ্ঞান না থাকে, তা থেকে আহকাম এবং মাসয়ালা কিভাবে বের করবে? হাদীছ অধিক রেওয়াজেত করা একজন ফকীহর উদ্দেশ্য নয়। এজন্য সাধারণ মুহাদ্দিছগণের

মত তাঁরা হাদীছ জমা করেন না। এটা মুহাদ্দিছগণের কাজ, যাঁরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক একটি হাদীছের জন্য দূর-দুরান্ত সফর করেছেন এবং কষ্ট করে সেগুলো জমা করেছেন।

অল্প সংখ্যক হাদীছ বর্ণনার অপবাদ খণ্ডন

ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) থেকে বর্ণিত হাদীছ সংখ্যা খুবই কম। এটিকে ভিত্তি করে তার সমালোচকগণ অপবাদ দিচ্ছে যে তাঁর হাদীছের জ্ঞান খুবই সীমিত।

মূলতঃ কারও বর্ণিত হাদীছের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তাঁর হাদীছের জ্ঞান পরিমাণ করা যায় না। কারণ স্বল্প সংখ্যক হাদীছ বর্ণনা করায় হাদীছের জ্ঞান সীমিত হওয়া বুঝা যায় না।

যেমন দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা ৫৪৫টি। অথচ তিনি নবুওয়্যাতের ষষ্ঠ বছর ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সর্বদা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যে ছিলেন। তাঁর জানা হাদীছের সংখ্যা তাঁর বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা হতে অনেক বেশী হবে।

হযরত আলী (রাঃ) সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে একজন। চব্বিশ বছর যাবৎ তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যে ছিলেন। অথচ তাঁর বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা ৫৮৬টি। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)-এর হাদীছের সংখ্যা ৮৪৮টি অথচ তিনি ২২ বছর যাবৎ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদেম হিসেবে তাঁর সাহচর্যে ছিলেন।

এঁদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ বর্ণিত হাদীছ সংখ্যা থেকে অনেক গুণ অধিক হাদীছ জানতেন। কিন্তু অত্যাধিক সতর্কতা অবলম্বন করার কারণে খুবই কম হাদীছ বর্ণনা করতেন। কারণ হাদীছ বর্ণনায় সামান্যতম ভুলেও ভয়ের কারণ রয়েছে। এ কারণে তাঁরা সরাসরি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে সম্পর্কিত করে হাদীছ বর্ণনা করতেন না। অবশ্য তাঁরা মাসায়েল এবং ফতোয়ার আকারে হাদীছ বর্ণনা করতেন। ‘আল এসাবা’ নামক কিতাবে বর্ণিত রয়েছে যে, হযরত উমর (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ), হযরত ইবনে উমর (রাঃ), হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত যায়েদ বিন ছাবেত (রাঃ), হযরত আয়েশা (রাঃ) প্রমুখের ফতোয়া এত অধিক যে, সেগুলো সংকলন করলে প্রত্যেকের ফতোয়াই একেকটি কিতাবাকার ধারণ করবে।

হাদীছ বর্ণনা করার ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) এবং তাঁর সঙ্গীগণ ছাহাবায়ে কিরামের পথ অনুসরণ করেন। তাঁরা এরূপ করেননি যে, যে হাদীছই শ্রবণ করেছেন তাই বর্ণনা করেছেন। বরং তারা হাদীছের মধ্যে নাসেখ-মনসুখ দুর্বল শক্তিশালী প্রভৃতি দিক বিবেচনা করে যেটা গ্রহণযোগ্য সেটাই বর্ণনা করতেন। অধিকন্তু তারা ছাহাবায়ে কিরামের আমল, তাঁদের ফতোয়া এবং বাণী দ্বারা হাদীছ নিরূপণে সহায়তা নিতেন। হানাফী মাযহাবের এ সব প্রশংসনীয় দিকের কারণে তাঁর সমালোচকরা ঈর্ষাকাতর হয়ে এ অপবাদ দিচ্ছে যে তিনি খুব কম সংখ্যক হাদীছ বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর অল্প সংখ্যক হাদীছ বর্ণনা করার অপবাদের আরেক উত্তর এভাবে দেয়া হয়ে থাকে যে, হাদীছ মূলতঃ দু প্রকারের। এক প্রকারের হাদীছ আহকামের সাথে সম্পর্কিত। দ্বিতীয় প্রকারের হাদীছ আহকামের সাথে সম্পর্কিত নয়।

দ্বিতীয় প্রকারের হাদীছ বর্ণনা করার ব্যাপারে ছাহাবায়ে কিরাম এবং ফিকাহবিদগণ অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। বরং খোলাফায়ে রাশেদীন এ প্রকারের হাদীছ বর্ণনা করা থেকে বিরত রয়েছেন এবং অন্যদেরকেও তার বর্ণনা করা থেকে নিষেধ করেছেন। আর প্রথম প্রকারের হাদীছ আহকামের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার কারণে সেগুলো বর্ণনা করা থেকে নিষেধ করতেন না। বরং সেগুলো বর্ণনা করার জন্য তাকীদ করতেন। খলীফা হওয়ার পর হযরত উমর (রাঃ) বলেন, তোমরা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীছ কম বর্ণনা কর। তবে যেগুলো আমল করা প্রয়োজন সেগুলো বর্ণনা কর।

হযরত উবাদা বিন ছাবেত (রাঃ) বলেন, যে সমস্ত হাদীছে তোমাদের ধর্মীয় ফায়দা রয়েছে, সেগুলো সব আমি বর্ণনা করে দিয়েছি।

হযরত উবাদা (রাঃ)-এর এ বাণীর ব্যাখ্যায় কাযী আরায (রহঃ) বলেন, এ কথা দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, তিনি সে সব হাদীছ রেওয়াজেত করেননি যেগুলোতে মুসলমানদের কোন ক্ষতি বা ফিৎনায় পতিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে কিংবা যেগুলো প্রত্যেকেই বুঝতে পারবে না। আর এগুলো সে সব হাদীছ যেগুলো আহকাম কিংবা দণ্ডবিধানের সাথে সম্পর্কিত নয়। এ ধরনের হাদীছ রেওয়াজেত না করা হযরত উবাদা বিন ছাবেত (রাঃ)-এরই বিশেষত্ব নয় বরং অন্যান্য অনেক ছাহাবী থেকেও এরূপ অনেক প্রমাণ রয়েছে।

ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)ও খোলাফায়ে রাশেদীন এবং বিশিষ্ট ছাহাবায়ে কিরামের নির্দেশাবলীর প্রতি লক্ষ্য রেখে শুধুমাত্র সে সমস্ত হাদীছ বর্ণনা

করেছেন যেগুলো আহকামের সাথে সম্পর্কিত।

শাহ ওলীউল্লাহ (রহঃ), হযরত উমর (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-কে তাদের বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা কম হওয়া সত্ত্বেও অধিক হাদীছ বর্ণনাকারীদের মধ্যে গণনা করেছেন। তিনি লিখেন, সমস্ত মুহাদ্দিছগণই অধিক হাদীছ বর্ণনাকারী হিসেবে আটজন ছাহাবীকে সাব্যস্ত করেছেন, এঁরা হচ্ছেন হযরত আবু হোরায়রাহ (রাঃ), হযরত আয়েশা (রাঃ), হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ), হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ), হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রাঃ), হযরত আনাস (রাঃ), হযরত জাবের (রাঃ), হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)। আর হযরত উমর (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)কে মাঝারি সংখ্যক হাদীছ বর্ণনাকারীদের মধ্যে গণনা করা হয়েছে। কিন্তু এ ফকীহের মতে এদের থেকেও অনেক হাদীছ বর্ণিত রয়েছে। কারণ, বাহ্যতঃ যে সব হাদীছ মওকুফ, বস্তুতঃ সেগুলো মরফু। আর এঁদের থেকে ফিকাহ, ইহসান এবং হিকমত সম্পর্কীয় যে সব বাণী বর্ণিত রয়েছে, বিভিন্ন কারণে সেগুলোও মরফু এর পর্যায়। সুতরাং তাঁদেরকে অধিক হাদীছ বর্ণনাকারীদের মধ্য গণনা করাই সমীচীন।

উল্লেখিত তিনজন ছাহাবীর প্রত্যেকের থেকে বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা পাঁচশ থেকে হাজারের মধ্যে। এঁদেরকে যদি অধিক হাদীছ বর্ণনাকারীদের মধ্যে গণনা করা সঠিক হয়ে থাকে তবে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-কে যার বর্ণিত মরফু হাদীছ ব্যতীত ও মওকুফ হাদীছ, মাসায়েল, ফতোয়া ইত্যাদি হাযার হাযার পৃষ্ঠাব্যাপী রয়েছে তাঁকে কোন মতেই অল্প সংখ্যক হাদীছ বর্ণনাকারী বলা সমীচীন হবে না।

প্রসিদ্ধ তাবেয়ী মসরুক (রহঃ) বলেন, আমি গভীরভাবে চিন্তা করে দেখলাম যে, সমস্ত জ্ঞানের উৎস হচ্ছেন হযরত উমর (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ), হযরত য়ায়েদ (রাঃ), হযরত আবু দারদা (রাঃ) এবং হযরত উবাই (রাঃ)। এরপর আরো গভীরভাবে চিন্তা করে দেখলাম যে, এদের সবার সমস্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার হচ্ছেন হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)।

শাহ ওলীউল্লাহ (রহঃ)-এর একটি দীর্ঘ আলোচনার সারকথা এরূপ, ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর শিক্ষক ইব্রাহীম নখয়ী (রহঃ) তাঁর মাযহাবের ভিত্তি রাখেন হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর বর্ণিত মাসায়েল এবং ফতোয়ার উপর।

ইব্রাহীম নখয়ী ছিলেন কৃষ্ণার সমস্ত আলেমদের জ্ঞান ভাণ্ডার। তাঁর ফিকাহর অধিকাংশ মাসয়ালাই ছাহাবায়ে কিরাম থেকে বর্ণিত। তিনি সে সব মাসয়ালাই সংগ্রহ করেছেন যেগুলো সহীহ হাদীছের আলোকে নির্ভুল।

এর উপসংহারে শাহ সাহেব যা লিখেছেন. তার মর্ম এরূপ, ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) ইব্রাহীম নখয়ী (রহঃ)-এর মাসায়েল এবং ফতোয়া অর্জন করেন।

মাসয়ালা গবেষণার ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল। ইব্রাহীম নখয়ী (রহঃ) এবং তাঁর সমকালীনদের মাসায়েল এবং বাণীগুলো যদি মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, মুসান্নাফে আন্দির রাযযাক এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর কিতাবুল আছার এর সাথে মিলিয়ে দেখা হয় তবে খুব অল্প সংখ্যক মাসয়ালার মধ্যে অমিল পাওয়া যাবে।

ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর সমালোচক এবং ঈর্ষাকাতররা তাঁর দোষ তলাশেই লিগু রয়েছে। মুহাদ্দিছগণ এবং ইমামগণ তাঁর যে সমস্ত গুণাবলীর সাক্ষ্য দিয়েছেন, তার প্রতি কোন লক্ষ্যই তাদের নেই। বস্তুতঃ তারা পূর্বেকার কোন কোন লিখকের অনুসরণে তাদের রচনাবলী হতে উদ্ধৃতি দিয়ে তার সমালোচনা করে থাকে। ঐ সমস্ত উদ্ধৃতি কিংবা রেওয়াজেত মিথ্যা। গ্রহণযোগ্য হবার জন্য ইমামদের দিকে সেগুলোকে সম্পর্কিত করা হয়েছে। আর যদি সত্য বলে ধরে নেয়া হয় তবে তার কারণ হবে অজ্ঞতা এবং ভুল বুঝাবুঝি। যেমন ইমাম আওয়ায়ী (রহঃ) ইমাম সাহেবের ব্যাপারে ভুল ধারণা নিয়েছিলেন। পরে যখন ইমাম সাহেবের সাথে তার সাক্ষাৎ হল তখন তার ভুল ধারণার অবসান হয়। তদুপ যাদের লেখায় কিংবা কথায় ইমাম সাহেবের দোষ-ত্রুটির উল্লেখ রয়েছে। সেটি তাদের ভুল ধারণার কারণে হয়েছে। ইমাম সাহেব সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান থাকলে তাদের এ ধারণার অবসান হতে পারত।

যারা ইমাম সাহেবের দোষত্রুটি বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর সমালোচনা করেছেন তাদের প্রত্যেকের থেকে আবার ইমাম সাহেবের প্রশংসাও বর্ণিত রয়েছে। এটা তখনই হতে পারে যখন তাদের ভুলের অবসান হয়ে থাকে। আর ভুল ধারণার অবসান তখনই হবে যখন তার মেধা, জ্ঞান প্রভৃতি গুণাবলী সম্বন্ধে সঠিক ধারণা হয়ে থাকে। তাঁর সাথে সাক্ষাতের মাধ্যমেই তাঁর সম্বন্ধে সঠিকভাবে জানা যেতে পারে।

একবার মদিনা মুনাওয়ারায় ইমাম সাহেবের সাথে ইমাম মালেক (রহঃ)-এর সাক্ষাত হল। দীর্ঘ সময়ব্যাপী উভয়ের মাঝে ইলমী আলোচনা হল।

ইমাম মালেক (রহঃ) যখন সেখান থেকে উঠে এলেন তখন তাঁর সমস্ত দেহ ধর্মান্ত ছিল। লাইছ বিন সাদ তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আবু হানিফার সাথে বিতর্ক করতে করতে ঘর্মান্ত হয়ে গেছি। নিঃসন্দেহে এ ব্যক্তি একজন বড় ফকীহ।

ইমাম সাহেবের সমালোচনামূলক যে সমস্ত কথা ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর দিকে সম্পর্কিত করা হয় তাও সম্পূর্ণ মিথ্যা। ইমাম সাহেবের মৃত্যুর বছর ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং তিনি তাঁর সম্পর্কে সমালোচনা করতে পারেন না। বরং তিনি দীর্ঘদিন ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর নিকট থেকে ইমাম সাহেবের ফিকাহর জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি আবু হানিফার শিষ্যের শিষ্য হয়ে কি করে তাঁর সমালোচনা করতে পারেন। বরং তিনি বলেন,

الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة *

ফিকাহ এর ব্যাপারে সমস্ত মানুষ আবু হানিফার প্রতি মুখাপেক্ষী।

তদুপ ইমাম আহমদ (রহঃ)-এর দিকে ইমাম সাহেবের সমালোচনামূলক যে কথাগুলো সম্পর্কিত করা হয় তাও ভিত্তিহীন। ইমাম সাহেবের মৃত্যুর চৌদ্দ বছর পর তাঁর জন্ম হয়। তিনি তাঁর বিশিষ্ট ছাত্র আবু ইউসুফ (রহঃ) থেকে হানাফী ফিকাহর জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি বলেন, তিন বৎসরে আমি ইমাম আবু ইউসুফ থেকে তিন বস্তা পরিমাণ ইলম লিখেছি।

যে সমস্ত লিখক বিভিন্ন ইমাম এবং ফিকাহবিদদের থেকে ইমাম সাহেবের সমালোচনামূলক উক্তি স্বীয় কিতাবে উল্লেখ করেছেন তাদের মধ্যে খতীবে বাগদাদী একজন। নিম্নে তার কয়েকটি নমুনা উল্লেখ করা হল।

আবু হানিফা হাদীছের ব্যাপারে এতীম এবং পঙ্গু ছিলেন। তিনি হাদীছের লোক ছিলেন না।

আবু হানিফার নিকট রায়ও ছিল না হাদীছও ছিল না। তার বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা সর্বসাকুল্যে একশ' পঞ্চাশটি। এর অর্ধেকগুলোতে আবার তিনি ভুল করেছেন।

ইতিহাসবিদ ইবনে খালদুন তার ইতিহাসের মুকাদ্দামায় লিখেন,

আবু হানিফার বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা সতেরটি পর্যন্ত পৌঁছেছে বলে কথিত আছে।

বাস্তব জগতে এটা কতটুকু সঠিক তা পূর্বের আলোচনা দ্বারাই বুঝা গেছে। শাসকদের সামনে এসব অপবাদের আর কয়েকটি উত্তর উল্লেখ করা হচ্ছে।

১। ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) সর্বজন স্বীকৃত ইমাম এবং মুজতাহিদ ছিলেন। খতীবের বাগদাদী যাদের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন তারাও এ বিষয়ে একমত। এখন প্রশ্ন জাগে, ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) যখন হাদীছ জানতেন না, মাত্র সতেরটি হাদীছ মুখস্ত ছিল, তখন কি করে অন্যান্য ইমাম এবং মুজতাহিদগণ তার ইজতিহাদ গ্রহণ করেছেন? তাঁর ফেকহী মাসায়েল শিক্ষা করে তা প্রসারের আয়োজন কেন করেছেন?

২। হানাফী ফিকাহর গবেষণায় পাঠকগণ হাযার হাযার মাসয়ালা এবং আহকাম সহীহ হাদীছের অনুরূপ পেয়েছেন। সাইয়েদ মুরতাজা যুবায়দী হানাফী মাযহাবের আহকাম সম্পর্কিত হাদীছগুলো আদুরারুল মুনীফা ফি আদিব্বাতে আবি হানিফা” নামক কিতাবে সংগ্রহ করেছেন।

প্রশ্ন জাগে, আবু হানিফা (রহঃ) হাদীছ না জানা সত্ত্বেও তাঁর গবেষণালব্ধ মাসয়ালাগুলো কি করে হাদীছের অনুরূপ হল?

৩। ইবনে আবি শাইবার মতে, ইমাম সাহেবের এমন মাসয়ালার সংখ্যা একশ পঁচিশটি যেগুলো সহীহ হাদীছের অনুরূপ নয়। তার একথাটি সঠিক বলে মেনে নিলে এর অর্থ দাঁড়ায় যে, এ গুটি কতক মাসয়ালা ব্যতীত অন্য সব মাসয়ালা সহীহ হাদীছের অনুরূপ, আর ইমাম সাহেবের গবেষণালব্ধ মাসয়ালার সংখ্যা এক বর্ণনামতে তিরিশি হাযার। অন্য এক বর্ণনা মতে বার লক্ষ।

অর্থাৎ প্রায় বার লক্ষ মাসয়ালা সহীহ হাদীছের অনুরূপ। এতে এ কথা প্রমাণ হয় যে, তিনি হাদীছের বিরাট একটা অংশের জ্ঞানী ছিলেন। সেগুলো থেকে তিনি এ সমস্ত মাসয়ালা উৎঘাটন করেন।

৪। উসূলে হাদীছের কিতাবে ইমাম সাহেবের মতামত সংকলিত হয়েছে। অর্থাৎ কোন্ রাবী গ্রহণযোগ্য কি বর্জনযোগ্য এ ব্যাপারে তাঁর মত গ্রহণযোগ্য। এমন ব্যক্তিত্বকে হাদীছের ব্যাপারে রিজ্তহস্ত বলা কি মিথ্যা অপবাদ নয়?

৫। ইমাম সাহেবের শিষ্যগণ তাঁর থেকে শ্রুত এবং পঠিত হাদীছগুলো কিতাব আকারে সংকলন করেছেন। সংকলনকারীগণও ছিলেন বিশিষ্ট ইমাম এবং মুজতাহিদ। যেমন ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম হাসান, ইমাম যুফার (রহঃ) প্রমুখ। ইমাম সাহেবের মুসনাদের সংখ্যা সতেরটি। “জামেউল মাসানিদ” নামক কিতাবে এর অনেকগুলোকে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

ইবনে খলদুন বলেছেন, ইমাম সাহেবের বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা সতেরটি, এর এক অর্থ এটা হতে পারে যে, তার মুসনাদের সংখ্যা সতেরটি। এর অর্থ

এটাও হতে পারে যে, মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদে ইমাম সাহেব থেকে বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা তেরটি এবং ইমাম আবু ইউসুফ থেকে বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা চারটি। সোট সতেরটি। এর উপর ভিত্তি করেই বলা হয় ইমাম সাহেবের বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা সতেরটি। অথচ এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন মিথ্যা অপবাদ। ইবনে খলদুল ব্যতীত আর কেউ এর উল্লেখ করেননি।

ইমাম সাহেবের নামে আরেকটি অপবাদ দেয়া হয় যে, তিনি মুরজিয়া ছিলেন। মুরজিয়াদের মতে কোন মুসলমান ব্যক্তি যত পাপই করুক এতে তার কোন অসুবিধা হবে না। যেমনিভাবে কোন অমুসলমান যত নেক কাজই করুক, এতে তার কোন উপকার হবে না।

অপরদিকে খারেজীদের আকীদা এরূপ যে, কোন মুসলমান যদি কবীরা গুনাহ করে তবে সে ইসলামের সীমারেখা থেকে বের হয়ে কুফরীর সীমারেখায় প্রবেশ করবে এবং সে অনন্তকাল জাহান্নামে থাকবে। আর মু'তাযিলাদের আকীদা এরূপ যে, কোন মুসলমান যদি কবীরা গুনাহ করে তবে সে ইসলামের সীমারেখা থেকে বের হয়ে যাবে। তবে কুফরীর সীমারেখায় প্রবেশ করবে না। কিন্তু সে অনন্তকালের জন্য জাহান্নামী হবে।

খারেজী এবং মু'তাযিলাদের মতের বিপরীত হচ্ছে মুরজিয়াদের মত। কারণ তাদের মতে কোন পাপের কারণেই সে ইসলামের সীমারেখা হতে বের হবে না। অনন্তকাল দোযখে থাকার তো প্রশ্নই উঠে না।

ইমাম সাহেবের মত এ দু'ধরনের মতের মাঝামাঝি। তিনি বলেন যে, গুনাহে কবীরার কারণে কোন মুসলমান অমুসলমান হয়ে যায় না। তবে এমনও নয় যে, গুনাহ তার কোন ক্ষতি করে না। বরং পরকালে তার জন্য শাস্তি নির্ধারিত রয়েছে। তবে আল্লাহ চাইলে তাকে ক্ষমা করতে পারেন। অনন্তকালের জন্য সে জাহান্নামী হবে না।

* ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء *

অর্থঃ নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা শিরক মাফ করেন না; এ ছাড়া অন্য সব গোনাহ মাফ করেন।

যেহেতু ইমাম সাহেব কবীরা গুনাহকারীকে মুসলমান বলে স্বীকার করেন, সেহেতু খারেজী এবং মু'তাযিলাপন্থীরা তাকে মুরজিয়া বলে থাকে। অথচ ঠাণ্ডা মুরজিয়া বলা কোন মতেই সমীচীন নয়। কারণ তিনি তাদের মত এ কথা বলেন না যে, পাপকাজ দ্বারা তার কোন ক্ষতি হবে না। সুতরাং তিনি এ

অপবাদ থেকে পবিত্র। আল্লামা ইবনে আছীর বলেন,

“ইমাম সাহেব এ সব অপবাদ থেকে পবিত্র ছিলেন।”

ইমাম সাহেবকে মুরজিয়া প্রমাণ করার জন্য ‘গুনিয়াতুত্তালেবীন’ কিতাবের এ উদ্ধৃতি দেয়া হয়ঃ

* اما المرجئة فيهم بعض اصحاب ابي حنيفة *

ইমাম আবু হানিফার কতক শিষ্য মুরজিয়া।

এ উদ্ধৃতি দ্বারা ইমাম সাহেবের মুরজিয়া হওয়ার প্রমাণ হয় না। কারণ এতে তাঁর কোন কোন শিষ্যের মুরজিয়া হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এটা কোন অবাস্তব ব্যাপারও নয়। আল্লামা যমখশরী গাস্‌সান কূফী প্রমুখ ফেকহী বিষয়ে ইমাম সাহেবের অনুসারী ছিলেন। কিন্তু আকায়েদের ব্যাপারে মুরজিয়া কিংবা মু'তাযিলা ছিলেন। এতে এ কথা প্রমাণিত হয় না যে, ইমাম আবু হানিফা কিংবা তাঁর সকল শিষ্য মুরজিয়া ছিলেন।

ইমাম আবু হানিফা এবং ইলমে ফিকাহ ও ফতোয়াঃ- ইবনে কাইয়েম (রহঃ) ‘এলামুল মু'আকেক'য়ীন’ কিতাবে লিখেন যে, ইবনে মাসউদ, যায়দ বিন ছাবেত, আব্দুল্লাহ বিন উমর, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) প্রমুখের শাগরেদদের মাধ্যমেই দ্বীন, ফিকাহ এবং ইলম প্রসার লাভ করে।

মদীনাবাসীরা যায়দ বিন ছাবেতের এবং ইবনে উমরের শাগরেদদের মাধ্যমে, মক্কাবাসীরা ইবনে আব্বাসের শাগরেদদের মাধ্যমে এবং ইরাকবাসীরা ইবনে মাসউদের শাগরেদদের মাধ্যমে ইলম লাভ করে।

ইবনে মাসউদের কূফার শাগরেদদের মধ্যে আলকামা বিন কায়স রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় জনগৃহণ করেন। ইবনে মাসউদ ব্যতীতও তিনি হযরত উমর (রাঃ), হযরত উছমান (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত সা'দ (রাঃ), হযরত হুযাইফা (রাঃ), হযরত আবু দারদা (রাঃ), হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রাঃ), খালেদ বিন ওলীদ (রাঃ), হযরত আয়েশা (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীদের থেকে হাদীছ রেওয়ায়েত করেন। ছাহাবায়ে কিরাম আলকামা বিন কায়স থেকে ফতোয়া জিজ্ঞেস করতেন। তিনি হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের (রাঃ) জ্ঞানের সঠিক উত্তরসূরী ছিলেন।

আর ইব্রাহীম বিন ইয়াযীদ নাখরী আলকামা থেকে ইলমে ফিকাহ শিক্ষা লাভ করেন। অন্যান্য তাবেয়ীনদের থেকেও তিনি ফয়েয লাভ করেন। তিনি আলকামার ভাগ্নে ছিলেন। এ দুজন সম্পর্কে আবুল মুছান্না রাবাহ বলেন,

তুমি যদি আলকামাকে দেখ, তবে ইবনে মাসউদকে না দেখায় কোন ক্ষতি নেই। কারণ তিনি ইবনে মাসউদের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর যখন ইব্রাহীমকে দেখবে, তখন আলকামাকে না দেখায় কোন ক্ষতি নেই।

আর ইব্রাহীম নাখরী থেকে হাম্মাদ বিন আবি সুলাইমান মুসলিম ইলমে ফিকাহ অর্জন করেন। এ ছাড়াও তিনি সায়ীদ বিন মুসাইয়্যাব, সায়ীদ বিন জুবাইর, ইকরামা, হাসান বসরী, শাবী (রহঃ) প্রমুখ থেকে শিক্ষা লাভ করেন।

আর তাঁর থেকে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) ফিকাহ এবং ফতোয়া শিক্ষা লাভ করে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের (রাঃ) ফিকাহর প্রসার ঘটান এবং তাঁর থেকে অনেক ছাত্র এবং শিষ্য ফিকাহ এবং ফতোয়া শিক্ষা লাভ করেন। তাঁদের থেকে উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের নাম নিম্নে প্রদত্ত হলঃ

কাযী আবু ইউসুফ (রহঃ), মুহাম্মদ বিন হাসান শায়বানী (রহঃ), যুফার বিন হযাইল (রহঃ), হাম্মাদ বিন আবি হানিফা (রহঃ), হাফস বিন গিয়াস (রহঃ), ওকী বিন জাররাহ (রহঃ), হাসান বিন যিয়াদ লু'লুঈ (রহঃ), আসাদ বিন আমর (রহঃ), কাযী আফিয়া বিন ইয়াযীদ আওদী (রহঃ) প্রমুখ।

ইমাম সাহেবের ছাত্র সংখ্যা ছিল অগণিত। তাঁদের মধ্য হতে বিশিষ্ট চল্লিশজনকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এঁদেরকে নিয়েই তিনি ফিকাহী মাসয়ালা আলোচনা করতেন। এদের মধ্যে কেউ ফিকাহ শাস্ত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করেন আবার কেউ হাদীছ শাস্ত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

নিম্নে তাদের কয়েকজন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো।

হযরত ইয়াহয়া বিন সায়ীদ আল কাত্তান

ফিকাহ শাস্ত্রকে ভিন্ন একটি বিষয় রূপে প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে যেমনিভাবে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন ঠিক তদুপ হাদীছের রিজাল শাস্ত্রকে (বর্ণনাকারী সম্পর্কিত বিষয়) ভিন্ন একটি শাস্ত্রের রূপ দেন হযরত ইয়াহয়া বিন সায়ীদ আল কাত্তান।

আল্লামা যাহরী 'মীযানুল ইত্তেদাল' নামক কিতাবের ভূমিকায় লিখেন যে, রিজাল শাস্ত্র সম্বন্ধে ইয়াহয়া বিন সায়ীদ আল কাত্তান সর্বপ্রথম কলম ধরেন। এরপর এ শাস্ত্রকে এগিয়ে নিয়ে যান। তাঁর ছাত্রবৃন্দ হতে ইয়াহয়া বিন মা'য়ীন, আলী ইবনুল মদীনী, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল প্রমুখ। এরপর ইমাম বোখারী এবং মুসলিমের এ বিষয়ে অনেক অবদান রয়েছে।

হাদীছ সম্বন্ধে হযরত ইয়াহয়া বিন সায়ীদ আল কাত্তানের দৃষ্টি এতই সুদূরপ্রসারী ছিল যে, হাদীছের তাহকীক করার জন্য ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, আলী ইবনুল মদীনী প্রমুখ তাঁর মজলিসে দণ্ডায়মান থাকতেন। আছরের নামাজের পর হতে মাগরিব পর্যন্ত চলত সেই মজলিস। ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা দণ্ডায়মান থাকতেন।

রেওয়য়াত সম্বন্ধে যাচাই ও নির্বাচনে তিনি এরূপ পূর্ণত্ব লাভ করেছিলেন যে, অধিকাংশ মুহাদ্দেছ এ মত দিয়েছেন যে, তিনি যে হাদীছটি গ্রহণ করেছেন আমরাও তা গ্রহণ করব। আর তিনি যেগুলো বর্জন দিয়েছেন, আমরা সেগুলো বর্জন করব।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলতেন, আমার নজরে ইয়াহয়ার মত আর কাউকে দেখিনি।

তাঁর এতসব গুণ-গরিমা থাকা সত্ত্বেও তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর শিক্ষা মজলিসে যোগদান করতেন। আর তিনি ইমাম সাহেবের শিষ্যত্বের বিষয়টি সগৌরবে প্রকাশ করে বেড়াতেন। যদিও তখন পর্যন্ত কারো তাকলীদ বা অনুসরণ ধারাবাহিক রূপে প্রচলিত ছিল না; তথাপি তিনি অধিকাংশ মাসয়ালাতে ইমাম সাহেবের তাকলীদ করতেন। তিনি নিজেই লিখেছেন, অধিকাংশ মাসয়ালায় আমি ইমাম আবু হানিফার তাকলীদ করেছি।

ইয়াহয়া বিন সায়ীদ আলকাত্তান ১৩০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৮ হিজরীতে বসরা শহরে ইন্তিকাল করেন।

ইয়াহয়া বিন যাকারিয়া বিন আবি মায়েদা

তিনি একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ ছিলেন। আল্লামা যাহরী রচিত 'তায়কিরাতুল হুফফায' নামক কিতাবে তাঁর নামও স্থান পেয়েছে। সে কিতাবে শুধুমাত্র তাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে যারা হাফেযুল হাদীছ ছিলেন।

আলী ইবনুল মদীনী যিনি ইমাম বোখারীর উস্তাদ ছিলেন। তিনি বলেন, ইয়াহয়ার সময়ে তাঁর সমকক্ষ আলেম আর দ্বিতীয়জন ছিলেন না।

তাঁর রেওয়য়াত হতে সিহাহ সিত্তার অনেক হাদীছ লওয়া হয়েছে। তিনি মুহাদ্দিছ এবং ফকীহ উভয়টিই ছিলেন। বহু বিষয়ে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি ইমাম সাহেবের ছাত্র ছিলেন। দীর্ঘদিন তিনি তাঁর সাহচর্যে ছিলেন। তাঁকে ইমাম সাহেবের পরিবারস্থ লোক বলে 'তায়কিরাতুল হুফফায' কিতাবে আল্লামা

যাহরী উপাধি দিয়েছেন। ফিকহী সংকলনের ইমাম সাহেবের যে কমিটি ছিল তিনিও সে কমিটির বিশেষ সদস্য ছিলেন। এতে তিনি ত্রিশ বৎসর যাবৎ নিয়োজিত ছিলেন বলে ইমাম তুহাবী উল্লেখ করেন। গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব তাঁর উপরই অর্পিত হয়েছিল।

‘মীযানুল ই‘তিদাল’ নামক কিতাবে বর্ণিত রয়েছে কুফা নগরে তিনিই সর্বপ্রথম হাতে কলম ধরেন। একজন বিখ্যাত লেখক হিসাবে তিনি মানুষের শ্রদ্ধাভাজন হন। মাদায়েনের প্রধান কাজী রূপে তিনি দায়িত্ব পালন করেন।

৬৩ বৎসর বয়সে তাঁর ইন্তিকাল হয়।

হযরত ওকী ইবনুল জাররাহ

হাদীছ শাস্ত্রে তিনি একজন বিশিষ্ট স্তম্ভ ছিলেন। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) তাঁর ছাত্র হতে পারায় নিজেকে পরম সৌভাগ্যশালী মনে করতেন। রিজাল শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ ইয়াহয়া বিন মা‘য়ীন বলেন, ওকীর চেয়ে উপযুক্ত লোক আমি আর কাউকে দেখিনি। হাদীছ শাস্ত্রে তাঁর রেওয়য়াত এবং রিজাল শাস্ত্রে তাঁর মতামতকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হত।

তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর বিশিষ্ট ছাত্র ছিলেন, ইমাম সাহেব হতে তিনি অনেক হাদীছ শবণ করেছেন। প্রায় মাসয়ালাতেই তিনি ইমাম সাহেবের তাকলীদ করতেন। ‘তায়কেরাতুল হুফফায়’ কিতাবে আল্লামা যাহরী উল্লেখ করেন, ওকী ইমাম আবু হানিফার মত অনুযায়ী ফতোয়া দিতেন।

১৯৭ হিজরীতে তাঁর ইন্তিকাল হয়।

হযরত দাউদ তায়ী

আল্লাহ তাআলা তাঁকে নেক ও সৎকর্ম করার অপরিসীম ক্ষমতা দান করেছিলেন। ছুফিয়ায়ে কিরাম তাঁকে কামেল মুর্শিদ হিসাবে মান্য করতেন। তায়কিরাতুল আউলিয়া কিতাবে তাঁর অনেক প্রশংসা করা হয়েছে। হানাফী ফিকহবিদগণ তাঁর ইজতেহাদের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন।

বিখ্যাত মুহাদ্দিছ মুহারিক বিন আত্তার বলেন, ইমাম দাউদ তায়ী যদি পূর্ব যামানায় জন্মগ্রহণ করতেন তবে কোরআন মজীদে তাঁর কাহিনী বর্ণিত হত।

প্রাথমিক জীবনেই তিনি ফিকহ এবং হাদীছ সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করেন। অতঃপর ইলমে কালাম সম্বন্ধে পর্যাণ্ড জ্ঞান লাভ করেন। তখন থেকেই তিনি তর্কবিতর্কে মেতে থাকতেন।

একদিন কোন এক ব্যক্তির সাথে তর্ক করতে করতে তার প্রতি কংকর নিক্ষেপ করে ফেললেন। তখন লোকটি বলে উঠল যে, হে দাউদ! আপনার যবান ও হাত অধিক বর্ধিত হউক।

সে ব্যক্তির এ কথাটি তাঁর জীবনে আমূল পরিবর্তন ঘটাল। তখন থেকেই তিনি বহু-বচসা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেন। তবে জ্ঞান-অর্জন তিনি ত্যাগ করেন নাই।

বহুর খানেক পরেই তিনি তাঁর সমুদয় কিতাব নদীতে ফেলে দিতেন। দুনিয়ার সবকিছু হতে সম্পর্কও ছিন্ন করে ফেললেন।

ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন, আমি প্রায়ই ইমাম দাউদ তায়ীর নিকট মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করার জন্য যেতাম। প্রয়োজনীয় 'আমলী' মাসয়ালা হলে উত্তর দিতেন। অন্যথায় বলে দিতেন ভাই আমার অন্য প্রয়োজনীয় কাজ রয়েছে।

তিনি ইমাম সাহেবের একজন বিগিষ্ট ছাত্র ছিলেন। ইমাম সাহেবের নির্বাচিত কমিটির একজন অন্যতম সদস্য ছিলেন তিনি।

১৬০ হিজরীতে তিনি পরলোক গমন করেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক

'তাহযীবুল আসমাওয়াল লুগাত' কিতাবে হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুবারক (রহঃ)-এর প্রশংসা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, তিনি এমন একজন ইমাম যার নেতৃত্ব এবং শৌর্যবীর্য সম্বন্ধে সমস্ত ইমাম এবং ফিকহবিদ একমত। তাঁর আলোচনা করা হলে খোদার রহমত নাযিল হত। তাঁর সাথে ভালবাসা জন্মাতে পারলে আল্লাহর নিকট ক্ষমাপ্রাপ্তি আশা করা যেতো।

তাকে মুহাদ্দেছীনগণ 'আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীছ' বলে আখ্যায়িত করেছেন। এর দ্বারাই হাদীছ শাস্ত্রে তাঁর অগাধ জ্ঞান সম্বন্ধে কিছুটা অনুমান করা যায়।

একদা তাঁর জনৈক ছাত্র তাকে 'হে প্রাচ্যের জ্ঞানী ব্যক্তি' বলে সম্বোধন করলেন। বিখ্যাত মুহাদ্দেছ ইমাম ছুফিয়ান ছাওরী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, আপনি বড়ই কার্পণ্য দেখালেন। তিনি শুধু প্রাচ্যের আলেম নন তিনি পাশ্চাত্যেরও আলেম।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুবারকের

যামানায় হাদীছ সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জনের জন্য তাঁর চেয়ে অধিক চেষ্টা আর কেউ করেন নাই।

স্বয়ং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক বর্ণনা করেন, আমি চার হাজার শায়খ থেকে হাদীছ শিখেছি। এদের মধ্য হতে শুধু মাত্র এক হাজার শায়খ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছি।

বোখারী এবং মুসলিম শরীফে তাঁর বর্ণিত অনেক হাদীছের সমাবেশ ঘটেছে। রেওয়ায়াত শাস্ত্রে তিনি একজন মহা স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। হাদীছ ও ফিকহ শাস্ত্রে তাঁর অনেক কিতাব রয়েছে। কিন্তু সেগুলো বর্তমানে দুপ্রাপ্য।

তাকওয়া, দ্বীনদারী, জ্ঞান-গরীমা ও কামালিয়াতে তিনি এরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন যে, আমীর-ওমারা রাজা-বাদশাহ তাঁর তুলনায় খুবই নগন্য ছিলেন।

খলীফা হারুনুর রশীদ একবার কোথাও গমন করেন। সেখানে হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুবারকও কোন কারণে গমন করেন। ঝড়ের গতিতে সে সংবাদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। অসংখ্য লোক তাঁকে সংবর্ধনা জানানোর জন্য ছুটে চলল। অনেকের জুতা ও জামা কাপড় ছিঁড়ে গেল। কিন্তু সেদিকে কারো ভ্রক্ষেপ নেই। কে কার পূর্বে আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীছকে দেখবে এটাই ছিল প্রত্যেকের লক্ষ্য। অন্য কোন খেয়াল কারো ছিল না।

খলীফা হারুনুর রশীদের স্ত্রী অট্টালিকার উপর হতে এ দৃশ্য দেখতে পেলেন। তিনি জানতে চাইলেন যে, কার আগমনের কারণে লোকেরা উম্মাদের ন্যায় ছুটে চলছে। তাঁকে জানানো হলো যে, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের আলেমের শুভাগমন হয়েছে। তিনি বললেন, একেই প্রকৃত বাদশাহী বলা চলে। এর তুলনায় হারুনুর রশীদের বাদশাহী অতি তুচ্ছ। জনগণ কখনও কোন বাদশাহকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য এরূপ অধীর হয়ে উঠে কি?

তিনি ইমাম সাহেবের স্বনামধন্য ছাত্র ছিলেন। উস্তাদের প্রতি তিনি পরম শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি বলতেন, আমি যা কিছু শিখেছি তা ইমাম আযম এবং সুফিয়ান ছাওয়ারী মেহেরবানীতে শিখেছি। একবার মনের আবেগে তিনি বলে উঠলেন,

لولا ان الله اغاثنى بابى حنيفة و سفينا كنت كسائر الناس *

আল্লাহ তাআলা যদি আবু হানিফা এবং সুফিয়ান ছাওয়ারী দ্বারা আমাকে সাহায্য না করতেন তবে আমি অন্যান্য সাধারণ মানুষের মতই হতাম।

ফিকহ বিশারদ আবু ইউসুফ

ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) আনহার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষ রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী ছিলেন। তাঁর পিতা একজন দরিদ্র লোক ছিলেন। দৈহিক পরিশ্রমে তাদের জীবিকা নির্বাহ হত।

১১৩ হিজরী অথবা ১১৭ হিজরী সনে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) কূফা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকালেই তিনি লেখাপড়ার প্রতি অনুরাগী হয়ে পড়েন। কিন্তু এতে তাঁর পিতার সম্মতি ছিল না। তার আশা ছিল যে, ছেলে কাজকর্ম করে দু'পয়সা কামাই করে সংসারের মধ্যে সচ্ছলতা সুখ-শান্তি আনতে চেষ্টা করবে। কিন্তু বালক আবু ইউসুফ একটু সুযোগ পেলেই ইমাম সাহেবের শিক্ষা মজলিসে চলে যেতেন। একদিন তিনি ইমাম সাহেবের শিক্ষা মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর পিতা তাঁকে সেখান হতে জোরপূর্বক উঠিয়ে নিয়ে গেলেন। ঘরে গিয়ে তাঁকে বুঝালেন যে, দেখ বাপু! আবু হানিফাকে আল্লাহ তাআলা ধন-দৌলত দান করেছেন। তাঁর পথের পথিক হওয়া কি গরীবের ছেলের পক্ষে সম্ভবপর?

তিনি বাধ্য হয়ে লেখাপড়ায় ক্ষান্ত দিলেন। পিতার সাথে তিনিও রোযগারে লেগে গেলেন। দু'চারদিন পর ইমাম সাহেব তাঁর অনুপস্থিতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁকে তাঁর অনুপস্থিতির কারণ সম্বন্ধে অবহিত করা হল। তিনি আবু ইউসুফ (রহঃ)-কে ডাকিয়ে এনে তাঁর হাতে একটি থলি তুলে দিয়ে বললেন এ অর্থ যখন শেষ হয়ে যাবে তখন আমাকে অবগত করো। তিনি থলিটি বাড়ীতে নিয়ে খুলে দেখলেন যে এতে একশত দিরহাম রয়েছে। ইমাম সাহেব আবু ইউসুফ (রহঃ)-কে এরূপে সাহায্য করে যেতে লাগলেন। ইমাম আবু ইউসুফের লেখাপড়া এভাবে সমাপ্ত হল।

ইমাম সাহেব ব্যতীতও কাজী আবু ইউসুফ (রহঃ) আ'মাশ বিন হিশাম বিন 'উরওয়া, সুলাইমান তাইমী, আবু ইসহাক শায়বানী, ইয়াইয়া বিন সা'য়ীদ আল-আনসারী প্রমুখ হতেও হাদীছ রেওয়য়াত করেন। তিনি মুহাম্মদ বিন ইসহাক হতে 'কিতাবুল মাগাযী' পাঠ করেন। মুহাম্মদ বিন আলী লায়লা হতে মাসয়াল শিফা লাভ করেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে এতই মেধা ও স্বরণশক্তি দান করেছেন যে, তিনি একই সময়ে সর্বপ্রকার ইলম অর্জন করেন।

তিনি হাদীছের শিক্ষা মজলিসে যোগদান করে প্রত্যহ পঞ্চাশ ঘাটটি হাদীছ শিখে নিতেন।

ইমাম সাহেবের জীবদ্দশায় তিনি প্রত্যহ তাঁর শিক্ষা মজলিসে অংশগ্রহণ করতেন। তাঁর ইন্তিকালের পর তিনি খিলাফতের দরবারের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন।

১৬৬ হিজরীতে খলীফা মাহদী আব্বাস তাঁকে কাজী পদে নিযুক্ত করেন। মাহদী আব্বাসের পরবর্তী খলীফাও তাঁকে সে পদে বহাল রাখেন। পরবর্তীতে খলীফা হারুনুর রশীদ তাঁর যোগ্যতার প্রমাণ পেয়ে তাঁকে মুসলিম সাম্রাজ্যের কাজিউল কুজাত বা প্রধান বিচারপতি পদে নিযুক্ত করেন। সে পদটি তখন যথেষ্ট গুরুত্বের দাবীদার ছিল যা ইতিপূর্বে আর দেখা যায়নি। এ পদে বহাল থাকাকালে তিনি বেশ জ্ঞানগরিমা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন।

তিনি ১৮৬ হিজরী সনে রবীউল আউয়ালের পাঁচ তারিখ বৃহস্পতিবার যোহরের সময় ইন্তিকাল করেন।

ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) অস্তিমকালে এ কথা কয়েকটি বলে ইন্তিকাল করেন, হে আল্লাহ! তুমি জান যে, আমি জানা সত্ত্বেও কোন মীমাংসা ঘটনার বিপরীত করি নাই। আমি যে মীমাংসাগুলো করেছি সেগুলো তোমার কিতাব এবং তোমার রাসূল ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীছ অনুসারে করতে চেষ্টা করেছি। যদি কখনো মুশকিলে পড়েছি এবং তোমার কিতাব এবং তোমার রাসূল ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীছে সমাধান পাই নাই তখন ইমাম আবু হানিফার পথ অবলম্বন করেছি। আমি যতটুকু অবগত আছি সে অনুপাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তিনি জ্ঞাতসারে কখনো তোমার পথ ছেড়ে যাননি এবং সে সম্বন্ধে বেশ ভালভাবেই অবগত ছিলেন।

কাজী সাহেব ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। সে ধনের সদ্যবহার সম্বন্ধেও তিনি বেশ অবগত ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি ওছিয়ত করে যান যেন মক্কা, মদীনা, কুফা এবং বাগদাদের দরিদ্রদের মধ্যে চার লক্ষ দিরহাম বিতরণ করা হয়।

কাজী সাহেব যদিও ফিকহ শাস্ত্রের উন্নতি বিধানে সুবিখ্যাত ছিলেন, কিন্তু অন্যান্য বিষয়েও তাঁর সুগভীর জ্ঞান ছিল। সে সব বিষয়েও তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না।

হেলাল বিন ইয়াহয়া বলেন, কাজী আবু ইউসুফ মাগাযী (যুদ্ধ) এবং আইয়ামুল আরবের (আরবের ইতিহাস ঘটনাবলী) সম্বন্ধে হাফেজ ছিলেন। ফিকহশাস্ত্র তাঁর পক্ষে সাধারণ ব্যাপার ছিল। হাদীছশাস্ত্রে তিনি এতই পারদর্শী ছিলেন যে, তাঁকেও হুফাযে হাদীছের মধ্যে গণ্য করা হত।

আল্লামা যাহবী তাযকিরাতুল হুফ্ফায় কিতাবে লিখেন, ইয়াহয়া বলতেন, আহলে রায়দের মধ্য হতে আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর চেয়ে অধিক হাদীছ আর কেউ রেওয়াজ করেন নাই।

খতীবে বাগদাদ তাঁর কিতাবে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ)-এর এ বাণী উল্লেখ করেছেন, ইলমে হাদীছ সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করার যখন আমার ইচ্ছা জাগল, তখন আমি ইমাম আবু ইউসুফের খিদমতে উপস্থিত হলাম।

ইয়াহয়া বিন মায়ীন ইমাম আহমদ বিন হাম্বল এবং হাদীছের আরও বহু ইমাম কাজী আবু ইউসুফ (রহঃ) থেকে হাদীছ রেওয়াজ করেন। তাঁর জ্ঞান-গরিমা এবং পদমর্যাদা সম্পর্কে এর চেয়ে অধিক আর কি থাকতে পারে?

ফিকহ শাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য কেউ অস্বীকার করবে না। স্বয়ং ইমাম সাহেবও তা স্বীকার করেছেন। তিনি একবার অসুস্থ হলে ইমাম সাহেব তাঁকে দেখতে যান। সেখান থেকে ফিরার পথে সংগীদের সাথে বললেন, আল্লাহ না করুক! যদি এ লোকটি মারা যায় তবে দুনিয়ার অপূরণীয় ক্ষতি হবে। অন্যান্য ইমামগণও কাজী সাহেবের জ্ঞানগরিমা এবং বুদ্ধিমত্তার ভূয়সী প্রশংসা করতেন।

তৎকালে একজন বিখ্যাত মুহাদ্দীছ ছিলেন ইমাম আ'মাশ। একবার তিনি কাজী সাহেবের নিকট কোন একটি মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করলেন। কাজী সাহেব উত্তর দিলেন। তিনি বললেন, আপনার উত্তরের স্বপক্ষে কোন প্রমাণ আছে কি? কাজী সাহেব বললেন, হ্যাঁ। তার প্রমাণ ঐ হাদীছটি যা আপনি অমুক ঘটনা সম্বন্ধে অমুক দিন বর্ণনা করেছেন। তখন ইমাম আ'মাশ (রহঃ) বললেন, কাজী সাহেব! এ হাদীছটি আমার তখন হতে স্মরণ রয়েছে যখন আপনার পিতা বিবাহও করেন নাই। কিন্তু এ হাদীছের মর্ম আজ আমার বুকে এসেছে।

ফিকহ হাদীছ সম্বন্ধে কাজী সাহেবই সর্বপ্রথম কিতাব রচনা আরম্ভ করেন। বিভিন্ন বিষয়ে তিনি কিতাব রচনা করেন। তন্মধ্যে কিতাবুল খারাজ একটি অনন্য কিতাব। এ সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করা হচ্ছে।

খলীফা হারুনুর রশীদ কাজী সাহেবের নিকট খারাজ এবং জিযিয়া সম্বন্ধে তাঁর বিস্তৃত মতবাদ জানতে চান। জবাবস্বরূপ কাজী সাহেব তাঁর নিকট কয়েকটি চিঠি প্রেরণ করেন। এ কিতাবটি সে কয়েকটি চিঠির সমষ্টিমাত্র। এতে যদিও অনেক বিষয়ের অবতারণা ঘটেছে কিন্তু খারাজ সম্পর্কিত মাসায়েলের সমাবেশ ঘটেছে সবচেয়ে বেশী। এ কারণে এ কিতাবটি খারাজ সম্পর্কিত মূল আইনগ্রন্থ হিসাবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

এতে জমির উর্বরতার পার্থক্য হিসাবে বিভিন্ন কর ধার্য করা হয়েছে। সেকালে তিনি যে অপূর্ব দূরদর্শীতার পরিচয় দিয়েছেন তাও রুম আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। কিতাবটির রচনাশৈলী এই যে, অত্যন্ত স্বাধীনভাবে অথচ উপদেশমূলকভাবে সবকিছুকে যথাস্থানে বিন্যস্ত করা হয়েছে। তদুপরি ন্যায়পরায়ণতার প্রতি খলীফার দৃষ্টিও আকর্ষণ করা হয়েছে।

কাজী সাহেবের জীবনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল হারুনুর রশীদের ন্যায় পরাক্রমশীল খলীফার দরবারেও তিনি স্বীয় দায়িত্ব অত্যন্ত স্বাধীন এবং বেপরওয়াভাবে পালন করেছেন যার নজীর ইতিহাসে বিরল।

কিতাবটির একস্থানে তিনি খলীফাকে লিখেছেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি যদি আপনার প্রজাদের প্রতি ন্যায়পরায়ণতা দেখাতে চান, তবে প্রতিমাসে একবারও যদি দরবার করেন এবং অত্যাচারীদের অভিযোগ শ্রবণ করেন তবে আশা করা যায় যে, আপনার কাজে প্রজা বিদ্রোহ ঘটবে না। এক্রপে দু'একটা দরবারও যদি করেন তবে আপনার রাজ্যে তা ছড়িয়ে পড়বে। ফলে মাথা তুলতে কেউ সাহসী হবে না। আর সুবেদারের নিকট যদি এ সংবাদ পৌঁছে যে, আপনি বৎসরে একবার বিচার করবেন তবে তাতেও তাদের অত্যাচার স্পৃহা আপনিতেই দমে যাবে।

ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)

ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) ছিলেন ফিকহে হানাফীর দ্বিতীয় স্তম্ভ। দামেশকের নিকট একটি গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা জন্মভূমি পরিত্যাগ করে ওয়াস্তা আগমন করেন এবং সেখানেই বসবাস করতে থাকেন। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) ১৩৫ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন।

কুফা নগরেই শিক্ষা আরম্ভ করেন। তিনি মেসআর বিন কিদাম, সুফিয়ান ছাওরী, মালেক বিন দীনার, ইমাম আওয়ামী প্রমুখ হতে হাদীছ রেওয়াজাত করেন। তিনি দু' বৎসরকাল ইমাম সাহেবের খিদমতে কাটান। ইমাম সাহেবের ইন্তিকালের পর কাজী সাহেবের নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করেন। অতঃপর মদীনায় গিয়ে তিন বৎসর যাবৎ ইমাম মালেকের নিকট হাদীছ শিক্ষা লাভ করেন।

যৌবনের শুরুতেই তাঁর জ্ঞানগরিমা ও যশ-গৌরব চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ষাশ বৎসর বয়সেই তিনি শিক্ষকের আসনে সমাসীন হন। অল্প সময়ের মধ্যেই পোক সমাজ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ল। তাঁর জ্ঞান-গরিমা ও যোগ্যতার কথা

অবগত হয়ে খলীফা হারুনুর রশীদ তাঁকে কাজী পদে নিযুক্ত করেন। খলীফা প্রায়ই তাঁকে তাঁর সঙ্গে রাখতেন।

একবার খলীফা কাজী সাহেবসহ বিদেশ ভ্রমণে বের হলেন। সে ভ্রমণেই কাজী সাহেবের ইত্তিকাল হয়। বিখ্যাত নাহ্‌তী (ব্যাকরণবিদ) কাসাঈও সে সফরে ছিলেন; তিনিও ইত্তিকাল করেন।

খলীফা হারুনুর রশীদ অত্যন্ত শোকাহত ও দুঃখিত হলেন। তিনি বড়ই আক্ষেপ প্রকাশ করে বললেন, আজ আমরা ফিকহ এবং নাহ্‌ (ব্যাকরণ) উভয়টিকে সমাধিস্থ করে এসেছি। খলীফার সংগে একজন সাহিত্যিক ছিলেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে সফরের সময় কে রক্ষা করবে?

ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) যদিও অধিকাংশ সময় রাজ দরবারে কাটিয়ে দিতেন তথাপি তিনি সবসময়ই স্বাধীনচেতা ছিলেন।

ইয়াহয়া উলুবী নামক এক ব্যক্তি বিদ্রোহ ঘোষণা করল। হারুনুর রশীদ তাকে যথা সময়ে দমন করলে সে খলীফার সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হল। সন্ধিপত্র লিপিবদ্ধ করা হলে তার সন্তুষ্টির জন্য খলীফা সে সন্ধিপত্রে বড় বড় আলেম, ফকীহ এবং মুহাদ্দেছগণের দস্তখত নিলেন। সে সন্ধিপত্রে রাজী হয়ে বাগদাদে উপস্থিত হল।

কিছুদিন পর খলীফা সে সন্ধি ভঙ্গ করতে চাইলেন। খলীফার ভয়ে ভীত হয়ে, সমস্ত আলেম ফতোয়া দিলেন যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে সন্ধি ভঙ্গ করা বৈধ। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) প্রকাশ্যভাবেই এর বিরোধিতা করলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর এ অভিমতের উপরই অটল রইলেন।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন, ইমাম মুহাম্মদ যখন কোন মাসয়ালা বর্ণনা করতেন তখন মনে হত যেন ওহী অবতীর্ণ হচ্ছে।

এক ব্যক্তি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি প্রশ্নের এরূপ সূক্ষ্ম সমাধান কোথা হতে শিখলেন? তিনি উত্তর দিলেন, 'মুহাম্মদ বিন হাসানের কিতাব হতে।'

ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর শিক্ষা মজলিস হতে অসংখ্য ছাত্র শিক্ষা লাভ করেছিল। তাদের মধ্য হতে শাফেয়ীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর সাহচর্য হতেই অগাধ জ্ঞান লাভ করেন। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) নিজেই তা গর্বের সাথে স্বীকার করেন। হাফেজ ইবনে হজর আল আসকালানী ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর বাণী উদ্ধৃত করেন,

'মুহাম্মদ বিন হাসান খলীফার দরবারে অতি সম্মানী লোক ছিলেন। আমি প্রায়ই তাঁর খিদমতে আসা-যাওয়া করতাম। ফিকহ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানের গভীরতা উপলব্ধি করে আমার হৃদয় তাঁর প্রতি ভক্তিতে ভরপুর হয়ে উঠত। তাঁর শিক্ষা মজলিসে যোগদান আমার জন্য অপরিহার্য করে নিলাম। তাঁর পবিত্র মুখ হতে আমি যা কিছু শুনতে পেতাম তাই লিপিবদ্ধ করে নিতাম।

ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) স্বয়ং ইমাম শাফেয়ীকে বিশেষ মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখতেন। ছাত্রদের মধ্যে তিনি তাঁকে অপারিসীম স্নেহ করতেন। একবার তিনি খলীফা হারুনুর রশীদের দরবারে রওয়ানা হলেন। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)ও তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-কে দেখতে পেয়ে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) ধোড়া হতে নেমে গেলেন। অতঃপর খাদেমকে বললেন, যাও! খলীফাকে গিয়ে বলবে, আজ কোন কারণবশতঃ আমি দরবারে উপস্থিত হতে পারব না।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন, না হয় আমি অন্য সময়ে আপনার খিদমতে হাজির হব। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বললেন, আপনার আগমনের কারণে আমি যতটুকু উপকৃত হব সেখানে তার আশা করা যেতে পারে না।

তাঁদের উভয়ের মধ্যে অনেক সময় কোন মাসয়ালা নিয়ে তর্ক-বিতর্কও হতো। সে বিতর্ক অনেক সময় দীর্ঘকাল চলত। এ কারণে অনেকে ধারণা করেন যে, তাঁদের দু'জনের মধ্যে উস্তাদ শাগরেদের সম্পর্ক ছিল না। তাঁদের এ ধারণা ভুল। কারণ তখনকার দিনে ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে আলোচনামূলক তর্ক-বিতর্ক কোন আপত্তিকর ব্যাপার ছিল না। আর মূলতঃ এতে দোষণীয় কিছুই নেই।

ফিকাহশাস্ত্রের বিকাশের জন্য ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর প্রসিদ্ধি লাভ ঘটে। এ বিষয়ে তিনি অনন্য ছিলেন। তদুপরি তফসীর, হাদীছ এবং সাহিত্যেও তিনি যথেষ্ট জ্ঞান রাখতেন।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন, কোরআন মজীদ সম্বন্ধে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) হতে অভিজ্ঞ আলেম আমি আর কাউকে পাইনি। সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর কিতাব বর্তমানে দুস্তাপ্রাপ্য। তবে ফিকাহর যেসমস্ত মাসয়ালা নাহভু-এর সাথে সম্পৃক্ত তার রচিত কিতাব জামে কবীরে সেগুলোর উদাহরণ পাওয়া যায়। এর দ্বারাই এ সম্বন্ধে যে তাঁর অগাধ জ্ঞান রয়েছে তার অনুমান করা যায়। ইবনে খাল্লিকান প্রমুখসহ অনেকে এর উল্লেখ করেছেন।

হাদীছশাস্ত্রে তাঁর রচিত 'মুয়াত্তা' একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। এর দ্বারাই বুঝা যায়

হাদীছশাস্ত্রে তাঁর কিরূপ জ্ঞান ছিল। তদুপরি তিনি তাঁর রচিত ‘কিতাবুল হজ্জ’ গ্রন্থেও অনেক হাদীছের সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন।

ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর ‘কিতাবুল হজ্জ’ কিতাবটি বেশ প্রসিদ্ধ।

এ ছাড়াও ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) অনেক কিতাব রচনা করেছেন। তাঁর কিতাবের উপর হানাফী মাযহাবের দলীল প্রমাণের ভিত্তি।

ইমাম সাহেবের মৃত্যুর পর ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) মদীনায় গমন করেন। সেখানে তিন বছর যাবৎ অবস্থান করে ইমাম মালেক (রহঃ) হতে ‘মুয়াত্তা’ পাঠ করেন। অনেক মাসয়ালা মদীনাবাসীদের মাযহাবের সাথে ইমাম সাহেবের মাযহাবের গরমিল ছিল। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) মদীনা হতে প্রত্যাবর্তন করে এ কিতাবটি প্রণয়ন করেন। এ কিতাবটিতে সর্বপ্রথমে ইমাম সাহেবের মাসয়ালা বা মত উল্লেখ করা হয়েছে। অতঃপর মদীনাবাসীদের মত উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর তিনি হাদীছ, আছার এবং কিয়াস দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, ইমাম সাহেবের মতই ঠিক এবং যুক্তিযুক্ত; অন্যগুলো নয়।

ইমাম যুফার

ফিকাহশাস্ত্রে তাঁর গুরুত্ব ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর চেয়েও অধিক ছিল। কিন্তু তাঁর কিতাবটি দুস্প্রাপ্য হওয়ায় এবং তাঁর স্বন্ধে লোক সমাজ তেমন পরিজ্ঞাত না থাকায় জনসমাজে তাঁর যথাযথ মূল্যায়ন ও পরিচয় লাভ ঘটে নাই।

তিনি ছিলেন আরবের অধিবাসী। প্রথম হতেই তিনি হাদীছের খিদমত করতে শুরু করেন। তিনি ছাহেবুল হাদীছ বা হাদীছ বন্ধু উপাধি লাভ করেন।

‘জরাহ ও তাদীল’ শাস্ত্রের ইমাম ইয়াহয়া বিন মা’য়ীন বলেন, যুফারের অভিমত অতি মূল্যবান এবং বিশ্বাসযোগ্য।

‘কিয়াসে তিনি অতুলনীয় পাণ্ডিত্য লাভ করেন। স্বয়ং ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) তাঁর প্রশংসা করেন। তিনি কাজী পদেও নিয়োজিত হয়েছিলেন। তিনি ১১০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫৮ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

মেস’য়ার বিন কিদাম

‘তায়কেরাতুল হুফায’ কিতাবে তাঁর আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে— তিনি ছিলেন ইমাম, হাফেজ এবং অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

তিনি আলি ইবনে ছাবেত, হাকাম বিন উয়াইনা, কাতাদা, আমর বিন

মুগনা, এবং তাঁদের পর্যায়ের যাঁরা ছিলেন তাদের থেকে হাদীছ রেওয়াজাত গণন।

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা, ইয়াহয়া বিন সা'য়ীদ কাতান, মুহাম্মদ বিন বিশর, ইয়াহয়া বিন আদম, আবু না'য়ীম, খাল্লাদ বিন ইয়াহয়া প্রমুখসহ অনেকেই তাঁর থেকে হাদীছ রেওয়াজাত করেন।

ইয়াহয়া বিন সা'য়ীদ কাতান বলেন, আমি তাঁর থেকে অধিক নির্ভরযোগ্য কাউকে দেখি নাই।

ইমাম আহমদ (রহঃ) নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের উপমা দিতে গিয়ে বলেন, যেমন গু'রা ও মেসয়ার।

ওকী' (রহঃ) বলেন, মেস'য়ারের সন্দেহ অন্যদের ইয়াকীনতুল্য।

ইবনে উয়াইনা বলেন, আ'মাশ (রহঃ)-কে বলা হল, মেস'য়ার হাদীছের মধ্যে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তিনি বললেন, তাঁর সন্দেহও অপরের ইয়াক্বিনের সমতুল্য।

আবু জাফর মনসূর তাঁকে ওয়ালী হিসেবে নিয়োগ করতে চাইলে তিনি কৌশলে সেটা প্রত্যাখ্যান করে দেন।

তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সির্কা এবং সবজির উপর সবর করে তাকে কারো নিকট মাথা নত করতে হয় না।

ইমাম সাহেবের শিক্ষা মজলিসে তাঁর বিশেষ মর্যাদা ছিল।

ইব্রাহীম বিন ত্বাহমান

'তাহযীবুত্বাহযীব' নামক কিতাবে উল্লেখ রয়েছে যে, তিনি আবু ইসহাক সুরাইয়ী আবু ইসহাক শাইবানী, আব্দুল আযীয বিন ছুহাইব প্রমুখ থেকে হাদীছ শিক্ষা গ্রহণ করেন।

ইবনে মুবারক এবং স্বয়ং তাঁর উস্তাদ ছফওয়াদ বিন সুলাইম তাঁর থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন।

ইয়াহয়া বিন আকসাম বলেন, খোরাसान, ইরাক এবং হিজাযের মধ্যে যাঁরা হাদীছ বর্ণনা করেছেন তাঁদের সবার মধ্য তিনি সঠিক নির্ভরযোগ্য এবং জ্ঞানী ছিলেন।

আবু যুর'আ বর্ণনা করেন, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) একবার হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। উপস্থিত লোকদের মধ্যে হতে কেউ ইব্রাহীম বিন ত্বাহমানের

আলোচনা করলে তিনি সোজা হয়ে বসে গেলেন এবং বললেন, এটা মানানসই নয় যে, সালেহীনদের আলোচনা হবে আর আমরা হেলান দিয়ে বসে থাকব।

‘তাযকেরাতুল হুফফায়’ নামক কিতাবে বর্ণিত আছে তিনি ইমাম সাহেবের ছাত্র ছিলেন।

ইয়াযীদ বিন হারুন

তিনি আছেন আহওয়াল, ইয়াহয়া বিন সা‘য়ীদ, সুলাইমান তাইমী, দাউদ বিন আবি হিন্দ, ইবনে আউনসহ বহু মুহাদ্দিছ থেকে হাদীছ শিক্ষা লাভ করেছেন।

ইমাম আহমদ (রহঃ) সহ অনেকেই তাঁর শিষ্যত্ব লাভের গৌরব অর্জন করেছেন।

ইবনে মদীনী বলেন, হিফযের বিষয়ে তাঁর সমতুল্য আমি আর কাউকে দেখিনি।

ইয়াহয়া বিন ইয়াহয়া বলেন, তিনি ওকী’ হতেও অধিক স্মরণশক্তিসম্পন্ন ছিলেন।

আছেন বিন আলী বলেন, তিনি সারারাত নামায পড়তেন। চল্লিশ বছরেরও বেশী তিনি ইশার অযু দ্বারা ফজরের নামায পড়েছেন।

ইবনে হুশাইম বলেন, মিশরবাসীদের কেউ তাঁর তুল্য নয়।

ইবনে আকছাম বলেন, একবার খলীফা মামুন আমাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, যদি ইয়াযীদ বিন হারুনের ভয় না থাকত তবে আমি আমার এ মত প্রকাশ করতাম যে, কোরআন মাখলুক বা সৃষ্ট। কেউ বলল, ইয়াযীদ বিন হারুন এমন কে যে, তাকে ভয় করতে হবে। তিনি বললেন, ভয় এই যে, যদি আমি আমার মত প্রকাশ করি আর তিনি তার প্রতিবাদ করেন তবে মানুষ তার অনুসরণ করবে। ফলে ফিতনা সৃষ্টি হবে।

‘তাহযিবুল আসমা ওল্লুগাত’ নামক কিতাবে আল্লামা নবুবী (রহঃ) লিখেছেন, তাঁর ছাত্র সংখ্যা অগণিত।

ইয়াহয়া বিন আবি তালেব বর্ণনা করেন, একবার আমি তাঁর শিক্ষা মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। তখন অনুমান করা হল যে, উপস্থিত শিক্ষার্থীদের সংখ্যা প্রায় সত্তর হাজার।

অধিক সংখ্যক হাদীছ জানার ব্যাপারে তাঁর উপমা দেওয়া হত।

হাফছ বিন গিয়াস

তায়কেরাতুল হুফ্ফাযে তাঁকে ইমাম এবং হাফেজ উপাধি দেওয়া হয়েছে।

তাহযীবুততাহযীব কিতাবে উল্লেখ রয়েছে, তিনি আপন দাদা তলক বিন মু'আবিয়া, ইসমাঈল বিন আবি খালেদ, আশ'আছ আল হাদ্দানী, আবু মালেক আশজা'য়ী, সুলাইমান আততায়মী, আছেম আহওয়াল, উবাইদুল্লাহ বিন উমর, মুছআব বিন সুলাইম, ইয়াহয়া বিন সা'য়ীদ আল আনছারী, হিশাম বিন উরওয়া, আ'মাশ, ছাওরী প্রমুখ থেকে হাদীছ শিক্ষা লাভ করেন।

ওকী (রহঃ)-কে কোন মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিতেন।

ইবনে নুমাইর বলেন, তিনি ইবনে ইদ্রীস হতেও অধিক সংখ্যক হাদীছ জানতেন।

তিনি স্বয়ং বলেন, আমি আবু হানিফা থেকে তাঁর কিতাবাদি এবং 'আছার' শ্রবণ করেছি।

'তারীখে বাগদাদে' উল্লেখ রয়েছে, তিনি ইমাম সাহেবের বিশিষ্ট ছাত্র ছিলেন।

ইমাম সাহেব তাঁর প্রধান উস্তাদ শা'বী (রহঃ)-এর উৎসাহ দানের পর ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের প্রতি বিশেষ মনোনিবেশ করেন। এ জ্ঞান অর্জন করার পূর্বে তিনি প্রচলিত দ্বীনি উলূম বা ধর্মীয় জ্ঞান সম্পর্কে চিন্তা করলেন। এতে তাঁর নিকট ইলমে ফিকাহই অধিক উপকারী মনে হল। এর মধ্যেও হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)-এর ফিকাহর কেন্দ্র তাঁর নিকট উত্তম মনে হল। একারণে তিনি তাঁর (ইবনে মাসউদের) মুখপাত্র হাম্মাদ বিন আবি সুলাইমানের ইলমী মজলিসে শরীক হন। সেখানে হযরত ইবনে মাসউদ ব্যতীত উমর, হযরত আলী, হযরত ইবনে উমর, হযরত ইবনে আব্বাস, হযরত যায়দ বিন ছাবেত, হযরত আয়েশা (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবীদের থেকে বর্ণিত হাদীছ এবং জ্ঞানের আলোকে ফিকহী মাসায়েলের আলোচনা হত।

মিথ্যা নবী হতে নবুওয়াতের আলামত চাওয়া কুফর

ইমাম সাহেবের যমানায় এক ব্যক্তি নবুওয়াতের দাবী করল। শাস্তি দেয়ার উদ্দেশ্যেই হউক কিংবা বহু মুনাযারার উদ্দেশ্যেই হউক লোকে তাকে খেফতার করে আনল।

মিথ্যা নবী বলল, আমাকে একটু সুযোগ দাও যেন তোমাদের সামনে আমার নবুওয়াতের আলামত এবং সত্যতার নিদর্শন উপস্থাপন করতে পারি।

মানুষ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নিয়ে ভাবছিল চলো এটাও দেখে নেয়া যাক।

ইমাম সাহেব বললেন, না! কখনো এরূপ করা যাবে না। মিথ্যা নবী হতে নবুওয়াতের নিদর্শন চাওয়াও কুফরি। কারণ রাসূলুল্লাহ ছাওয়াল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার পরে আর কোন নবী নেই। মিথ্যা নবী হতে নবুওয়াতের নিদর্শন চাইলে বুঝা যায় যে, নবী হওয়া সম্ভব। এতে হুযুরের এ বাণীকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা হয় এবং খতমে নবুওয়াতের ব্যাপারে সন্দেহে পতিত হতে হয়, যা কুফরের কারণ।

ফতোয়ায় সতর্কতা

কোন মুসলমানকে কুফরের প্রতি সশ্রদ্ধ করার ব্যাপারে এবং কাফের ফতোয়া দেওয়ার ব্যাপারে ইমাম সাহেব অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতেন। তার মত ছিল যে, যদি কোন মুসলমানের মধ্যে কুফরের নিরান্নব্বইটি কারণ থাকে আর ঈমানের শুধুমাত্র একটি কারণ থাকে তবুও সেটাকে প্রাধান্য দেয়া হবে।

এক ব্যক্তি ইমাম সাহেবের নিকট এসে আরজ করল, জনাব এক ব্যক্তি ঈমান এবং ইসলামের দাবী করে এবং নিজেকে মুসলমান বলে কিন্তু এতদসত্ত্বেও-

- ১। সে জান্নাতের আকাজক্ষা রাখে না।
- ২। সে জাহান্নামের অগ্নিকেও ভয় করে না।
- ৩। নির্দিধায় মৃত প্রাণী খায়।
- ৪। নামায পড়ে কিন্তু রুকু সিজদা করে না।
- ৫। না দেখে সাক্ষ্য দেয়।
- ৬। তার নিকট ফিতনা প্রিয় এবং হক অপ্রিয়।
- ৭। রহমত হতে ভেগে যায়।
- ৮। ইয়াহুদী এবং নাসারাদের কথাকে সত্য বলে।

বাহ্যতঃ এগুলো কুফরীর কারণ। এমন ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার মত কি?

ইমাম সাহেব নির্দিধায় বললেন, আমার মতে সে মুসলমান। প্রশ্নকারীকে আশ্চর্য হতে দেখে তিনি বললেন, কারণ-

১। তার উপর আল্লাহর আকাঙ্ক্ষাই প্রাধান্য পেয়েছে। তাকেই সে চায়।
কাঃজেই জান্নাতের আকাঙ্ক্ষার প্রতি তার পরওয়া নেই।

২। সে জাহান্নামের আগুন নয় আগুনের রবকে ভয় পায়।

৩। সে মৃত মৎস খায়।

৪। জানাযার নামাজ গড়ে যাতে রুকু সেজদা নেই।

৫। আল্লাহ এবং তার রাসূলকে না দেখে তৌহীদ এবং রেসালাতেব সাক্ষ্য
দায়।

৬। ধন-দৌলত এবং সন্তান সন্ততিকে কোরআনে ফিতনা বলা হয়েছে।
ধাবাগতভাবেই সেগুলো মানুষের প্রিয়। মৃত্যু হক; কিন্তু ইবাদত করার জন্য
মৃত্যুকে অপছন্দ করলে সেটা মন্দ নয়। বরং প্রশংসনীয়।

৭। বৃষ্টি আল্লাহর রহমত। ভিজ়ে যাওয়ার ভয়ে সেখান থেকে সে ভেগে
যায়।

৮। ইয়াহুদী এবং নাসারা পরস্পরকে বলেছে যে তারা সত্যের উপর নয়।
এ কথায় সে বিশ্বাস করে আর এটাই হচ্ছে ইমান।

প্রশ্নকারী এবং উপস্থিত ব্যক্তির। ইমাম সাহেবের কথা শুনে বিস্মিত হয়ে
গেল।

ইমাম সাহেব কর্তৃক জনৈক কার্যীর ভ্রম সংশোধন

ইবনে আবি লায়লা দীর্ঘদিন কুফার কাষী ছিলেন। মসজিদে বসে তিনি
বিচারকার্য সমাধা করতেন। তার যে সমস্ত ফয়সালা ভুল হত ইমাম সাহেব
পত্ন্য প্রকাশের নিমিত্তে সেগুলো চিহ্নিত করে দিতেন।

একদিন তিনি বিচারকার্য সমাধা করে ফিরার পথে দেখতে পেলেন, একটি
মহিলা অন্য এক ব্যক্তির সাথে ঝগড়া করছে। তিনি ঐ লোকটিকে লক্ষ্য করে
মহিলাটিকে বলতে শুনলেন যে, 'হে দুই যিনাকারীর সন্তান!'

কাষী সাহেব ঐ মহিলাটিকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন।
ঐয়ং মসজিদে ফিরে এসে ফয়সালা দিলেন যে, মহিলাটিকে দাঁড় করিয়ে 'হদ্দে
শাফ' লাগানো হক এবং দুই হদ্দের একশত ঘাটটি দোররা মারা হউক।

ইমাম সাহেব যখন এ ঘটনার বিস্তারিত জানতে পারলেন; বললেন, কাজী
সাহেব এ ফয়সালায় ছয়টি ভুল করেছেন।

প্রথমতঃ তিনি বিচারের মজলিস সমাপ্ত করে উঠে যাওয়ার পর ফয়সালা করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ মসজিদের ভিতর 'হদ্দ' জারী করেছেন; যা নিষিদ্ধ।

তৃতীয়তঃ মহিলাটিকে দাঁড় করিয়ে হদ্দ লাগিয়েছেন। অথচ নিয়ম হল মেয়েদেরকে বসিয়ে হদ্দ লাগানো।

চতুর্থতঃ কাজী সাহেব দুইটি 'হদ্দ' লাগানোর নির্দেশ দিয়েছেন অথচ এক শব্দ দ্বারা একটি হদ্দ ওয়াজেব হওয়া চাই।

পঞ্চমতঃ কাজী সাহেব দুটি 'হদ্দ' একসাথে লাগিয়েছেন। অথচ যদি ধরে নেয়া যায় যে, কারো উপর দুটি 'হদ্দ' সাব্যস্ত হয়েছে তবে সে ক্ষেত্রে নিয়ম হল একটি হদ্দের চিহ্ন দূর হবার পর আরেকটি 'হদ্দ' লাগানো। উভয়টি একত্রে নয়।

ষষ্ঠতঃ হদ্দে কযফ লাগানোর জন্য যাকে কযফ (অপবাদ) লাগানো হয়েছে তার পক্ষ হতে দাবী থাকা চাই। উল্লেখিত অবস্থায় যাকে অপবাদ দেয়া হয়েছে তার পক্ষ থেকে কোন দাবীই উঠেনি। কাজী সাহেবের নিজের পক্ষ থেকে মোকাদ্দমা কায়েম করার কি অধিকার আছে।

কাজী সাহেব ইমাম সাহেবের এ বক্তব্য জানতে পেরে খুবই রাগান্বিত হলেন। তিনি গভর্ণরের নিকট নালিশ করলেন। ফলে গভর্ণর ইমাম সাহেবের ফতোাদানের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করে দিলেন।

ফতোয়া দেয়া ফরণে কিফায়াহ। ইমাম সাহেব ব্যতীত কুফা নগরীতে অনেক উলামা বিদ্যমান, যারা এ দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। তাই ইমাম সাহেব গভর্ণরের নির্দেশ শিরোধার্য করে নিয়ে ফতোয়া দেয়া থেকে বিরত রইলেন। এমনকি একবার তাঁর স্বীয় কন্যা ঐকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, আজ আমি রোজা রেখেছি। দাঁত হতে রক্ত বের হয়ে থুথুর সাথে মিশ্রিত হয়ে পেটে চলে গিয়েছে। এখন রোজার কি হুকুম। তিনি বললেন, হৃদয়ের মনি! তোমার ভাই হাম্মাদকে তার হুকুম জিজ্ঞাসা কর। আমাকে ফতোয়া দেয়া হতে বারণ করা হয়েছে।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে খাল্লিকান লিখেন, নির্দেশ পালনের উপমা এর চেয়ে বড় আর কি হতে পারে?

পরবর্তীতে গভর্ণর স্বয়ং একটি 'ফিকহী মাসয়ালায় ইমাম সাহেবের মুখাপেক্ষী হলে ইমাম সাহেবের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেয়া হয়।

অনুরূপ আরেকটি ঘটনা

খলীফা আবু জাফর মনছুরের সঙ্গে মুছেলবাসীরা কোন এক বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ ছিল। চুক্তিতে এ কথাটিও উল্লেখ ছিল যে, যদি মুছেলবাসীরা চুক্তিভঙ্গ কবে তবে তারা হত্যার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

ঘটনাক্রমে তারা চুক্তিভঙ্গ করে ফেলল। খলীফা সমস্ত ফিকাহবিদকে সমবেত করলেন। ইমাম সাহেবও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। খলীফা বললেন, রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি এ কথা বলেন নাই যে, মুমিনগণ শর্ত পূরণ করতে বাধ্য। মুছেলবাসীরা বিদ্রোহ না করার অঙ্গীকার করেছিল। এখন তারা আমার প্রতিনিধির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসেছে। কাজেই তাদের রক্ত আমার জন্য হালাল।

উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্য হতে একজন বলল, তাদের ব্যাপারে আপনার কথা গ্রহণযোগ্য। তাদের উপর আপনার ক্ষমতা রয়েছে। আপনি যদি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন তবে আপনি তাদেরকে ক্ষমা করার অধিকার সংরক্ষণ করেন। আর যদি তাদেরকে শাস্তি দেন তবে তারা শাস্তির যোগ্য।

খলীফা মনছুর ইমাম সাহেবকে লক্ষ্য করে বললেন, আপনার মতামত কি? আমরা কি শান্তিপ্ৰিয় খিলাফতের গোত্র নই?

ইমাম সাহেব বললেন, মুছেলবাসীরা যে শর্ত আরোপ করেছেন তাদের তা করার ক্ষমতা নেই। আর আপনি যে শর্ত আরোপ করেছেন তাও আপনার আওতায় পড়ে না। কারণ শুধুমাত্র তিন কারণে (হত্যা, যিনা, ইরতিদাদ) মুসলমানকে হত্যা করা যেতে পারে।

কাজেই তাদেরকে শাস্তি দেয়া আপনার জন্য অবৈধ হবে। আল্লাহর নির্দেশিত শর্ত পূরণ হবার অধিক যোগ্য। আচ্ছা বলুন তো! কোন মহিলা বিবাহিতা কিংবা কারো দাসী। শুওয়া ব্যতীত যদি তার দেহ কারো জন্য বৈধ করে দেয় তবে কি তার সাথে সঙ্গম করা বৈধ হবে?

খলীফা মনছুর ইমাম সাহেব ব্যতীত অন্যান্য ফিকাহবিদকে চলে যেতে নির্দেশ দিলেন। অতঃপর ইমাম সাহেবকে একাকী রেখে বললেন, 'জনাব আপনার ফতোয়াই সঠিক। আপনি অনুগ্রহ করে আপনার দেশে ফিরে যান। এখানে এমন ফতোয়া দিবেন না যা খলীফার বদনামের কারণ হবে এবং বিদ্রোহীদের শক্তি জোগাবে।

ইমাম সাহেবের ফিকহী উসূল

কিতাব, সুন্নাহ এবং ইজমার পর ইমাম সাহেব হযরত আলী এবং হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদকে (রাঃ) দলীল হিসাবে মানতেন। তাঁর মত ছিল, দুর্বল বা মুবসাল হাদীছ কিয়াস হতে অগ্রগণ্য। কাজেই এর কোন একটির উপস্থিতিতে কিয়াস অনুসারে আমল করা যাবে না।

ইমাম সাহেব স্বয়ং তাঁর ফিকহী মত এভাবে বর্ণনা করেন, প্রতিটি মাসয়ালার সমাধান কিতাবুল্লা হতে পেল সেখান থেকেই আমি গ্রহণ করি। আর যদি সেখানে না পাই তবে রাসূলুল্লাহ ছাঃল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নত এবং তাঁর ঐ সমস্ত হাদীছ থেকে গ্রহণ করি, যেগুলো নির্ভরযোগ্য রাবীদের থেকে নির্ভরযোগ্য রাবীগণ বর্ণনা করেছেন। আর যদি এর সমাধান কোরআন এবং হাদীছে না পাই তবে ছাহাবাদের থেকে যার মত ইচ্ছা গ্রহণ করি আর যার মত ইচ্ছা পরিত্যাগ করি। অতঃপর তাদের মত ছেড়ে অন্য কারও মত গ্রহণ করি না। আর যখন এটা ইব্রাহীম, শা'বী, ইবনে সীরিন, সায়ীদ বিন মুসাইয়্যেব এবং অন্যান্য মুজতাহিদ পর্যন্ত এসে পৌঁছে তখন তাদের ন্যায় আমার জন্যও ইজতিহাদ করার সুযোগ রয়েছে।

ইমাম সাহেবের এ কথাটি তাঁর ছাত্র এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ ভিন্ন শব্দে নকল করেছেন। কাযী আবু ইউসুফের বর্ণনা হল, যখন নির্ভরযোগ্য রাবীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ছাঃল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীছ আমাদের নিকট পৌঁছে, তখন আমরা সেটি গ্রহণ করি। আর যখন ছাহাবাদের মত আসে তখন আমরা তার বাইরে যাই না। আর যখন তাবেঈনদের মত আসে তখন আমরাও স্বীয় মত ব্যক্ত করি।

ইমাম সাহেবের সবচেয়ে বড় সমালোচক খতীব বাগদাদী তাঁর কিতাব 'তারিখে বাগদাদে' আব্দুল্লাহ বিন মুবারক থেকে তাঁর মত নকল করেন।

যখন রাসূলুল্লাহ ছাঃল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীছ পাওয়া যায় তখন তা শিরদার্য। আর যখন ছাহাবাদের মতামত পাওয়া যায়, তখন সেখান থেকে যে কোন একটি অবলম্বন করি, তাদের মতের বাইরে না। আর যখন তাবেঈনদের কোন কথা আসে তখন আমরাও তাদের মত ইজতিহাদ করি। অধিকন্তু খতীব বাগদাদী 'আল ফকীহ ওয়ালা মুতাফাক্কিহ' নামক কিতাবে ইমাম সাহেবের এ সম্পর্কিত কয়েকটি অভিমত উল্লেখ করেছেন। যেমন ইমাম সাহেবের বিশিষ্ট ছাত্র যুফার বিন হুযাইল থেকে ইমাম সাহেবের এ কথা বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি ইলমে দ্বীনের কোন বিষয় সম্পর্কে কথা বলে এবং ধারণা করে যে, আল্লাহ

তাআলা তাকে জিজ্ঞেস করবে না যে, দ্বীনের বিষয়ে তুমি কিভাবে ফতোয়া দিয়েছ, তবে তার নফস যেন আত্মহত্যা এবং দিয়াত (রক্তপণ) দু'টিই সহজ করে দিয়েছে।

ইমাম সাহেবের এ বক্তব্যটি খতীব বাগদাদী উল্লেখ করেন, যদি ইলমে দ্বীন নষ্ট হওয়ার কারণে আল্লাহর জিজ্ঞাসাবাদের ভয় না থাকত, তবে আমি কাউকে ফতোয়া দিতাম না। তার জন্য হবে আনন্দ আর আমার জন্য হবে বোঝা।

ওকী বিন জাররাহ হতে খতীব বাগদাদী ইমাম সাহেবের এ কথাটি বর্ণনা করেন, কোন কোন কিয়াস হতে মসজিদে প্রস্রাব করে দেয়া উত্তম।

এরপর লিখেন যে, ইয়াহয়া বিন সালেহকে ওকী বিন জাররাহ বলতেন, তুমি দ্বীনের বিষয়ে কিয়াস করা ছেড়ে দাও। কারণ আমি আবু হানিফাকে এরূপ বলতে শুনেছি।

খালেদ বিন সালমা আবু হানিফাকে বলতেন, যদি কোন হাদীছ না পাই তবে আমরা আপনার মতের মুখাপেক্ষী হই। আর যদি কোন হাদীছ পেয়ে যাই তবে আপনার কথা দেয়ালের উপর নিষ্ক্ষেপ করি।

যুফার বিন হুযাইল বলেন, হাদীছ না পেলে আমরা কিয়াস অনুসারে আমল করি। হাদীছ পেলে আমরা কিয়াস প্রত্যাখ্যান করে হাদীছ গ্রহণ করি।

তদ্রূপ ওকী বিন জাররাহ বলেন, প্রয়োজনের ভিত্তিতে আবু হানিফাকে যে কোন কথা বলেছেন, আমরা তার সমর্থনে হাদীছ বর্ণনা করি।

ফিকাহর কোন কোন মাসয়ালা কিয়াসের বিপরীত হয়। সেগুলোকে ইস্তিহসান বলা হয়। এ ধরনের অবস্থার সম্মুখীন হলে ইমাম সাহেব খুবই সতর্কতা এবং চিন্তা ফিকিরের সাথে কাজ করতেন। এ সম্পর্কে তাঁর বিশিষ্ট শাগরেদ কাযী আবু ইউসুফ থেকে খতীব বাগদাদী এ বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন, ফিকাহ সম্পর্কিত কোন মাসয়ালা বর্ণনা করার পূর্বে এক বৎসর পর্যন্ত তিনি চিন্তা ফিকির করতেন। এ সময়ে তাঁর কোন শাগরেদের নিকট তা প্রকাশ করতেন না। এক বৎসর পর সেটাকে সুদৃঢ় করে তাদের সামনে প্রকাশ করতেন। আর যখন ইস্তিহসান সম্পর্কে কথা বলতেন তখন গভীর চিন্তা এবং বিবেচনার পর নিশ্চিত হলেই কিছু বলতেন, নচেৎ বলতেন না।

ইমাম সাহেব সম্পর্কে খতীব বাগদাদী'র এসব উদ্ধৃতি শত্রু স্বীকৃত গুণ এর পর্যায়ে। এতে ইমাম সাহেবের ফিকহী মতবাদ স্পষ্টরূপে প্রকাশ পেয়েছে। আল্লামা ইবনে হযমের এ উদ্ধৃতিটিও এ পর্যায়ে।

আবু হানিফার সমস্ত শাগরেদ এ বিষয়ে ঐক্যমত যে, আবু হানিফার মাযহাবে কিয়াস অপেক্ষা জসফ হাদীছ উত্তম এবং অগ্রগণ্য।

ইমাম আওয়ামী (রহঃ) সিরিয়ার অধিবাসী ছিলেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ ইমাম ও একটি ভিন্ন মাযহাবের প্রবক্তা ছিলেন।

একবার মক্কা মুকাররমায় ইমাম সাহেবের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ হয়। তাঁরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে লাগলেন। প্রসঙ্গক্রমে রফে ইয়াদাইন অর্থাৎ রুকুতে যাবার সময় এবং রুকু হতে উঠার সময় হাত উঠানোর মাসয়ালটি তাঁদের আলোচনায় এসে গেল।

ইমাম আওয়ামী (রহঃ) ইমাম সাহেবকে লক্ষ্য করে বললেন, ইরাকবাসীরা! আপনাদের কী হল আপনারা রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু হতে উঠার সময় 'রফে ইয়াদাইন' করেন না।

ইমাম সাহেব বললেন, এ সম্পর্কিত কোন প্রামাণ্য হাদীছ নেই। এতে ইমাম আওয়ামী (রহঃ) বললেন, কি করে আপনারা বলেছেন যে, এ সম্পর্কিত কোন প্রামাণ্য হাদীছ নেই। অথচ আমার নিকট ইমাম যুহরী (রহঃ) সালেমের বরাদ দিয়ে তার পিতা আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শুরু করার সময়, রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু হতে উঠার সময় হাত উঠাতেন।

তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এটা বুঝানো যে, এ হাদীছের রাবী প্রত্যেকেই নির্ভরযোগ্য। কাজেই রফে ইয়াদাইনের হাদীছ নির্ভরযোগ্য সনদ দ্বারা প্রমাণিত। এর উত্তরে ইমাম সাহেব বললেন, আমার নিকট হাম্মাদ ইব্রাহীম হতে, তিনি আলকামা হতে, তিনি ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শুরু করার সময় ব্যতীত অন্য সময়ে হাত উঠাতেন না।

ইমাম আওয়ামী (রহঃ) এ কথা শুনে বলতে লাগলেন, সুবহানাল্লাহ! আমি যুহরী হতে সালেমের বরাদ দিয়ে ইবনে উমরের রেওয়াজাত বর্ণনা করেছি আর আপনি বলেছেন, হাম্মাদ আমাকে ইব্রাহীম হতে রেওয়াজাত করেছে।

ইমাম আওয়ামী (রহঃ) বুঝাতে চেয়েছেন যে, ইমাম সাহেবের রেওয়াজাতের তুলনায় তার রেওয়াজাতে রাবীর সংখ্যা কম হওয়ার কারণে তার হাদীছটির সনদ আলী বা উন্নত। কারণ তাঁর বর্ণিত হাদীছের সনদে তাঁর মধ্যে এবং হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী ইবনে উমর (রাঃ)-এর মধ্যে মাত্র দু'জন রাবী রয়েছেন।

পক্ষান্তরে ইমাম সাহেবের বর্ণিত হাদীছের সনদে ইমাম সাহেব এবং হাদীছ বর্ণনাকারী ছাহাবী ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর মধ্যে তিনজন রাবী রয়েছে। কাজেই তাঁর বর্ণিত হাদীছটির সনদ আলী। তাই সেটি অগ্রগণ্য হওয়ার দাবীদার।

এর উত্তরে ইমাম সাহেব বললেন, হাম্মাদ ফিকাহ সম্পর্কে যুহরী হতে অধিক জ্ঞাত। ইব্রাহীম ফিকাহ সম্পর্কে সালেম হতে অধিক জ্ঞাত। ফিকাহর ব্যাপারে ইবনে উমর হতে আলকামা কম জ্ঞানী নন। যদিও তিনি ছাহাবী হবার মর্যাদা লাভ করেছেন। আর আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ তো নিজেই নিজের তুলনা।

ইমাম সাহেবের এ উত্তর শুনে ইমাম আওয়ামী (রহঃ) চূপ হয়ে গেলেন।

আবু হানিফার (রহঃ) ফিকাহ সম্বন্ধে ইমামগণের মত

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বর্ণনা করেন, আমি ইমাম মালেককে জিজ্ঞেস করলাম যে, আপনি কি আবু হানিফাকে দেখেছেন? ইমাম মালেক (রহঃ) বললেন, সুবহানাল্লাহ! আমি তাঁর মত আলেম দেখিনি। আল্লাহর কসম! যদি আবু হানিফা বলেন যে, এ স্তম্ভটি স্বর্ণের তবে তিনি তা প্রমাণ করে দিবেন। এক বর্ণনায় এরূপ রয়েছে, যদি আবু হানিফা বলেন যে, এ স্তম্ভটি স্বর্ণের তবে তা তদুপই হবে। তাঁকে এমন জ্ঞান দেয়া হয়েছিল যে, এটা তাঁর জন্য কঠিন কোন ব্যাপার ছিল না।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি ফিকাহ সম্পর্কে আবু হানিফা হতে অধিক অভিজ্ঞ অন্য কাউকে দেখিনি। যে ব্যক্তি ফিকাহ শিখতে চায়, সে যেন আবু হানিফা এবং তাঁর শাগরেদদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। ফিকাহর বিষয়ে সকল আহলে ইলম আবু হানিফার মুখাপেক্ষী। তিনি আরো বলেছেন, যে ব্যক্তি ফিকাহ সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করতে চায় সে যেন আবু হানিফার অনুসরণ করে।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেন, সুবহানাল্লাহ! আবু হানিফা ইলম, যুহদ (দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি) এবং তাকওয়ার এমন উচ্চাসনে আছেন যা অন্য কেউ পেতে পারে না। কাযীর পদ গ্রহণের জন্য আবু জাফর মনসুরের নির্দেশে তাঁকে দুররা মারা হয়েছে। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি। তাঁর উপর আল্লাহর রহমত এবং সন্তুষ্টি নাযেল হোক।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে দুররা মারার পর যখন তিনি আবু হানিফা

(রহঃ)-এর এ ঘটনা স্মরণ করতেন. তখন অশিষ্টিসত্ত্বেও তাঁর ক্রন্দন এসে যেত এবং তাঁর জন্য রহমত এবং মাগফিরাতের দোয়া করতেন ।

সুফিয়ান বিন উয়াইনা বলেন, যে ব্যক্তি ইলমে মাগাযী (জিহাদ সম্পর্কিত জ্ঞান) অর্জন করতে চায় তার জন্য মদীনা, যে ব্যক্তি হজেজর মানাসেক হাসিল করতে চায় তার জন্য মক্কা, আর যে ব্যক্তি ইলমে ফিকাহ অর্জন করতে চায় তার জন্য কূফা । সে যেন আবু হানিফার ছাত্রদের সঙ্গ অবলম্বন করে ।

আব্দুল্লাহ বিন মুবারক (রহঃ) বলেন, যদি হাদীছের পর কিয়াসের প্রয়োজন পড়ে, তবে মালেক, সুফিয়ান এবং আবু হানিফার কিয়াস গ্রহণযোগ্য । এ তিনজনের মধ্যে আবু হানিফা ফিকাহ সম্পর্কে অধিক অভিজ্ঞ । তিনি সূক্ষ্ম দৃষ্টি দ্বারা ফিকাহর গভীর দেশে পৌঁছেছেন । যখন আবু হানিফা এবং সুফিয়ান কোন বিষয়ে একমত হন তবে আমি সেটাই দলীল হিসাবে গ্রহণ করি ।

ইবনে আব্দিল বারর কিতাবুল ইত্তিকায় লিখেন যে, আবু হানিফা ছিলেন ফিকাহর ইমাম, কিয়াস এবং রায়ের বিষয়ে অভিজ্ঞ, মাসয়লা গবেষণায় গোধাবী, প্রত্যুৎপন্নমতি মুত্তাকী আলেম । অবশ্য খবরে ওয়াহেদ (যে হাদীছের রাবী কোন এক পর্যায়ে হলেও একজন হয় তাকে খবরে ওয়াহেদ বলে) এর ব্যাপারে তাঁর মত ছিল যে, সর্বজন সমর্থিত নীতির বিপরীত হলে তা তিনি গ্রহণ করতেন না । এজন্য মুহাদিছদের একদল তাঁর বিরোধিতা করতেন । তাঁর সম-সাময়িকরাই সর্বাধিক পরশীকাতর ছিলেন । তারা তাঁর দোষ খুঁজতে শুরু করলেন । আর একে তারা বৈধও মনে করতেন । এর বিপরীত অন্যান্যরা তাঁকে অত্যাধিক ইয্যত সম্মান করতেন ।

অন্যান্য ইমামগণের দৃষ্টিতে ইমাম সাহেবের মর্যাদা

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) একবার ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর কবর যিয়ারতে আসলেন । ইতিমধ্যে ফজরের নামাযের সময় হলো । ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) সেখানেই নামায আদায় করলেন । কিন্তু নামাযে তিনি উচ্চস্বরে বিসমিল্লাহ পড়লেন না কিংবা দোয়ায় কুনুতও পড়লেন না । অথচ তাঁর মাযহাব হলো সারা বৎসর ফজরের নামাযে দোয়ায় কুনুত পড়তে হবে এবং জাহরী বিসমিল্লাহ (নামাযে তাসমিয়া) স্বশব্দে পড়তে হবে ।

এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, এ কবরে শায়িত ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) থেকে লজ্জা হওয়ার কারণে এবং তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য আমি আমার চিরাচরিত নিয়ম এবং মত পরিত্যাগ করেছি ।

ইমাম আবু জাফর সাদেক এবং ইমাম আবু হানিফা

একবার হজ্জের সময় ইমাম আবু জাফর সাদেকের সাথে ইমাম সাহেবের সাক্ষাৎ হয়। কথা প্রসঙ্গে আবু জাফর জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আমার নানা (রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হাদীছের বিপরীত কিয়াস করেন নাকি? ইমাম সাহেব বললেন, নাউযুবিল্লাহ! আমাদের নিকট আপনিও আপনার নানার মত সম্মানিত। তাশরীফ রাখুন। এ বিষয়ে আমি কিছু কথা আরয় করব। ইমাম সাহেব আবু জাফরের সামনে আদবের সহিত বসলেন এবং বললেন, আমি আপনাকে তিনটি বিষয়ে জিজ্ঞেস করব। আপনি উত্তর দিবেন। এরপর আমি আরয় করব।

১। পুরুষ দুর্বল না মেয়ে দুর্বল? ইমাম আবু জাফর বললেন, মেয়ে দুর্বল। ইমাম সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, পুরুষের তুলনায় মেয়েরা কতটুকু মিরাহ্ পায়? ইমাম আবু জাফর বললেন, পুরুষের অর্ধেক। ইমাম সাহেব বললেন, যদি আমি কিয়াস করতাম তবে এর বিপরীত বলতাম। কারণ মেয়েরা পুরুষের তুলনায় দুর্বল।

২। নামায উত্তম না রোযা উত্তম? ইমাম আবু জাফর বললেন, নামায উত্তম। ইমাম সাহেব বললেন, যদি আমি কিয়াস করতাম তবে বলতাম, ঋতুবতীরা যেন রোযার পরিবর্তে নামায কাযা করে।

৩। প্রস্রাব অধিক নাপাক নাকি শুক্র? ইমাম আবু জাফর বললেন, প্রস্রাব অধিক নাপাক। ইমাম সাহেব বললেন, যদি কিয়াস গ্রহণযোগ্য হত, তবে আমি বলতাম, শুক্র দ্বারা গোসল ওয়াজিব হবে না, বরং প্রস্রাব দ্বারা ওয়াজিব হবে।

এ কথা শুনে ইমাম আবু জাফর ইমাম সাহেবের ললাটে চুষন করলেন। ইমাম আবু জাফর ইমাম সাহেবের শায়খ এবং উস্তাদ ছিলেন। কেউ তাঁর নিকট বলেছিল, আবু হানিফা কিতাব এবং সুন্নাহ বাদ দিয়ে নিজের কিয়াস অনুসারে আমল করে। এজন্য সরাসরি তিনি তাঁর ছাত্র থেকে ভুল ধারণা দূর করে নিলেন।

শরীয়ত সংকলন

ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)ই সর্বপ্রথম শরীয়তের বিষয়গুলো বিভিন্ন অধ্যায়ে সাজিয়ে সংকলন করেন।

জালালুদ্দীন সূয়ুতী (রহঃ) লিখেন, ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) সর্বপ্রথম শরীয়ত সংকলনের এবং সেটাকে বিভিন্ন অধ্যায়ে ভাগ করার মর্যাদা লাভ

করেন। অতঃপর ইমাম মালেক (রহঃ) তাঁর অনুকরণ করেন। আবু হানিফার আগে কেউই এ কাজ করেননি।

ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) সহীহ হাদীছ নির্বাচিত করে সেগুলো সংকলন করে নেন। পরে তিনি সেগুলো শাগরেদদের সামনে দরস (পাঠ) হিসেবে উপস্থাপন করেন। যোগ্য শাগরেদবৃন্দ সেগুলো লিখে নিয়ে কিতাবে রূপ দেন। সেটাই 'কিতাবুল আছার' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এটা দ্বিতীয় শতাব্দীর দ্বিতীয় চতুর্থাংশের ঘটনা।

হাদীছের অন্যান্য কিতাবের মত কিতাবুল আছারের বর্ণনাকারী অনেক হওয়ার কারণে এরও বিভিন্ন নুসখা (কপি) হয়েছে। এ কিতাবের বর্ণনাকারীদের সংখ্যা অনেক। তন্মধ্যে চারজনের বর্ণনা প্রসিদ্ধ। এঁরা হচ্ছেন- ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম মুহাম্মদ, ইমাম যুফার এবং ইমাম হাসান (রহঃ)। এগুলোর মধ্যে আবার ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর রেওয়াজে অধিক প্রসিদ্ধ এবং সমাদৃত হয়েছে। হাফেয ইবনে হজর আসকালানী (রহঃ) লিখেন, এ সময়ে ইমাম আবু হানিফার হাদীছ হতে 'কিতাবুল আছার' রয়েছে যেটি মুহাম্মদ (রহঃ) বর্ণনা করেছেন।

আবু যুহরা মিসরীর রায়

প্রসিদ্ধ লেখক আবু যুহরা মিসরী (রহঃ) কিতাবুল আছার সম্পর্কে লিখেন, তিন কারণে এ কিতাবটি মূল্যবান। প্রথমতঃ এ কিতাবটি ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর বর্ণিত হাদীছগুলোর ভাণ্ডার। এ কিতাব দ্বারা আমরা জানতে পারি যে, ইমাম সাহেব মাসয়ালা গবেষণার ব্যাপারে কিভাবে হাদীছকে প্রমাণ হিসাবে উপস্থাপন করেছেন। দ্বিতীয়তঃ এ কিতাব দ্বারা আমরা জানতে পারি যে, ছাহাবায়ে কিরামের ফতোয়া এবং মুরসাল হাদীছ কোন পর্যায়ের দলীল। তৃতীয়তঃ এ কিতাব দ্বারা আমরা ইরাকের ফিকাহবিদ তাবেয়ীদের ফতোয়া, বিশেষ করে কুফার ফিকাহবিদদের ফতোয়া জানতে পারি।

কিতাবুল আছার-এর নির্বাচনঃ ইমাম আবু বকর বলেন, ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) চল্লিশ হাজার হাদীছ হতে কিতাবুল আছার নির্বাচন করেছেন।

মোল্লা আলী কারী (রহঃ) লিখেন, ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) তাঁর রচনাবলীতে সত্তর হাজারেরও অধিক হাদীছ উল্লেখ করেছেন। আর চল্লিশ হাজার হাদীছ হতে কিতাবুল আছার নির্বাচন করেছেন।

ইয়াহয়া বিন নসর বলেন, আমি ইমাম আবু হানিফার (রহঃ) একটি

কামরায় প্রবেশ করলাম। দেখলাম সেটি কিতাবে ভরপুর। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এগুলো কি? তিনি বললেন, এগুলো সব হাদীছ। আমি এর থেকে কমসংখ্যক হাদীছ বর্ণনা করেছি।

জামেউল মাসানিদঃ ইমাম মুহাম্মদ বিন মাহমুদ খাওয়ারেযমী (রহঃ) একটি বিরাট কিতাব আকারে ফেকহী মাসয়ালার ধারা অনুসারে সন্নিবেশ করেন। এটির নাম জামেউস মাসানীদ (মুসনাদসমূহের সমন্বয়কারী)। তিনি কিতাবের ভূমিকায় লিখেন,

শামদেশের (সিরিয়ার) জাহেলদের মুখে আমি ইমাম সাহেবের হাদীছের পরিমাণের ব্যাপারে এমন ক্ষুদ্র পরিমাণ শুনেছি যাদ্বারা ইমাম সাহেবের অপমান হয়। এর কারণেই তারা ইমাম সাহেবকে অল্প সংখ্যক হাদীছ জ্ঞাত হিসেবে জানে। এর প্রমাণ হিসেবে তারা মুসনাদে শাফেয়ী এবং মুয়াত্তা ইমাম মালেক উল্লেখ করে বলে যে, ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর কোন মুসনাদ কিংবা হাদীছের কিতাব নেই। তিনি তো মাত্র অল্প কয়েকটি হাদীছ বর্ণনা করতেন। এরপর আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, বড় বড় আলেমদের লিখিত পনেরটি মুসনাদ আমি এক কিতাবে সন্নিবেশ করব।

এ ছাড়াও ইমাম শরফুদ্দীন ইসমাঈল বিন ঈসা আলমক্কী, আবুল বাকা আহমদ বিন জিয়া মুহাম্মদ আলকারশী, মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ আল করদরী প্রমুখ জামেউল মাসানিদকে বিভিন্ন নামে সংক্ষিপ্ত করে ইমাম হানিফার হাদীছের খিদমত করেন।

ইমাম বুখারী এবং ইমাম আবু দাউদের উস্তাদ আলী বিন জাদ বলেন, আবু হানিফা যখন হাদীছ উল্লেখ করেন তখন তা মোতির মত বর্ষিতে থাকে।

প্রশ্ন জাগতে পারে যে, ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) সত্তর হাজার হাদীছের চল্লিশ হাজার হতে কিতাবুল আছার নির্বাচিত করেছেন, পক্ষান্তরে ইমাম বোখারী (রহঃ) ছয় লক্ষ হাদীছ হতে নির্বাচিত করে বোখারী শরীফ সংকলন করেছেন। তবে দেখা যাচ্ছে ইমাম বোখারী (রহঃ) ইমাম সাহেব হতে অনেক বড় মুহাদ্দিছ ছিলেন এবং তাঁর জ্ঞাত হাদীছ অনেক বেশী।

এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, হাদীছের স্বল্পতা কিংবা আধিক্য সনদের উপর নির্ভর করে। একই হাদীছ যদি দশটি সনদে বর্ণনা করা হয়, তবে সেখানে দশটি হাদীছ ধরা হবে। আর যদি বিশটি সনদে বর্ণনা করা হয় তবে সেখানে বিশটি হাদীছ ধরা হবে, কিন্তু মূল হাদীছ একটিই।

মূলতঃ সহীহ হাদীছের সংখ্যা উলামায়ে কিরামের গণনা হিসেবে চার হাজার চারশটি। ইমাম সাহেব যে সত্তর হাজার হাদীছ জানতেন তা ছিল সনদের পরিবর্তনের উপর নির্ভর করে। ইমাম সাহেব এবং ইমাম বোখারীর জন্মের মধ্যে একশ চৌদ্দ বছর পার্থক্য রয়েছে। এ দীর্ঘ সময়ে সনদের সংখ্যাও বহুগুণ বেড়ে গেছে। সুতরাং সত্তর হাজার এবং ছয় লক্ষের পার্থক্য মূলতঃ সনদের সংখ্যার পার্থক্য মাত্র; মূল হাদীছের নয়।

ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর পূর্বে বিশিষ্ট সাহাবী এবং তাবেয়ীগণ হাদীছের আলোচনার মত ফিকাহর আলোচনাও করতেন। হাদীছ থেকে মাসয়ালা গবেষণা করে বের করতেন। সেগুলো সংকলনও করা হত। কিন্তু সেটা কোন নিয়মতান্ত্রিক সংকলন ছিল না কিংবা সেটা ভিন্ন বিষয় হিসেবে ছিল না। এতে এমন কোন নিয়মও সংকলিত হয়নি যার উপর ভিত্তি করে আহকাম বের করা যাবে।

১২০ হিজরীতে ইমাম সাহেবের উস্তাদ হাম্বাদের মৃত্যু হয় এবং ইমাম সাহেব তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। দেশের বিভিন্ন স্থান হতে দৈনিক তাঁর নিকট ফিকাহ সম্পর্কিত শত শত প্রশ্ন আসতে লাগল। এ সবগুলোর উত্তর দেয়া এক ব্যক্তি দ্বারা সম্ভব নয়। তিনি এটাও লক্ষ্য করলেন যে, সরকারী কাযী এবং হাকেমগণ ভুল ফয়সালা করছেন। এসব চিন্তা করে তিনি একটি আইন পরিষদ গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। সে পরিষদ আলোচনার মাধ্যমে শরীয়তের সমস্ত আহকাম সংকলন করে রাখবে। যেন ভবিষ্যতে যে কোন মাসয়ালার সমাধান সংকলিত আহকাম এবং নীতি নিয়মের উপর নির্ভর করে দেয়া যেতে পারে। এ দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, যে সমস্ত মাসয়ালার সম্মুখীন হতে হয় শুধু সেগুলোর সমাধানই তিনি দিয়ে যাননি বরং যে সমস্ত মাসয়ালার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলোরও সমাধান দেয়ার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন।

একবার ইমাম কাতাদা (রহঃ) ইমাম সাহেবের ফেকহী এবং ইলমী সুনাম শুনে তাঁর খিদমতে উপস্থিত হলেন। মজলিসে কোন একটি মাসয়ালার আলোচনা উঠল, ইমাম সাহেব সে মাসয়ালার সমস্ত দিকগুলো তুলে ধরে সেগুলোর আহকাম বর্ণনা করলেন। ইমাম কাতাদা (রহঃ) জিজ্ঞেস করলেন, এসব অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে, না কি কাল্পনিক বর্ণনা দিচ্ছেন?

ইমাম সাহেব বললেন, আলেমদের উচিত লোকদের যে সমস্ত বিষয়ের সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলোর সমাধানের জন্য পূর্ব থেকেই প্রস্তুত

থাকা। কোন মাসয়ালার সম্মুখীন হওয়ার পূর্বে তার আহকামগুলো ভেবে রাখা চাই। এমন যেন না হয় যে, সমস্যা তো এসে পড়ল কিন্তু সমাধান জানা নেই। বরং এমন হওয়া চাই যে, সমস্যা আসার সময় সে জানবে শরীয়তে এর থেকে নিষ্কৃতির কি ব্যবস্থা রয়েছে।

ফিকাহর সংকলন এবং তার শ্রেণী বিন্যাস যেমনি গুরুত্বপূর্ণ ঠিক তেমনি নাজুক এবং সতর্কতার দাবীদার। এ কারণেই ইমাম সাহেব এককভাবে এ দায়িত্ব পালন করেননি। বরং তিনি আইন প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করেন। এ কমিটিতে এমন লোকদের নেয়া হয় যাদের প্রত্যেকেই ফেকহী মাসয়ালার ব্যাপারে ইজতেহাদের যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। এঁদের সংখ্যা ছিল চল্লিশ।

অধিকন্তু নীতি নির্ধারণের জন্য যেসব বিষয়ে জ্ঞান থাকা আবশ্যিক সৈসব বিষয়ে পারদর্শী লোকও সে কমিটিতে ছিলেন। যেমন ইমাম মুহাম্মদ আরবী ভাষা এবং আদবে (সাহিত্য), কাসেম বিন মায়ীন সাহিত্যে, ইমাম যুফার (রহঃ) মাসয়ালার গবেষণার ব্যাপারে, কাযী আবু ইউসুফ, দাউদ তাঈ, ইয়াহয়া বিন আবি যায়েদা, আব্দুল্লাহ বিন মুবারক এবং হাফস বিন গিয়াস রেওয়াজেত এবং হাদীছে পারদর্শী ছিলেন।

চল্লিশ সদস্যের পরিষদ ব্যতীত তের সদস্যেরও একটি কমিটি ছিল। এ কমিটির কাজ ছিল চল্লিশ সদস্যের কমিটিতে আলোচিত মাসয়ালার সিন্দাক্ত গ্রহণ করা। এ কমিটিতে আব্দুল্লাহ বিন মুবারক, ইমাম আবু ইউসুফ, ইমাম যুফার, ইউসুফ বিন খালিদ এবং স্বয়ং ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)ও ছিলেন।

সমস্ত মাযহাবের মধ্যে হানাফী মাযহাবেরই এ মর্যাদা রয়েছে যে, এটি আইন পরিষদ দ্বারা সংকলিত হয়েছে। অন্য কোন মাযহাবে এ সৌভাগ্য হয়নি। মুয়াফ্ফেক মক্কীর বর্ণনা মতে, এ মাযহাবের নাম 'শুরাই মসলক' বা আলোচনামূলক মাযহাব।

ইমাম আবু হানিফার খিদমতে প্রথমে প্রতিটি মাসয়ালার বিভিন্ন দিক এবং এর বিভিন্ন উত্তর উপস্থাপন করা হত। যেটা সর্বাধিক প্রযোজ্য এবং সঠিক মনে করতেন তিনি তাই বলতেন। এভাবে কোন কোন মাসয়ালার দীর্ঘদিন পর্যন্ত আলোচনা করা হত এরপর তা লিখা হত। ইমাম সাহেব কখনো তাঁর শাগরেদদেরকে তাঁর মত গ্রহণের জন্য চাপ সৃষ্টি করেননি। বরং প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে নিজের মত যুক্তির মাধ্যমে উপস্থাপন করতেন এবং এরপর

আলোচনার পর যার যে মত ইচ্ছে গ্রহণ করতেন।

ইমাম সাহেবের প্রতিষ্ঠিত দস্তুরী কমিটি অর্থাৎ আইন পরিষদ তিরিশ বছর পর্যন্ত এভাবে কাজ করতে থাকে এবং ইসলামী নীতিমালা সংকলন করতে থাকে। এ নীতিমালার সমষ্টির কিতাবগুলো আবু হানিফা (রহঃ)-এর ফিকাহর কিতাব নামে পরিচিতি লাভ করে। এগুলোতে ফিকাহর তিরিশি হাজার দফা লিপিবদ্ধ ছিল। ইমাম সাহেবকে বাগদাদের জেলে স্থানান্তর করার পরও এ কাজ চলতে থাকে। ঐ নীতিমালার মধ্যে সংযোজন করলে মাসয়ালার সংখ্যা পঞ্চাশ লাখে উন্নীত হয়।

ফিকহে হানাফীর এ কিতাবগুলো সর্বত্র সমাদৃত হয়। ইসলামী হুকুমত সরকারীভাবে এগুলোকে কাযীদের নিকট রেখেছিলেন। এগুলোর দ্বারা তারা উপকৃত হয়েছিলেন। ইয়াহয়া বিন আদম বলেন,

* قضي به الخلفاء والائمة والحكام واستقر عليه الامر

“খলীফা ইমাম এবং হাকেমগণ এগুলো দ্বারা বিচার করতেন, পরবর্তীতে এর উপরই আমল হতে লাগল।”

ফিকহে হানাফীর মধ্যে ইসলামী আইন সম্পর্কীয় যে সমস্ত কিতাব সংকলিত হয় সেগুলো নিম্নরূপঃ

(ক) যাহেরুর রেওয়াজেতের কিতাব। এখানে ছয়টি কিতাব রয়েছে, এগুলোর প্রণেতা ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)।

১। জামে সগীর। এটিকে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর রেওয়াজেত হতে সংকলন করেন। এ কিতাবটির চল্লিশটি ব্যাখ্যা লিখা হয়েছে।

২। জামে কবীর। এটিতে জামে সগীর অপেক্ষা অধিক মাসয়ালার সংকলন করা হয়েছে। ইমাম সাহেবের মতামত ছাড়াও ইমাম আবু ইউসুফ এবং যুফার (রহঃ)-এর মতামত এটিতে স্থান পেয়েছে। এটিও ইমাম মুহাম্মদের রচনা। যাহেরুর রেওয়াজেতের সবকটি কিতাব ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) রচিত।

৩। মবসূত। এটি ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর সর্বপ্রথম রচনা এবং আসল নামে পরিচিত।

৪। যিয়াদাত। এটিতে সেসব মাসয়ালার স্থান পেয়েছে যেগুলো জামে সগীর কিংবা জামে কবীরে নেই।

৫। সিয়ারে সগীর। এটিতে প্রশাসন, রাজনীতি এবং জিহাদ সম্পর্কিত মাসয়ালা লিখা হয়েছে।

৬। সিয়ারে কবীর। এটি ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর সর্বশেষ কিতাব।

ইমাম আবুল ফযল মুহাম্মদ বিন আহমদ মারওয়ী (রহঃ) যাহেরুর রেওয়াকে সর্বকটি কিতাবকে একত্রে সংকলন করেছেন। এটির নাম কাফী। ইমাম সরখসী তিরিশ খণ্ডে এটির ব্যাখ্যা লিখেছেন। মবসূত নামে এ ব্যাখ্যাটি পরিচিত।

(খ) কুতুবে নাওয়াদের। উল্লেখিত ছয়টি কিতাব ছাড়া ইমাম মুহাম্মদের রচিত ফিকাহ সম্পর্কিত অন্যান্য কিতাবকে নাওয়াদের বলা হয়। যেমন, কায়সানিয়াত, জুরজানিয়াত, হারুনিয়াত, আমালী ইমাম মুহাম্মদ প্রভৃতি। এগুলো ছাড়াও ফিকাহ এবং হাদীছে ইমাম মুহাম্মদ এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর কিতাবগুলোকেও নাওয়াদেরাত বলা হয়। যেমন কিতাবুল আছার, কিতাবুল হজ্জ প্রভৃতি।

দরস তাদরীস বা শিক্ষাদানের হালকা

ইমাম সাহেবের দরসী হালকায় বসার বিস্তারিত ঘটনা হাম্মাদ বিন সালমা এবং দাউদ ত্বায়ী বলেছেন-

ইব্রাহীম নাখরীর মৃত্যুর পর হাম্মাদ বিন আবি সুলাইমান তাঁর স্থলাভিষিক্ত ছিলেন। ফিকাহ এবং ফতোয়ায় সবার নিকট গ্রহণযোগ্য ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর আহলে ইলমগণ তাঁর জা-নশীনের তালাশ করলেন। তাঁর শাগরেদদের নির্বাচনী দৃষ্টি ইসমাইল বিন হাম্মাদের উপর পড়ল। আবু বকর নহশলী, আবু বুরদা আতাবী, মুহাম্মদ বিন জাবের হানাফী, আবু হুসাইন, হাবীব বিন ছাবেত এবং তাঁর ছাত্রদের এক জামাত ইসমাইলকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করলেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বুঝা গেল যে, তিনি আরবী ব্যাকরণ, আরবী ভাষা এবং আরবী কবিতা সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞানী হলেও ফিকাহ এবং ফতোয়ায় সে যোগ্যতা নেই যার আশা করা হয়েছিল। এতে অন্যান্যরা আবু বকর নহশলীকে হাম্মাদের জা-নশীন করতে চাইলে তিনি অস্বীকৃতি জানান। আবু বুরদাকে বলা হলে তিনিও অসম্মতি প্রকাশ করলেন। এ জন্য সবাই এ বলে আবু হানিফাকে নির্বাচিত করলেন- “এ রেশম বিক্রেতার বয়স কম হলেও ফিকাহ সম্পর্কে ভাল জ্ঞান রাখে।”

সাথীদের অনুরোধ রক্ষার্থে ইমাম সাহেব আপন শিক্ষকের হালকায় শিক্ষক

হিসাবে বসতে রাখী হলেন। হাম্মাদ বিন সুলাইমানের বড় বড় শাগরেদগণও তাঁর দরসী হালকায় শরীক হন। এ সংবাদ কুফায় ছড়িয়ে পড়লে আবু ইউসুফ, আসাদ বিন আমর, কাসেম বিন মাআন, যুফার বিন হুয়াইল, ওলীদ বিন আবান, আবু বকর হুয়ালী এবং অন্যান্য আহলে ইলম তাঁর দরসী হালকায় আসতে লাগলেন এবং কুফার মসজিদ এত আকর্ষণীয় হয়ে উঠল যে, আমীর-হাকেম, এবং অভিজাত শ্রেণীর লোকজনও সেখানে সমবেত হতে লাগলেন।

ইমাম সাহেব স্বীয় উস্তাদের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার এবং দরসী হালকা কায়েম করার ব্যাপারে প্রথমে দ্বিধাদ্বন্দে ছিলেন। ঐ সময় তিনি একটি স্বপ্ন দেখেন যা বাহ্যতঃ চিন্তার কারণ ছিল। তিনি বলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র কবর খনন করছি। এতে আমার বড়ই ভীতির সঞ্চার হল। আমি বসরায় গিয়ে এক ব্যক্তির মাধ্যমে এর তাবীর ইবনে সীরিনকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এ ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীছের মর্ম প্রকাশ করবে। এরপর ইমাম সাহেব আনন্দের সাথে ফিকাহ এর ফতোয়ার দরস দিতে শুরু করলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুবারক (রহঃ) হতে ইবনে খিল্লিকান বর্ণনা করেন, একবার ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) স্বপ্নে দেখতে পেলেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর মুবারক খনন করে তাঁর পবিত্র দেহের হাঁড়সমূহ সংগ্রহ করছেন। ঘুম হতে জাগ্রত হয়েই তিনি পেরেশান এবং চিন্তিত হয়ে পড়লেন। পরে তিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যাকারী প্রসিদ্ধ আলেম আল্লামা ইবনে সীরিনের নিকট গিয়ে তাঁর পরিচয় প্রকাশ না করে স্বপ্নের বর্ণনা শুনে তার ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন।

ইবনে সীরিন (রহঃ) বললেন, এ স্বপ্ন দ্রষ্টা ইলমের প্রচার ও প্রসার এমনভাবে করবে যে-রূপে আর ইতিপূর্বে কেউ করে নাই। অতঃপর বললেন, এ স্বপ্ন ইমাম আবু হানিফা দেখে থাকবে।

ইমাম সাহেব আরম্ভ করলেন, জনাব! আমার নামই আবু হানিফা। ইবনে সীরিন (রহঃ) ইতিপূর্বে ইমাম সাহেবকে দেখেন নাই। তবে তাঁর পিঠ এবং বাম পাঁজরে তিল ছিল বলে জানতেন। তিনি তা দেখে বললেন, হ্যাঁ, আপনিই আবু হানিফা। অতঃপর স্বপ্নের এ ব্যাখ্যা করলেন যে, এর উদ্দেশ্যে হচ্ছে ইলম পুনর্জীবিত করা এবং তার সংকলন করা।

ইমাম সুযুতী (রহঃ) 'তাবয়ীজুস্‌সহীফা' নামক গ্রন্থে লিখেছেন, ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) বলেন, আমি প্রত্যহ হাম্মাদ (রহঃ)-এর মজলিসে যেতাম। তাঁর

থেকে যা কিছু শুনতাম মুখস্ত করে নিতাম। পরদিন তা নির্ভুলভাবে তাঁকে শুনাতাম। অপর ছাত্ররা অনেক ক্ষেত্রে ভুল করে ফেলত। এ কারণে হাম্মাদ (রহঃ) নির্দেশ দিলেন যে, আবু হানিফা ব্যতীত মজলিসের অগ্রাসনে অন্য কেউ বসবে না। দশ বৎসর যাবৎ এরূপে আমি তাঁর মজলিসে থেকে শিক্ষা অর্জন করেছি।

একদিন আমার মনে এ ধারণা আসল যে, আমার তো যথেষ্ট ফিকাহ শিখা হয়ে গেছে। কাজেই আমি ভিনুভাবে এখন শিক্ষা মজলিস প্রতিষ্ঠা করতে পারি। এ আশা নিয়ে আমি বের হলাম। মসজিদে প্রবেশ করে যখন হাম্মাদ (রহঃ)-কে দেখলাম তখন শিক্ষকের বিপরীতে আরেকটা শিক্ষা মজলিস কায়ম করতে আমার আর সাহস হল না। তাই তাঁর মজলিসেই বসে গেলাম। ঠিক সে রাত্রেই বসরা হতে তাঁর এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মৃত্যুর সংবাদ এলো। তিনি ব্যতীত তার কোন উত্তরাধিকারী ছিল না। এ সংবাদ শুনার সাথে সাথেই তিনি আমাকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে দিয়ে সেখানে চলে গেলেন। দুই মাস যাবৎ আমি তার এ কাজ সমাধা করলাম। এ সময় ষাটটি এমন মাসয়ালা উত্থাপিত হয়েছিল যেগুলোর উত্তর তার থেকে শুনা হয়নি। সেগুলোর উত্তরও আমি দিয়েছি। কিন্তু তা লিখে রেখেছি। তিনি ফিরে আসলে আমি তার সম্মুখে প্রশ্ন এবং উত্তরগুলো পেশ করলাম। সেগুলো দেখে তিনি চল্লিশটি মাসয়ালায় আমার সাথে একমত হলেন। অবশিষ্ট বিশটিতে একমত হলেন না। এরপর আমি সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আমি কখনো তাঁর শিক্ষা মজলিস পরিত্যাগ করবো না।

হাম্মাদ (রহঃ)-এর মৃত্যুর পর ইমাম সাহেবকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার জন্য তার সঙ্গীগণ চাপ সৃষ্টি করলেন। কিন্তু তিনি এতে সম্মত হলেন না। অবশেষে তিনি এ শর্তে রাজী হলেন যে, তাদের মধ্য হতে দশজন লোক এক বৎসর পর্যন্ত ইমাম সাহেবের সঙ্গে থেকে তার ফতোয়া কাজে সহযোগিতা করবেন। পরিশেষে তদুপই করা হল। এরপর ইমাম সাহেব ফিকাহ সঙ্কলনের কাজ আরম্ভ করেন। এ কাজের জন্য তিনি হাদীছ বিশারদদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেন।

রদ্দুল মুখতার গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, ফিকাহ সঙ্কলনের সময় ইমাম সাহেবের নিকট এক হাজার উলামার সমাবেশ ছিল। এদের মধ্যে চল্লিশজন এমন ছিলেন যাদের মধ্যে ইজতিহাদ করার যোগ্যতা ছিল। তিনি তাদেরকে প্রমাণ করে বললেন, দেখ! ফিকাহর মধ্যে আমি লাগাম লাগিয়ে দিয়েছি। তোমাদের জন্য গদি বা বসার আসনও বেঁধে দিয়েছি। এখন তোমরা আমার

সহায়তা কর। অতঃপর কোন মাসয়ালার সম্মুখীন হলে তিনি তাদের সাথে আলোচনা করে নিতেন। যেসব হাদীছ কিংবা ছাহাবাদের মতামত তাদের জানা থাকত তারা তা বর্ণনা করতেন। ইমাম সাহেবও যা জানতেন তাও তিনি বর্ণনা করতেন। সেগুলো নিয়ে তাঁরা আলোচনা করতেন। কোন কোন সময় এমনও হত যে, কোন মাসয়ালার সিদ্ধান্তে পৌঁছতে এক মাস লেগে যেত। সবাই যখন একমত হতেন তখন তা লিপিবদ্ধ করা হত।

সীরাতুননুমান কিতাবে উল্লেখ রয়েছে যে, খতীবে বাগদাদী (রহঃ) ওকী ইবনুল জাররাহ (রহঃ)-এর জীবনী লিখতে গিয়ে বর্ণনা করেন, একবার কয়েকজন বিজ্ঞ আলেম তার নিকট সমবেত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্য হতে কোন একজন বললেন, অমুক মাসয়লাটিতে ইমাম সাহেব ভুল করেছেন। এ কথা শনেই তিনি বলে উঠলেন, ইমাম সাহেব কিভাবে ভুল করতে পারেন অথচ তাঁর নিকট রয়েছেন, আবু ইউসুফ এবং যুফারের মত কিয়াস সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তি, ইয়াহয়া বিন যায়েদা, হাফছ বিন গিয়াস ও হাব্বানের মত হাদীছ বিশারদ, কাসেম বিন মাআনের ন্যায় ভাষাবিদ, যুহদ এবং তাকওয়ায় রয়েছেন দাউদ তায়ী এবং ফোযায়েল বিন আয়াবের মত ব্যক্তিত্ব। এমন লোক যাঁর সঙ্গে থাকে তিনি কি করে ভুল করতে পারেন? আর যদি তিনি ভুল করেও ফেলেন তবে এঁরা তাঁকে কি সে ভুলের উপর থাকতে দিবেন?

‘আলখাইরাতুল হিসাব’ নামক কিতাবে বর্ণিত রয়েছে এক ব্যক্তি ওকী (রহঃ)-এর নিকট বলল, আবু হানিফা ভুল করেছেন। তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, এ ধরনের কথা যে বলে সে পশুর সমতুল্য বরং এর চেয়েও নিকৃষ্ট। তাঁর সাথে রয়েছেন আবু ইউসুফ এবং মুহাম্মদের মত ফিকাহবিদ। ফোযায়েল এবং দাউদ তায়ীর মত যাহেদ, মুত্তাকী, অসংখ্য হাদীছ বিশারদ এবং ভাষাবিদ। যার নিকট এমন সব ব্যক্তিত্বের সমাবেশ তিনি কখনো ভুল করতে পারেন না। যদি ভুল করেও বসেন তবে তারা তাঁকে সত্যমুখী করে দিবেন।

ইবনে মুবারক (রহঃ) বলেন, ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর মজলিসে আমি সবসময়ই উপস্থিত হতাম। একবার হায়েযের একটি মাসয়লা নিয়ে আলোচনা শুরু হল। তিনদিন সকাল সন্ধ্যা সে মাসয়লাটি নিয়ে আলোচনা চলল। তৃতীয়দিন সন্ধ্যার পূর্বক্ষণে সমস্বরে আল্লাহ্ আকবর বলে উঠলেন। এ তকবীর দ্বারা বুঝা যেত যে, মজলিসের সবাই কোন মাসয়লায় একমত হয়েছেন।

একবার ইমাম যুফার (রহঃ) এশার নামাযের পর কোন একটি মাসয়ালার

ব্যাপার তাঁর সন্দেহের কথা ইমাম সাহেবের নিকট পেশ করলেন। ইমাম সাহেব মাসয়ালার জবাব দিলেন। কিন্তু এতে তাঁর সন্দেহ নিরসন হল না। তারা যে মাসয়ালার নিয়ে আলোচনা করছিলেন তা ফজরের সময় পর্যন্ত স্থায়ী হল। ইমাম সাহেব যে মত প্রকাশ করেছিলেন শেষ পর্যন্ত তাই সঠিক বলে প্রমাণিত হল।

ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, ইসলামের মধ্যে ইমাম আবু হানিফার ষাট হাজারটি মত রয়েছে। অর্থাৎ তাঁর এত সংখ্যক ফিকহী মাসয়ালার রয়েছে। আরেকটি নির্ভরযোগ্য বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম সাহেব তিরিশি হাজার মাসয়ালার লিপিবদ্ধ করেছেন। তন্মধ্যে আটত্রিশ হাজার মাসয়ালার ইবাদত সম্পর্কিত এবং পঁয়তাল্লিশ হাজার মাসয়ালার মু'আমালাত বা আচার-আচরণ ও লেন-দেন সম্পর্কিত। যেহেতু ইমাম মালেক (রহঃ) তাঁর সময়ের ইমাম ছিলেন এবং মদীনায় অবস্থান করতেন যেখানে মুহাদ্দেছগণের আগমন আবশ্যিকীয় ছিল; সেহেতু ইমাম সাহেবের শিক্ষা মজলিসের মুহাদ্দেছগণও সেখানে আগমন করতেন। তাদের সাথেও ইমাম মালেক (রহঃ)-এর সাক্ষাৎ হত। তাঁদের থেকে শ্রুত মাসয়ালার সংখ্যাই ইমাম মালেক (রহঃ) এখানে উল্লেখ করেছেন। এ কারণেই তিনি সন্দেহসূচক কোন শব্দ ব্যবহার করেন নাই।

ইমাম মালেক (রহঃ)-এর এ বাণীতে একটা লক্ষ্যণীয় বিষয় হল তিনি ইমাম সাহেবের মাসয়ালার সংখ্যা উল্লেখ করার সময় কোন প্রকার বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন নাই। এতে বুঝা যায় ইমাম সাহেবের মাসয়ালার সমূহ কোরআন ও সুন্নাহর সমর্থিত ছিল। যদি কোরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী হত তবে ইমাম মালেক (রহঃ) অবশ্যই সেটা প্রকাশ করতেন। অন্ততঃপক্ষে নিজের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন। অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা তো দূরের কথা বরং সেগুলোর উপর তাঁর অগাধ আস্থা ছিল।

মুহাম্মদ বিন উমর আল ওয়াকেদী বর্ণনা করেন, ইমাম মালেক (রহঃ) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর মতামত অনুসন্ধান করতেন। অধিকাংশ সময়ে তার মতানুসারে ফতোয়া দিতেন। যদিও তিনি তা প্রকাশ করতেন না। এ কারণেই তাঁদের উভয়ের মত ও রায়ের মধ্যে এত মিল ও সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

প্রশ্ন জাগতে পারে ইমাম সাহেব এবং তাঁর শিষ্যদের মধ্যে মতপার্থক্যের কারণ কি? এ প্রশ্নের উত্তর সহল বিন মুযাহেমের কথা থেকেই বুঝা যাবে। তিনি বলেন, যে সব মাসয়ালায় ইমাম সাহেবের সাথে ইমাম আবু ইউসুফ

(রহঃ)-এর মতবিরোধ হয়েছে তার কারণ ছিল ইমাম সাহেব যে দলীলের ভিত্তিতে কোন মাসয়ালায় স্বীয় মত প্রকাশ করেছেন সে দলীলের গুরুত্ব ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) অনুধাবন করতে পারেননি।

মূলতঃ ইমাম সাহেবের দৃষ্টিভঙ্গি খুবই গভীর ছিল। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) স্বয়ং বর্ণনা করেন, যে সব মাসয়ালায় ইমাম সাহেবের মতের সাথে আমার মত মিলে যেত, সেসব ক্ষেত্রে আমার অন্তরে শক্তি এবং নূর সৃষ্টি হত। আর যেসব ক্ষেত্রে তার মত আমি গ্রহণ করি নাই সেসব ক্ষেত্রে পাহাড় পরিমাণ দুর্বলতা এবং সন্দেহ থেকে যেতো।

একটু চিন্তা করলেই মতভেদের কারণ বুঝে এসে যাবে। যে সকল মাসয়ালার গবেষণার সময় ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) অনুপস্থিত ছিলেন, ইমাম সাহেবের উপস্থাপিত প্রমাণাদি শুনতে পান নাই সে সব মাসয়ালাতেই ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) নিজে ইজতিহাদ করার মুখাপেক্ষী হয়েছেন। সে সকল মাসয়ালা হতে যেগুলোর মধ্যে ইমাম সাহেবের মতের সাথে তাঁর মতের মিল হয় নাই সেগুলোতেই মতানৈক্য দেখা দিয়েছে। আর যে সকল মাসয়ালার গবেষণার সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন সেগুলোতে মতানৈক্য হওয়ার প্রশ্নই আসে না। কারণ সেখানে এই নীতি নির্ধারিত ছিল যে, যে পর্যন্ত সবাই কোন মাসয়ালায় একমত না হবেন সে পর্যন্ত তা লিপিবদ্ধ করা হবে না। এ কারণেই কোন মাসয়ালায় এক মাস যাবৎও আলোচনা হত।

ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মত ব্যক্তিত্ব কোন মাসয়ালার ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করবেন আর ইমাম সাহেব সেদিকে কর্ণপাত না করে সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন তা কখনো হতে পারে না।

প্রশ্ন হতে পারে, যেহেতু ইমাম সাহেব এবং ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তাই হানাফী মাযহাব অবলম্বনকারীদের উচিত শুধুমাত্র ইমাম সাহেবের মতানুসারে আমল করা। অথচ অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় তাঁর মত বাদ দিয়ে আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতানুসারে ফতোয়া দেওয়া হয় এবং তদনুযায়ী আমল করা হয়। এর কারণ কি?

এ প্রশ্নের জবাবে বলা যেতে পারে যে, যদি কোন মাসয়ালায় আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতানুসারে আমল করা হয় তবে পক্ষান্তরে ইমাম সাহেবের মতানুসারেই আমল করা হয়। কারণ তাঁর একাধিক মত হতেই ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) একটি গ্রহণ করেছেন। তাঁর স্বীয় মত প্রকাশ করেননি।

মূলতঃ ব্যাপার এই যে, কোন দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে ইমাম সাহেব কোন মত প্রকাশ করেছেন। পরবর্তীতে এমন হয়েছে যে, সে মতের বিপরীত অধিক শক্তিশালী কোন দলীল প্রমাণ তিনি পেয়েছেন। তাই তিনি পূর্ববর্তী মত হতে প্রত্যাবর্তন করে আরেকটি নতুন মত ব্যক্ত করেছেন। এভাবে তাঁর একাধিক মতের সৃষ্টি হয়েছে। সে মতগুলো হতে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর নিকট যেটি অধিক যুক্তিযুক্ত এবং প্রামাণ্য সাব্যস্ত হয়েছে তিনি সেটিই ব্যক্ত করেছেন। এখন যে মতটি আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর নিকট অধিক প্রামাণ্য সেটিকে যদি ইমাম সাহেবের নিকটও অধিক যুক্তিযুক্ত বলা হয় তবে তা অত্যাুক্তি বা ভুল হবে না। কারণ ইমাম সাহেব বলেছেন, যখন কোন হাদীছ সঠিক বলে প্রমাণিত হয় তবে ধরে নিবে যে, সেটাই আমার মাযহাব।

কাজেই ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর নিকট হাদীছ সহীহ প্রমাণিত হওয়ার কারণে তিনি যে মতটি অবলম্বন করেছেন সেটিকে ইমাম সাহেবের মাযহাব বললেও ভুল হবে না বরং তা বলাই যুক্তিসঙ্গত। তাই কোন মাসয়ালায় আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর অনুসরণ করা দ্বারা আবু হানিফা (রহঃ)-এরই অনুসরণ করা হয়।

উপরোল্লিখিত আলোচনা দ্বারা বুঝা যায় যে, অসংখ্য মুহাদ্দেছ ও হাদীছ বিশারদের উপস্থিতিতে ইমাম সাহেব কোরআন এবং হাদীছ গবেষণা করে মাসয়ালা বের করতেন এবং তাদের মতামত সাপেক্ষে তা সঙ্কলন করতেন।

নিম্নে ফিকহে হানাফী সম্বন্ধে বিশিষ্ট মুহাদ্দেছ ও হাদীছ বিশারদগণের বাণী উল্লেখ করা হচ্ছে, যা দ্বারা ফিকহে হানাফী সম্বন্ধে তাঁদের অধিক আস্থা প্রকাশ পাচ্ছে।

আব্দুল্লাহ বিন দাউদ বলেন, কেউ যদি চায় যে, অজ্ঞতার অপমান হতে বের হয়ে ফিকহ অর্জন করবে সে যেন আবু হানিফার কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করে।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) প্রায়ই বলতেন, আমি ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) হতে এক উটের বোঝা পরিমাণ ইলম অর্জন করেছি।

আবু উবাইদ কাসেম বিন সালাম ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন; যে ব্যক্তি ফিকাহ শিখতে আগ্রহী সে যেন আবু হানিফার শিষ্যদের সঙ্গ অবলম্বন করেন। খোদার কসম! আমি শুধুমাত্র আবু হানিফার কিতাব পাঠ করেই ফকীহ হয়েছি। তাঁর যামানায় আমি থাকলে কখনো তাঁর শিক্ষা মজলিস ত্যাগ করতাম না।

একবার আব্দুল্লাহ বিন মুবারক হাসান বসরী হতে বর্ণনা করেন, তোমরা লক্ষ্য রেখো কার থেকে হাদীছ শিখছ। কারণ তা তোমাদের দ্বীন।

এ রেওয়াজাত বর্ণনা করার পর ইবনে মুবারক (রহঃ) বললেন, যে ক্ষেত্রে হাদীছ নির্ভরযোগ্য লোকদের থেকে গ্রহণ করা অবশ্যিক সে ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিদের থেকেই ফিকহ গ্রহণ করা চাই। অতঃপর বললেন, যদি কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী তোমার নিকট আবু হানিফার কোন মত বর্ণনা করে তবে সেটি গ্রহণযোগ্য মনে করো।

আবু ইসহাক বলেন, তাদের জন্য আমার করুণা জাগে যাদের আবু হানিফার ইলমের কোন অংশই নসীব হয়নি।

আব্দুল আযীয বিন খালেদ ছাফ্ফানী বর্ণনা করেন, আমি আবু হানিফার কিতাব তাঁর থেকেই পাঠ করেছি। পাঠ শেষে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম আমি কি এ সমস্ত কিতাব আপনার থেকে রেওয়াজাত করব? তিনি তার অনুমতি প্রদান করলেন। আমি বললাম, *سمعت* (আমি শ্রবণ করেছি) শব্দ বলব? তিনি বললেন, *سمعت* (আমি শ্রবণ করেছি) *اخبرني* (আমাকে সংবাদ দিয়েছেন) এবং *حدثني* (আমাকে বর্ণনা করেছেন) এ সবগুলোই সমার্থক।

হাফছ বিন গিয়াস বলেন, আমি আবু হানিফা থেকে তাঁর কিতাব পাঠ করেছি, তাঁর থেকে 'আছার' শুনেছি। তাঁর চেয়ে অন্য কাউকে মেধাবী পাইনি। আহকামের ব্যাপারে বিশুদ্ধ ভুল সম্বন্ধে তিনি সর্বাধিক অবগত ছিলেন!

ইয়াহয়া বিন আকছাম বলেন, ওহাব বিন জরীরকে আমি বলতে শুনেছি, আমার পিতা জরীর বিন আছেম আমাকে আবু হানিফার কিতাব অধ্যয়ন করার প্রতি অনুপ্রাণিত করতেন। তিনি ইমাম সাহেবের হালকায় অংশ নিতেন।

মুহাম্মদ বিন দাউদ বর্ণনা করেন, একবার আমি ঈসা বিন ইউনুসের নিকট গেলাম। দেখতে পেলাম তিনি তাঁর সম্মুখে আবু হানিফার কিতাব নিয়ে পাঠ করছেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি তাঁর থেকে রেওয়াজাত করেন? তিনি বললেন, তাঁর জীবদ্দশায় আমি তাঁর উপর সন্তুষ্ট ছিলাম। তাঁর মৃত্যুর পর কি তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হয়ে যাব?

মারুফ বিন আব্দুল্লাহ বলেন, একবার আমি আলী বিন আছেমের নিকট গিয়েছিলাম। তিনি তাঁর শাগরেদদেরকে বললেন, তোমরা ফিকাহ এবং ইলম শিক্ষা কর। আমরা বললাম, 'আপনার নিকট যা শিখেছি তা ইলম নয়?' তিনি বললেন, ইলমের কথা যদি বল তবে তা হচ্ছে আবু হানিফার ইলম। ইমাম

সাহেবের প্রতি আলী ইবনে আছেমের যথেষ্ট ভালবাসা ছিল। তাঁর শাগরেদবৃন্দ যদি কখনো তাঁকে সন্তুষ্ট করতে চাইতেন তবে ইমাম সাহেবের আলোচনা তুলে দিতেন। তিনি আনন্দের সাথে ইমাম সাহেবের গুণাবলী এবং ঘটনাসমূহ বর্ণনা করতেন।

তিনি বলেছেন, ইমাম সাহেবের ইলমের সাথে যদি তাঁর সমকালীন সবার ইলম পরিমাপ করা হয় তবে তাঁর ইলমই অধিক হবে। তিনি এও বলতেন, যে ব্যক্তি আবু হানিফার মতামত শিখবে না, অজ্ঞতার কারণে সে ব্যক্তি হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করে দিবে এবং সে গোমরাহ হয়ে যাবে।

মুহাম্মদ বিন সা'দান বর্ণনা করেন, একবার ইয়াহয়া বিন মা'য়ীন, আলী ইবনুল মদনী, আহমদ বিন হাম্বল, যুহাইর বিন হারব প্রমুখসহ আমরা কয়েকজন ইয়াযীদ বিন হারুননের নিকট উপস্থিত ছিলাম। এ সময় এক ব্যক্তি এসে তাঁর নিকট কোন মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, আহলে ইলমদের নিকট যাও।

আলী ইবনুল মদনী জিজ্ঞাসা করলেন, সে কি আপনার নিকট আসেনি। অর্থাৎ আপনি নিজেই তো আহলে ইলমের অধিকারী। তিনি বললেন, আবু হানিফার সঙ্গী-শাগরেদরাই হচ্ছে আহলে ইলম। আর তোমরা হচ্ছে আন্তার। (ঔষধ বিক্রেতা)

তার এ কথা দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, আমল করার জন্য তিনি ফিকহকে বিশেষ করে ফিকহে হানাফীকে আবশ্যকীয় মনে করতেন। হাদীছের জ্ঞান যে পরিমাণই হোক না কেন ফতোয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।

ইয়াযীদ বিন হারুনকে আবু মুসলিম জিজ্ঞাসা করলেন, আবু হানিফা এবং তাঁর কিতাবসমূহ সম্বন্ধে আপনার মতামত কি? তিনি বললেন, তুমি যদি চাও যে, ফিকহ এবং বুদ্ধিমত্তা অর্জন করবে তবে তাঁর কিতাব অধ্যয়ন কর। কোন ফকীহকে তার মত ও রায়কে অপছন্দ করতে দেখিনি। সুফিয়ান ছাওরী কৌশলে তাঁর 'কিতাবুর রেহন' নামক কিতাবটি হস্তগত করে সেটি নকল করে নেন।

জনৈক ব্যক্তি ইয়াযীদ বিন হারুনকে জিজ্ঞাসা করল, মানুষ কখন ফতোয়া দেওয়ার যোগ্য হয়? তিনি বললেন, যখন আবু হানিফার মত হবে। অতঃপর বললেন, প্রত্যেকেই তার ইলম এবং কিতাবের মুখাপেক্ষী। সেগুলো দ্বারা মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি পায়।

মুহাম্মদ বিন ইয়াযীদ বলেন, আমি প্রায়শঃ আমের (রহঃ)-এর নিকট

যেতাম। একবার তিনি আমাকে বললেন, তুমি কি আবু হানিফার কিতাবসমূহ পড়েছ? আমি বললাম, আমি হাদীছ শিখেছি। তাঁর কিতাবের আমার কি প্রয়োজন? তিনি বললেন, সত্তর বছর যাবৎ আমি আছার (হাদীছ) শিখেছি। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আবু হানিফার কিতাব পড়ি নাই ভালভাবে ইস্তিঞ্জা করার পদ্ধতিও জানতে পারি নাই।

আতিয়া বিন আসবাত বলেন, ইবনে মুবারক যখনই কুফায় আগমন করতেন, যুফার (রহঃ) হতে ইমাম সাহেবের কিতাব ধার নিয়ে সেগুলো নকল করে নিতেন। অনেকবারই তিনি এরূপ করেছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে যে ফিকহ সম্বন্ধে ইমাম মালেক (রহঃ) অধিক জ্ঞাত, না কি ইমাম সাহেব? তিনি বললেন, ইমাম সাহেব ফিকহ সম্বন্ধে সর্বাধিক জ্ঞাত।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেন, যে মাসয়ালায় তিন ব্যক্তি একমত হয়েছে এর বিপরীত কোন কিছু গ্রহণযোগ্য নয়। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে সে তিন ব্যক্তি কে কে? তিনি বললেন, আবু হানিফা, আবু ইউসুফ এবং মুহাম্মদ বিন হাসান (রহঃ)।

মুহাম্মদ বিন তালহা (রহঃ) বলেন, যদি কোন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারীর মাধ্যমে তোমার নিকট আবু হানিফা (রঃ)-এর কোন বাণী এসে পৌঁছে তবে তার উপর নির্বিশেষে নির্ভর করতে পার। কারণ তাঁর কথা সবসময়ই নির্ভরযোগ্য হয়ে থাকে। আমাদের নিকট যে কিতাব দেখছ এতে ইমাম সাহেবের নির্ভরযোগ্য বাণী রয়েছে। যেগুলো বিশ্বস্ত বর্ণনাকারীর মাধ্যমে আমাদের নিকট পৌঁছেছে।

ইয়াযীদ বিন হারুন বলেন, ফিকহশাস্ত্রে ইমাম আবু হানিফার তুল্য কেউ ছিল বলে শোনা যায় নাই। জ্ঞানী বুদ্ধিমানরাই তাঁর মতামত পছন্দ করে এবং সেগুলো আয়ত্ত্ব করে।

ইমাম সাহেবের দৃষ্টিতে হাদীছ ও ইজতিহাদ

ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মুবারক (রহঃ) বলেন, ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) শুধুমাত্র সেসব হাদীছই গ্রহণ করতেন যেগুলো রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে নির্ভুলভাবে বর্ণিত হয়ে এসেছে। নাসেখ (রহিতকারী) ও মনসুখ (রহিত) সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান রাখতেন। সবসময়ই নির্ভরযোগ্য রাবীদের হাদীছ অনুসন্ধান করতেন। কুফার উলামাদের যে সমস্ত আমল সঠিক পেতেন সেগুলো তিনি অনুসরণ করতেন। এতদসত্ত্বেও মানুষ তাঁর সমালোচনা করলে

আমরা নীরবতা অবলম্বন করতাম, আর তজ্জন্য থেকে তা ইস্তেগফার করতাম।

তিনি আরো বলেন, আবু হানিফা (রহঃ) বলতেন, রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীছ সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করা হবে। ছাহাবাদের মধ্যে কোন মাসয়ালা যদি মতভেদ দেখা যায় তবে তাঁদের কোন একটি মত গ্রহণ করা হবে। তাঁদের মতের বাইরে যাওয়া যাবে না। আর তাবেয়ীদের সাথে আমরাও ইজতিহাদ করব।

ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন, যখন কোন ঘটনা সামনে আসত ইমাম সাহেব আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করতেন, এ সম্পর্কিত কোন আছর তোমাদের জানা আছে কি? যদি আমাদের নিকট কিংবা তাঁর নিকট কোন আছর তথা ছাহাবীর মত থাকত তবে সেটাই গ্রহণ করা হত। আর যদি ছাহাবাদের মতের মধ্যে বিরোধ থাকত তবে অধিকাংশের মত গ্রহণ করা হত। আর যদি কোন আছর পাওয়া না যেত সেক্ষেত্রে কিয়াস করতেন। আর যদি কিয়াসও দুষ্কর হয়ে যেত তবে তখন ইসতিহসান দ্বারা ফয়সালা করতেন।

কোন মাসয়ালা উপস্থিত হলে ইমাম সাহেব তাঁর শাগরেদদেরকে তৎসম্পর্কিত আছর জিজ্ঞাসা করতেন। কারণ এ নয় যে, সে সম্পর্কিত কোন আছর তাঁর জানা নেই। যদি এমন হত তবে দূর-দূরান্ত হতে মুহাদ্দেহগণ তাঁর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য আগমন করতেন না। যে ব্যক্তি প্রতিটি মাসয়ালায় শাগরেদদের মুখাপেক্ষী হয় তার নিকট তাদের কি ফায়দা? বরং শাগরেদরাই বলতেন, জনাব! প্রতিটি মাসয়ালায়ই আপনি উল্টো আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন তবে আপনার শিক্ষকতা কোন্ ক্ষেত্রের জন্য?

বস্তুতঃ কয়েকটি কারণে ইমাম সাহেব তাঁর শাগরেদদেরকে জিজ্ঞাসা করতেন। তন্মধ্যে একটি কারণ হল তাদের প্রত্যেকের হাদীছ সম্বন্ধে জ্ঞানের পরিধি পরিমাপ করা। আর কোন হাদীছ দ্বারা কোন মাসয়ালার হুকুম সাব্যস্ত করে তা প্রত্যক্ষ করা।

আরেকটি উদ্দেশ্য হল, ছাত্রদের হিন্মত ও সাহস বৃদ্ধি করা। যেন চিন্তা-ভাবনা করে প্রত্যেকেই তার জানা হাদীছ এবং আছারের মধ্য হতে সে মাসয়ালা সম্পর্কিত নির্দেশ বের করার প্রয়াসী হয়। এতে তাদের মধ্যে ইজতিহাদ করার যোগ্যতা সৃষ্টি হবে।

তৃতীয়তঃ প্রত্যেকেই তার চিন্তাভাবনা উপস্থাপনা করার ফলে সে মাসয়ালায় তাদের পূর্ণ জ্ঞান অর্জিত হবে। এ কারণেই আ'মাশ (রহঃ)-কে

কোন ফতোয়া জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলতেন, আবু হানিফার মজলিসে যাও। সেখানে তাদের পারস্পরিক আলোচনার কারণে মাসয়ালাটি স্পষ্ট হয়ে যাবে।

হাসান বিন যিয়াদ বলেন, ইমাম সাহেব বলতেন, যদি কোন মাসয়ালার ব্যাপারে কোরআনের নির্দেশ কিংবা হাদীছ অথবা ইজমা পাওয়া যায় তবে কারো জন্য স্বীয় রায় মোতাবেক কিছু বলা বৈধ হবে না। আর যদি কোন বিষয়ে ছাহাবাদের মতভেদ হয় তবে তন্মধ্যে হতে যেটি কোরআন হাদীছের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ আমরা সেটাই গ্রহণ করব। আর যদি এরূপ কোন কিছু পাওয়া না যায়, তাহলে আমরা ইজতিহাদ করব। কারণ, ফকীহদের ইজতিহাদ করার সুযোগ রয়েছে; যদি তারা ইখতিলাফ সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান রাখে এবং সঠিকভাবে কিয়াস করার যোগ্যতা রাখে। সলফে সালেহীন বা সুযোগ্য পূর্বসূরিদের নিয়ম এটাই ছিল।

আবু হামযা বলেন, আমি আবু হানিফা (রহঃ)-কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, কোন মাসয়ালায় যদি কোন হাদীছ পাওয়া যায় তবে তার বিপরীতে আমরা কারো মতামত গ্রহণ করি না। শুধুমাত্র হাদীছই গ্রহণ করি। আর যদি ছাহাবাদের থেকে বিভিন্ন মত বর্ণিত থাকে তবে সেখান থেকে যে কোন একটি মত গ্রহণ করি।

আব্দুল করীম বিন হেলাল বলেন, আমি আবু হানিফাকে বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের যে নির্দেশ আমাদের নিকট পৌঁছে সেটিকে আমরা অতিক্রম করে যাই না। আর যে বিষয়ে ছাহাবাদের মতভেদ রয়েছে, সেখান থেকে আমরা যে কোন একটি মত গ্রহণ করি। ছাহাবা ব্যতীত অন্য কারো মত হলে আমরা যদি সমীচীন মনে করি তবে তা গ্রহণ করি; অন্যথায় প্রত্যাখ্যান করি।

ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন, একবার আ'মশ (রহঃ)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হল। তিনি আমাকে বললেন, তোমাদের উস্তাদ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর বিরোধিতা করেছেন। কারণ তাঁর মতে কোন দাসীকে বিক্রয় করলে তালাক হয় না। অথচ ইবনে মাসউদ (রাঃ) দাসীর বিক্রয়টাকেই তালাক মনে করে থাকেন।

ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) বলেন, আমি বললাম, আপনার থেকে আমাদের নিকট রেওয়য়াত পৌঁছেছে যে, দাসীকে বিক্রয় করাটা তালাক নয়। তিনি বললেন, কিভাবে? আমি বললাম, আপনি ইব্রাহীমের মাধ্যমে আসওয়াদ হতে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর এ হাদীছটি বর্ণনা করেছেন, আয়েশা বারীয়াকে ক্রয়

করার পর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে এখতিয়ার (স্বামীর বিবাহে থাকা, না থাকার অনুমতি) দিয়েছিলেন। এখন আপনিই বলুন যদি বিক্রয় করা দ্বারাই তালাক হয়ে যায় তবে এখতিয়ার দেওয়ার কি অর্থ হতে পারে? তিনি বললেন, এ হাদীছটি কি এ ব্যাপারে? আমি বললাম, জী হ্যাঁ! তিনি বললেন, বস্তুতঃ আবু হানিফার হাদীছ প্রয়োগের স্থান ভালভাবেই জ্ঞাত। ইবনে মাসউদ (রাঃ) একজন বিশিষ্ট ছাহাবী এবং ইমাম সাহেবের উস্তাদ। কিন্তু মরফু হাদীছ থাকার কারণে তিনি তাঁর মত গ্রহণ করেন নাই।

আহমদ বিন ইউনুস বলেন, আবু হানিফা (রহঃ) সহীহ হাদীছ অনুসরণ করার প্রতি খুবই গুরুত্ব দিতেন।

ফোয়ায়েল বিন আয়ায (রহঃ) বলেন, কোন মাসয়লায় কোন সহীহ হাদীছ পাওয়া গেলে ঐটির অনুসরণ করাই ছিল ইমাম আবু হানিফার রীতি।

ওহাব (রহঃ) বলেন, আব্দুল আযীয বিন রিয়মা ইমাম সাহেবের হাদীছের জ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বললেন, একবার কূফায় একজন মুহাদ্দিছ এসেছিলেন। ইমাম সাহেব তাঁর মজলিসের সদস্যদের বললেন, তোমরা জেনে দেখ তো তাঁর নিকট এমন কোন হাদীছ আছে কি না যা আমাদের নিকট নাই। পরে অন্য এক মুহাদ্দিছ আগমন করলেন। তখনো তিনি অদ্রুপ বললেন।

জনৈক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ বিন মুবারক (রহঃ)-কে বললেন, হাদীছে বর্ণিত রয়েছে আহলে রায়গণ হচ্ছে সুন্নাতের দূশমন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য আবু হানিফা।

ইবনে মুবারক (রহঃ) বললেন, সুবহানাল্লাহ! আবু হানিফা সব সময়ই সুন্নাত মুতাবেক আমল করতে চেষ্টা করতেন। সুন্নাতের বাইরে কোন আমল করতেন না। তিনি সুন্নাতের দূশমন কি করে হতে পারেন? এ হাদীছ দ্বারা তাদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা প্রবৃত্তির দাস, কলহপ্রিয়। যারা কিতাবুল্লাহ এবং সুন্নাতে রাসূল পরিত্যাগ করে নিজেদের প্রবৃত্তির আনুগত্য করে।

উসূলে বয়দতী কিতাবে রয়েছে, ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর মতে সুন্নাতের এ শক্তি রয়েছে যে, তার দ্বারা কিতাবুল্লাহকে মনসূখ করা যাবে। হাদীছ যদিও মুরসাল হয় তবুও তদানুযায়ী তিনি আমল করেন। মজহুল বা অজানা গ্যক্তির রেওয়াজাতকে তিনি কiyাসের তুলনায় অগ্রগণ্য বলে মনে করেন। কiyাসকে তিনি কোন ছাহাবার মতের উপর অধাধিকার দেন না। কারণ, গণ্যবনা রয়েছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে কোনই তা বলেছেন।

ইবনে হযম বলেন, আবু হানিফার শাগরেদরা এতে একমত যে, তার নিকট একটি দুর্বল হাদীছও কিয়াস হতে অগ্রগণ্য।

যুফার (রহঃ) বলেন, বিরোধীদের কথার প্রতি কখনো কর্ণপাত করে না। ইমাম সাহেব যা কিছু বলেছেন তা তিনি কিতাবুল্লাহ অথবা সুন্নতে রাসূল অথবা ছাহাবাদের বাণী থেকে বলেছেন। এরপরই তিনি এগুলোর উপর কিয়াস করেছেন।

উসূলে বয়দতীর ব্যাখ্যা কাশফুল আসরার এ ইয়াহয়া বিন আদম হতে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি বলেন, কোরআনের আয়াতের মতই হাদীছের মধ্যে নাসেখ-মনসুখ রয়েছে। নু'মান (অর্থাৎ ইমাম সাহেব) সমস্ত হাদীছের মধ্যে গবেষণা করে যেসব হাদীছ সংগ্রহ করেছেন সেগুলো রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের শেষভাগে প্রকাশ পেয়েছে। সে অনুযায়ীই তিনি ফতোয়া দিয়েছেন।

হাসান বিন সালেহ বলেন, ইমাম সাহেব হাদীছের নাসেখ এবং মনসুখ অনুসন্ধান করতেন। যে হাদীছটি তাঁর নিকট প্রমাণিত সে হাদীছ অনুসারেই তিনি আমল করতেন। চাই তা মরফু হাদীছ অর্থাৎ স্বয়ং রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী হোক কিংবা ছাহাবীর বাণী হোক। তিনি বলতেন, কোরআনের মত হাদীছের মধ্যেও নাসেখ-মনসুখ রয়েছে। হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সর্বশেষ কার্যাবলী সম্বন্ধে তিনি সম্যক অবগত ছিলেন, যেগুলো তার শহরে পৌঁছেছে।

খতীবে বাগদাদী আবু নায়ীম হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি যদি কখনো ইমাম যুফার (রহঃ)-এর নিকট দিয়ে যেতাম তিনি ডেকে বলতেন, আস তোমার হাদীছগুলোকে যাচাই করি। আমি আমার হাদীছগুলো তাঁর নিকট পেশ করলে তিনি বলতেন, অমুক হাদীছটি গ্রহণযোগ্য, অমুকটি গ্রহণযোগ্য নয়। অমুকটি নাসেখ আর অমুকটি মনসুখ।

এর দ্বারা বুঝা যায় যে, ইমাম সাহেবের মজলিসে সকল হাদীছই যাচাই করা ছিল যে, অমুকটি নাসেখ অমুকটি মনসুখ।

ইব্রাহীম বিন সুলাইমান যাইয়াত বলেন, ইসরাঈলের সামনে ইমাম সাহেবের আলোচনা উঠল। তিনি বললেন, এ সময়ে মানুষ যে সমস্ত বিষয়ের মুখাপেক্ষী সে সম্বন্ধে তিনি সবচেয়ে বেশী জ্ঞাত।

এ কথা তো সুস্পষ্ট যে, মানুষ সে সময় সহীহ হাদীছ এবং আছর দ্বারা

প্রমাণিত মাসয়ালারই মুখাপেক্ষী ছিল সবচেয়ে বেশী। ইসরাঈলের সাক্ষ্য দ্বারা বুঝা যায়, ইমাম সাহেব সে সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশী জ্ঞাত ছিলেন।

হাফছ বিন গিয়াস বলেন, আমি ইমাম সাহেব থেকে তাঁর কিতাবাদি এবং আছার শ্রবণ করেছি। তিনি খুবই বুদ্ধিমান এবং মেধাবী ছিলেন। আহকাম সম্পর্কিত আছার সম্বন্ধে তাঁর চেয়ে অধিক জ্ঞাত আর কাউকে দেখিনি।

হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর মতের উপর আমল করার ব্যাপারে ইমাম সাহেব সবচেয়ে বেশী প্রয়াসী ছিলেন। সর্বপ্রকার কাজ-কর্ম এবং চাল-চলনে বিশেষভাবে তাঁর অনুকরণ করতে সচেষ্ট ছিলেন তিনি। যেমনিভাবে হযরত আবু বকর ছিদ্দীক (রাঃ) ফিকাহ, তাকওয়া, যুহদ, দানশীলতা, ইবাদত, রিয়াযতে সমস্ত ছাহাবার উর্ধ্বে ছিলেন, তদুপ ইমাম সাহেবও এসব গুণাবলীতে তাঁর সমকালীন সবার উর্ধ্বে ছিলেন। এমনকি যেমনিভাবে মক্কা নগরীতে হযরত আবু বকর (রাঃ) কাপড়ের ব্যবসা করতেন, তদুপ ইমাম সাহেবও কাপড়ের ব্যবসা করতেন। এছাড়াও ইমাম সাহেব অনেক বিষয়ে হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর অনুসরণ করতেন।

যেমনিভাবে যথেষ্ট পরিমাণ হাদীছ জানা থাকা সত্ত্বেও তিনি খুবই অল্পসংখ্যক হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তদুপ ইমাম সাহেবের বহু সংখ্যক হাদীছ জানা থাকা সত্ত্বেও সামান্য সংখ্যক হাদীছ বর্ণনা করেছেন। যার ফলে বিরোধীদের এ কথা বলার সুযোগ হয়েছে যে, তিনি মোটেই হাদীছ জানতেন না।

যেমনিভাবে তিনি প্রত্যেক ব্যাপারে ছাহাবাদের হাদীছ জিজ্ঞাসা করতেন, তেমনি করে ইমাম সাহেবও তাঁর শাগরেদদের হাদীছ জিজ্ঞাসা করতেন।

যেমনি ছিদ্দীকে আকবর (রাঃ) কোরআন মজীদ জমা করে হিফাযত করে গিয়েছেন তদুপ ইমাম সাহেবও ফিকাহ সংকলন করে হাদীছ হিফাযত করেছেন।

যে রূপে ছিদ্দীকে আকবর (রাঃ) স্বীয় রায় এবং কিয়াস দ্বারা যাকাত অস্বীকারকারীদের কতলের ফতোয়া দিয়েছেন এবং সহীহ হাদীছ পেশ করা সত্ত্বেও তিনি স্বীয় মতে অটল ছিলেন। কোন ছাহাবীর বাধা মানেন নাই; তদুপ ইমাম সাহেবও প্রয়োজনের সময় স্বীয় রায় দ্বারা কিয়াস করতেন; কোন আহলে হাদীছের বিরোধীতার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করতেন না। যেমনিভাবে ন্যায়পরায়ণগণ ছিদ্দীকে আকবরের রায় মেনে নিয়েছেন তদুপ ইমাম সাহেবের রায়ও তারা

মেনে নিয়েছেন।

মোদ্দাকথা, ছিন্দীকে আকবরের সাথে তাঁর একটি বিরাট সাদৃশ্য ও মিল ছিল, যার ফলে ছিন্দীকদের মধ্যে যেমনিভাবে তাঁকে ছিন্দীকে আকবর (মহান ছিন্দীক) বলা হত, তদ্রূপ ইমাম সাহেবকেও ইমামদের মধ্যে ইমামে আযম (মহান ইমাম) বলা হত।

কোন মহান ব্যক্তিত্বের সাথে এরূপ মিল হওয়া আল্লাহ তাআলার বিশেষ দান। তিনি যাকে চান তাঁকে এ মর্যাদা দান করেন।

আবু গাস্‌সান বলেন, আমি ইসরাঈলকে এ কথা বলতে শুনেছি, নু'মান উত্তম ব্যক্তি ছিলেন। ফিকহী মাসয়ালা সম্পর্কিত অনেক হাদীছ তাঁর জানা ছিল। এ ধরনের হাদীছ তিনি খুবই অনুসন্ধান করতেন।

ইয়াহয়া বিন আব্দুল্লাহ বলেন, জনৈক মুহাদ্দিছ আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, আমি ইমাম সাহেবের নিকট পাঁচশত মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি প্রত্যেকটি মাসয়ালার ব্যাপারে ফতোয়া দিলেন। অতপঃর আমি সুফিয়ান ছাওরীর নিকট জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি প্রত্যেকটি মাসয়ালা সম্পর্কিত একটি করে হাদীছ শুনিয়ে দিলেন।

এর দ্বারা বুঝা যায় যে, ইমাম সাহেবের কোন ফতোয়াই হাদীছের পরিপন্থী ছিল না। তাঁকে মাসয়ালা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি শুধুমাত্র উত্তর দিয়ে যেতেন; হাদীছ বর্ণনা করতেন না। কিন্তু তিনি যে জবাব দিতেন তা হাদীছ মোতাবেকই হত; হাদীছের পরিপন্থী ছিল না।

আসাদ বিন আমর বলেন, ইমাম সাহেব বলতেন, যখন আমি তোমাদের নিকট এমন কোন কথা বলি যে সম্পর্কে ছাহাবাদের থেকে কোন রেওয়য়াত পাওয়া না যায় তবে রেওয়য়াত না পাওয়া পর্যন্ত তালাশ করতে থাক। একদিন তিনি বললেন, কোন স্বামী যদি তার স্ত্রীকে বলে তিন মাস পর্যন্ত আমি তোমার নিকট যাব না তবে তার দ্বারা ঈলা সাব্যস্ত হবে না। এ সম্পর্কিত কোন আছর তিনি উল্লেখ করেন নাই। বরং বললেন, তোমরা এ সম্পর্কিত আছর তালাশ করে বের কর। দীর্ঘদিন পর সা'য়ীদ বিন আরু'বাকে আমরা এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, ইবনে আব্বাহ (রাঃ)-এর বাণী রয়েছে তিনি বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তি কসম করে যে, তিন মাস পর্যন্ত তার স্ত্রীর নিকট যাবে না তবে এর দ্বারা ঈলা সাব্যস্ত হবে না। এ কথা শুনে আমরা ইমাম সাহেবকে সুসংবাদ দিলাম যে, আপনি যে ফতোয়া দিয়েছেন তা ইবনে আব্বাহ (রাঃ)-এর আছর দ্বারাও সাব্যস্ত ও প্রমাণিত হয়।

আমরা ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম, জনাব! এ কথাটা আমাদেরকে যখন যে, তিনি কোন দলীলের ভিত্তিতে তাঁর মত প্রকাশ করেছিলেন।

তিনি বললেন, এ আয়াত দ্বারা :

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نَّسَائِهِمْ تَرِيصٌ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ *

অর্থাৎ যারা আপন স্ত্রীদের সাথে ঙ্গা করে তাদেরকে চার মাস অপেক্ষা করতে হবে।

এর দ্বারা বুঝা যায় যে, ইমাম সাহেব যখন কোন ফতোয়া দিতেন তখন কোন দলীলের ভিত্তিতেই ফতোয়া দিতেন।

আমর বিন হারুন বলেন, আমি ইবনে জুরাইজকে বলতে শুনেছি, ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) মজবুত কোন দলীল ব্যতীত ফতোয়া দিতেন না। এটা বলা অতু্যক্তি হবে না যে, প্রতিটি মাসয়ালার ব্যাপারেই তাঁর এ নিয়ম ছিল।

আব্দুল্লাহ বিন মুবারক (রহঃ) বলেন, আমি অনেক দেশ ভ্রমণ করেছি। অনেক নাম করা আলেমের সাথে সাক্ষাৎ করেছি। কিন্তু ইমাম সাহেবের সাহচর্যে আসার পূর্বে আমি হালাল হারামের নিয়ম-নীতি জানি নাই।

ইমাম সাহেবের মজলিসে জ্ঞানী-গুণীদের সমাবেশ

ইমাম সাহেব দ্বীনের তাত্ত্বিক জ্ঞান শিক্ষা দিতেন। তাঁর দরসী হালকায় উলামাদের এক বিরাট জামাত অংশগ্রহণ করতেন। এঁদের মধ্যে প্রত্যেক বিষয়ের অভিজ্ঞ ব্যক্তি থাকতেন। একবার ওকী বিন জাররাহ বলেন, ধর্মীয় বিষয়ে আবু হানিফা কি করে ভুল করতে পারেন; যখন তাঁর দরসী হালকায় প্রত্যেক বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি উপস্থিত থাকেন? কিয়াস এবং ইজতিহাদে রয়েছেন আবু ইউসুফ, যুফার বিন হুযাইল, মুহাম্মদ বিন হাসানের মত বক্তিত্ব। হাদীছের অভিজ্ঞতা নিয়ে রয়েছেন ইয়াহয়া বিন যাকারিয়া বিন আবি যায়েদা, হাফস বিন গিয়াস, হাব্বান বিন আলী এবং মাযাল বিন আলীর মত ব্যক্তিত্ব। আরবী ভাষার অভিজ্ঞতা নিয়ে রয়েছেন কাসেম বিন মাআন বিন আদির রহমান আর দাউদ বিন নুসাইর ত্বাঈ এবং ফুযায়েল বিন আয়ায রয়েছেন। যুহদ এবং তাকওয়া নিয়ে যাঁর দরসী হালকায় এ ধরণের আহলে-ইলম শরীক থাকেন কিভাবে তিনি ভুল করতে পারেন? যদি কখনও এমন হয় তবে এঁরা অবশ্যই তাঁকে সংশোধন করে দিবেন।

উল্লেখযোগ্য ছাত্রবৃন্দ

এমনি তো ইমাম সাহেবের দরসী হালকায় অনেক উলামা শরীক থাকতেন। কিন্তু এঁদের মধ্যে দশজন এমন ছিলেন যারা সব সময় হালকায় উপস্থিত থাকতেন। তন্মধ্যে চারজন কোরআনের মতই ফিকাহরও হাফিয ছিলেন। এরা হাচ্ছেন যুফার বিন হুযাইল, আবু ইউসুফ, আসাদ বিন আমর, আলী বিন মুসাহির। এক বর্ণনাতে সুফিয়ান ছাওরী, আলী বিন মুসাহিরের মাধ্যমে ইমাম সাহেব মতামত সংগ্রহ করতেন। আলজামে কিতাবটি সংকলনের সময় তিনি আলী বিন মুসাহিরের সাথে আলোচনা করে সহযোগিতা নিয়েছেন। ইমাম সাহেবের পৌত্র ইসমাঈল বিন হাম্মাদ বলেন, ইমাম আবু হানিফার বিশিষ্ট শাগরেদ ছিলেন দশজন। আবু ইউসুফ, যুফার, আসাদ বিন উমর আলবাজালী, আফিয়া আওদী, দাউদ ত্বাঈ, কাসেম বিন মাআন মাসউদী, আলী বিন মুসাহির এবং তার ভাই মন্দল। এদের মধ্যে আবু ইউসুফ এবং যুফারের মত কেউ ছিলেন না।

ইসমাঈল আরো বর্ণনা করেন যে, ইমাম সাহেব বলেছেন, আমার ছাত্র ছত্রিশজন। এদের মধ্যে আটশজন কাযীর পদ পাবার যোগ্য। ছয়জন ফতোয়া দেয়ার যোগ্য এবং দুজন কাযী এবং মুফতীদের তালীম তরবীয়াত শিক্ষা দেয়ার যোগ্য। এতকথা বলে আবু ইউসুফ এবং যুফার (রহঃ)-এর দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

ইমাম সাহেবের ছাত্ররা তাঁর দরসী হালকায় ফিকহী মাসয়ালা নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা করতেন। যদি আফিয়া আওদী উপস্থিত হতেন তবে তাদেরকে বলতেন, আফিয়া আসা পর্যন্ত তোমরা এ আলোচনা বন্ধ রাখ। আর যখন আফিয়া আসতেন আর কোন মাসয়ালা তাঁদের সাথে একমত হতেন, তখন ইমাম সাহেব তাঁর শাগরেদদের বলতেন, এ মাসয়ালাটি লিখে রাখ। আর যদি আফিয়া একমত না হতেন তবে নিষেধ করে দিতেন।

একবার আবু ইউসুফ এবং যুফার (রহঃ) ইমাম সাহেবের দু'পাশে বসে কোন একটি মাসয়ালা আলোচনায় একে অপরের দলীল খণ্ডন করছিলেন। এর মাঝেই যোহরের সময় হয়ে গেল। ইমাম সাহেব যুফারকে বললেন, যেখানে আবু ইউসুফ থাকবে সেখানে শ্রেষ্ঠত্ব লাভের আশা করো না। এ কথা বলে আবু ইউসুফের সমর্থনের সিদ্ধান্ত দিলেন।

সুফিয়ান বিন উয়াইন বলেন, একবার আমি মসজিদে আবু হানিফার দরসের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। দেখলাম তাঁর শাগরেদরা তাঁর আশে পাশে বসে

উচস্বরে বহছ-মুবাহাছা করছে। আমি বললাম, আপনি তাদেরকে শোর করা থেকে বাধা দেন না কেন? তিনি বললেন, তাদেরকে আপন অবস্থায় ছেড়ে দিন। ওভাবেই তারা ফিকাহ শিখবে। দরসের মজলিসে দাউদ ত্বঈর আওয়ায গরচেয়ে উচু ছিল।

ইমাম সাহেবের নিয়ম ছিল জটিল মাসয়ালায় তিনি অনেক চিন্তা-ভাবনা করতেন। যে পর্যন্ত এ ব্যাপারে সন্দেহমুক্ত না হতেন, শাগরেদদের মধ্যে তা প্রকাশ করতেন না।

একই মাসয়ালায় বিভিন্নমুখী দলীল

একবার ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর বাগদাদ আগমনের সংবাদ শুনে তাঁর ছাত্রদের মধ্য হতে আবু ইউসুফ, যুফার, আসাদ বিন আমর সহ আরো অনেকে মিলে একটি মাসয়ালা আলোচনা করে ঠিক করে রাখলেন। ইমাম সাহেব দরসী হালকায় বসার সাথে সাথে সর্বপ্রথম সে মাসয়ালাটি জিজ্ঞেস করা হল। ইমাম সাহেব তাদের সিদ্ধান্তকৃত উত্তরের বিপরীত উত্তর দিলেন। এতে মজলিসে কানাঘুসা শুরু হয়ে গেল। সাবই বলে উঠল হে আবু হানিফা! আপনার কি হল? সফরের কারণে কি আপনি ক্লাস্ত হয়ে পড়েছেন? ইমাম সাহেব তাদের লক্ষ্য করে বললেন, থাম! থাম!! আস্তে আস্তে বল। শোরগোল দ্বারা কোন লাভ হয় না। আচ্ছা! তোমরা কি বলতে চাও? তারা বললেন- এ মাসয়ালার উত্তর তা নয় যা আপনি বলেছেন। ইমাম সাহেব বললেন, তোমরা কি দলীলের উপর ভিত্তি করে বল, না কি দলীল ছাড়াই? তারা বললেন, দলীলের ভিত্তিতে। ইমাম সাহেব বললেন, তোমাদের দলীল বল।

মুনাযারা শুরু হল। পরিশেষে ইমাম সাহেবের দলীল দ্বারা প্রমাণিত হল। তারা ইমাম সাহেবের উত্তর মেনে নিলেন। ইমাম সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা এ মাসয়ালার সঠিক উত্তর জানলে তো? তারা বললেন, হ্যাঁ! এবপর ইমাম সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, সে ব্যক্তি সম্পর্কে তোমাদের কি ধারণা যে তোমাদের প্রথম উত্তরকে সঠিক বলে এবং আমার উত্তরকে ভুল বলে। তারা সবাই একবাক্যে বলে উঠলেন, এটা কখনো হতে পারে না। দলীল দ্বারা আপনার উত্তর সঠিক প্রমাণিত হয়েছে।

আবার ইমাম সাহেব যুক্তি প্রমাণ দ্বারা তাদের উত্তরটাকে সঠিক এবং স্বীয় উত্তরকে ভুল প্রমাণ করলেন। তারা বলে উঠলেন, আপনি আমাদের সাথে ন্যায় খাচরণ করেননি। আমাদের উত্তরটাই তো সঠিক ছিল। এরপর আবার ইমাম সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা সে ব্যক্তি সম্পর্কে কি বল যে এ উভয়

উত্তরকে ভুল বলে এবং তৃতীয় অন্য এক উত্তরকে সঠিক বলে? তারা বললেন এটা কখনও হতে পারে না যে, উভয় উত্তর ভুল হবে। ইমাম সাহেব তৃতীয় একটি উত্তর বের করে দলীল দ্বারা সেটা সঠিক প্রমাণ করে দিলেন।

সবাই বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন, হে ইমাম সাহেব! মূল ব্যাপারটি আমাদেরকে বলুন। তখন ইমাম সাহেব বললেন, অমুক অমুক দলীলের ভিত্তিতে তো প্রথম উত্তরটিই সঠিক। তবে আমার উদ্দেশ্য ছিল তোমাদেরকে এ বিষয়টি জানানো যে, এ মাসয়ালাটির তিনটি দিক হতে পারে। এর প্রত্যেকটিই যুক্তিযুক্ত এবং কোন না কোন ফকীহর মায়হাব। এগুলো কাল্পনিক ধারণা মাত্র নয়।

ইমাম আবু ইউসুফের অনুতাপ

একবার ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) ইমাম সাহেব হতে পৃথক হয়ে একটি দরসী হালকা কায়েম করেন। এতে ইমাম সাহেব হতে অনুমতিও ছিল না এবং ইমাম সাহেব তার জন্য দরসী হালকা কায়েম করা সমীচীনও মনে করেননি। তাই তিনি এক ব্যক্তিকে একটি প্রশ্ন শিখিয়ে আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর দরসী হালকায় পাঠালেন। প্রশ্নটি এরূপ- এক ব্যক্তি কোন এক ধোপীকে কাপড় ধুইতে দিল। ধোপী কাপড় নেয়ার একটি তারিখ নির্ধারণ করে দিল। নির্দিষ্ট তারিখে কাপড়ের মালিক কাপড় আনতে গেলে ধোপী কাপড় দিতে অস্বীকৃতি জানালো। পরে ধোপী স্বয়ং কাপড় নিয়ে কাপড়ের মালিকের নিকট এল। এখন কি ধোপীকে তার পারিশ্রমিক দেয়া কাপড়ের মালিকের উপর আবশ্যিক? তিনি ঐ ব্যক্তিকে এও বলে দিলেন যে, যদি আবু ইউসুফ বলে পারিশ্রমিক দিতে হবে তুমি বলবে ভুল। আর যদি বলে দিতে হবে না তবুও বলবে ভুল।

সে ব্যক্তি ইমাম ইউসুফের মজালিসে গিয়ে তাই করল। ইমাম আবু ইউসুফ অত্যন্ত মেপাবী এবং দূরদর্শী ছিলেন। তৎক্ষণাৎ পটভূমি বুঝে নিলেন। তিনি নিজেই এ কর্মের উপর সতর্ক হয়ে ইমাম সাহেবের নিকট উপস্থিত হলেন। ইমাম সাহেব বললেন, তোমাকে ধোপীর মাসয়ালা এখানে নিয়ে এসেছে। ইমাম আবু ইউসুফ স্বীয় কর্মের উপর অনুতপ্ত হলেন।

ইমাম সাহেব এ মাসয়ালার বিশ্লেষণে বললেন, ধোপী যদি কাপড় ধোয়ার পূর্বেই দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে থাকে তবে সেটা হবে 'গসব' বা আত্মসাৎ। আর আত্মসাৎকারীকে পারিশ্রমিক দিতে হয় না। আর যদি কাপড় ধোয়ার পর অস্বীকৃতি জানিয়ে থাকে তবে কাপড় ধোয়ার কারণে তার পারিশ্রমিক দেয়া আবশ্যিক। পরে যখন ধোপী নিজেই কাপড়ের মালিকের নিকট কাপড় ফেরৎ দিতে এল তখন আত্মসাৎের অপরাধ বাকী রইল না। তার পারিশ্রমিক বহাল থাকবে।

ইমাম সাহেবের বিনয়

কূফার বাজারে এক ব্যক্তি এ কথা জিজ্ঞেস করতে করতে প্রবেশ করল, ফকীহ (ফিকাহবিদ) আবু হানিফার দোকান কোনটি? ঘটনাচক্রে এ প্রশ্নটি স্বয়ং আবু হানিফা (রহঃ)-কে করা হয়েছিল। তিনি বললেন, সে তো ফকীহ নয় বরং জোর করে মুফতী হয়ে বসে আছে।

ইমাম সাহেবের জীবনের একমাত্র

আদালতী ফয়সালা

ইমাম সাহেবের নিকট প্রধান বিচারপতি হবার প্রস্তাব আসলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে দু'একদিনের জন্য ছোট এক বস্তির কাযীর পদ গ্রহণ করেন। সে সময়ে তাঁর আদালতে একটি মুকাদ্দামা দায়ের হয়। এটিই ছিল তাঁর আদালতে সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষ মুকাদ্দামা। এরপর তিনি কাযীর পদ থেকে ইস্তফা দেন।

এক গরীব হাঁড়ি বিক্রেতা জনৈক ব্যক্তির নিকট একটি হাঁড়ির মূল্য বাবদ দু' দেরহাম চার পয়সা দাবী করল। ইমাম সাহেব বিবাদীকে এর সত্যতা জিজ্ঞেস করলে সে তা অস্বীকার করল। বাদীর নিকটও কোন সাক্ষী নেই। বিচারের ধারা হিসেবে এখন বিবাদী কসম করে বলবে। ইমাম সাহেব বিবাদীকে কসম করে বলতে বললে সে নির্দিধায় কসম করতে লাগল। কসম করার ব্যাপারে তার এ সাহস ইমাম সাহেবের সহ্য হল না। তিনি তার কসম বন্ধ করে দিয়ে বাদীকে তাঁর হাতব্যাগ হতে দু'টি ভারি ভারি দেরহাম বের করে তাকে দিয়ে বললেন, তুমি তার উপর যে মূল্য দাবী করেছ তা আমার থেকে নিয়ে যাও।

বদান্যতা ও দানশীলতা

ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর 'মজলিসুল বারাকা'-র নাম জীবনীকারগণ অনেক কিতাবে উল্লেখ করেছেন। নিম্নে এ সম্পর্কিত একটি ঘটনা উল্লেখ করা হচ্ছে যেটি অনেক জীবনীকারই উল্লেখ করেছেন। এ ঘটনা থেকে ইমাম সাহেবের নিবাসকে 'মজলিসুল বারাকা' নামকরণের কারণ ও সার্থকতাও বুঝে আসবে।

কূফা নগরীতে এক ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু কালের পরিবর্তনের সাথে সাথে তার অবস্থারও পরিবর্তন ঘটল। দারিদ্র্য তাকে গ্রাস করল। তিনি দরিদ্র হলেন বটে, কিন্তু তার আত্মসম্মানবোধ ছিল অটুট। তার দিন অভাব অনটনেই কেটে যাচ্ছে তবুও তিনি কারও নিকট হাত পাতেননি।

একদিন তার ছোট এক মেয়ে তাজা কাকড়ি দেখে দৌড়ে এসে মায়ের নিকট কাকড়ি খাওয়ার জন্য পয়সা চাইল। কিন্তু দরিদ্র স্বামীর ঘরে থেকে মা পয়সা পাবে কোথায়! মেয়েটি কাঁদতে লাগল। পিতা বসে বসে তা দেখছিলেন আর তার চোখ বেয়ে অশ্রু বইতেছিল। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, ইমাম আবু হানিফার থেকে সাহায্য চাইবেন। ইমাম সাহেবের মজলিসে উপস্থিত হলো। যে কোন দিন কারো নিকট কিছু চায় নাই আজও তার পক্ষে মুখ খোলা সম্ভবপর হয়ে উঠল না। লজ্জা এবং আত্মসম্মানবোধ প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়ালো! শেষ পর্যন্ত কিছু না বলেই তিনি উঠে চলে-গেলো।

ইমাম সাহেব তার চেহারা দেখেই বুঝে নিয়েছেন যে, তার কোন প্রয়োজন ছিল কিন্তু মর্যাদাবোধ তা প্রকাশ করা থেকে তাকে বিরত রেখেছে। লোকটি যখন বাড়ীর দিকে রওয়ানা হলো ইমাম সাহেব গোপনে তাকে অনুসরণ করে তার বাড়ীটি ভালভাবে চিনে এলেন। দিন শেষে যখন রাত্র এল এবং রাত গভীর হল ইমাম সাহেব পাঁচশত দিরহামের একটি থলি নিয়ে তার বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছিলেন। দরজায় করাঘাত করলেন। যখন দরজার নিকটে এল তখন ইমাম সাহেব সে থলিটি দরজার চৌকাঠের উপরে রেখে পিছনের দিকে যেতে যেতে বললেন, তোমাদের দরজায় যে থলিটি পড়ে আছে সেটি তোমাদের।

ভিতরে গিয়ে থলি খুলে একটি কাগজের টুকরা দেখতে পেলো। তাতে লিখা ছিল এ অর্থ নিয়ে আবু হানিফা তোমার নিকট এসেছিল। এগুলো বৈধ উপায়ে অর্জিত। নিষ্কিন্দায় সেগুলো খরচ কর।

প্রসিদ্ধ ইমাম ইব্রাহীম ইবনে উয়াইনাকে একবার কয়েদ করে জেলখানায় পাঠানো হয়েছিল। কারণ, তিনি লোকদের থেকে ঋণ এনে তা পরিশোধ করেননি।

ইমাম সাহেবের নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি খুবই দুঃখিত হলেন। তিনি তার সংগীদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তার ঋণায় কত টাকা ঋণ আছে? তাঁকে জানানো হল যে, চার হাজার দিরহামেরও বেশী।

ইমাম সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁর ঋণ পরিশোধ করে তাঁকে মুক্ত করে আনার জন্য কি অন্য কারো থেকে ঋণ নেয়া হয়েছে?

ইতিবাচক জবাব দিলে ইমাম সাহেব বললেন, প্রত্যেকের অর্থ ফিরিয়ে দাও। ইব্রাহীমের সমস্ত ঋণ আমি একাই পরিশোধ করব।

পরে প্রত্যেকের অর্থ ফিরিয়ে দেয়া হল এবং ইমাম সাহেব একাই তার ঋণ

পরিশোধ করলেন।

আব্দুল্লাহ বিন বকর সাহমী বর্ণনা করেন, মক্কা মুকাররমায় যাওয়ার পথে আমার সফরসঙ্গী ছিল জামাল। কিছু টাকার ব্যাপারে তার সাথে আমার ঝগড়া হয়ে গেল। কথায় কথা বেড়ে গেল। সে আমাকে ইমাম সাহেবের মজলিসে টেনে নিয়ে গেল। তিনি যখন আমাদেরকে মুকাদ্দমার ধরন জিজ্ঞাসা করলেন; তার বর্ণনা দিতে গিয়ে অর্থের পরিমাণে আমাদের উভয়ের মধ্যে মতভেদ হল। ঝগড়া শুরু হল। ইমাম সাহেব এটা দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। তিনি জানতে চাইলেন, ভাই! কি পরিমাণ অর্থ নিয়ে তোমরা ঝগড়া করছ? আমার সঙ্গী জামাল বলল, চল্লিশ দিরহাম।

ইমাম সাহেব বলতে লাগলেন, আশ্চর্য ব্যাপার মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সহমর্মিতা এবং ভ্রাতৃত্ববোধ একেবারে শেষ হয়ে গেছে।

ইমাম সাহেবের এ কথায় আমার বড়ই লজ্জা হল। তিনি স্বীয় পকেট হতে চল্লিশ দিরহাম বের করে জামালকে দিয়ে দিলেন।

তাঁর দয়া-দাক্ষিণ্য দ্বারা এভাবে ঝগড়াটির মীমাংসা হয়ে গেল।

হাদিয়া-তোহফা বন্টনের প্রতি ইমাম সাহেবের বড়ই সখ ছিল। এটা তাঁর অভ্যাস এবং স্বভাবে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। হাদিয়া-তোহফা বন্টনের সময় ইমাম সাহেব মাঝে মাঝে বলতেন, ভায়েরা! তোমরা আশ্চর্যবোধ করছো কেন? এটা তো হজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেরই বাণী যে, আমি তো শুধুমাত্র কোষাধ্যক্ষ। যেখানে রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে সেখানেই রাখি।

মুহাম্মদ বিন ইউসুফ সালেহী ইমাম সুফিয়ান ইবনে উয়াইনার এ উক্তিটি বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমার নিকট ইমাম আবু হানিফা এত অধিক পরিমাণ হাদিয়া পাঠালেন যে, তা দেখে আমি খাবড়ে গেলাম।

এরপর ইবনে উয়াইনা ইমাম সাহেবের দয়া-দাক্ষিণ্যের আধিক্যের কথা তাঁর কোন শিষ্যের নিকট বললে তিনি বললেন, আপনার নিকট কি এমন পরিমাণ হাদিয়া যায় যে, আপনি বিরক্ত হয়ে গেছেন? সায়ীদ ইবনে আবি আরুবার নিকট ইমাম সাহেবের মূল্যবান তোহফা সব সময়েই যেতে থাকে। আপনি যদি তা দেখতেন তবে আল্লাহ জানেন আপনি কী বলতেন?

এরপর বললেন, ইমাম সাহেব প্রত্যেক মুহাদ্দিছকেই পর্যাপ্ত পরিমাণ হাদিয়া তোহফা দিয়েছেন।

গোরক সাদী আলকুফীর বর্ণনা— আমি একবার ইমাম সাহেবের খিদমতে

কিছু হাদিয়া তোহফা পাঠাইলাম। ইমাম সাহেব তার দ্বিগুণ তোহফা দান করলেন। এ দেখে আমি তাঁর খিদমতে আরজ করলাম, হযরত! আমি যদি জানতাম আপনি এত কষ্ট করবেন এবং আমার হাদিয়ার বিনিময়ে দ্বিগুণ দান করবেন তবে কখনো আমি এ কাজ করতাম না।

ইমাম সাহেব বললেন, এরূপ কথা কখনো বলবেন না। কারণ প্রথম ব্যক্তি অধিক সওয়াব এবং ফযীলতের প্রাপ্য। আপনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণী শুনে ননি, যে ব্যক্তি তোমার সাথে সদাচরণ বা ইহসান করে তুমি তার বিনিময়ে ইহসান কর। যদি তার বরাবর বদলা কিংবা ইহসান করার শক্তি তোমার না থাকে, তবে ইহসানকারীর শুকরিয়া আদায় কর। যবান দ্বারা তার প্রশংসা কর।

বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে আমি বললাম জনাব! হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণী আমার নিকট সমস্ত ধন-সম্পদ হতেও প্রিয়।

অন্য এক বর্ণনায় এ কথাটি ইমাম সাহেবের দিকে সম্পর্কিত করা হয়েছে।

শাগরেদের জন্য ইমাম সাহেবের আর্থিক সাহায্য

ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) একজন বিত্তশালী ও দানবীর ব্যক্তি ছিলেন। বন্ধু-বান্ধবের আপ্যায়ন তাঁর প্রিয় কাজ ছিল। শাগরেদ এবং দরসী হালকায় অংশগ্রহণকারীদের প্রতি তাঁর বিশেষ লক্ষ্য ছিল। হাসান বিন যিয়াদ তাঁর বিশিষ্ট ছাত্র ছিলেন। তিনি যখন ইমাম সাহেবের মজলিসে শরীক হতে লাগলেন, তাঁর পিতা ইমাম সাহেবের নিকট এসে বললেন, আমার কয়েকটি কন্যা রয়েছে। একমাত্র হাসান ছাড়া আর কেউ আমার কাজে সাহায্য করার নেই। তাই আমি অত্যন্ত চিন্তিত। ইমাম সাহেব হাসান বিন যিয়াদকে ডেকে বললেন, তোমার পিতা এরূপ বলছেন; তুমি আমার নিকট থেকে যাও। আমি কোন ফকীরকে ফকীর থাকতে দেখিনি। এব সাথে সাথে ইমাম সাহেব তাঁর জন্য ভাতা নির্ধারণ করে দিলেন। যা তাঁর শিক্ষা শেষ হওয়া পর্যন্ত চালু ছিল।

ইমাম আবু ইউসুফ বলেন, আমি অভাব অনটনের মাঝেই ইমাম সাহেব থেকে তা'লীম হাসিল করছিলাম। একদিন আমার পিতা এসে আমাকে দরস থেকে উঠিয়ে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, আবু হানিফা সচ্ছল ব্যক্তি। তুমি অভাবগ্রস্ত। তাঁর সমান হতে যেয়ো না। এরপর আমি ইমাম সাহেবের নিকট আসা বন্ধ করে দিলাম। ইমাম সাহেব আমার অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞেস করলেন। কয়েকদিন পর আমি আবার সেখানে গেলে তিনি আমার অনুপস্থিতির

কারণ জানতে চাইলেন। আমি সাংসারিক অভাবের কথা বললাম। মজলিস শেষে তিনি আমাকে বসে যেতে ইঙ্গিত করলেন। সবাই চলে গেলে তিনি আমাকে একটি থলি দিয়ে বললেন, নিজের কাজ চালিয়ে যাও এবং সবসময় এখানে আসতে থাক। এ অর্থ শেষ হয়ে গেলে আমাকে জানাবে। ঐ থলিতে একশত দিরহাম ছিল। এর কিছুদিন পরেই আরেকটি থলি দিলেন। এভাবে তা চালু রইল। আমি বড়ই প্রশান্তির সাথে তালীম শেষ করলাম। সতের বছর পর্যন্ত আমি আবু হানিফা (বহঃ)-এর খিদমতে এভাবে ছিলাম যে, দুই ঈদের দিন ব্যতীত অন্য কোন দিন অনুপস্থিত ছিলাম না।

একবার হাজীগণ তাঁর খিদমতে কিছু জুতো হাদিয়া স্বরূপ পেশ করলেন। কিছুদিন পর ইমাম সাহেব নিজের জন্য জুতা কিনতে চাইলে লোকেরা জিজ্ঞেস করল হাদিয়ার জুতোগুলো কোথায়? তিনি বললেন, এর এক জোড়াও আমার নিকট নেই। আমি আমার শাগরেদদের সবকটি দিয়ে দিয়েছি।

শাগরেদদের হিম্মত্বর্ধন

ইমাম সাহেবের নিকট শিক্ষা গ্রহণের সময়েই ইমাম যুফারের বিবাহ হয়। তিনি তার উস্তাদের নিকট বিবাহ পড়ানোর আকাঙ্ক্ষা পেশ করলে ইমাম সাহেব সানন্দে তাঁর ইচ্ছা পূরণ করেন। বিবাহের খোংবায় তাঁর সম্পর্কে ইমাম সাহেব এ মর্যাদাপূর্ণ শব্দগুলো বলেন,

এ হচ্ছে হুযাইল তনয় যুফার; যে বংশধারা, আভিজাত্য এবং ইলমের কারণে মুসলমানদের ইমাম এবং দ্বীনের একজন উল্লেখযোগ্য ইমাম।

শাগরেদ সম্পর্কে উস্তাদের এ বাক্যে উপস্থিত ব্যক্তিগণ খুবই সন্তুষ্ট হলেন। কিন্তু তাঁর পরিবারেব কেউ কেউ তাঁকে বললেন, 'তোমাদের গোত্রের অভিজাত শ্রেণীর লোক এখানে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তুমি আবু হানিফা দ্বারা বিবাহ পড়ালে?' যুফার বললেন, 'যদি আমার পিতাও উপস্থিত থাকতেন তবুও আমি আবু হানিফাকেই এ ব্যাপারে অগ্রাধিকার দিতাম।'

ইমাম সাহেবের এক শাগরেদ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ফিকহী দূরদৃষ্টি কিভাবে অর্জন করা যেতে পারে? তিনি বললেন, সম্পূর্ণ মনোযোগ ও একাগ্রতার সাথে চেষ্টা করলে। শাগরেদ বললেন, এ কি করে সম্ভব? তিনি বললেন, পার্শ্বিক ব্যস্ততা পরিহার করে! শাগরেদ বললেন, এটা কিভাবে হবে? ইমাম সাহেব বললেন, যে বস্তু যতটুকু প্রয়োজন তা ততটুকুই গ্রহণ কর। এর অধিকের চিন্তায় পড়ো না।

শাগরেদদের সাহস বর্ধন, তাদের মঙ্গল ও প্রয়োজনের লক্ষ্য রাখা ইমাম সাহেবের দবসী হালকার বিশেষত্ব ছিল।

কয়েকজন বিশিষ্ট শাগরেদের নাম

ইমাম সাহেবের শাগরেদদের সংখ্যা কয়েক সহস্র। তাঁর সমকালীন কোন মুহাদ্দিহ কিংবা ফকীহর ছাত্র এত অধিক ছিল না। হাফিব আবুল হাশ্বাজ 'তাহযীবুল কামাল' কিতাবে প্রায় একশত শাগরেদের নাম উল্লেখ করেছেন। 'উকুদুল জুমান- গ্রন্থ অষ্টশত শাগরেদের নাম উল্লেখ রয়েছে, যারা নিম্নে বর্ণিত দেশ ও শহর থেকে এসে ইমাম সাহেব থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেনঃ

মক্কা মক্কারমা, মদীনা মুনাওয়ারা, দামেশক, বসরা, কূফা, ওয়াসেত, মুসেল, জাযীরা, রিক্কা, ননীবীন, রমলা, মিশর, ইয়ামান, বাহরাইন, বাগদাদ, আহওয়াজ, কেরমান, ইস্পাহান, ইত্তরাবাদ, হুলওয়ান, হামদান, রায়, কুমাস, দামগান, তিবরিস্তান, জুরজান, সরখসী, নাসা, মারভ, বুখারা, সমরকন্দ, কাস্‌নাস, তিরমিয, বলখ, হিরাত, কুহস্তান, যুম্ম, খাওয়ারফেম, সিদ্দিস্তান, মাদায়েন, মাসীসা, হিমস্ প্রভৃতি।

অনেকেই নিজ নিজ দেশ বা শহর ভিত্তিক ইমাম সাহেবের শাগরেদদের নাম এবং জীবনী নিয়ে আলোচনা করেছেন, যাঁদের মধ্যে ফকীহ, মুহাদ্দিহ, কাযী সবই অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। কয়েকজনের নাম নিম্নরূপঃ-

কাযী আবু ইউসুফ ইয়াকুব বিন ইব্রাহীম, মুহাম্মদ বিন হাসান শায়বানী, যুফার বিন হুযাইল আশ্বরী, হাম্মাদ বিন আবি হানিফা, হাসান বিন যিয়াদ লুলুঈ, আবু ইসমত নূহ বিন আবি মরিয়ম, কাযী আসাদ বিন আমর, আবু মৃতী হাকাম বিন আদ্দিল্লাহ বলখী, মুগীরা বিন মিকসাম, যাকারিয়া বিন আবি যায়েদা, মিসআর বিন কিদাম, সুফিয়ান ছাওরী, মালেক বিন মেণওয়াল, ইউনুস বিন আবি ইসতাক, দাউদ ত্বাঈ, হাসান বিন সালেহ, আবু বকর বিন আয়্যাশ, ঈসা বিন ইউনুস, আলী বিন মুসহির, হাফস বিন গিয়াস, জরীর বিন আদিল হামীদ, আব্দুল্লাহ বিন মুবারক, ওকী বিন জাররাহ, আবু ইসহাক ফাযারী, ইয়াযীদ বিন মক্কী বিন ইব্রাহীম, আবু আসেম নবীল, আব্দুর রাযযাক বিন হাম্মাদ সানআনো, আবু আদ্রির রহমান মক্কী, হুশাইম বিন বশীর, আলী বিন আসেম আব্বাদ বিন আওয়াম, জা'ফর বিন আওন, ইব্রাহীম বিন তহমান, হামযা বিন হাবীল বইয়্যাৎ, ইয়াযীদ বিন যুবাঈ, ইয়াহয়া বিন ইয়ামান, খারেজা বিন মুসআব, মুসআব বিন মিকদাম, রবীয়া বিন আদ্রির রহমান মাদানী, ইয়াহয়া

বিন নসর বিন হাজেব, আমর বিন মুহাম্মদ আনকারী হাওয়া বিন খলীফা, উবাইদুল্লাহ বিন মুসা প্রমুখ।

জীবিকা নির্বাহ : ইমামগণের কেউ ইলমে দ্বীনকে জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম বানাননি বা তদ্বারা কোন পার্শ্ব স্বার্থও উদ্ধার করেননি। বরং দ্বিনি খিদমত হিসাবে ফিকাহ বা হাদীছ ইত্যাদি শিক্ষা করা বা শিক্ষা দেয়ার সাথে সাথে জীবিকার জন্য কাজ-কর্ম বা ব্যবসা ইত্যাদি করতেন। উপদেশ গ্রহণের জন্য তাঁদের নামের সাথে পেশাও উল্লেখ করা হত। বিভিন্ন কিতাবে পূর্বেকার ইমামগণের নামের সাথে বায়যায (কাপড় বিক্রেতা) খায্যার (রেশম বিক্রেতা) যাইয়াত (তৈল বিক্রেতা) সাম্মান (ধি বিক্রেতা) হান্নাত (গম বিক্রেতা) হাত্তাব (কাষ্ঠ বিক্রেতা) বায্যার (শস্য বিক্রেতা) এবং এধরনের অনেক খেতাব পাওয়া যায়।

রেশমের কারখানা

ইমাম আবু হানিফাও খায্যার অর্থাৎ রেশম বিক্রেতা ছিলেন। এটা তাঁদের পারিবারিক পেশা ছিল। তাঁদের রেশম এবং রেশমী কাপড় তৈরী করার বিরাট কারখানা ছিল। সেখানে বহু কারিগর এবং কর্মচারী কাজ করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করত। রেশমী কাপড় বিক্রির একটি বড় দোকানও ছিল। সেখানে কারখানায় তৈরী রেশমী কাপড় বিক্রয় করা হত। ইমাম যাহাবী বলেন—

“আবু হানিফা অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। ফিকাহ, ইবাদত, পরহেয়গারী, দানশীলতা প্রভৃতি গুণসমূহের সমাবেশ তিনি নিজের মধ্যে ঘটিয়েছেন। তিনি সরকারী কোন অনুদান গ্রহণ করতেন না। বরং নিজের আয় থেকে অন্যের জন্য ব্যয় করতেন। নিজের প্রয়োজন থেকে অপরের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিতেন। তাঁদের রেশম ও রেশমী কাপড় তৈরী করার একটি বিরাট কারখানা ছিল। সেখানে বহু কারিগর এবং কর্মচারী কাজ করত।”

রেশমের এ কারখানাটি সম্ভবতঃ কুফার পূর্বদিকে ইমাম সাহেবের বাসস্থানের নিকটেই ছিল। ইমাম মালেক (রহঃ) বায্যায অর্থাৎ সুতি কাপড়ের ব্যবসায়ী ছিলেন। পরে তিনি দ্বিনি এবং ইলমী বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করেন। এই উভয় ব্যুর্গেরই জীবিকার মাধ্যম ছিল কাপড়ের ব্যবসা।

রেশমী কাপড়ের দোকান

ইরাক ছিল ইসলামী এবং অনারব সংস্কৃতির মিলন-কেন্দ্র। শামের গহরগুলোতে রোমীয় এবং পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতির নিদর্শন পাওয়া যেত। আর

ইরাকে অনারব এবং ইরানী সংস্কৃতির আভাস পাওয়া যেত। বাগদাদ শহরের পতন হওয়ার পূর্বে কূফা এবং বসরা শহর দু'টি সুখ-সমৃদ্ধির কেন্দ্র ছিল। কূফায় উন্নতমানের সুতি এবং রেশমী কাপড় তৈরী হত। বহু পূর্ব থেকেই ইমাম সাহেবের পরিবার রেশমী কাপড়ের ব্যবসা করত। শহরের মাঝখানে জামে মসজিদ এবং প্রশাসন ভবনের নিকটে আমার হুরাইছ (রাঃ)-এর সুপরিচিত প্রকাণ্ড বাড়ীতেই ছিল তাঁর দোকান। খতীব বাগদাদী লিখেন,

আবু হানিফা রেশম বিক্রেতা ছিলেন। আমার বিন হুরাইছের বাড়ীতে তার দোকানটি বেশ পরিচিত ছিল।

তাঁর বাড়ী এবং দোকানের গুরুত্ব বুঝার জন্য এতটুকু জানাই যথেষ্ট যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের ওফাতের সময় হযরত আবু সায়ীদ আমার বিন হুরাইছ মাখযুমী (রাঃ)-এর বয়স ছিল বার বৎসর। তিনি বলেন, একবার আমার পিতা আমাকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের খিদমতে নিয়ে যান। তিনি আমার মাথার উপর হাত বুলিয়ে আমার বেচা-কেনায় বরকত এবং রিযিকের প্রাচুর্যের জন্য দোয়া করলেন। একবার আমার ভাই সায়ীদ আমাকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামের খিদমতে নিয়ে গেলেন। তিনি ঐ সময় স্বর্ণ বক্টন করছিলেন। আমাকেও একটি টুকরা দান করলেন। আমি মনে মনে বললাম, এটা যে কাজেই লাগাব তাতে বরকত হবে। তার শেষাংশ এ বাড়ীতে ব্যয় করেছি।

অতএব এর ফল এই যে, তিনি বহু সম্পদের অধিকারী হয়ে গেলেন এবং কূফার শ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তিত্বে পরিণত হলেন।

হযরত আমার বিন হুরাইছ (রাঃ) কাদেসিয়ার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কূফায় বসতি স্থাপন হলে তিনি সেখানে চলে আসেন। ইবনে সা'দের বর্ণনায় তিনি কূফায় এসে জামে মসজিদের সন্নিকটে একটি বিরাট বাড়ী তৈরী করেন। ইবনে সা'দ আরো বর্ণনা করেন, সেটা বিশাল এবং প্রশস্ত। বর্তমানে (তৃতীয় শতাব্দী) সেখানে রেশম ব্যবসায়ীরা বাস করে।

কূফার আমীর যিয়াদ যখন শহরের বাইরে যেতেন, তখন তাকেই নিজের জায়গায় আমীর বানিয়ে যেতেন। তিনি ৮৫ হিজরীতে ইস্তিকাল করেন। তাঁর এ বাড়ীতে দোকান পাওয়ার জন্য অনেক চেষ্টা করা হত। কারণ, প্রতিটি দোকান এত বরকতময় ছিল যে, খুবই সাধারণ দোকানদার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই যথেষ্ট সম্পদশালী হয়ে যেত। এ বিশাল বাড়ীটিতে অনেক দোকান ছিল। যেগুলোতে রেশম ব্যবসায়ী থাকত।

ক্রয়-বিক্রয়ে সততা এবং পরিচ্ছন্নতা

হাফস বিন আন্দির রহমান ইমাম সাহেবের ব্যবসায় শরীক ছিলেন। তিনি এখানে মাল পাঠিয়ে দিতেন। তিনি বিক্রয় করতেন। একবার মাল পাঠিয়ে দিয়ে তাঁকে জানিয়ে দিলেন, এখানে খুঁত রয়েছে। তাই গ্রাহককে জানিয়ে দিবেন। কিন্তু হাফসের এ কথাটি স্মরণ ছিল না, সেহেতু তিনি এ খানটিও স্বাভাবিক দামেই বিক্রয় করলেন। ক্রেতার ঠিকানা জানা যায়নি। ইমাম সাহেব তার সম্পূর্ণ মূল্য সদকা করে দিলেন।

এক ব্যক্তি নির্দিষ্ট একটি রং-এর কাপড় তালাশ করছিল। ইমাম সাহেব বললেন, অপেক্ষা কর। এ ধরনের কাপড় আসলে তোমার জন্য রেখে দিব। সপ্তাহ পুরা হওয়ার আগেই সে রং-এর কাপড় দোকানে এসেছে। ঐ ব্যক্তি দোকানের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। ইমাম সাহেব তাকে ডেকে বললেন, তোমার পছন্দের কাপড় এসে গেছে। সে মূল্য জিজ্ঞেস করলে ইমাম সাহেব বললেন, এক দিরহাম। সে ভাবল ইমাম সাহেব ঠাট্টা করছেন। ইমাম সাহেব বললেন, আমি দু'টো কাপড় বিশ দীনার এক দিরহাম দ্বারা ক্রয় করেছি। তন্মধ্যে একটি বিশ দীনারে বিক্রয় করেছি। আমার পুঁজির এক দিরহাম কম রয়েছে। তুমি অন্য কাপড়টি নিয়ে যাও এবং এক দিরহাম দিয়ে দাও। আমি আমার বন্ধুদের কাছ থেকে লাভ করিনা।

এক ব্যক্তি দোকানে এসে ইমাম সাহেবকে বলল, আমার বিয়ের কথাবার্তা সম্পন্ন হয়ে গেছে। আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। দু'টি কাপড়ের প্রয়োজন। দুই সপ্তাহ পর ইমাম সাহেব ঐ ব্যক্তিকে ডাকলেন। সে ব্যক্তি আসলে ইমাম সাহেব তাকে বিশ দীনারেরও অধিক মূল্যের দুটি কাপড় এবং নগদ এক দীনার দিয়ে বললেন, 'তুমি এগুলো নিয়ে যাও।' তাকে আশ্চর্যান্বিত হতে দেখে ইমাম সাহেব বললেন, তোমার নামে বাগদাদে কিছু সামান পাঠিয়েছিলাম। সেগুলো বিক্রয় করেই তোমার কাপড় কেনা হয়েছে এবং এক দীনার অবশিষ্ট রয়েছে। তুমি এগুলো নিয়ে যাও। নচেৎ আমি এগুলো বিক্রয় করে তার মূল্য এবং অতিরিক্ত এক দীনার দান করে দিব। লোকেরা এর কারণ জানতে চাইলে ইমাম সাহেব বললেন, এক ব্যক্তি এসে বলল, আমার প্রতি ইহসান করুন। আর আমার উস্তাদ আতা বিন আবি রাবাহ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)-এর এ কথা বর্ণনা করেছেন যে, যদি কোন ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের নিকট বলে যে, আমার উপর ইহসান কর- তবে সে নিজের ভাইকে তার গোপন কথার আমীন (আমানতদার) বানিয়ে দিল। এ জন্য আমি

ঐ ব্যক্তির সাথে যথাসম্ভব সদাচার এবং তার প্রতি ইহসান করতে চাই।

মালীহ বিন ওকীর পিতা বর্ণনা করেন, আমি ইমাম সাহেবের দোকানে বসা ছিলাম। জনৈক বৃদ্ধা রেশমী কাপড় বিক্রয় করার জন্য এসেছিল। ইমাম সাহেব মূল্য জিজ্ঞেস করলে সে বলল, একশত দিরহাম। ইমাম সাহেব বললেন, এ কাপড় এর চেয়েও দামী। সে বলল, দুইশত দিরহাম। ইমাম সাহেব বললেন, এর চেয়েও দামী। সে বলল তিনশত দিরহাম। ইমাম সাহেব বললেন, এর চেয়েও মূল্যবান। সে বলল, চারশত দিরহাম। ইমাম সাহেব বললেন, এখনও এর দাম কম। বৃদ্ধা বুঝল, ইমাম সাহেব কৌতুক করছেন। ইমাম সাহেব বললেন, তুমি এমন কাউকে ডেকে আন, যে এর সঠিক দাম বলবে, ইমাম সাহেব ঐ কাপড়টি পাঁচশত দিরহামে ক্রয় করে নিলেন।

এক ব্যক্তি দোকানে এসে কাপড় কিনতে চাইল। ইমাম সাহেব কর্মচারীকে বললেন, কাপড় বের করে দেখাও। সে থান বের করল এবং তার উপর হাত রেখে বলল— ছাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মাদ। এটা শুনে ইমাম সাহেব বড়ই রাগান্বিত হলেন এবং কর্মচারীকে বললেন, তুমি আমার কাপড়ের প্রশংসা দরুদ শরীফ দ্বারা করছ? আজ বেচা-কেনা হবে না। পরে তাই করলেন।

তাকওয়া ও খোদাভীরুতা, সন্দেহযুক্ত খাদ্য পরিহার

একবার লুটের কতিপয় ছাগল কুফাবাসীদের ছাগলের সাথে মিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল। লুটের ছাগল এবং কুফাবাসীদের নিজস্ব ছাগলের মধ্যে পার্থক্যও করা যাচ্ছিল না যে, সেগুলো পাল হতে পৃথক করে মালিকের নিকট হস্তান্তর করা যাবে। এখন এ আশংকা হচ্ছিল যে, কসাই বাজার হতে যে ছাগল এনে জবাই করবে হয়তোবা তন্মধ্যে লুটের ছাগলও থাকবে এবং বাজারের মধ্যে সেটার গোস্তও বিক্রয় হবে। এভাবে লুটের ছাগলের গোস্ত লোকদেরকে খাইয়ে দিবে। এমন গোস্ত খাওয়া থেকে কিভাবে বেঁচে থাকা যায়। ইমাম সাহেব সে বিষয়ে চিন্তা করতে লাগলেন। তিনি মানুষকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, একটি ছাগল কতদিন জীবিত থাকতে পারে? তারা বলল সাত বৎসর। ইমাম সাহেব দীর্ঘ সাত বৎসর পর্যন্ত কুফাবাসীদের থেকে বাজারের গোস্ত খরিদ করেন নাই।

জনৈক অগ্নিপূজকের ইসলাম গ্রহণ

'তফসীরে কবীর' নামক বিখ্যাত তফসীরগ্রন্থে ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী উল্লেখ করেন, ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) তাঁর এক মাজুসী (অগ্নিপূজক) প্রতিবেশীর নিকট কিছু ঋন পাওনা হলেন। ইমাম সাহেব একদিন সেগুলোর

আগাদা করার উদ্দেশ্যে তার বাড়ীতে গেলেন। তার ঘরের নিকটবর্তী হলে কিছু নাপাক তাঁর জুতায় লেগে গেলো। তা দূর করার জন্য তিনি জুতো খুলে ঝাঁকি দিলেন। এতে কিছু নাপাকী তার ঘরের দেয়ালে লেগে গেলো। এতে ইমাম সাহেব বড়ই দুঃখিত হলেন এবং মনে মনে ভাবতে লাগলেন আমি যদি এভাবে নাপাকী রেখে দেই তবে দেয়ালটি কদাকার হয়ে যাবে। আর যদি তা তুলে ফেলতে যাই তবে দেয়ালের মাটি খসে পড়বে। এতে ঘরের মালিকের ক্ষতি হবে। অবশেষে তিনি তার দরওয়াজা খটখটালেন। একজন বাঁদী বেরিয়ে এল। ইমাম সাহেব তাকে বললেন, তোমার মালিককে বল আবু হানিফা দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। বাঁদী সংবাদ পৌঁছালে সে বেরিয়ে এল এবং ভাবতে লাগল সম্ভবতঃ তিনি ঋণ শোধ করতে বলবেন। তাই সে ওয়রখাহী করতে লাগল। ইমাম সাহেব নাপাক লাগার ঘটনা বলে জিজ্ঞাসা করলেন, এমন কোন পদ্ধতি বল যার দ্বারা তোমার দেয়াল পরিষ্কার হয়ে যায়।

মাজুসী ব্যক্তি ইমাম সাহেবের তাকওয়া এবং পরহেয়গারী দেখে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ফেলল।

ঘরের ছায়া ছেড়ে রৌদ্রে গিয়ে অবস্থান

ইসমাইল বাগদাদী বলেন, আমি ইয়াযীদ বিন হারুনকে জিজ্ঞাসা করলাম মানুষ কখন ফতোয়া দেওয়ার যোগ্য হতে পারে? তিনি বললেন, মানুষ যখন ইমাম আবু হানিফার মত সতর্কতা অবলম্বন করে। প্রশ্নকারী বললেন, জনাব! আপনি এ কথা বলেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ আমি আরও বলবো যে, আমি তাঁর চেয়ে বড় ফকীহ এবং মুত্তাকী দেখিনি। একদিন ইমাম সাহেব এক ব্যক্তির ঘরের দরওয়াজার সামনে রৌদ্রে বসা ছিলেন। আমি আরজ করলাম যদি আপনি রৌদ্র হতে সরে এসে ঘরের ছায়ায় বসেন তবে ভাল হয়।

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আমি ইমাম আবু হানিফাকে কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম যে, আপনি ছায়া ছেড়ে কেন রৌদ্রে বসলেন? তিনি বললেন, এ দরওয়ালার কাছে আমার কিছু ঋণ আছে। আমি ঋণ গ্রহীতার ঘরের ছায়া এ ভেবে ব্যবহার করতে অপছন্দ করলাম যে, যেন সেটা অবৈধ উপকার এবং সুদের মধ্যে গণ্য না হয়। হাদীছ শরীফে আছে ঋণ দ্বারা যদি কোন উপকার হাসেল হয় তবে সেটা সুদ।

চোখের হিফায়ত

ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বাল্যকালে খুবই সুন্দর এবং সুশ্রী ছিলেন। তিনি যখন ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তার নিকট গমন করেন তখন একবারই মাত্র ইমাম সাহেবের দৃষ্টি তার উপর পড়েছিলো। তাও ছিল অনিচ্ছাকৃত। এরপর তিনি কখনও তার দিকে চোখ তুলে তাকাননি। তিনি যখন তাকে পড়াতে তখন স্তম্ভের পিছনে তাকে বসাতেন, যেন অনিচ্ছায়ও তাঁর দৃষ্টি তার উপর পতিত না হয়।

জনৈকা বাঁদীর খেদমত গ্রহণ থেকে বিরত থাকা

খারেজা বিন মুছআব হতে বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেন, আমার যখন হজ্জ যাবার সৌভাগ্য হল তখন বাঁদীকে ইমাম সাহেবের খিদমত করার জন্য তাঁর নিকট রেখে গেলাম। প্রায় চার মাস মক্কা মুকাররমায় অবস্থান করলাম। সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে ইমাম সাহেবের খিদমতে হাজির হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। হযরত! আমার বাঁদীর চরিত্র এবং খিদমত কেমন মনে হলো? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি কোরআন পড়ে, মানুষকে তদানুসারে আমল করতে উৎসাহিত করে, হালাল-হারাম সম্পর্কে মানুষকে অবহিত করে, তার জন্য আবশ্যিক সে যেন তার নফস এবং দৃষ্টি সাধারণ লোকদের চেয়ে বেশী হিফায়ত করে। খোদার কসম! যখন থেকে আপনি চলে গিয়েছেন। আমি আপনার বাঁদীর দিকে চোখ তুলেও তাকাইনি।

খারেজা বলেন, এরপর আমি আমার বাঁদীকে ইমাম সাহেবের আখলাক এবং তাঁর ঘরোয়া মুআমালা ও আচরণ বিধি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। সে বললো, আমি আবু হানিফার মত পবিত্র পাকদামান ব্যক্তিত্ব আর দেখি নাই। শুক্রবারে ফজরের নামায পড়তে বেরিয়ে যেতেন। সেখান থেকে এসে চাশতের নামায পড়তেন। এরপর গোসল করে তেল লাগিয়ে জুমার নামাযের জন্য বেরিয়ে যেতেন। তাঁকে কোনদিন বেরোজা দেখিনি। তিনি ঘুমাতেনও খুব কম।

ঋণ গ্রহীতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা

প্রসিদ্ধ সুফী শকীক বলখী তার স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, একদিন আমি ইমাম আবু হানিফার সাথে যাচ্ছিলাম। এ সময়ে দূর হতে আগত এক ব্যক্তি আমাদেরকে দেখে রাস্তা পরিবর্তন করে অন্য এক গলিতে ঢুকে গেল।

শকীক বলখী বলেন, দেখতে পেলাম ইমাম সাহেব তাকে ডেকে বলছেন, যে রাস্তা দিয়ে তুমি আসছিলে সে রাস্তায় চলে এসো। অন্য রাস্তায় কেনো গেলে? এ কথা শুনে পথিক বেচারা দাঁড়িয়ে গেল। আমরা তার নিকটে গিয়ে দেখলাম যে, সে লজ্জিতভাবে দাঁড়িয়ে আছে। ইমাম সাহেব তাকে রাস্তা পরিবর্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে বলল, আপনি দশ হাজার দিরহাম আমার নিকট পাবেন। সেগুলো দিতে দেরি হয়ে গেছে। আপনাকে দেখে লজ্জা হচ্ছিল। আপনার দিকে তাকাতে লজ্জাবোধ করছিলাম। তাই অন্য পথ ধরেছিলাম।

ইমাম সাহেব বললেন, সুবহানাল্লাহ! সামান্য এ কারণে তুমি আমার থেকে লুকানোর জন্য অন্য পথ ধরেছিলে। যাও! আমার পক্ষ থেকে তোমাব সমস্ত ঋণ মাফ করে দিলাম।

শকীক বলেন, শুধু এতটুকুই নয়। ইমাম সাহেব অনুনয় করে তাকে বলছিলেন, ভাই! আমাকে দেখে তোমার মনে যে লজ্জা বা ভয় এসেছিল- এজন্য আমাকে ক্ষমা করে দিও।

ইবাদত এবং রিয়াযাত বা সাধনা

কিতাব এবং সুন্নাহের তালীম, ফিকাহর সংকলন এবং ব্যবসায়িক ব্যস্ততার সাথে সাথে মুহুদ ও তাকওয়া এবং ইবাদত ও রিয়াযাতে পুরোজীবন অতিবাহিত করেন। বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ শরীক বলেন, আমি হান্নাদ বিন আবি সুলাইমান, আলকামা বিন মারছাদ, মুহারিব বিন দিছার, আওন বিন আদ্দিলাহ, আব্দুল মালেক বিন উমায়ের, আবু হুমাম সালুলী, মুসা বিন তালহা এবং আবু হানিফাকে দেখেছি এবং তাঁদের সঙ্গে রয়েছি। এদের মধ্যে কাউকে আবু হানিফা থেকে অধিক সুন্দরভাবে রাত কাটাতে দেখিনি। আমি তাঁর সাথে এক বছর রয়েছি। এ সময় কখনো রাতে তাঁকে বিছানায় দেখিনি।

আবু নায়ীম বলেন, আমি আমাশ, মেসআর, হামযা যাইয়াত, মালেক বিন মেগওয়াল, ইস্রাইল, উমর বিন ছাবেত শরীক এবং অন্যান্য অনেক উলামার সাথে রয়েছি এবং তাঁদের সাথে নামায পড়েছি। কিন্তু তাদের কাউকে আবু হানিফা থেকে উত্তম নামায পড়তে দেখিনি। তিনি নামাযের পূর্বে কান্নাকাটি এবং দোয়া করতেন। স্বয়ং ইমাম সাহেব বর্ণনা করেন, কোরআনে এমন কোন সূরা নেই যা আমি নফল নামাযে পড়িনি।

খারেজা বিন মুসআব বর্ণনা করেন, চারজন ইমাম এক রাকআতে পুরো কোরআন খতম করেছেন; উহমান বিন আফ্ফান, তমীমদারী, সায়ীদ বিন

যোবায়ের, এবং আবু হানিফা (রহঃ)।

কাসেম বিন মানান বলেন, এক রাত্রে আবু হানিফা নামায়ে দাঁড়ালেন। সারারাত তিনি

وَأَمْتَارُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمَجْرُمُونَ *

এ আয়াত বারবার পড়ছিলেন এবং কাঁদছিলেন।

যায়েদা নিজের ঘটনা বর্ণনা করেন, এক রাত্রে আমি আবু হানিফার সাথে এশার নামায পড়লাম। ইমাম সাহেব আমার আগমনের সংবাদ জানতে পারেননি। নিভূতে তাঁকে একটি মাসয়ালা জিজ্ঞেস করার ছিল। এজন্য এক কিনারে বসে গেলাম। মানুষ নামায পড়ে চলে গেল। ইমাম সাহেব নফল নামায শুরু করলেন। সকাল পর্যন্ত নামাযে তিনি বারবার এ আয়াত পড়তে রইলেন। আমি তাঁর অপেক্ষায় বসে ছিলাম।

কাযী আবু ইউসুফ বলেন, একবার আমি ইমাম সাহেবের সাথে যাচ্ছিলাম। রাস্তায় ছেলেরা তাঁকে দেখে পরস্পরে বলাবলি করতে লাগল, ইনি হচ্ছেন আবু হানিফা। ইনি সারারাত জাগ্রত থাকেন। ইমাম সাহেব বললেন, আবু ইউসুফ দেখ! ছেলেরা কি বলছে, আজ থেকে রাত্রে আমি আর ঘুমাব না।

আব্দুল মজীদ বিন রাওয়াদ বলেন, হজ্জের সময়ে আমি আবু হানিফা থেকে তওয়াফ, নামায এবং ফতোয়ায় অধিক ব্যস্ত অন্য কাউকে দেখিনি। সারাদিন এবং সারারাত তিনি ইবাদতে ব্যস্ত থেকে তালীমও দিতেন। একটানা দশদিন পর্যন্ত তিনি নামায, তওয়াফ এবং তালীমে ব্যস্ত ছিলেন। দিবারাত্রে এক মুহূর্তের জন্যও ঘুমাননি।

আব্দুল্লাহ বিন লবীদ বর্ণনা করেন, রমযান মাস আসলে আবু হানিফা কোরআন তেলাওয়াতে নিমগ্ন থাকতেন। আর রমযানের শেষের দশকে তাঁর সাথে কথা বলার সুযোগ হত না।

আমর বিন হাইছাম বলেন, একবার আমি ইমাম সাহেবের নিকট শো'বার একটি পত্র নিয়ে উপস্থিত হলাম। তখন আছরের নামাযের সময়। তিনি মসজিদেই আছর, মাগরিব এবং এশার নামায আদায় করে আমাকে নিয়ে ঘরে গেলেন। খানা খাইয়ে আমাকে একটি বিছানায় শুতে দিয়ে তিনি ঘরের এক কোণায় নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। সারারাত নামায পড়লেন।

সকালে আমাকে ঘুম হতে জাগিয়ে ওয়ূর পানি দিয়ে মসজিদে চলে গেলেন। ফজরের নামাযের পর তিনি নিজ স্থানে বসা ছিলেন। হঠাৎ মসজিদের

ছাদ হতে তার উপর একটি সাপ পতিত হল। তিনি সাপটির মাথার উপর পা রেখে নিরবে বসে রইলেন। শান্তভাবে আল্লাহর যিকর আযকার করতে লাগলেন। সূর্যোদয়ের পর তিনি এ দোয়াটি পাঠ করলেন

الحمد لله الذى اطلعها من مطلعها اللهم ارزقنا خيرا وخير ما طلعت فيها *

এরপর তিনি সাপটি ফেলার নির্দেশ দিলেন। এশরাকের নামাযের পর ইমাম সাহেব এ ঘটনাকে সামনে রেখে একটি হাদীছ শুনালেন। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ফজরের নামাযের পর হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহর যিকর ব্যক্তিত কোন কথা না বলে সে যেন আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী।

এ ঘটনা দ্বারা বুঝা যায় হাদীছের মর্মানুসারে আমল করার ব্যাপারে ইমাম সাহেবের আকাঙ্ক্ষা কী পরিমাণ ছিল।

ইমাম সাহেবের মুজাহাদা, রিয়াযাত, তাহাজ্জুদ এবং রাত্রি জাগরণের ঘটনা জীবনীকারগণ এতবেশী উল্লেখ করেছেন যে, সেগুলো তাওয়াতুর বা বহুল বর্ণিত সংবাদে পর্যায় গিয়ে পৌঁছেছে। মুহাম্মদ বিন ইউসুফ সালেহী এবং মুজাম কিতাবের লিখক উল্লেখ করেন, ইমাম সাহেবের অধিক পরিমাণে রাত্রি জাগরণের কারণে তাকে ওতাদ (পেরেক) বলা হত। এ সম্পর্কে বিভিন্ন কিতাবে একটি চমৎকার ঘটনা বর্ণিত হয়ে আসছে। ইমাম সাহেবের মৃত্যুর পর তাঁর প্রতিবেশীর এক ছোট ছেলে পিতাকে জিজ্ঞাসা করল, আব্বাজান! আবু হানিফার ছাদে প্রতিরাত্রে যে স্তম্ভটি দেখতে পেতাম সেটি কেথায়? পিতা আদরের সাথে ছেলেকে বললেন, হৃদয়ের টুকরা! সেটি কোন স্তম্ভ ছিল না। সেটি ছিল শরীয়তের স্তম্ভ আবু হানিফা।

ইমাম সাহেবের রিয়াযাত এবং মুজাহাদা দেখে জনৈক ভক্ত একটি কবিতা বলে উঠলেন যার অর্থ হচ্ছে—

আবু হানিফার দিবস হচ্ছে অন্যকে উপকৃত করার জন্য। আর আবু হানিফার রাত্রি হচ্ছে আল্লাহর ইবাদতের জন্য।

খতীবে বাগদাদী ‘আবু মুহাম্মদ আল হারেছী’ আবু আব্দিল্লাহ বিন খসরু প্রমুখ মেসআর বিন কিদাম হতে তাঁর একটি উক্তি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর খিদমতে তাঁর মসজিদে উপস্থিত হলাম। দেখতে পেলাম যে, তিনি ফজরের নামায আদায় করে লোকজনকে ইলমে দ্বীন শিক্ষাদানে মশগুল হয়ে গেছেন। শিক্ষাদানের এ ধারা যোহরের

নামাযের সময় পর্যন্ত চলল। অতঃপর যোহরের নামাযের জন্য বিরতি দেয়া হল। যোহরের নামাযের পর আছর পর্যন্ত, আছর থেকে মাগরিব পর্যন্ত এবং মাগরিব থেকে এশা পর্যন্ত সেক্ষেত্রে বসে বসে তালীম দিতে রইলেন। এক নাগাড়ে ইলম শিক্ষা দানে ইমাম সাহেবের ব্যস্ততা দেখে আমি আশ্চর্যবিত্ত হলাম। তাঁর শিক্ষাদানের একাগ্রতা এবং মাসায়ের শিখানোর ব্যস্ততা যদি এরূপ হয় তবে তিনি কিতাব অধ্যয়ন করার জন্য এবং নফল ইবাদত করার জন্য সময় পান কখন? সুন্নত, নফল এবং মুস্তাহাব কাজগুলো কিভাবে আদায় করে থাকেন? আমি এরূপ চিন্তায় থাকতে থাকতেই লোকজন এশার নামায পড়ে চলে গেল। এরপর দেখতে পেলাম ইমাম সাহেব পরিষ্কার সাদা পোশাক পরিধান করে খুশবু লাগিয়ে মসজিদের এ কোণে এসে নামাযে দাঁড়িয়ে গেছেন। সোবহে সাদেক পর্যন্ত তিনি নামায পড়লেন। রাত্রি জাগরণ এবং ইবাদত রিয়াযত শেষে তিনি ঘরে প্রবেশ করলেন। এরপর যখন তিনি পুনঃবার আসলেন তখন তাঁর পোশাক পরিবর্তিত ছিল। ফজরের নামাজ জামাতের সহিত আদায় করলেন। এরপর পূর্বের মত তা'লীম এবং তাদরীসের কাজ শুরু হল। এশা পর্যন্ত তা চলল। আমি মনে মনে ভাবলাম, আজ রাত অবশ্যই তিনি বিশ্রাম করবেন। কারণ গত দিবস এবং রাত্রি পুরোটাই জাগ্রত ছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় রাত্রি আগের রাতের মত কাটিয়ে দিলেন। তৃতীয় রাত্রিও আগের রাতের মত অতিবাহিত করলেন। এরপর সিন্ধান্ত নিলাম যে, আমি আবু হানিফার শিষ্যত্ব এবং সঙ্গ ততক্ষণ পর্যন্ত ছাড়ব না যতক্ষণ না তাঁর কিংবা আমার মৃত্যু ঘটে। তাই আমি সেই মসজিদে অবস্থান করতে লাগলাম। সেখানে আমার অবস্থান কালে ইমাম সাহেবকে দিনে কখনো বে-রোজা এবং রাত্রে কখনো জাগ্রত ছাড়া দেখিনি। তবে যোহরের পূর্বে কিছুক্ষণ আরাম করে নিতেন। এটাই তার স্বাভাবিক নিয়ম ছিল।

ইবনে আবি মু'য়ায বর্ণনা করেন, মেস'য়ার বিন কিদাম বড়ই সৌভাগ্যবান। তার মৃত্যুও ইমাম সাহেবের মসজিদে সেজদার অবস্থায় হয়েছিল।

ইমাম সাহেবের মুনাজাত

ইয়াযীদ বিন কুমাইত বর্ণনা করেন, ইমাম সাহেব সর্বদাই আল্লাহর ভয়ে ভীত এবং পরকালের চিন্তায় চিন্তিত থাকতেন।

একবার আলী ইবনুল হুসাইন আল মুয়াজ্জেন আমাদেরকে এশার নামায পড়াইলেন। নামাযে তিনি সুরায়ে যিল্‌যাল তেলাওয়াত করলেন। আমাদের সাথে ইমাম আবু হানিফাও তার পিছনে নামায পড়ছিলেন। নামাজ শেষে লোকজন চলে গেলো। কিন্তু ইমাম সাহেব তাঁর জায়গায় বসে রইলেন। মনে

হলো তিনি পরকালের চিন্তা করছেন। আমি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। কিন্তু ইমাম সাহেব চিন্তায় নিমগ্ন থাকার কারণে আমি ভাবলাম ইমাম সাহেব আমার প্রতি লক্ষ্য করবে না। তাই আমি চলে গেলাম। অবশ্য বাতিটি রেখে গেলাম। তাতে তেল অপরিষ্কার ছিল। ফজরের সময় হলে আমি নিয়মানুসারে মসজিদে গেলাম। দেখতে পেলাম ইমাম সাহেব আল্লাহ তাআলার দরবারে দাঁড়িয়ে আছেন। স্বীয় দাড়ি হাত দ্বারা ধরে অনুনয় বিনয়ের সহিত কেঁদে কেটে দোয়া করছেন। বলছেন, হে আল্লাহ! যদি কেউ সামান্য পরিমাণও নেক কাজ করবে আপনি তাকে তার পুরা প্রতিদান দিবেন। আর যে কেউ অণু পরিমাণও পাপ করবে আপনি তাকে শাস্তি দিবেন। আপনার এ দুর্বল বান্দা নোমানকে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা করুন। ছোট বড় সকল খারাপ কাজ হতে বাঁচিয়ে রাখুন। আপনার রহমতের দরিয়ায় তাকে আশ্রয় দিন।

আলী ইবনে হুসাইন বলেন, আমি ইমাম সাহেবের নিকটবর্তী ছিলাম। দেখলাম যে, বাতিটি জ্বলছে আর ইমাম সাহেব দাঁড়িয়ে দোয়ায় মগ্ন রয়েছেন। আমাকে দেখে বললেন, বোধ হয় তুমি তোমার চেরাগ নিতে এসেছ। আমি আরজ করলাম, জানব! রাত অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। ফজরের আযানও দিয়ে দিয়েছে।

ইমাম সাহেব বুঝে গেলেন যে, সে আমার সমস্ত অবস্থা দেখে ফেলেছে। বড়ই মিনতির সাথে বললেন, তুমি যা দেখেছ তা গোপন রাখবে; কারো কাছে প্রকাশ করবে না।

অতঃপর ইমাম সাহেব নিজেকে সামলে নিয়ে দু' রাকাত নামায পড়ে মসজিদে বসে রইলেন। নামায শুরু হলে তিনি আমাদের সাথে নামায পড়লেন।

আমার বিশ্বাস, ইমাম সাহেব ফজরের নামায এশার অযু দ্বারা আদায় করেছেন।

ইলমের সাথে আমল প্রয়োজন

ইসলামের বিশিষ্ট ওলীদের মধ্যে দাউদ তায়ী অন্যতম। তিনি ইমাম সাহেবের প্রথম যুগের শিষ্য ছিলেন। তাঁর শিষ্যত্বে থেকে তিনি হাদীছ, ফিকাহ, তফসীর, কিরাত প্রভৃতি বিষয়ে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন।

একদিন ইমাম সাহেব তাকে বললেন, দাউদ! উপকরণ তো তোমার পরিপূর্ণ হয়েছে। দাউদ তায়ী আরয করলেন, কোন জিনিস বাকী রয়েছে কি?

ইমাম সাহেব বললেন, হাঁ, ইলম অনুযায়ী আমল করা বাকী রয়েছে।

ইমাম সাহেব এ কথা বলার সাথে সাথেই সেখান থেকে উঠে গিয়ে তিনি উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি চারশত দিরহামে বিক্রি করে দিয়ে দুনিয়াবী বামেলা হতে মুক্ত হয়ে যান। এরপর মানুষের সাথে খুব কমই মেলামেশা করতেন। একদিন ফোযায়েল বিন আয়ায তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে এলেন। দরজা খুললেন। ফোযায়েল বাইরে বসে কাঁদতে লাগলেন। দাউদ তায়ী-ভিতরে বসে ক্রন্দন করছিলেন। ফোযায়েল বললেন, যাব কোথায় আমি তো মানুষের তালাশ করছি। দাউদ তায়ী বললেন, জী হ্যাঁ এটাই সে হারানো বস্তু যা তালাশ করলেও পাওয়া যায় না।

মায়ের সেবা

ইমাম সাহেবের পিতামাতা বড়ই নেককার ছিলেন। ব্যবসার ব্যস্ততা সত্ত্বেও ধর্মীয় জীবন যাপন করতেন। আহলে ইলমদের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। পিতা ছাবেত বিন নোমান তাবেঈ ছিলেন। বাল্যকালে তিনি হযরত আলী (রাঃ)-এর যিয়ারত লাভ করেন এবং তাঁর দোয়াপ্রাপ্ত হন। হযরত আমর বিন হুরাইছ মাখযুমী (রাঃ)-এর বাড়ীতে তাঁর দোকান ছিল। সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর সাথে সাক্ষাত হত। তাঁর পুত্রকে নিয়ে তিনি হজ্জে যান এবং সেখানে পিতা-পুত্র উভয়ই হযরত আব্দুল্লাহ বিন হারেছ (রাঃ)-এর যিয়ারত লাভ করেন। ইমাম সাহেব তাঁর পিতামাতার খিদমতের জন্য সদা প্রস্তুত থাকতেন। তাঁদের ইন্তেকালের পর সদা তাঁদের জন্য দোয়া করতেন। তিনি বলেন, আমি আমার নেক আমলগুলোকে তিনভাগ করেছি। একভাগ নিজের জন্য, একভাগ পিতা-মাতার জন্য, আরেকভাগ আমার উস্তাদ হান্মাদের জন্য।

ইমাম সাহেবের পিতা আগে মারা যান। তাঁর মাতা পরে ১৩০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। এজন্য সেবা করার অধিক সুযোগ পেয়েছেন।

কাযী আবু ইউসুফ বলেন, ছাত্রজীবনে ইমাম সাহেব তাঁর মায়ের কোন কথা অমান্য করতেন না। এমন কি উমর বিন যরের মজলিসে যাওয়ার সময় তাঁর মাকে সওয়ারীর উপর বসিয়ে নিয়ে যেতেন। হাসান বিন যিয়াদ বর্ণনা করেন, একবার ইমাম সাহেবের মাতা কোন ব্যাপারে কসম করলেন এবং এ সম্পর্কে তাঁর ছেলের নিকট ফতোয়া জিজ্ঞেস করলেন। ইমাম সাহেব উত্তর দিলেন। কিন্তু এতে তিনি নিশ্চিত হলেন না। বললেন যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি যুরআর নিকট জিজ্ঞেস না করবে আমি নিশ্চিত হব না। ইমাম সাহেব তাঁর মাকে নিয়ে যুরআর

নিকট গেলেন। তাঁর মা নিজেই তাঁকে ফতোয়া জিজ্ঞেস করলেন। যুরআর আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন, কূফার ফকীহ আপনার সাথে আপনাকে কি ফতোয়া দিব। ইমাম সাহেব তাঁকে ফতোয়ার উত্তর জানিয়ে বললেন, আপনি এভাবে ফতোয়া দিন। তিনি তদুপই করলেন। ইমাম সাহেবের মাতা সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে এলেন।

কূফার আমীর ইয়াযীদ বিন উমর ফযারী ইমাম সাহেবকে কাযীর পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার প্রস্তাব দিলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। এতে ইয়াযীদ তাঁকে একশত দুররা মেরে শাস্তি দিল। তিনি বললেন, এ শাস্তিতে আমার তত কষ্ট হয়নি যতটুকু হয়েছিল এ ঘটনায় আমার মায়ের দুঃখ-কষ্ট এবং চিন্তার কারণে। মা বললেন, নোমান! যে ইলমের কারণে তোমার এ অবস্থা, তার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন কর। আমি বললাম, যদি এ ইলম দ্বারা দুনিয়া লাভ করতে চাইতাম তবে অনেক বেশী অর্জন করতে পারতাম। এ ইলম আমি শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি এবং নিজের নাজাতের জন্য অর্জন করেছি।

স্বভাব চরিত্র এবং ব্যক্তিগত জীবন

ইমাম সাহেব জন্মলাভ করেছিলেন এবং লালিত-পালিত হয়েছিলেন একটি ধনাঢ্য ব্যবসায়ী পরিবারে। প্রচুর সম্পদের মালিক ছিলেন। কিন্তু তিনি খুবই সাদাসিধাভাবে চলতেন। তিনি বলেন, চল্লিশ বছর পর্যন্ত আমার নিয়ম এই ছিল যে, প্রতি বছর চার হাজার দিরহাম আমার নিকট রাখতাম এবং অতিরিক্ত টাকা খরচ করে ফেলতাম। কারণ, হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, পারিবারিক ব্যয়ের জন্য সর্বোচ্চ চার হাজার দিরহামই যথেষ্ট। যদি আমার এ আশংকা না থাকত যে, নিজের প্রয়োজনের জন্য সম্পদশালীদের নিকট ধর্ণা দিতে হবে তাহলে একটি দিরহামও আমার নিকট রাখতাম না।

ফয়েয বিন মুহাম্মদ রাকী বলেন, একবার আমি বাগদাদে আবু হানিফার সাথে সাক্ষাৎ করে বললাম, আমি কূফায় যাওয়ার আশা করেছি। কোন সংবাদ থাকলে বলুন। ইমাম সাহেব বললেন, তুমি আমার ছেলে হান্নাদের সাথে সাক্ষাৎ করে আমার পক্ষ থেকে বলবে যে, আমার মাসিক ব্যয় দুই দিরহাম। কখনও ছাতু, কখনও রুটি খেয়ে কালাতিপাত করি। আর তুমি তাও পাঠাচ্ছ না। তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দাও।

অভাবগ্রস্ত উলামা, মুহাদ্দিছ এবং মাশায়েখদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য কিছু ব্যবসায়িক দ্রব্য বাগদাদে পাঠিয়ে দিতেন। সেগুলো ওখানে বিক্রয় করে

অন্য দ্রব্য কুফা হতে আনিয়ে নিতেন। যেগুলো তথায় বিক্রয় হত। সারা বছরের লাভ তিনি সংগ্রহ করে আহলে ইলমদের পিছনে ব্যয় করতেন এবং তাদেরকে বলতেন, আপনারা শুধুমাত্র আল্লাহর শোকর করবেন। কারণ আমি আমার পুঞ্জির কিছুই দেইনি। এসবই আপনাদের দ্রব্যের লাভ।

শরীক বলেন, ইমাম সাহেব নিজের সমস্ত ছাত্রের ব্যয় বহন করতেন, যেন তারা নিশ্চিত মনে তালীম হাসিল করতে পারে। লেখাপড়া শেষ হওয়া পর্যন্ত তাদের সন্তানদের ভাতা দিতেন। লেখাপড়া থেকে অবসর হলে তাদেরকে বলতেন, তোমরা হালাল হারামের পরিচয় লাভ করে গনীয়ে আকবার বা শ্রেষ্ঠ ধনী মর্যাদায় পৌঁছে গেছ।

হাসান বিন যিয়াদ লুলুঈ বর্ণনা করেন, ইমাম সাহেব শাগরেদদেরকে হীন অবস্থায় দেখলে দরসী মজলিস শেষে তাদের বসার নির্দেশ দিতেন। অতঃপর তাদেরকে আর্থিক সাহায্য করতেন। একদিন এক তালেবে ইলমের গায়ে পুরোনো ছেঁড়া জামা দেখে নিয়ম মারফিক তাকে বসতে বললেন। সবাই চলে গেলে তাকে বললেন, মুসাল্লা সরিয়ে দেখ, ওর নীচে মুদ্রা আছে সেগুলো নিয়ে নাও এবং নিজের অবস্থা পরিবর্তন কর। ঐ তালেবে-ইলম বলল, আমি ধনী ব্যক্তি। সুখ-সমৃদ্ধির মাঝেই কালাতিপাত করি। আমার এর প্রয়োজন নেই। ইমাম সাহেব বললেন, তোমার কি এই হাদীছ জানা নেই। আল্লাহ তাআলা আপন বান্দাদের মধ্যে তাঁর নিয়ামতের নিদর্শন দেখতে পছন্দ করেন। তুমি যদি ধনী ব্যক্তি হয়ে থাক তাহলে নিজের অবস্থা সংশোধন করে নাও, যাতে তোমার বন্ধুরা তোমার এ অবস্থা দেখে দুঃখিত না হয়।

কেউ ইমাম সাহেবের দরসী হালকার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সেখানে গিয়ে বসে যেত। ইমাম সাহেব তার অবস্থা জিজ্ঞেস করতেন। যদি অভাবগ্রস্ত হত তবে তার অভাব পূরণ করে দিতেন। যদি অসুস্থ হত তবে তার সেবা গুশ্মার জন্য যেতেন এবং তাকীদ করতেন, যেন সে সম্পর্ক বজায় রাখে।

একবার আব্বাসীয় খলীফা আবু জাফর মনসুর ইমাম সাহেবের নিকট ত্রিশ হাজার দিরহাম পেশ করলেন। তিনি বললেন, হে আমীরুল মুমেনীন! আমি বাগদাদ শহরে একজন অপরিচিত মুসাফির। এখানে এগুলো হিফায়ত করার জায়গা নেই। আপনিই এগুলো আমার নামে বাইতুল মালে রেখে দিন। আবু জাফর তাই করলেন। ইমাম সাহেব দুনিয়া ছেড়ে চলে গেলেন আর সেগুলো এভাবেই পড়ে রইল।

মুহাম্মদ বিন আদ্বির রহমান মাসউদী বলেন, আমি আবু হানিফা হতে

অধিক আমানতদার কাউকে দেখেনি। মৃত্যুর সময় তাঁর নিকট পঞ্চাশ হাজার দিরহাম মূল্যের জিনিসপত্র আমানত ছিল। তার থেকে একটি দিরহামও বিনষ্ট হয়নি।

কাযী আবু ইউসুফ বলেন, একদিন বৃষ্টি হচ্ছিল। আমরা ইমাম সাহেবের দরসী হালকায় তাঁর আশেপাশে বসা ছিলাম। উপস্থিতদের মধ্যে দাউদ তাঈ, কাসেম বিন মাআন, আফিয়া বিন ইয়াযীদ, ওকী বিন জাররাহ, মালেক বিন মগেওয়াল, যুফার বিন হুয়াইল প্রমুখ ছিলেন। ইমাম সাহেব আমাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা আমার হৃদয়ের আনন্দ, নয়নের আলো। আমি তোমাদেরকে দ্বীনের জ্ঞান দিয়ে এর যোগ্য করে তুলেছি। লোকেরা তোমাদের অনুসরণ করবে। তোমাদের প্রত্যেকেই কাযী হওয়ার যোগ্য। আমি আল্লাহ তাআলা এবং তোমাদের ইলমের দোহাই দিয়ে বলছি, বিনিময় ও মযদুরীর অপমান থেকে ইলমে দ্বীনকে রক্ষা করবে। একে জীবিকার মাধ্যম বানাতে না। তোমাদের কেউ যদি কাযী পদে অধিষ্ঠিত হয় এবং এ ব্যাপারে নিজের মধ্যে কোন ক্রটি অনুভব করে যেটা সম্পর্কে জনসাধারণ অবগত নয় তবে তার জন্য এ পদে থাকা বৈধ হবে না। আর যদি বাধ্য হয়ে সে পদে যেতেই হয় তবে সর্বসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবে না। সবার মহল্লার মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়বে। তাদের দ্বীনি প্রয়োজন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। যদি অসুস্থ হয়ে পড় এবং বিচারের মজলিসে উপস্থিত না হও তবে অনুপস্থিত দিনের ওযীফা নিবে না।

যে ব্যক্তি কোন বিচারে বে-ইনসাফী করবে, তার সে বিচার গ্রহণযোগ্য হবে না।

ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর জীবনের প্রতিটি দিক এমন আকর্ষণীয় ছিল যে, প্রত্যেক শ্রেণীর লোকেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হত। উলামা, উমারা এবং সাধারণ শ্রেণীর লোক প্রত্যেকেই তাঁর বশ্য ছিল। ফলে পৃথিবীর পুরাতন ধারা মতেই তাঁর পরশ্রীকাতর এবং তাঁর অমঙ্গলকামীরা তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রকার অপবাদ গড়তে লাগল। ইমামগণের কারও বিরুদ্ধে হিংসা-বিদ্বেষ এবং শত্রুতার এত বড় তুফান উঠেনি যা উঠেছিল ইমাম সাহেবের বিরুদ্ধে। এর ধারা আজও বাকী আছে। তাঁর বদনাম গেয়ে আমলনামা কালো করার মত ব্যক্তি বর্তমানেও আছে। এসব হিংসুক অমঙ্গলকামীদের প্রতি উত্তরে তিনি সব সময় দোয়া দিতেন এবং ক্ষমা প্রদর্শন করতেন।

ইউসুফ বিন খালেদ যখন ইমাম সাহেব থেকে শিক্ষা সমাপন করে বসরা

ফেরৎ যাচ্ছিলেন, তখন তাকে এ উপদেশ দিলেন যে, বসরায় পূর্ব থেকেই আহলে ইলমদের এক জমাত রয়েছে, যারা ইলমী এবং ধ্বনি বিষয়ে নেতৃত্বের অধিকারী। কাজেই তুমি স্বীয় দরসী হালকা কায়ম করার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করোনা। আর 'আবু হানিফার উক্তি এরূপ' এ কথাও বলো না। নচেৎ তোমাকে অতিশীঘ্রই দরসী হালকা থেকে উঠে যেতে হবে। কিন্তু ইউসুফ বিন খালেদ বসরায় পৌঁছেই স্বীয় দরসী হালকা প্রতিষ্ঠা করে ফেললেন এবং 'আবু হানিফা এরূপ বলেছেন' 'এটা আবু হানিফার উক্তি' এসব বলতে শুরু করলেন। ফলে ইউসুফ বিন খালেদকে মসজিদ থেকে বের হয়ে যেতে হল। এরপর যুফার বিন হুযাইল বসরায় গেলেন এবং তিনি ইমাম সাহেবের পরামর্শ অনুসারে দরসী হালকা প্রতিষ্ঠা না করে বসরার উলামা এবং মাশায়েখদের মজলিসে বসতে লাগলেন। তিনি তাদের মত এবং রায়ের সমর্থনে এমন সব দলীল পেশ করতেন, যেগুলো সম্পর্কে তারা অবগত ছিল না। এ কারণে তাঁরাও আনন্দিত হতেন। এরপর যুফার তাদেরকে বলতেন, এর চেয়েও উত্তম একটি মত আছে। আর সেটাকে দলীল প্রমাণসহ উপস্থাপন করতেন। সে মতটি তাদের অন্তরে বসে গেলে বলতেন, এটা আবু হানিফার মত। তারা এর উত্তরে বলতেন।

অর্থাৎ 'এটি একটি উত্তম মত। কে বলেছে তা নিয়ে আমরা ভাবি না।' এত সর্তকতা সত্ত্বেও ইমাম সাহেব সারাজীবন হিংসা সহ্য করে গেলেন এবং এভাবে স্বীয় অন্তরকে পরিস্কার রাখার সাথে সাথে হিংসুকদেরকে এ বলে দোয়া দিতেন।

হে আল্লাহ! যার অন্তর আমাদের কারণে সংকীর্ণ আমাদের অন্তর যেন তাদের কারণে প্রশস্ত থাকে।

ইমাম সাহেব এটাও বলতেন, যে ব্যক্তি আমাকে হিংসা করে আল্লাহ তাআলা তাকে মুফতি বানিয়ে দিন।

এক ব্যক্তি ইমাম সাহেবের নিকট এসে বললেন, সুফিয়ান ছাওরী আপনার সম্পর্কে অসমীচীন কথা বলেন না। তিনি তার উত্তরে বললেন, আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করুন।

ইয়াযীদ বিন কুমাইত বলেন, এক ব্যক্তি আমার সামনে ইমাম সাহেবের কুৎসা বর্ণনা করল এবং তাকে যিন্দীক বলে গালি দিল। ইমাম সাহেব বললেন, আল্লাহ তোমাকে মাফ করুন। তিনি ভালভাবেই জানেন, আমি তা নই যা তুমি বলছ।

আব্দুর রায়্যাক সানআনী বর্ণনা করেন, আমি আবু হানিফা হতে অধিক

সহনশীল রুটকে দেখিনি। আমরা মসজিদে খায়ফে বসাছিলাম। বসরার এক হাজী ইমাম সাহেবকে একটি মাসয়ালা জিজ্ঞেস করলেন। তিনি উত্তর দিলেন। সে বলল, এ মাসয়ালায় হাসান বসরী এরূপ বলেন। ইমাম সাহেব বললেন, হাসান বসরী ভুল করেছে। এ কথা শুনে সেখানে উপস্থিত একব্যক্তি ইমাম সাহেবকে খুবই খারাপ গালি দিতে লাগল এবং বলল, তুমি বলছ হাসান বসরী ভুল করেছেন।

এ অবস্থা দেখে অন্যান্যরা তাকে প্রহার করার জন্য এগিয়ে আসল। কিন্তু ইমাম সাহেব সবাইকে বারণ করলেন এবং বললেন, হ্যাঁ হাসান বসরী এ মাসয়ালায় ভুল করেছেন। আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহীহ হাদীছ রেওয়াজেত করেছেন যা আমার বক্তব্যের সমর্থন করে।

ইমাম সাহেব কুফার জামে মসজিদে পড়াচ্ছিলেন। একব্যক্তি মসজিদের কিনারায় দাঁড়িয়ে ইমাম সাহেবকে মন্দ বলতে লাগল। তিনি সবকিছু শুনছিলেন এবং পড়াচ্ছিলেন। শাগরেদদেরকেও কথা বলতে নিষেধ করে দিলেন। পড়ানো শেষে ইমাম সাহেব মসজিদ থেকে বের হলে সে ব্যক্তিও ইমাম সাহেবের পিছু নিল। ইমাম সাহেব বাড়ীর দরওয়াহজায় পৌঁছে তাকে বললেন, এটা আমার ঘর। তোমার কথা যদি এখনো শেষ না হয়ে থাকে তবে ভিতরে এসে পুরো করে যাও। ভয়ের কিছুই নেই। এই কথা শুনে সে ব্যক্তি লজ্জিত হয়ে ফিরে গেল।

ইমাম সাহেবের মেধা, তীক্ষ্ণজ্ঞান ও অনুভূতি

ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) জ্ঞান, বুদ্ধি, বিচক্ষণতা, মেধা অনুভূতি ইত্যাদিগুণে তাঁর সমকালীনদের মধ্যে শীর্ষে ছিলেন। ফিরাসতে মু'মিন তথা মুমিনের অন্তর্দৃষ্টির এক বিরাট অংশ তিনি পেয়েছেন। ইমাম যাহাবী লিখেন, ইমাম আবু হানিফা অত্যন্ত প্রতিভাবান ব্যক্তি ছিলেন।

মুহাম্মদ বিন আব্দিল্লাহ আনসারী থেকে খতীব বাগদাদী বর্ণনা করেন, আবু হানিফার চালচলন এবং কথাবার্তা থেকে তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা প্রকাশ পায়।

আলী বিন আসেম বলেন, যদি আবু হানিফার জ্ঞান জগৎবাসীদের অর্ধেকের জ্ঞানের সাথে মাপা হয় তবে তাঁর জ্ঞানের পাল্লা ভারি হবে।

তবীয়া নামক ইমাম সাহেবের এক শাগরেদ বর্ণনা করেন, ইমাম সাহেব

আমাকে বললেন, যখন আমি রাস্তায় চলি অথবা কারও সাথে কথাবার্তা বলি, অথবা দাঁড়িয়ে থাকি কিংবা হেলান দিয়ে থাকি, এমতাবস্থায় আমাকে দ্বীনি বিষয়ে কোন কিছু জিজ্ঞেস করো না। কারণ এ সময় মানুষের বুদ্ধি স্থিতিশীল থাকে না। পরে একদিন আমি ইমাম সাহেবের সাথে পথ চলাকালে ইলমী প্রেরণার বশীভূত হয়ে তাঁকে বিভিন্ন প্রশ্ন করে তার উত্তর লিখে রাখলাম। পরদিন শিক্ষা মজলিসে সবাই উপস্থিত হলে আমি পূর্বদিনের প্রশ্নগুলো শুনাতে শুরু করলাম। কিন্তু আজ ইমাম সাহেব গতকালের উত্তরগুলোকে ভুল বলে দিলেন এবং বললেন, আমি কি তোমাকে এ কথা বলিনি যে, অমুক অমুক সময়ে আমাকে প্রশ্ন করবে না?

ইমাম সাহেব-এর মেধা, জ্ঞান এবং তাৎক্ষণিক-বুদ্ধির কয়েকটি দৃষ্টান্ত

কূফার এক ব্যক্তি হযরত উছমান (রাঃ)-কে ইয়াহুদী বলত (নাউযুবিল্লাহ)। একদিন ইমাম সাহেব তার নিকট গিয়ে বললেন, আমি তোমার মেয়ের বিবাহের পয়গাম নিয়ে এসেছি। ছেলে একান্তই ভদ্র, সম্পদশালী, হাফেযে কোরআন, দানশীল, খোদাভীরু, নামায রোযার পাবন্দ। সে বলল, আমি তো এর চেয়েও কম মর্যাদাশীল পাত্রে মেয়ে দিতে রাজী। এ পাত্র তো খুবই ভাল। ইমাম সাহেব বললেন, কিন্তু একটি কথা হলো ছেলেটি ইয়াহুদী। এ কথা শুনেই সে কঠোরভাবে অস্বীকৃতি জানালো। সে বলল, একজন ইয়াহুদীর সঙ্গে আপনি আমার মেয়ের বিবাহ দিতে চান? ইমাম সাহেব উত্তরে বললেন, তোমার ধারণায় রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দুজন কন্যার বিবাহ একজন ইয়াহুদীর সাথে দিয়েছিলেন কি? এ কথা শুনেই সে বলল, আসতাগফিরুল্লাহ! আমি তওবা করছি। আর কখনও এমন কথা বলব না।

খলীফা আবু জাফর মনসুর একবার হজ্জের সময় মসজিদে হারামের সংকীর্ণতা দেখে তা প্রশস্ত করার ইচ্ছা করলেন। আশেপাশের ঘরগুলোকে হারামের সাথে মিলানোর জন্য সেগুলোর মালিকদেরকে অর্থ দিতে চাইলেন। কিন্তু কোন মতেই হারামের পড়শ ছেড়ে যেতে রাযী হলেন না। আবু জাফর মনসুর বড়ই চিন্তিত হলেন। জোরপূর্বকও তা দখল করে নেয়া যায় না। ঐ বৎসর আবু হানিফাও হজ্জে গিয়েছিলেন। লোকেরা তা জানতে পারেনি। আর তখনও তিনি মুফতী এবং ফকীহ হিসাবে প্রসিদ্ধ ও পরিচিত হননি। ইমাম সাহেব এ ঘটনা জানতে পেরে স্বয়ং আবু জাফরের নিকট গেলেন এবং বললেন, এটা খুবই সহজ ব্যাপার। আমীরুল মুমেনীন! ঘরের মালিকদের ডেকে জিজ্ঞেস

করুন যে, কাবা তোমাদের প্রতিবেশী হিসাবে এসেছে, না তোমরা তার পাশে এসে বসতি স্থাপন করেছ? যদি তারা বলে, কাবা আমাদের প্রতিবেশী হয়ে এসেছে তবে তা মিথ্যা। আর যদি বলে, আমরা তার নিকট এসে বসতি স্থাপন করেছি; তবে তাদেরকে বলা হবে যে, যিয়ারতকারী এবং হাজীদের সংখ্যা বেড়ে গেছে। মেহমানদের তুলনায় তার আঙ্গিনা ছোট হয়ে গেছে। আর সে নিজের সম্মুখস্থ ময়দানের অধিক হকদার। অতএব তার জন্য তার নিজের জায়গা খালী করে দাও। আবু জাফর ইমাম সাহেবের পরামর্শ অনুযায়ী বাড়ীর মালিকদের ডেকে এ কথাই বললেন। হাশেমী প্রতিনিধিরা স্বীকার করলেন যে, আমরাই কাবার নিকট এসে বসতি স্থাপন করেছি। এরপর সবাই নিজ নিজ বাড়ী বিক্রয় করতে রাজী হয়ে গেলেন।

আব্দুল্লাহ বিন মুবারক ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, পাত্রের গোশত পাকানো হচ্ছিল। এমতাবস্থায় তাতে একটি পাখী পড়ে মারা গেল। এ ব্যাপারে আপনি কি বলেন? ইমাম সাহেব তাঁর শাগরেদদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা এ মাসয়ালার ব্যাপারে কি রায় দাও? তাঁরা হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদের একটি হাদীছ উল্লেখ করলেন, যার মর্মমতে শোরবা ফেলে দিয়ে গোশত ধুয়ে খাওয়া যাবে। ইমাম সাহেব বললেন, আমিও তাই বলি। তবে যদি পাখী ফুটন্ত পানিতে পড়ে থাকে তবে গোশত এবং শোরবা দুটোই ফেলে দিতে হবে। আর যদি ঠাণ্ডা হবার পর পড়ে থাকে তবে শোরবা ফেলে দিতে হবে এবং গোশত পরিষ্কার করে খাওয়া যাবে। আব্দুল্লাহ বিন মুবারক এর কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন, পাত্রের পানি ফোটাকালে পাখী পড়লে তা মশল্লার মতই গোশতের সাথে মিশে যাবে এবং ক্রিয়া ভিতরে ছড়িয়ে পড়বে। কিন্তু ঠাণ্ডা থাকাকালে পড়লে গোশতের সাথে লেগে যাবে কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করবে না। এ কথা শুনে ইবনে মুবারক বললেন, এটা অতি মূল্যবান কথা।

এক ব্যক্তি ইমাম সাহেবের নিকট এসে বলল, আমি ঘরে কোন একটি বস্তু মাটিতে পুঁতে রেখেছিলাম। এখন ঐ জায়গা ভুলে গিয়েছি। ইমাম সাহেব বললেন, তোমার জানা নেই তো আমি বলব কিভাবে? অতঃপর শাগরেদদেরকে নিয়ে তার বাড়ীতে গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কাপড়-চোপড় কোথায় রাখ? সে স্থান দেখিয়ে দিলে ইমাম সাহেব শাগরেদদেরকে নিয়ে সেখানে গেলেন এবং তাদেরকে বললেন, তোমরা এ ঘরে কোন জিনিস পুঁতে রাখলে কোথায় রাখতে? পাঁচজন তালেবে ইলম নিজ নিজ জায়গা চিহ্নিত করল। ইমাম সাহেব সে জায়গাগুলো খনন করতে নির্দেশ দিলেন। তৃতীয় জায়গা খনন

করার সময় উক্ত জিনিস পাওয়া গেল।

তদূপ অন্য একব্যক্তি ইমাম সাহেবকে তার পুঁতে রাখা বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এটা ফিকাহর কোন মাসয়ালা নয় যে, আমি তোমাকে জানাব। যাও; সারারাত নামায পড়। তোমার জিনিস মিলে যাবে। সে ব্যক্তি তাই করল। রাত্রের এক চতুর্থাংশ অতিবাহিত হতে না হতেই স্বরণ হয়ে গেল। সে ব্যক্তি ইমাম সাহেবের নিকট এসে ঘটনা বর্ণনা করল। তিনি বললেন, আমার জানা ছিল যে, শয়তান তোমাকে সারারাত নামায পড়তে দিবে না। আফসোস! তুমি যদি আল্লাহর শোকর আদায় করে সারারাত নামায পড়তে।

ইমাম সাহেবের দরসী হালকার সম্মুখ দিয়ে একব্যক্তি যাচ্ছিল। তিনি বললেন, এ ব্যক্তি এখানে নতুন এসেছে, তার আস্তিনে মিষ্টি লেগে আছে, আর এ ব্যক্তি বাচ্চাদের মুআল্লিম। এক শাগরেদ তার পিছে পিছে গিয়ে যাচাই করে দেখল যে, তিনটিই ঠিক। শাগরেদরা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এ ব্যক্তি পথ চলার সময় ডানে বাঁয়ে দেখছিল। অপরিচিত ব্যক্তি এরূপই করে থাকে। তার আস্তিনে মাছি বসা ছিল; এতে বুঝলাম যে, সেখানে মিষ্টি লেগে আছে। আর ঐ ব্যক্তি বাচ্চাদের দিকে দেখছিল, এতে অনুমান করলাম যে, সে মুআল্লিম।

একদিন কতক লোক ইমামের পিছনে কিরআত সম্পর্কে তর্ক করার জন্য ইমাম সাহেবের নিকট সমবেত হল। ইমাম সাহেব বললেন, আমি এত লোকের সাথে একা কিভাবে কথা বলব। সবার পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত করে দিলে তার সাথে আলোচনা করব। সবাই এতে সম্মত হয়ে একজনকে নির্বাচিত করে দিলে তিনি বললেন, তোমাদের সাথে আমার তর্ক শেষ। যেভাবে সবার পক্ষ থেকে তোমরা একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত করে দিলে, নামাযেও ঠিক তাই হয়। মুক্তাদীদের পক্ষ হতে ইমাম প্রতিনিধি হন।

একবার খারেজীদের নেতা যাহ্‌হাক ইমাম সাহেবের নিকট এসে তলোয়ার উঁচিয়ে বলল, আপনি তওবা করুন। ইমাম সাহেব বললেন, কোন্‌ কথা থেকে। সে বলল, এ আকীদা হতে যে, হযরত আলী এবং হযরত মু'আবিয়া (রাঃ)-এর বিবাদ মিটানোর জন্য তৃতীয় ব্যক্তিকে সালিশ মানা হয়েছে। কারণ যদি তিনি সত্যের উপর থেকে থাকেন তাহলে তৃতীয় ব্যক্তিকে মানার অর্থ কি? ইমাম সাহেব বললেন, আমার কিছু বলার অনুমতি আছে কি? সে বলল, হ্যাঁ আমি তর্কই চাই। ইমাম সাহেব বললেন, যদি তর্কের মাধ্যমে আমরা সিদ্ধান্তে পৌছতে না পারি তবে কি হবে? সে বলল, জয় পরাজয় নির্ধারণ করে দেয়ার

দ্বিতীয় ব্যক্তিকে সাব্যস্ত করে নিব। অতঃপর সে নিজেই নিজদল থেকে একজনকে সাব্যস্ত করে নিল। ইমাম সাহেব বললেন, এ কাজটিই তো হযরত আলী (রাঃ) করেছিলেন। তাঁকে কিভাবে দোষারোপ করা যায়? এ কথা শুনে ঠাহ্যক স্তব্ধ হয়ে গেল।

একদিন ইমাম সাহেব, সুফিয়ান ছাওরী, ইবনে আবি লায়লা প্রমুখ একটি মজলিসে বসা ছিলেন। একব্যক্তি এসে এ মাসয়ালাটি জিজ্ঞেস করল যে, এক স্থানে কতক লোক বসা ছিল। হঠাৎ একটি সাপ একজনের গায়ে এসে পড়ল। সে আত্মরক্ষার্থে সাপটিকে নিক্ষেপ করল। তা আরেকজনের উপর গিয়ে পড়ল। সেও তদুপ করল। এভাবে কয়েকজনের পর একজনকে সাপটি দংশন করলে সে মারা গেল। এখন এর দিয়াত (রক্তপণ) কার উপর ওয়াজিব হবে? উত্তরে কেহ বললেন, দিয়াত সবাইকে দিতে হবে। আবার কেহ বললেন, প্রথমজনকে দিতে হবে। প্রত্যেকেই ভিন্নমত প্রকাশ করল। পরিশেষে সবাই ইমাম সাহেবকে তাঁর মত জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, প্রথম ব্যক্তি তার দেহ হতে সাপ নিক্ষেপ করার পর দ্বিতীয় ব্যক্তি যখন তার দেহ হতে সাপ নিক্ষেপ করে বেঁচে গেল, তখন প্রথম ব্যক্তি অপরাধ হতে মুক্ত হল। এভাবে প্রত্যেকেই মুক্ত হল। বাকী রইল যার নিক্ষেপের পর শেষ ব্যক্তি মারা গেল। এখন দেখতে হবে যদি তার সাপ নিক্ষেপের সাথে সাথেই তাকে দংশন করে থাকে তবে দিয়াত দিতে হবে। আর যদি সাথে সাথে দংশন না করে থাকে বরং কিছুক্ষণ পরে করে থাকে, তবে তার দিয়াত দিতে হবে না। কারণ সে তার অলসতার কারণে মারা গেছে। ইমাম সাহেবের এ মতে সবাই একমত হলেন।

একবার তৎকালীন খলীফা স্বপ্নে মালাকুল মউতকে দেখে তার হায়াত কতদিন আছে জানতে চাইলে তিনি পাঁচ আঙ্গুল দ্বারা ইঙ্গিত করলেন। পরদিন এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা বিভিন্নজনকে জিজ্ঞেস করা হল। কিন্তু কেউ এর ব্যাখ্যা দিতে পারলেন না। পরে ইমাম সাহেবকে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, পাঁচ আঙ্গুল দ্বারা সে পাঁচটি ইলমের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যেগুলো আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। অর্থাৎ ১। কিয়ামত কখন হবে ২। বৃষ্টি কখন হবে ৩। গর্ভের সন্তান কেমন হবে ৪। কে আগামীকাল কি আয় করবে ৫। কে গোথায় মারা যাবে।

একবার বাগদাদের ইয়াহুদী ইমাম সাহেবের নিকট এসে তাঁকে অনেক প্রশ্ন করল। তিনি সব কয়টি প্রশ্নের উত্তর দিলেন। তন্মধ্যে একটি প্রশ্ন এটা ছিল, এ দুনিয়ায় কোন শহরে ষাটটি মহল্লা আছে যার ত্রিশটি উজ্জল ত্রিশটি অন্ধকার।

অন্ধকার মহল্লার মধ্যে একটি মহল্লা এমন রয়েছে যা হাজার মহল্লা হতে উত্তম। ইমাম সাহেব উত্তরে বললেন, শহরটি হল রমযান শরীফের মাস। ষাটটি মহল্লা হল ত্রিশদিন এবং ত্রিশরাত। রাত্রি অন্ধকার আর দিন উজ্জ্বল। রাত্রিগুলোর মধ্যে একটি রাত হাজার রাত হতে উত্তম। সেটি হচ্ছে লাইলাতুল কদর। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন ‘লাইলাতুল কদর সহস্র রজনী হতে উত্তম।’

একদিন ইমাম আবু হানিফা খলীফা মনসুরের দরবারে উপস্থিত হলেন। সেখানে খলীফার পেশকার রবী উপস্থিত ছিল। সে বলল, এ ব্যক্তি আমীরুল মুমেনীনের দাদা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাসের বিরোধীতা করে। কারণ তাঁর কথা ছিল, কোন ব্যক্তি যদি কোন বিষয়ে কসম করে একদিন পরও ‘ইনশাআল্লাহ’ বলে তা কসমের সাথে গণ্য হবে, তার কসম পূরণ করতে হবে না। আর এ ব্যক্তি বলেছে, কসমের সাথে সাথেই যদি ‘ইনশাআল্লাহ’ বলা হয় তবে তা কসমের সাথে গণ্য হবে নচেৎ কসমের সাথে গণ্য হবে না।

ইমাম সাহেব বললেন, আমীরুল মুমেনীন! রবীর ধারণামতে আপনি লোকদের যে বায়য়াত নিয়েছেন, তার কোন মূল্য নেই। কারণ লোকেরা দরবারে বায়য়াত করে বাড়ী গিয়ে যদি ইনশাআল্লাহ বলে তবে রবীর ধারণা মতে এ বায়য়াত অর্থহীন হয়ে যাবে। খলীফা-মুদু হেসে বললেন, আবু হানিফার মাথা আনতে তোমার অস্ত্র চলতে পারে না। দরবার হতে বের হয়ে রবী বলল, আপনি আজ আমার জীবন নাশ করে ফেলছিলেন। ইমাম সাহেব বললেন, এটা তোমার ইচ্ছা ছিল। আমি শুধু তা প্রতিহত করেছি।

একদিন ইমাম সাহেব মসজিদে বসা ছিলেন। এমন সময় খারেজীদের একদল মসজিদে প্রবেশ করল। লোকেরা ভয়ে পলায়ন করতে চাইল। ইমাম সাহেব তাদের শান্তনা দিয়ে বসিয়ে রাখলেন। খারেজীদের দলনেতা ইমাম সাহেবের নিকট এসে বলল, আপনি কে? তিনি বললেন, আমি আশ্রয় প্রার্থনাকারী। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ‘মুশরেকীনদের থেকে যদি কোন ব্যক্তি আশ্রয় প্রার্থনা করে তবে তাকে আশ্রয় দিও, যেন সে আল্লাহর কলাম্ব শুনতে পারে। অতঃপর তাকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়ে দিও।’ খারেজীদের ধারণা ছিল শুধুমাত্র তারাই মুসলমান, অন্য সবাই কাফির মুশরিক। তাদেরকে হত্যা করা ওয়াজিব। এখানে ইমাম সাহেবকে পরীক্ষা করার জন্য এসেছিল। কিন্তু ইমাম সাহেবের উত্তর তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করে দিল। তাদের দলনেতা তাদেরকে আদেশ করল ‘তোমরা তাদেরকে কোরআন শুনো। অতঃপর বাড়ী পৌঁছিয়ে দাও।’

একবার জনৈক খ্রীষ্টান পাদরী বাগদাদ এসে ঘোষণা করল যে, যে ব্যক্তি তার চারটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে সে তার ধর্ম গ্রহণ করবে। এতে তার চারিদিকে অনেক লোক জমায়েত হয়ে গেল। সে পথে ইমাম সাহেবও যাচ্ছিলেন। তিনি ব্যাপারটা জানতে পেরে পাদরীর নিকট এসে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার প্রশ্ন চারটি কি কি? পাদরী বলল, আপনি কি উত্তর দিবেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ! অতঃপর বললেন, আমি উত্তরদাতা আর তুমি প্রশ্নকারী। আর প্রশ্নকারী হতে উত্তরদাতা উত্তম। তাই তোমার উচিত নীচে নেমে এসে আমাকে তোমার স্থানে বসতে দেয়া। সে তাই করল। ইমাম সাহেব আসনে বসে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল, আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, এখন আল্লাহ কি করেন? ইমাম সাহেব উত্তরে বললেন, এখন আল্লাহ তাআলা তোমার মত পাদরীকে নীচে নামিয়ে আমার মত নগণ্য লোককে উপরে উঠালেন। আমাকে সম্মানিত করলেন আর তোমাকে অসম্মানিত করলেন। এ উত্তর শুনে পাদরী চূপ হয়ে গেল। ইমাম সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন কি? পাদরী বলল, আল্লাহর পূর্বে কি ছিল? ইমাম সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, তুমি গণনা জান কি? সে বলল, হ্যাঁ! ইমাম সাহেব বললেন, গণনা কর। সে এক, দুই থেকে দশ পর্যন্ত গণনা করল। ইমাম সাহেব বললেন, এবার উলটো দিকে গণনা কর। সে দশ, নয় থেকে এক পর্যন্ত গণনা করল। ইমাম সাহেব বললেন, এরপর আরও গণনা কর। সে বলল, এক এর পূর্বে আর কোন সংখ্যা নেই যে গণনা করব। ইমাম সাহেব বললেন, এ সংখ্যাগুলো সৃষ্ট। তা সত্ত্বেও এক এর পূর্বে কোন সংখ্যা আছে কিনা বলতে পারছ না। আল্লাহ তাআলা স্রষ্টা, সত্যিকারের একক, তাঁর পূর্বে তো কিছুই থাকতে বা হতে পারে না। এ উত্তর শুনে পাদরী নিরব হয়ে গেল। ইমাম সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, তোমার তৃতীয় প্রশ্ন কি? সে বলল, আল্লাহর মুখ এখন কোন দিকে? ইমাম সাহেব বললেন, মোমবাতি জ্বালানোর পর তার আলোর মুখ কোনদিকে থাকে? পাদরী বলল, আমি বলতে পারব না। ইমাম সাহেব বললেন, 'ধ্বংসপ্রাপ্ত মোমবাতির আলোর মুখ সম্পর্কে যখন অজ্ঞ, তখন অনাদি অনন্ত আল্লাহ তাআলার মুখ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা মূর্খতা নয় কি? এ উত্তরে পাদরী স্তব্ধ হয়ে গেল। ইমাম সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, তোমার চতুর্থ প্রশ্ন কি? সে বলল, এখন আল্লাহ কোথায় আছেন? ইমাম সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি বলতে পার তোমার রুহ দেহের কোথায় আছে? সে বলল, না। ইমাম সাহেব বললেন, রুহ সৃষ্ট। তা কোথায় আছে যখন তুমি বলতে পারছ না। তখন স্রষ্টা আল্লাহ কোথায় আছেন তা কিভাবে বলা যেতে পারে? পাদরী এ কথা শুনে চূপ হয়ে গেল এবং সর্বান্তকরণে মুসলমান হয়ে গেল।

ইবনে মুবারক (রহঃ) বর্ণনা করেন, আমি ইমাম সাহেবকে একটি মাসয়ালার সমাধান জিজ্ঞাসা করলাম। মাসয়লাটি ছিল এরূপ, এক ব্যক্তির দুই দিরহামের সাথে অন্য ব্যক্তির একটি দিরহাম মিলে গেল। অতঃপর সে তিন দিরহাম হতে দুই দিরহাম হারিয়ে গেল। কিন্তু সে দুই দিরহাম কোনগুলো ছিল তা জানা গেল না- এখন অবশিষ্ট এক দিরহাম কার হবে?

ইমাম সাহেব উত্তর দিলেন, অবশিষ্ট এক দিরহাম তিনভাগ করে একভাগ এক দিরহাম যার ছিল তাকে দিবে এবং দুই ভাগ দুই দিরহামওয়ালাকে দিবে।

ইবনে মুবারক বলেন, এরপর আমি ইবনে শুবরুমার সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে এ মাসয়লাটিই জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, এর পূর্বেও এই সম্বন্ধে কাউকে জিজ্ঞাসা করেছ? আমি আরজ করলাম, হ্যাঁ, ইমাম আবু হানিফাকে জিজ্ঞাসা করেছি। মাসয়ালার বিবরণ তাঁর নিকট পেশ করলাম। তিনি বললেন, সঠিক উত্তর দেওয়ার ব্যাপারে এ ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা হতে ভুল হয়ে গেছে। অতঃপর মাসয়লাটি স্পষ্ট করার জন্য তিনি বললেন, যে দুই দিরহাম হারিয়ে গেছে তন্মধ্যে হতে এক দিরহামের ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, সেটি দুই দিরহামওয়ালার ছিল। তাই বলা যেতে পারে হারানো দুই দিরহামের অবশিষ্ট দিরহাম উভয়ের। কাজেই অবশিষ্ট এক দিরহাম উভয়ের মধ্যে সমান ভাগে বন্টন করা হবে।

ইবনে মুবারক বলেন, আমার নিকট এ উত্তরটি পছন্দ হলো। এরপর ইমাম সাহেবের সাথে আমার সাক্ষাৎ হলো। ইনিই তো সেই ইমাম যার জ্ঞান অর্ধেক দুনিয়াবাসীর জ্ঞানের বিপরীত পাল্লায় যদি রাখা যায় তবে তাঁর পাল্লাই ভারী হবে। তিনি আমাকে বললেন, ইবনে শুবরুমার সাথে তোমার সাক্ষাৎ হয়েছে। তোমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি এরূপ উত্তর দিয়েছেন যে অবশিষ্ট এক দিরহাম উভয়ের মাঝে সমানভাবে ভাগ হবে। আমি বললাম, আপনি ঠিক বলেছেন।

তখন ইমাম সাহেব বললেন, ভাই! ব্যাপারটা এরূপ নয়। মূলত ব্যাপারটি হল যখন উভয় পক্ষ হতে তিন দিরহাম পরস্পরে মিলে গেল তখন প্রত্যেকটি দিরহাম উভয়ের দিরহামের সংখ্যানুপাতে উভয়ের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। কাজেই প্রত্যেকটি দিরহামে দুই দিরহামওয়ালার অংশ হবে তিনভাগের দুই ভাগ। আর এক দিরহামওয়ালার হবে তিন ভাগের একভাগ। তাই দুই দিরহাম হারানোর ফলে তাদের অংশ হিসাবে হারিয়েছে বলে গণ্য করা হবে। আর অবশিষ্ট দিরহাম তাদের অংশীদারিত্বের অংশ হিসাবে বাকী রয়েছে বলে ধরা হবে। কাজেই যার দুই দিরহাম ছিল সে পাবে তিন ভাগের দুই ভাগ। আর

যার এক দিরহাম ছিল সে পাবে এক ভাগ।

কাজী শরীক বর্ণনা করেন, একবার ঘটনাক্রমে বনী হাশেমের এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সন্তানের জানাযায় সুফিয়ান ছাওরী, ইবনে শুবরুমা, কাজী ইবনে আবি লায়লা, আবুল আহওয়াছ, হাব্বান এবং ইমাম আযম একত্রিত হলেন। এদের ছাড়াও আরো অনেক উলামা, ফকীহ এবং শহরের গণ্যমান্য লোক জানাযায় শরীক ছিলেন।

হঠাৎ জানাযা থেমে গেল। পরস্পরে জানাযা থেমে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করতে লাগল। কানাযুযা হতে লাগল। পরে জানা গেল যে, মৃত ছেলের জননী পাগলবৎ হয়ে জানাযার সাথে বেরিয়ে এসেছে। স্বীয় উড়না জানাযার উপর ফেলে উলঙ্গ মাথায় জানাযার সাথে চলছে।

মৃত ছেলের পিতা যখন জানতে পারলেন যে, তার স্ত্রী উদাসিনী হয়ে জানাযার সাথে এভাবে চলছে। তখন তিনি উচ্চস্বরে তার স্ত্রীকে ডেকে বললেন, ফিরে চলে যাও। কিন্তু স্ত্রী ফিরে যেতে অস্বীকৃতি জানাল। স্বামী তখন রাগান্বিত হয়ে হলফ করে বললেন, তুমি যদি এখান থেকেই ফিরে না যাও তবে তুমি তলাক।

প্রকাশ থাকে যে, তখনো জানাযাগাহে জানাযা পৌঁছেনি। জানাযার নামায সেখানেই অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। স্বামীর কথার উত্তরে স্ত্রীও কসম করল। বলল আমি ততক্ষণ পর্যন্ত ফিরব না যতক্ষণ না তার জানাযার নামায পড়া হয়। যদি এর আগে ফিরে যাই তবে আমার সমস্ত দাস মুক্ত।

মাসয়লাটি কঠিন ছিল। মানুষের মধ্যে কানাযুযা শুরু হয়ে গেল। উপস্থিত উলামায়ে কিরামদের কেউ তার সমাধান দিতে পারলো না। ছেলের পিতা ইমাম সাহেবের নিকট এসে বললেন, জনাব! আল্লাহর ওয়াস্তে আমাদেরকে সাহায্য করুন।

ইমাম সাহেব অগ্রসর হয়ে মৃত ছেলের মাতাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কিভাবে হলফ করেছ? সে তার বিস্তারিত বর্ণনা দিল।

অতঃপর স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি বলে হলফ করেছেন? সে তার কসমের বাক্য ইমাম সাহেবের নিকট বর্ণনা করল।

প্রকৃত ঘটনা সম্বন্ধে অবহিত হয়েই ইমাম সাহেব বললেন, জানাযার খাট রেখে দাও। তাই করা হল। অতঃপর বললেন জানাযার নামায এখানেই হবে। তোমরা ছফবন্দী হয়ে যাও। মৃতের পিতাকে বললেন, জনাব! আগে গিয়ে

জানাযার নামায পড়িয়ে দিন।

জানাযার শেষে ইমাম সাহেব জনতাকে বললেন, মৃতকে দাফন করার জন্য কবরস্থানে নিয়ে যাও।

স্ত্রীলোকটিকে বললেন, এখান থেকেই ফিরে যাও। তোমার কসম পূরণ হয়ে গেছে। কারণ জানাযার নামাযের পরই তুমি ফিরে যাচ্ছ।

তার স্বামীকে বললেন, আপনিও কসম হতে মুক্ত হয়েছেন। আপনার নির্দেশে স্ত্রী এখান থেকেই ফিরে যাচ্ছে।

ইমাম সাহেবের প্রত্যুৎপন্নমতি দেখে ইবনে শুবরুমা বলে উঠলেন, তোমার মত জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমান সন্তান জন্ম দিতে মেয়েরা অপারগ হয়ে গেছে। আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন। যে কোন ইলমী সমস্যার সমাধান তুমি অনায়াসে করে দিতে পার।

ওকী ইবনুল জাররাহ (রহঃ) বর্ণনা করেন, একবার আমরা ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর মজলিসে বসা ছিলাম। সেখানে একজন মহিলা এসে বলল, আমার ভাই মারা গিয়েছে। তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি ছিল ছয়শ দীনার। সম্পত্তি বন্টন করা হলে আমাকে ছয়শত দীনার হতে মাত্র একটি দীনার দেওয়া হয়েছে।

তার বলার উদ্দেশ্য হল তার সাথে বেইনসাফী করা হয়েছে। সে ভেবেছিল যে, মৃত ব্যক্তির বোন হওয়ার কারণে সে আরো অধিক মীরাছ পাওয়ার যোগ্য ছিল। অথচ তাকে মাত্র একটি দীনার দেওয়া হয়েছে।

ইমাম সাহেব তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, কে এরূপ বন্টন করেছেন?

সে বলল, দাউদ তায়ী।

ইমাম সাহেব বললেন, তোমার প্রাপ্য ছিল এক দীনার; তোমাকে তাই দেওয়া হয়েছে।

সে বলল, কিভাবে?

ইমাম সাহেব বললেন, তোমার ভাই কি দুটি কন্যা সন্তান রেখে যাননি?

সে বলল, হ্যাঁ।

ইমাম সাহেব বললেন, তার মাতাও জীবিত রয়েছেন।

সে বলল, ঠিক।

ইমাম সাহেব বললেন, তার স্ত্রীও জীবিত রয়েছেন।

সে বলল, তাও ঠিক।

ইমাম সাহেব বললেন, এদের ছাড়াও তার বার ভাই এক বোন জীবিত আছে।

সে বলল, আপনি ঠিকই বলেছেন।

এরপর ইমাম সাহেব তাকে মাসয়ালাটির ব্যাখ্যা বুঝাতে গিয়ে বললেন, মৃতের দুই কন্যা পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ পাবে। কাজেই তারা চারশত দীনার পারে। তার মা পাবেন এক ষষ্ঠাংশ। তাই তার অংশে পড়বে একশত দীনার। তার স্ত্রী আট ভাগের এক ভাগ হিসাবে পাবে পঁচাত্তর দীনার। অবশিষ্ট থাকবে মাত্র পঁচিশ দীনার। তার বার ভাই পাবে চব্বিশ দীনার। অবশিষ্ট এক দীনার পাবে তুমি। দাউদ ভায়ী সেটাই তোমাকে দিয়েছেন।

একবার ইমাম সাহেব কুফার মসজিদে আগমন করেছিলেন। প্রসিদ্ধ রাফেযী তार्কিক শয়তান তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, বলো তো দেখি; মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় শক্তিশালী কে?

ইমাম সাহেব বললেন, আমাদের নিকট শক্তিশালী হচ্ছেন হযরত আলী (রাঃ), আর তোমাদের মতে হযরত আবু বকর (রাঃ)। শয়তান তাক বিরক্ত হয়ে বলল, তুমি তো কথা উল্টিয়ে দিলে। মূলতঃ আমাদের মতে আশাদ্দুন্নাস মানব সিংহ শক্তিদ্র ব্যক্তি হচ্ছেন হযরত আলী আর তোমাদের নিকট আবু বকর।

ইমাম সাহেব বললেন, কক্ষনো এরূপ নয়। আমরা যে হযরত আলীকে আশাদ্দুন্নাস সাব্যস্ত করি তার কারণ হল যখন তিনি জানতে পারলেন যে খিলাফতের অধিকার আবু বকরের, তিনি তো মেনে নিলেন। সারাজীবন তাঁর আনুগত্য করেছেন। আর তোমরা বলছ খিলাফত হযরত আলীর প্রাপ্য ছিল। আবু বকর তা জোর করে ছিনিয়ে নিয়েছে। কিন্তু হযরত আলীর নিকট এ পরিমাণ শক্তি ছিল না যে, তার প্রাপ্য হযরত আবু বকর হতে ফিরিয়ে আনবে। বুঝা যাচ্ছে হযরত আলী হতেও হযরত আবু বকর অধিক শক্তিশালী।

শয়তান তাক রাফেযী ইমাম সাহেবের এ উত্তর শুনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল।

দুই ব্যক্তি হান্মামখানায় গোসল করতে গিয়ে হান্মামীর নিকট কিছু আমানত রাখল। তাদের একজন আগে গোসল করে বেরিয়ে এসে আমানতের বস্তু হান্মামীর নিকট হতে নিয়ে চলে গেল। এরপর দ্বিতীয় ব্যক্তি বেরিয়ে এসে আমানতের বস্তু ফেরৎ চাইল। হান্মামী বলল, সেটা তোমার সঙ্গীর নিকট দেয়া হয়েছে। এতে সে আদালতের শরণাপন্ন হল। কাযী সাহেব হান্মামীকে এ বলে দোষী সাব্যস্ত করলেন যে, যেহেতু তারা উভয়ে মিলে তোমার নিকট আমানত

রেখেছে কাজেই তোমার উচিত ছিল উভয়ের উপস্থিতিতে আমানত ফিরিয়ে দেয়া।

হাম্মামী বেচারার পেরেশান হয়ে ইমাম সাহেবের শরণাপন্ন হল। ইমাম সাহেব বিস্তারিত ঘটনা শুনে বললেন, যাও! তুমি গিয়ে সে ব্যক্তিকে বল, আমি তোমার আমানত ফিরিয়ে দিতে প্রস্তুত। কিন্তু নিয়ম মোতাবেক তোমার একটা নিকট দিব না। তোমার সঙ্গীকে নিয়ে এসে আমানত নিয়ে যাও।

সে তার সঙ্গীকে উপস্থিত করতে পারে নাই। এভাবে মজলুম হাম্মামী জুলুম হতে রক্ষা পেল।

ইমাম আমাশ ছিলেন প্রসিদ্ধ তাবেয়ী এবং বিশিষ্ট মুহাদ্দিছ। তাঁর আসবাব নাম ছিল সুলাইমান। চক্ষুরোগে আক্রান্ত থাকার কারণে তাঁকে আ'মাশ বলা হত। ৬১ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ১৪৭ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। চার হাজার হাদীছ মুখস্থ শুনিয়ে দিতেন। তার নিকট কোন কিতাব থাকত না।

ব্যাহিক আকৃতি তাঁর সুশ্রী ছিল না। অধিকন্তু চোখে ক্রটি ছিল। পক্ষান্তরে তার স্ত্রী ছিল সুন্দরী এবং রূপসী। স্বীয় রূপ সৌন্দর্যে সে গর্বিতা ছিল। কথায় কথায় স্বামীর সাথে ঝগড়া করত, ঝগড়ার কথা বের করত। বিভিন্নভাবে ইমাম আ'মাশকে বিরক্ত করত, যেন তার থেকে নিকৃতি পেতে পারে।

একদিন এশার পরে উভয়ের মধ্যে বিবাদ হল। উভয় পক্ষ হতেই কথা বাড়াবাড়ি হল। শেষ পর্যন্ত স্ত্রী তার সাথে কথা বলা বন্ধ করে দিল। ইমাম আ'মাশ হাজারও প্রচেষ্টা করলেন কিন্তু স্ত্রী কথা বলতে নারাজ। শেষ পর্যন্ত গোস্‌সায় এসে তিনি বললেন, যদি আজ রাতে তুমি আমার সাথে কথা না বল তবে তোমাকে বায়েন তালাক। ক্রোধের তিশাঘ্যাতে তো তার মুখ থেকে কথা বেরিয়ে গেছে। কিন্তু স্ত্রীর অভাবে যে সমস্ত অসুবিধার সম্মুখীন হতে হলে সেগুলো ভেবে তিনি খুবই লজ্জিত হলেন। এখন কী করা যায়? অনেকে নিকটই ধর্ণা দিলেন। কিন্তু কেউ কোন সমাধান দিতে পারল না। অবশেষে ইমাম সাহেবের নিকট এসে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। তিনি বললেন, চিন্তা কোন কারণ নেই। নিশ্চিন্তে থাকুন। আপনাকে মহল্লার ফজরের আযান আগে দিয়ে দিব।

অতঃপর ইমাম সাহেব নিজে গিয়ে মসজিদের মুয়াজ্জিনকে ফজরের আযান সুবহে সাদেকের আগে দিতে রাজী করিয়ে নিলেন। সুবহে সাদেকের পরে মুয়াজ্জিন আযান দিয়ে দিল।

এদিকে ইমাম আ'মাশের স্ত্রী ফজরের আযানের অপেক্ষায় ছিল। আযান শুনতেই সে খুশীতে টগবগিয়ে উঠল। বলল, আল্লাহর শোকর। আজ বদ আখলাক বুড়ো হতে নিষ্কৃতি পেলাম।

ইমাম আ'মাশ বললেন, আল্লাহর শোকর! আবু হানিফা ভেঙ্গে যাওয়া সম্পর্ক পুনরায় গড়ে দিল।

আব্দুল আযীয বিন আবি দাউদ বর্ণনা করেন, একবার তাকে খলীফার দরবারে ডাকা হল। তিনি ইমাম সাহেবের ছাত্র ছিলেন। পেরেশান হয়ে তাঁর সাথে পরামর্শ করতে এলেন। বললেন, খলীফার দরবারে আমাকে যেতে হবে। সেখানে গিয়ে সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজ হতে নিষেধ করা ব্যতীত ফিরে আসা আমার জন্য কঠিন ব্যাপার। এ বিষয়ে আমাকে কিছু নসীহত করুন।

ইমাম সাহেব বললেন, তার দরবারে গিয়ে সুন্নত অনুসারে সালাম দিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকবে। যখন তিনি তোমার নিকট কোন মাসয়ালা কিংবা পরামর্শের কথা জিজ্ঞাসা করবেন এবং সেটার উত্তর তোমার জানা থাকে তবে খোলা মনে তা বলে দিও। সে সময় তোমার কথার ফাঁকে এ কথাগুলোও বলে দিও, হে আমীরুল মুমিনীন! দুনিয়া চার জিনিসের জন্য অর্জন করা হয়। ইজ্জত এবং সম্মানের জন্য। আলহামদুলিল্লাহ! আপনি শুধু সম্মানীই নন। আপনি সম্মানীর পুত্রও। রাজত্বের জন্য। আল্লাহর শোকর। আপনার সেটা অর্জিত হয়েছে। আপনার মাল-দৌলতও যথেষ্ট রয়েছে। হে আমীরুল মুমিনীন! এখন আপনি তাকওয়া অবলম্বন করুন এবং নেককাজ করতে থাকুন। এতে দুনিয়া ও আখেরাতের দৌলত এবং চিরস্থায়ী সৌভাগ্য অর্জিত হবে।

উপস্থিত বুদ্ধির ক্ষেত্রে ইমাম সাহেব ছিলেন এক অসাধারণ প্রতিভা ও অনন্য প্রত্যুৎপন্নমতি। যে কোন কঠিন সমস্যা উপস্থিত হলে তিনি এত দ্রুত তার সমাধান দিতেন যে, মানুষ তাতে বিস্মিত না হয়ে পারত না।

মাসয়ালা মাসায়েলের ব্যাপারে যদিও অনেকেই অভিজ্ঞ ছিলেন কিন্তু কোন প্রকার চিন্তা ভাবনা ছাড়াই মাসয়ালার সঠিক উত্তর দেয়ার ব্যাপারে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না।

জনৈক ব্যক্তি কোন এক ব্যাপারে তার স্ত্রীর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে বলল যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমার সাথে কথা না বল, ততক্ষণ পর্যন্ত আমিও তোমার সাথে কথা বলব না।

তার স্ত্রীরও ছিল বদমেজাজ। সে সাথে সাথে বলে উঠল, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমার সাথে কথা না বলবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমিও তোমার সাথে কথা বলব না।

রাগের সময় তাদের কেউ তলিয়ে দেখে নাই যে, এ ধরণের কথাবার্তার পরিণাম কি হতে পারে। পরে যখন উভয়ের মেজাজ শান্ত হল তখন বুঝতে পেরে উভয়ই অনুতপ্ত হল।

এ মাসয়ালার সমাধানের জন্য স্বামী ইমাম সুফিয়ান ছাওরীর নিকট উপস্থিত হয়ে সমস্ত বিবরণ খুলে বলল। তিনি বললেন, এ অবস্থায় কসমের কাফ্ফারা দেয়া ব্যতীত গত্যান্তর নেই। কসমের কাফ্ফারা আদায় করে পরে একে অপরের সাথে কথা বলতে পারবে।

অতঃপর সে ব্যক্তি ইমাম আযম আবু হানিফা (রহঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত হল। তার সমস্যা পেশ করে সমাধান জানতে চাইল। ইমাম সাহেব বললেন, যাও। সানন্দে তোমার স্ত্রীর সাথে কথাবার্তা বল। এ জন্য কাউকে কাফ্ফারা দিতে হবে না।

ইমাম সাহেবের এ উত্তর ইমাম সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ)-এর কর্ণগোচর হলে তিনি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন। তিনি ইমাম সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন, আপনি মানুষকে ভুল মাসয়ালার বলে থাকেন।

ইমাম সাহেব তৎক্ষণাৎ সে ব্যক্তিকে ডাকিয়ে এনে ঘটনাটি পুনরায় বলতে বললেন। সে ব্যক্তি ঘটনাটি পুনরায় বলল। ইমাম সাহেব বললেন, আগে যা বলেছি এখনও তা-ই বলি। অর্থাৎ কাউকে কাফ্ফারা দিতে হবে না। নির্দিধায় পরস্পরে কথা বলতে পারবে।

তখন ইমাম সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) এর গুরুত্ব জানতে চাইলেন। ইমাম সাহেব বললেন, স্বামীর কসম করার পর তার স্ত্রী তাকে লক্ষ্য করে কসমের কথা বলল। ফলে স্ত্রীর পক্ষ হতে প্রথম কথা বলার শর্তটি পূরণ হয়ে গেল। কাজেই স্বামীকে আর কসমের কাফ্ফারা দিতে হবে না।

ইমাম সাহেবের এ ব্যাখ্যা শুনে ইমাম সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বললেন, উপস্থিত ক্ষেত্রে আপনার বুদ্ধি যতদূর পর্যন্ত পৌঁছে সে পর্যন্ত আমার কল্পনাও পৌঁছে না।

একদা ইমাম সাহেব মসজিদে বসে ছাত্রদের পাঠদান করছিলেন। জনৈক মহিলা মসজিদে প্রবেশ করে ইমাম সাহেবের সম্মুখে একটি আপেল রেখে দিল।

আপেলটির অর্ধেকটা ছিল লাল আর অর্ধেক হলুদ।

ইমাম সাহেব আপেলটির মাঝখানে কেটে দু'টুকরা করে দিয়ে মহিলাটির হাতে তুলে দিলেন। সে তা নিয়ে চলে গেল।

এ ঘটনাটি উপস্থিত লোকদের নিকট ধাঁধার মত মনে হল। তারা আশ্চর্যবোধ করল। ইমাম সাহেবের নিকট এর রহস্য জিজ্ঞাসা করল।

উত্তরে ইমাম সাহেব ধাঁধার সমাধান দিতে গিয়ে বললেন, মহিলাটির হয়েযের রক্তের রং কখনো লাল হয় কখনো হলুদ হয়। আপেলের দুটি রংয়ের মাধ্যমে সে তা বুঝিয়ে কখন সে পবিত্র হবে জানতে চেয়েছে। আমি আপেলটি কেটে দিয়ে এটা বুঝিয়েছি যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না এর ভিতরের সাদা অংশের মত সাদা পানি আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে পবিত্র হবে না।

একবার ইমাম সাহেবের নিকট এমন একটি মাসয়ালা উপস্থাপন করা হলো যার সমাধান দিতে তাঁর সমকালীন উলামায়ে কেরাম অপারগ হয়ে গিয়েছিলেন। মাসয়ালাটি ছিল এরূপ।

জনৈক স্ত্রীলোক সিঁড়ি ডিঙ্গিয়ে ছাদে উঠছিল। হঠাৎ তার স্বামীর দৃষ্টি তার দিকে পড়ল। স্ত্রীর এ কাজটি তার অপছন্দ হলো। স্ত্রীকে বলল, তুমি যদি ছাদে উঠ তবে তোমাকে তিন তালাক। আর যদি নীচে নেমে আস তবুও তোমাকে তিন তালাক। এমতাবস্থায় স্ত্রীর উপর তালাক পতিত না হওয়ার জন্য কোন কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে?

ইমাম সাহেব বললেন, খুবই সহজ ব্যাপার। মহিলাটি আর উপরেও উঠবে না, নীচেও নামবে না। কিছু সংখ্যক লোক গিয়ে সিঁড়িটিকে মেয়েলোকটিসহ নামিয়ে মাটিতে রেখে দিবে। এতে তার উপর তালাক পতিত হবে না। কারণ, মেয়েলোকটি উপরেও উঠে নাই নীচেও নামে নাই।

প্রশ্নকারীরা জিজ্ঞাসা করল অন্য কোন পন্থা আছে কি?

ইমাম সাহেব বললেন, আরেকটি ব্যবস্থা এরূপ করা যেতে পারে যে, কিছু সংখ্যক মহিলা গিয়ে সে স্ত্রী লোকটিকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক মাটিতে নামিয়ে রাখবে। এতে স্বামীর হলফ ভঙ্গ হবে না। অর্থাৎ স্ত্রীর উপর তালাক পতিত হবে না।

ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তির ঘরে চোর প্রবেশ করল। তারা তার ঘরের সমস্ত মূল্যবান সামগ্রী নিয়ে গেল। ঘরের মালিক টের পেয়ে গেল। চোরেরা তাকে ধরে এরূপ কসম করতে বাধ্য করল যে, সে ব্যক্তি যদি

চিৎকার করে কিংবা কারো নিকট চোরদের পরিচয় প্রকাশ করে দেয় তবে তার স্ত্রী তিন তালাক।

সকাল বেলায় সে ব্যক্তি বাজারে গিয়ে দেখতে পেল যে, তার ঘরের মূল্যবান মালামাল চোরেরা বাজারে বিক্রয় করছে। কিন্তু তালাকের কসমের কারণে কোন কিছু বলার কিংবা কাউকে জানানোর ক্ষমতা তার ছিল না। এ নিয়ে সে খুবই চিন্তিত ছিল।

পরিশেষে সে ভাবল যে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর সাথে এ ব্যাপারে পরামর্শ করা যেতে পারে। এতে হয়ত এর কোন সুরাহা হয়ে যাবে।

ইমাম সাহেব যখন সমস্ত ঘটনা শুনলেন, বললেন, তোমাদের মহল্লার মসজিদে ইমাম, মুয়াজ্জন এবং কিছু সংখ্যক প্রভাবশালী লোকদের নিয়ে এস।

তাদেরকে যখন ইমাম সাহেবের নিকট আনা হল তিনি বললেন, তোমরা কি চাও আল্লাহ তাআলা এই বেচারার মালগুলো ফিরিয়ে দিক? সবাই ইতিবাচক উত্তর দিলে ইমাম সাহেব বললেন, তোমরা তোমাদের মহল্লার সমস্ত খারাপ এবং সন্দেহযুক্ত লোকদেরকে একটি ঘরে কিংবা মসজিদে একত্রিত করবে। দু'একজন লোক যার মালামাল চুরি হয়েছে তাকে নিয়ে দরজায় দাঁড়াবে। অতঃপর ঘর হতে একজন একজন করে বের করতে থাকবে এবং তাকে জিজ্ঞাসা করতে থাকবে, এই কি তোমার চোর? সে ব্যক্তি যদি চোর না হয়ে থাকে তবে বলবে এ চোর নয়। আর যদি চোর হয়ে থাকে তবে সে চূপ থাকবে। যার ব্যাপারে চূপ থাকবে তাকে আটকে রেখো। কারণ, সেই চোর। এভাবে চোরকেও ধরা যাবে। আর তার স্ত্রীও তালাক হবে না।

লোকজন এসে ইমাম সাহেবের নির্দেশিত পন্থায় কাজ করে চোর আটক করল। সে ব্যক্তি তার মালামাল ফেরৎ পেল। আর তার স্ত্রীও তালাক হলো না।

আব্দুর রহমান বিন আবি লায়লা একজন প্রসিদ্ধ ফকীহ এবং কাজী ছিলেন। দীর্ঘ তেত্রিশ বৎসর যাবৎ তিনি কাজী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

একবার ইমাম সাহেবের এক প্রতিবেশী তাঁর আদালতে হাজির হয়ে কোন এক ব্যক্তির বাগান সম্পর্কে সাক্ষী দিতে চাইল।

কাজী ইবনে আবি লায়লা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, যে বাগান সম্পর্কে তুমি সাক্ষী দিতে চাচ্ছ, বলতো সে বাগানে গাছের সংখ্যা কতটি? সে ব্যক্তি গাছের সংখ্যা বলতে না পারায় কাজী সাহেব তার সাক্ষ্য গ্রহণ করলেন না।

একদিন ইমাম সাহেবের সাথে তার সাক্ষাৎ হলে কথা প্রসঙ্গে তাঁর নিকট

তাঁর সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হবার কথা বর্ণনা করল। ইমাম সাহেব তাকে কাজীর দরবারে ফেরত পাঠিয়ে বললেন, যাও! কাজী সাহেবকে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর যে, আপনি বিশ বৎসর যাবৎ কুফার যে জামে মসজিদে বসে মামলা-মোকাদ্দমা মীমাংসা করে আসছেন, বলুন তো দেখি সে মসজিদের খুঁটির সংখ্যা কয়টি?

ইমাম সাহেবের প্রতিবেশীর এ কথায় কাজী ইবনে আবি লায়লা আশ্চর্যম্বিত হয়ে গেলেন। স্বীয় কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হয়ে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করে নিলেন।

এক ব্যক্তি কসম করল যে, রমযান মাসে দিনের বেলায় সে স্ত্রী সহবাস করবে।

কসম করার ফলে এখন যদি সে রমজানে দিনের বেলায় স্ত্রী সহবাস না করে তবে কসমের কাফ্ফারা দিতে হবে। আর যদি স্ত্রী সহবাস করে তবে রোজা ভঙ্গের কাফ্ফারা দিতে হবে। অধিকন্তু পরকালের শাস্তি এবং গুনাহ তো আছেই।

এ সমস্যার সমাধানের জন্য সে অনেকের নিকট ধর্না দিল। কিন্তু কেউ তার কোন সদুত্তর দিতে পারল না। অবশেষে ইমাম সাহেবের নিকট এর সমাধানের জন্য সমস্যা উত্থাপন করা হলে তিনি তৎক্ষণাৎ বলে দিলেন যে, সে রমযানের মধ্যে সফর করবে। সফররত অবস্থায় রোজা না রেখে দিনের বেলায় স্ত্রী সহবাস করবে। এতে তার কসমও পূরণ করা হবে। কাফ্ফারাও দিতে হবে না। আর রোজা ভঙ্গের গুনাহও হবে না।

একবার কাজী ইবনে আবি লায়লা ভ্রমনের জন্য একটি বাগানে প্রবেশ করলেন। ঘটনাচক্রে ইমাম সাহেবও সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। বাগানের অপর প্রান্তে কিছু সংখ্যক মহিলা ছিল। তারা গান গাইতে লাগল। গান গেয়ে যখন তারা স্কান্ত হল তখন ইমাম সাহেব বলে উঠলেন, 'তোমরা খুব ভাল করেছ।'

এ কথা দ্বারা বাহ্যত এটাই বুঝা যায় যে, ইমাম সাহেব তাদের গানের শংসা করেছেন। কাজী ইবনে আবি লায়লাও তাই বুঝলেন। বললেন, এ-কি? মেয়েদের গানের শংসা করছেন। এ দ্বারা তো আপনি ফিসক কাজে লিপ্ত হয়েছেন যার ফলে আপনার বিরুদ্ধে আপনার সাক্ষী অগ্রাহ্য হবার মামলা দায়ের করা যেতে পারে।

ইমাম সাহেব বললেন, কাজী সাহেব আমি কি বলেছি? তিনি বললেন,

আপনি মেয়েদের গানের প্রশংসা করেছেন।

ইমাম সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, কখন এ কাজ করলাম?

তিনি বললেন, মেয়েরা যখন গান গাওয়া বন্ধ করল তখন।

ইমাম সাহেব বললেন, আমি এ কথার প্রশংসা করলাম যে, তারা ফিসক (গান) পরিত্যাগ করে নিরবতা অবলম্বন করেছে। এটা ভাল করেছে। তাই আমি তাদের বললাম তোমরা খারাপ কাজ পরিত্যাগ করে ভাল করেছে।

একবার ইমাম সাহেবের এক প্রতিবেশীর একটি ময়ূর হারানো গিয়েছিল। ময়ূরটিকে বড়ই সখ করে সে পালত। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তার কোন সন্ধান পায়নি। অবশেষে ইমাম সাহেবের খিদমতে উপস্থিত হয়ে তার পেরেশানী প্রকাশ করে বলল যে, আমার ময়ূরটি হারানো গিয়েছে। অনেক তালাশ করেও তার সন্ধান পাইনি।

ইমাম সাহেব বললেন, নিশ্চিন্ত থাক। আল্লাহ তোমার সাহায্য করবেন।

সকাল বেলায় ইমাম সাহেব মসজিদে গেলেন। অন্যান্য কথার মাঝে তিনি এ কথাও বলে ফেললেন, তোমাদের মধ্য হতে তার লজ্জা শরম থাকা উচিত যে স্বীয় প্রতিবেশীর ময়ূর চুরি করে নামায পড়তে আসে অথচ তার মাথায় এখনো ময়ূরের পালক লেগে আছে।

একথা শুনতেই ময়ূর চোর তার মাথায় হাত বুলাতে লাগল। ইমাম সাহেব তাকে লক্ষ্য করলেন। সবাই চলে যাওয়ার পর ইমাম সাহেব নির্জনে তাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে তার থেকে ময়ূর নিয়ে মালিকের নিকট পৌঁছিয়ে দিলেন।

একবার ইমাম সাহেব গভর্ণর ইবনে হুয়ায়রার দরবারে গিয়ে দেখতে পেলেন তার সম্মুখে এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করে কতল করার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু ইমাম সাহেব সেখানে পৌঁছতেই গভর্ণর তাঁর সম্মান শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে লাগলেন। মজলুম বেচারী দেখল যে এখন ইমাম সাহেবের যথেষ্ট ইয়্যত করা হচ্ছে এবং তার রেয়াত করা হচ্ছে। তাই সে গভর্ণরের সম্মুখে ইমাম সাহেবের নিকট আরজ করল, হে আবু হানিফা আপনি কি আমাকে চিনতে পেরেছেন?

ইমাম সাহেব তার প্রশ্নের উদ্দেশ্য বুঝে নিয়েছেন। তার সাথে তাঁর পূর্ব পরিচয় না থাকা সত্ত্বেও তিনি বললেন, হ্যাঁ, আপনাকে আমি চিনেছি। আপনি তো সে ব্যক্তি যে আযান দেওয়ার সময় লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ কলেমাটি দীর্ঘ করে পড়েন।

সে বলল, হ্যাঁ! আপনি ঠিকই বলেছেন।

ইমাম সাহেবের উদ্দেশ্য ছিল যে, আমি তাকে মুসলমান হিসাবে চিনি। এ কথা শুনে ইবনে হুবায়রা বললেন, আচ্ছা ভাই! আযান দাও। সে ব্যক্তি আযান দিল। ইমাম সাহেব বললেন, ঠিক আছে। মাশাআল্লাহ। জাযাকাল্লাহ।

এটা দেখে গভর্ণর ইবনে হুবায়রা তাকে মুক্ত করে দিলেন।

বশীর বিন ওলীদ বর্ণনা করেন। ইমাম সাহেবের এক প্রতিবেশী যুবক ছিল। সে তাঁর মজলিসে প্রায়ই আসা-যাওয়া করত। একদিন সে ইমাম সাহেবের খিদমতে আরজ করল যে, আমি কুফার অমুক গোত্রের সাথে আত্মীয়তা করতে চাই। এ প্রসঙ্গে আমি তাদের নিকট বিবাহের প্রস্তাবও পাঠিয়েছি। কিন্তু তারা আমার নিকট এ পরিমাণ মহর দাবী করছে যা আমার ক্ষমতার বহির্ভূত। আর এদিকে বিবাহ করতেও মন চাচ্ছে। এখন আমি কি করতে পারি?

ইমাম সাহেব বললেন, প্রথমে ইস্তিখারা করে নাও। এরপর তারা যে পরিমাণ মহর দাবী করে তা যে কোন উপায়ে সংগ্রহ করে বিবাহ করে নাও।

ইমাম সাহেবের পরামর্শ অনুযায়ী সে পাত্রীর গোত্রকে জানিয়ে দিল যে, সে তাদের দাবীকৃত মহরের পরিমাণে বিবাহ করতে রাজী। যথারীতি বিবাহ হয়ে গেল।

এরপর সে ব্যক্তি আবার ইমাম সাহেবের খিদমতে উপস্থিত হয়ে বলল, জনাব! আমি পাত্রীর পরিবারের নিকট আবেদন করছিলাম যে, এখন মহরের কিছু অর্থ নিয়ে নিন। বাকীটা আমার যখন সুযোগ হয় আদায় করে দিব। কিন্তু এতে তারা রাজী হচ্ছে না। মহরের সম্পূর্ণ অর্থ আদায় করার পূর্বে তারা তাদের মেয়ের রাখছতী দিতে নারাজ।

ইমাম সাহেব বললেন, একটি কৌশল অবলম্বন কর। এখন কারো থেকে ঋণ নিয়ে তাদের দাবীকৃত অর্থ আদায় করে দাও। কোনোভাবে তোমার স্ত্রীর রাখছতী করিয়ে নাও। আমার বিশ্বাস তাদের কঠোর মনোভাবের কারণে আল্লাহ চাহে তো তোমার কাজ সহজ হয়ে যাবে।

সে ব্যক্তি তাই করল। মানুষের থেকে ঋণ নিয়ে- যার বেশীর ভাগই ইমাম সাহেব দিয়েছেন- মহর আদায় করল। পাত্রীর পিতামাতা তাকে রাখছতী করে দিল।

এরপর ইমাম সাহেব তাকে বললেন, তুমি একথা রটিয়ে দাও যে, এ শহর

থেকে তোমার অনেক দূরে যাওয়ার ইচ্ছে আছে, সাথে করে স্ত্রীকেও নিয়ে যাওয়ার খেয়াল। এতে তোমাকে কেউ বাধা দিতে পারবে না।

সে ব্যক্তি ইমাম সাহেবের পরামর্শ মতেই কাজ করল। দুটি উট ভাড়া করে আনল। আর ঘোষণা করে দিল যে, জীবিকা উপার্জনের জন্য তার খোরাসান যাওয়ার ইচ্ছে। সাথে করে তার স্ত্রীকেও নিয়ে যাওয়ার আশা আছে।

তার এ ইচ্ছে আকাঙ্ক্ষা পাত্রী পক্ষের অপছন্দ হল। তারা ইমাম সাহেবের নিকট এসে তার অভিযোগ করে এ সম্পর্কিত শরীয়তের নির্দেশ জানতে চাইল।

ইমাম সাহেব বললেন, শরীয়তের দৃষ্টিতে তার এ অধিকার রয়েছে যে, সে তার স্ত্রীকে যেখানে ইচ্ছে নিয়ে যেতে পারবে।

তারা বলল, আমরা আমাদের কলিজার টুকরাকে কোনভাবেই দূরে নিয়ে যেতে দিতে রাজী নই। তার বিরহ আমাদের জন্য বড়ই কষ্টদায়ক।

ইমাম সাহেব বললেন, এটা তো সহজ ব্যাপার। তাকে কোন উপায়ে রাজী করে নাও। সহজ উপায় হল এটাই যে, তার থেকে যে পরিমাণ অর্থ তোমরা নিয়েছ তা তাকে ফিরিয়ে দাও।

তারা যখন এতে রাজী হল ইমাম সাহেব সে যুবককে ডেকে এনে বললেন, পাত্রী পক্ষ তোমার থেকে মহর বাবত যে অর্থ নিয়েছে তা ফিরিয়ে দিতে সম্মত হয়েছে। এতে তোমার ঋণ পরিশোধ হয়ে যাবে।

সে বলল, আমি অতিরিক্ত আরো কিছু আদায় করে নিতে চাই।

ইমাম সাহেব তাকে অবৈধ পদক্ষেপ নিতে নিষেধ করে বললেন, তোমার স্ত্রী যদি কারো ধন নিজ দায়িত্বে করে নেয় তবে তার ঋণ আদায় না করা পর্যন্ত তুমি তাকে কোথাও নিতে পারবে না।

এ কথায় সে যুবক শর্কিত হয়ে বলল, আপনি যা আদায় করিয়ে দেন তাতেই আমি সন্তুষ্ট।

ইমাম লাইছ বিন সা'দ (রহঃ) ছিলেন-মিশরের একজন প্রখ্যাত ইমাম। তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর জ্ঞান-গরিমার কথা অনেক গুনেছিলেন। কিন্তু তাঁর সাথে মুলাকাত করার সুযোগ হয়ে উঠেনি।

একবার তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি ইমাম সাহেবকে একটি প্রশ্ন করলেন। তিনি বললেন, হে ইমাম আবু হানিফা! আমার একটি বদ মেজাজী পুত্র সন্তান আছে। যদি আমি তাকে বিবাহ করিয়ে দেই তবে সে তালাক দিয়ে

দেয়। আর যদি তাকে দাসী ক্রয় করে দেই তবে সে তাকে মুক্ত করে দেয়। শলুন; এমতাবস্থায় আমি কোন পস্থা অবলম্বন করতে পারি।

ইমাম সাহেব বললেন, আপনি আপনার ছেলেকে নিয়ে বাজারে যাবেন। আপনার ছেলে বাজারের যে দাসীটি পছন্দ করে আপনি তাকে ক্রয় করে এনে আপনার ছেলের সাথে বিবাহ করিয়ে দিবেন। পরে যদি আপনার ছেলে তাকে তলাক দিয়ে দেয় তবে আপনার কোন ক্ষতি হবে না।

ইমাম লাইছ বিন সা'দ ইমাম সাহেবের উপস্থিত বুদ্ধি দেখে আশ্চর্যাব্বিত হয়ে গেলেন।

একবার লুলুঈ গোত্রের একটি দল কুফায় আগমন করল।

এদের মধ্যে হতে এক ব্যক্তির স্ত্রী খুবই রূপসী ছিল। জনৈক কূফাবাসীর সাথে তার সম্পর্ক গড়ে উঠল।

পরিশেষে এক সময় সে কূফাবাসী দাবী করে রসল। বলল, এ মেয়েলোকটি আমার স্ত্রী।

মহিলাটিকে যখন জিজ্ঞাসা করা হল তখন সে তার স্ত্রী হওয়ার কথা স্বীকার করল।

লুলুঈ গোত্রের লোকটি; যে তার প্রকৃত স্বামী ছিল সে খুবই পেরেশান হয়ে পড়ল। সে বলছিল এ আমার বিবাহিতা স্ত্রী। কিন্তু তার কোন সাক্ষী ছিল না।

ইমাম সাহেবের নিকট ঘটনাটি পেশ করা হলে তিনি কাজী ইবনে আবি লায়লা প্রমুখসহ কাজী এবং ফকীহদের একটি জামাত এবং মেয়েদের একটি দল নিয়ে লুলুঈদের আবাসভূমির দিকে রওয়ানা হলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি মেয়েদেরকে নির্দেশ দিলেন, যে ব্যক্তি মহিলাটিকে আপন বলে দাবী করছে তোমরা তার তাঁবুতে প্রবেশ কর। কিন্তু দেখা গেল যখন কোন মেয়েলোক তাঁবুর দিকে এগুতে যাচ্ছে তখন লুলুঈর কুকুর তাদের তাড়িয়ে আসছে। অবশেষে যে মেয়ে লোকটিকে নিয়ে বিরোধ ইমাম সাহেব তাকে তাঁবুর দিকে যেতে নির্দেশ দিলেন। মহিলাটি যখন তাঁবুর নিকটবর্তী হল তখন কুকুরটি তাকে দেখে সানন্দে সংবর্ধনা জানালো।

ইমাম সাহেব বললেন, মাসয়ালা সমাধান হয়ে গেছে। যা সত্য ছিল তাই প্রকাশ পেয়েছে।

পরে যখন মহিলাটিকে প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হল। তখন সে

স্বীকার করল যে, বস্তুতঃ সে লুলুঈর স্ত্রী। কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে সে কুফী ব্যক্তির স্ত্রী হিসাবে পরিচয় দিয়েছিল।

খারেজীদের একটি দল একবার ইমাম সাহেবের নিকট এসে তলোয়ার উত্তোলন করে বলল, যেহেতু কবীরা গুনায় লিগু ব্যক্তিকে তুমি কাফের বল না, তাই তোমাকে হত্যা করা হবে।

মুনাযারায় বিজয়ী হওয়ার কৌশল বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম সাহেব একবার এ কথাও বলেছেন যে, কখনো যদি কারো সাথে মুনাযারা করার সুযোগ হয় তবে উল্টো তাকে প্রশ্ন করা শুরু কর। তবে তুমি বিজয়ী হবে। ইমাম সাহেবও এ ক্ষেত্রে তাই করলেন।

তিনি তাদেরকে বললেন, উত্তেজিত না হয়ে ঠাণ্ডা মেজাজে কথাবার্তা বল। প্রথমে জেনে নিবে। যদি মূলতঃ আমারই ভুল হয়ে থাকে তবেই হত্যা করতে অগ্রসর হও। সবচেয়ে ভালো হয় যদি তলোয়ারগুলো খাবের ভিতর রেখে দাও। পরে প্রশ্নোত্তরের পর মনে যা আসে তাই করবে।

খারেজীরা বলল, আমরা আপনার রক্তদ্বারা আমাদের তলোয়ার রঞ্জিত করব। এ কাজ সত্তর বৎসর আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা হতে উত্তম বলে আমাদের বিশ্বাস। ইমাম সাহেব বললেন, আলোচনায় আসা যাক। তোমরা কি বলতে চাও?

খারেজীরা বলল, বাইরে দুই জানাযা পড়ে আছে। একটি পুরুষের অপরাট মেয়েলোকের। পুরুষটি শরাব পান করেছে এবং সে অবস্থায় তার মৃত্যু ঘটে। আর স্ত্রীলোকটি ছিল গর্ভবর্তী। সে আত্মহত্যা করেছে। এখন এদের ব্যাপারে আপনার মত কি?

ইমাম সাহেব ভীতও হলেন না; তাঁর বুদ্ধিও লোপ পেল না। তিনি উল্টো তাদের প্রশ্ন করতে লাগলেন। বললেন, তোমরা বল এরা উভয় কি ইয়াহুদী ছিল না কি খৃষ্টান কিংবা মজুসী?

খারেজীরা বলল, এরা ইয়াহুদীও ছিল না, খৃষ্টানও ছিল না, মাজুসীও না।

ইমাম সাহেব বললেন, তবে কোন মিল্লাতের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল?

তারা বলল, এদের সম্পর্ক ছিল সে গোত্রের সাথে যারা কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করে এবং বলে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নাই এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।

ইমাম সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা তোমরা বল এ কালেমাটি ঈমানের কতটুকু? এটা কি ঈমানের অর্ধেক না চার ভাগের এক ভাগ নাকি এক তৃতীয়াংশ।

খারেজীরা বলল, ঈমানের কোন অংশ হয় না। কাজেই এটাই পুরো ঈমান।

ইমাম সাহেব বললেন, যখন ঈমানের অংশ হয় না আর এরা উভয় কালেমায়ে শাহাদাতের স্বীকারকারী এবং তাতে বিশ্বাসী তবে তোমরাই বল এ জানাযা দুটি কাদের হবে? মুসলমানের হবে না কি কাফেরের?

এ কথায় খারেজীরা পেরেশান এবং হতভম্ব হয়ে গেল। তারা বলল, এ কথা বাদ দিন। অন্য একটি প্রশ্নের উত্তর দিন। বলুন এরা উভয়ই জান্নাতী হবে না জাহান্নামী?

ইমাম সাহেব বললেন, এ কথার উত্তরে আমার নিকট নবীদের উত্তম আদর্শ রয়েছে। আমি সে কথাই বলব যে কথা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এ দুজন হতেও বড় পাপীদের সম্পর্কে আল্লাহর দরবারে আরজ করেছেন।

যে আমার অনুসরণ করল সে আমার মধ্যে হতে। আর যে আমার কথা অমান্য করল তবে হে আল্লাহ! আপনি ক্ষমাশীল দয়াময়।

আমি সে রূপই বলব যে রূপ হযরত ঈসা (আঃ) বলেছেন, যদি আপনি তাদের শাস্তি দেন তবে তারা আপনার বান্দা। আর যদি তাদের ক্ষমা করেন তবে আপনি পরাক্রমশীল প্রজ্ঞাময়।

আমি সে কথাই বলব যে কথা হযরত নূহ (আঃ) বলেছেন, তারা যা কিছু করেছে সেটা আমার উপর আসবে না। তাদের হিসাব তো আল্লাহর কাছে।

ইমাম সাহেবের এরূপ যুক্তিযুক্ত কথা শুনে খারেজীরা লজ্জিত ও অনুতপ্ত হল। উত্তোলিত তলোয়ার খাবে ঢুকিয়ে নিল। তারা তওবা করে আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াতের দলভুক্ত হয়ে গেল।

রচনা জগতে ইমাম সাহেবের খ্যাতি

ফিকাহর ধারা অনুসারে রীতিমত কিতাব রচনার প্রচলন হয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। ইসলামী জগতের বিশিষ্ট উলামা এবং মুহাদিচ্ছগণ কিতাব প্রণয়ন করেন। রবী বিন সবীহ বসরায়, মামার বিন রাশেদ ইয়ামানে, ইবনে জুরাইজ মক্কায়, সুফিয়ান ছাওরী কুফায়, আব্দুল্লাহ বিন মুবারক খোরাসানে, ওলীদ বিন মুসলিম সিরিয়ায়, হুছাইম বিন বশীর ওয়াসেতে। আর

ঐ সময়েই ইমাম আবু হানিফাও কুফায় ফিকাহ সংকলন করেন। তাঁর ছাত্রদের থেকে কয়েকজনকে নিয়ে ফিকাহ কমিটি গঠন করেন। তাদেরকে হাদীছ এবং ফিকাহ লিপিবদ্ধ করান। পরে তাঁর শাগরেদরা নিজ নিজ দরসী হালকায় তা রেওয়াজেত করেন যার কারণে ঐ কিতাবসমূহ তাদের দিকে সম্পর্কিত হয়। এরপরও কিছু সংখ্যক কিতাব তার নামে বাকী রয়েছে। ইবনে নদীম সে-সব কিতাবের নাম উল্লেখ করেছেন। ১। কিতাবুল ফিকাহিল আকবর ২। কিতাব রিসালাতুন ইলাল বস্তুী ৩। কিতাবুল আলেম ওয়াল মুতাআল্লেম ৪। কিতাবুরুদ্দে আলাল কাদেরিয়া।

ইমাম সাহেবের ওফাতের অনেক পর পর্যন্তও আলেমগণ এসব কিতাব দ্বারা উপকৃত হচ্ছিলেন বলে তাদের লেখা থেকে প্রতীয়মান হয়। আব্দুল্লাহ বিন দাউদ ওয়াসেতী বলেন, কেহ যদি অজ্ঞতা এবং জ্ঞানাক্রম থেকে মুক্তি পেতে চায় এবং ফিকাহর স্বাদ পেতে আগ্রহী হয়, সে যেন আবু হানিফার কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করে।

যায়েদা বিন কুদামা বর্ণনা করেন, আমি সুফিয়ান ছাওরীর শিয়রে একটি কিতাব পেলাম যেটি তিনি পড়তেন। সেটি দেখার অনুমতি চাইলে তিনি আমাকে দিয়ে দিলেন। ঐটি ছিল আবু হানিফার 'কিতাবুর রেহন।' আমি তাঁকে বললাম, আপনি কি আবু হানিফার কিতাব পড়েন? তিনি বললেন, আমার আকাঙ্ক্ষা তো এরূপ যে, তাঁর সমস্ত কিতাব আমার নিকট বিদ্যমান থাকুক আর আমি সেগুলো অধ্যয়ন করি। তাঁর কিতাবে তিনি প্রত্যেকটি ইলমী বিষয়ের চূড়ান্ত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। মূলতঃ আমরা আবু হানিফার সাথে ইনসাফ করিনি।

সাজ্জাদ বর্ণনা করেন, আমি এবং আবু মুসলিম মুসতামিলী উভয়ই ইয়াযীদ বিন হারুনের নিকট গেলাম। তিনি তখন বাগদাদে খলীফা মনসুরের নিকট অবস্থান করছিলেন। আবু মুসলিম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু খালেদ! আবু হানিফা এবং তাঁর কিতাব অধ্যয়ন করা সম্পর্কে আপনার কি অভিমত? তিনি বললেন, তোমরা যদি ফকীহ হতে চাও, তবে তাঁর কিতাব অধ্যয়ন কর। আমি কোন ফকীহকে আবু হানিফার রায়কে অপছন্দ করতে দেখিনি। সুফিয়ান ছাওরী কৌশলে তাঁর কিতাবুর রেহনে নকল করেছেন।

আব্দুল্লাহ বিন মুবারক বর্ণনা করেন, আমি শাম দেশে ইমাম আওযায়ীর নিকট গেলাম। বৈরুতে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হল। তিনি আমাকে বললেন, হে খোরাসানী! কুফায় আবু হানিফা নামে কোন বিদআতী আবির্ভূত হয়েছে? আমি তখন কোন উত্তর না দিয়ে স্বীয় বাসস্থানে ফিরে এলাম এবং আবু হানিফার

কিতাব বের করলাম। তিনদিন পর্যন্ত সমস্ত কিতাব মুখস্ত করে ভাল ভাল মাসয়ালাগুলো চিহ্নিত করলাম। তৃতীয়দিন আমি তাঁর নিকট গেলাম। মাসয়ালার কিতাবটি আমার হাতে ছিল। আওয়ামী আমাকে বললেন, এটি কোন্ কিতাব? আমি তাকে কিতাবটি দিয়ে দিলাম। তিনি তা দেখতে শুরু করলেন। একটি মাসয়ালায় তার দৃষ্টি পড়ে গেল যাতে আমি 'নোমান বলেছেন' লিখেছিলাম। আযান হয়ে গেছে। একামতের সময়ও নিকটবর্তী। আবার তাকেই ইমামতী করতে হবে। এতদসত্ত্বেও তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিতাবের প্রথমভাগ পড়ে নিলেন। অতঃপর আস্তিনে কিতাবটি রেখে নামায পড়ালেন। এরপর আবার পড়া শুরু করলেন এবং পুরো কিতাবটি পড়ে নিলেন। পরে জিজ্ঞেস করলেন, হে খোরাসানী! এ নোমান বিন ছাবেত কে? আমি বললাম, ইনি একজন ইকারে। আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করেছি। আওয়ামী বললেন, ইনি একজন উচ্চ পর্যায়ের শায়খ। তুমি তাঁর নিকট গিয়ে আরো জ্ঞান অর্জন কর। এরপর আমি বললাম, ইনিই আবু হানিফা, যার নিকট যেতে আপনি আমাকে নিষেধ করেছেন।

উপরোক্ত ঘটনা সম্পর্কে 'উকুদুলজুমান' নামক কিতাবে আরো বর্ণিত রয়েছে যে, আব্দুল্লাহ বিন মুবারক বর্ণনা করেন, আবু হানিফা এবং আওয়ামী উভয় মক্কায় মিলিত হন। আওয়ামীকে দেখতে পেলাম তিনি ঐ সব মাসয়ালা নিয়ে আবু হানিফার সাথে আলোচনা করেছেন। আবু হানিফা ঐ মাসয়ালাগুলোকে আমি যেভাবে লিখেছিলাম তার চেয়েও স্পষ্ট দলীল দিয়ে বর্ণনা করেছেন। পরে আমি আওয়ামীর সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি স্বীকার করলেন যে, সত্যিই আবু হানিফার ইলমের প্রাচুর্য এবং জ্ঞানে পূর্ণতা ঈর্ষণীয়। আমি ভুল বুঝেছিলাম। তুমি তাঁর সাথে থেকে ইলম অর্জন কর।

ইমাম শাফেয়ী বলেন, যে ব্যক্তি ইমাম আবু হানিফার কিতাব অধ্যয়ন করবে না সে ফিকাহর গভীরতা অর্জন করতে পারবে না।

ইমাম মালেক (রহঃ) খালেদ বিন মাখলাদের নিকট আবু হানিফার কিতাবগুলো চেয়ে চিঠি পাঠান। তিনি সে সব কিতাব তাঁর নিকট পাঠিয়ে দেন।

আব্দুল্লাহ বিন দাউদ বলেন, আমাশ (রহঃ) একবার হজ্জ করার ইচ্ছা করলেন এবং বললেন, এমন কেউ আছে কি, যে আবু হানিফার নিকট থেকে আমাদের জন্য কিতাবুল মানাসিক লিখে আনবে?

নুসাইর বিন ইয়াহয়া বলখী বলেন, একবার আমি আহমদ বিন হাম্বলকে বললাম, আপনি আবু হানিফার সমালোচনা করেন কেন? তিনি বললেন, তাঁর

কিয়াস এবং রায়ের কারণে। আমি বললাম, ইমাম মালেক (রহঃ) তো কিয়াস করেছেন। ইমাম আহমদ বললেন, হ্যাঁ। তবে আবু হানিফার রায় এবং কিয়াস কিতাবে সংরক্ষিত হয়ে গেছে। এতে আমি বললাম, ইমাম মালেকের রায় এবং কিয়াসওতো কিতাবে আছে। ইমাম আহমদ বললেন, আবু হানিফা তাঁর চেয়ে অধিক কিয়াস করতেন। আমি বললাম, তাহলে আপনি তাঁদের উভয়ের হিস্যা অনুপাতে সমালোচনা করুন।

ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর রচনা এবং কিতাব সম্পর্কে তাঁর সমসাময়িকদের সাক্ষ্য প্রদানের পরও এ ধারণা রাখা যে, তিনি কোন কিতাব লিখেননি নিতান্ত অজ্ঞতার পরিচয়। বরং বাস্তব এটাই যে, ইমাম সাহেবের কিতাবসমূহ কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। ফকীহ এবং তদ্বিবিদগণ সেসব কিতাব দ্বারা উপকৃত হয়েছেন।

আল ইকমাল কিতাবে আবু হামেদ বিন ইসমাঈলের জীবনীতে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি আবু হানিফা এবং আবু ইউসুফের কিতাবসমূহ আহমদ বিন নসর থেকে শ্রবণ করেছেন। তিনি আবু সুলাইমান জুরজানী থেকে আর তিনি মুহাম্মদ থেকে এ কিতাবগুলো শ্রবণ করেছেন।

কাযী আবু আসেম মুহাম্মদ বিন আহমদ আমেরী হানাফী মাযহাবের একজন বড় ইমাম ছিলেন। তিনি বলেন, যদি আবু হানিফার কিতাবসমূহ বিনষ্ট হয়ে যায় তবে আমি সেগুলো স্মৃতি থেকে বলতে পারব। ১৪০ এবং ১৫০ হিজরীর মাঝে কয়েকজন ইমাম ফিকহীধারা অনুসারে কিতাব লিখেন। পরে সেগুলো তাদের শাগরেদদের বর্ণনা এবং কিতাবে রূপান্তরিত হয়ে যায়। সেগুলোর মূলকপি বিনষ্ট হয়ে যায়। ঠিক ঐ সময় ইমাম আবু হানিফাও কয়েকটি কিতাব লিখেন যেগুলো তাঁর নামেই পরিচিত হয়। উলামা এবং মুহাদ্দিছগণ সেগুলো থেকে ইলমী উপকার লাভ করেছেন। কিন্তু তৎকালীন প্রথা অনুসারে তাঁর শাগরেদগণ সেগুলোকে স্বীয় রচনার অন্তর্ভুক্ত করে নেন এবং সেগুলো পরে তাদের নামের সাথে সম্পর্কিত হয়ে যায়। তাঁর শাগরেদদের মধ্য হতে কাযী আবু ইউসুফ এবং মুহাম্মদ (রহঃ)-এর কয়েকটি কিতাব প্রকাশিত হয়েছে যেগুলো মূলতঃ তাঁদের উস্তাদ আবু হানিফার কিতাব। তাঁরা সেগুলোতে কিছুটা পরিবর্তন পরিবর্ধন করে উপস্থাপন করেছেন। এজন্য তাদের কিতাব হিসাবে পরিচিত হয়ে গেছে।

অবয়ব, পোষাক-পরিচ্ছদ, চালচলন এবং কথাবার্তা

ইমাম সাহেবের চেহারা ছিল অতিকমণীয় ও আকর্ষণীয়। তাঁর দেহ ছিল মধ্যাক্ষী। গায়ের রং ছিল গোধূমী। তিনি উত্তম পোষাক এবং সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। সুগন্ধির কারণে পূর্ব থেকেই তার আগমন বুঝা যেত। তিনি ছিলেন মিষ্টভাষী। তাঁর আওয়াজ ছিল সুমধুর। তিনি উত্তম জুতা ব্যবহার করতেন। মোজাও ব্যবহার করতেন। তাঁর কয়েকটি টুপি ছিল। জামে মসজিদের দরসী হালকায় কালো লম্বা টুপি ব্যবহার করতেন যা কৃফার ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। প্রয়োজনে তিনি পশমী কাপড়ও ব্যবহার করতেন।

জুমার দিন রেদা ও কামিস (লুঙ্গি এবং জামা) পরিধান করতেন যার মূল্য আনুমানিক চার দিরহাম ছিল। সাধারণতঃ ঘরে চাটাই বিছানো থাকত।

নযর বিন মুহাম্মদ বর্ণনা করেন, একদিন আমি ইমাম সাহেবের সাথে ফজরের নামায পড়লাম। ঐ সময়ে আমার গায়ে একটি কোমসী কম্বল ছিল। ইমাম সাহেব কোথাও যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। আমার কাছে কম্বলটি চাইলেন। ফেরৎ এসে বললেন, তোমার কম্বলের কারণে আমার লজ্জা হচ্ছিল। কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এটা মোটা। অথচ এ কম্বলটি আমার পছন্দের ছিল। এটা আমি পাঁচ দীনার দিয়ে খরিদ করেছি। এরপর আমি ইমাম সাহেবের গায়ে একটি কোমসী কম্বল দেখেছি যার মূল্য আমার ধারণায় ত্রিশ দীনার ছিল।

জেলখানায় বিষপানে মৃত্যু

শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক ইমাম সাহেব বহু নির্যাতিত হয়েছেন। উমাইয়া শাসনামলে ইরাকের আমীর ইবনে হুবাইরা তাঁকে কাযী পদের প্রস্তাব দিলে তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। এতে তাঁকে প্রতিদিন একটি আবর্জনাস্থলে নিয়ে দশটি করে দুররা মারা হত। এভাবে তাঁকে একশত দশটি দুররা মারা হয়। কিন্তু তারপরও তিনি কাযীপদ গ্রহণ করেননি। এরপর আব্বাসীয় শাসনামলে তাঁকে কাযী পদ গ্রহণ করার প্রস্তাব দেয়া হয়। তখনও তিনি উক্ত দায়িত্ব গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। অবশেষে তাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়।

কাযী পদ গ্রহণ না করায় দুররা মারা বা বিষপান করানোর নেপথ্যে কারণ ছিল অন্যটি। ইমাম সাহেবের মতে উমাইয়া এবং আব্বাসীয় শাসকগোষ্ঠী সঠিক পথ থেকে অনেক দূরে ছিল। অন্যায় অত্যাচারে সীমা অতিক্রম করত।

সুতরাং কাযীর পদ গ্রহণ করা জুলুমে সহযোগীতা করার শামিল ছিল। তখনকার সতর্ক এবং বিচক্ষণ আলেমদের চিন্তাধারা এটাই ছিল। তাঁরা রাষ্ট্রীয় কোন পদে কাজ করাকে পাপ মনে করতেন। তাঁদের এ ভাবমূর্তিতে আমীর এবং খলীফাগণ ভীত ছিল। কোন প্রকার বাহানা করে তাদেরকে নিজ মতানুসারী করার চেষ্টা করত। বিরাট অংকের অর্থ এবং বড় বড় পদ দিয়ে তাদের উপর চাপ সৃষ্টি করত। ইমাম সাহেবের সাথেও এরূপই করা হয়েছে। ইমাম সাহেব যেহেতু এসব বিষয়ের বিরুদ্ধাচারণ করেছেন এবং আলাভী আলেমদের ন্যায়সঙ্গত পক্ষ অবলম্বন করেছেন, তাই আবু জাফর মনসুর কাযীর পদ গ্রহণ না করার বাহানায় ইমাম সাহেবকে জেলখানায় বিষপান করান।

খতীব বাগদাদী যুফার বিন হুযাইলের উক্তি বর্ণনা করে বলেন, ইমাম সাহেব ইব্রাহীম বিন আদ্দিল্লাহ বিন হাসান বিন আলী বিন আবি তালিবের জোর সমর্থন করেন। আমি তাঁকে বললাম, মনে হচ্ছে আপনি আমাদের গলায় রশি লাগিয়ে ছাড়বেন। তখনই কুফার আমীর ঈসা বিন মুসার নিকট আবু জাফরের নির্দেশ এলো যে, আবু হানিফাকে আমাদের নিকট পাঠিয়ে দাও। ইমাম সাহেবকে বাগদাদ নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে তিনি পনের দিন জীবিত ছিলেন। অতঃপর তাঁকে বিষপ্রয়োগে মারা হয়।

ইব্রাহীম বিন আদ্দিল্লাহ তার ভাই মুহাম্মদ আনুফ সুয়যাকিয়া নিহত হওয়ার পর বসরায় আবু জাফরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। আবু জাফর তার চাচাত ভাই এবং কুফার আমীর ঈসা বিন মুসাকে পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে আসার নির্দেশ দিল। কুফার নিকটে বাখুমরা নামক স্থানে উভয় দলের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। ইব্রাহীম বিন আদ্দিল্লাহ যুদ্ধে মারা যান। এটা ১৪৫ হিজরীর ঘটনা। ইমাম সাহেব ইব্রাহীম বিন আদ্দিল্লাহর সমর্থক ছিলেন। হাফিয যাহাবী লিখেন, খলীফা মনসুর ইমাম সাহেবকে বিষপান করায়। তিনি ইব্রাহীমের সমর্থন করার কারণে শাহাদাত লাভ করেন।

অন্যান্য জীবনী লিখকগণও এ ঘটনা অনুরূপভাবে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম সাহেবকে আবু জাফর মনসুরের সামনে নেয়া হলে তাঁকে কাযী পদের প্রস্তাব দেয়া হয়। তিনি অস্বীকৃতি জানালে তাকে জেলে পাঠান হয়। সেখানেই তিনি ১৫০ হিজরীতে বিষপ্রয়োগে শহীদ হন। তাঁর লাশ পাঁচজন সরকারী কর্মচারী বের করে আনে। অতঃপর তাঁকে গোসল দেয়া হয়। তাঁর জানাযায় পঞ্চাশ হাজারেরও অধিক লোক অংশ নিয়েছিল। ছয়বার জানাযার নামায পড়া হয়েছিল। পূর্ব বাগদাদের খায়যরান নামক কবরস্থানে তাঁকে দাফন

করা হয়। বাগদাদের কাযী হাসান বিন উমারা গোসল দেয়ার পর ইমাম সাহেবের প্রতি এভাবে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

হে আবু হানিফা! আল্লাহ আপনাকে রহম করুন, আপনি ত্রিশ বৎসর রোযা রেখেছেন। চল্লিশ বৎসর রাতে ঘুমাননি। আমাদের মধ্যে আপনি সবচেয়ে বড় ফকীহ, সবচেয়ে বড় আবেদ, সবচেয়ে বড় যাহেদ এবং সবচেয়ে বেশী সৎগুণের অধিকারী ছিলেন। নেক ও সুন্নাতের উপর মৃত্যুবরণ করেছেন। আপনার পরবর্তী লোকদেরকে দুঃখে রেখে গেলেন। উলামাদের সুনাম চলে গেল।

সামআনী বর্ণনা করেন, প্রচণ্ড ভীড়ের কারণে ছয়বার জানাযা পড়া হয়। শেষবার তাঁর পুত্র হাম্মাদ জানাযা পড়ান।

একবার কাযী হাসান বিন হাসান ইমাম সাহেবের কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, আল্লাহ তাআলা আপনার প্রতি রহম করুন। আপনি সলফদের সত্যিকার উত্তরসূরী ছিলেন। আপনি এমন শাগরেদ রেখে গেছেন যারা আপনার ইলমের উত্তরসূরী হতে পারেন। কিন্তু তাকওয়া পরহেযগারীতে আল্লাহর তৌফিকেই উত্তরসূরী হওয়া যায়।

একবার আব্দুল্লাহ বিন মুবারক বাগদাদ আগমন করলেন। তিনি ইমাম সাহেবের কবরের পাশে গিয়ে বললেন, আবু হানিফা! ইব্রাহীম নাখয়ী মারা যাবার পর তাঁর জা-নশীন (প্রতিভু) রেখে গেছেন। হাম্মাদ বিন সুলাইমান মারা যাবার পর তাঁর জা-নশীন রেখে গেছেন। কিন্তু আপনি মারা যাবার পর পৃথিবীর বুকে আপনার জা-নশীন কেউ নেই। একথা বলে অঝোরে কাঁদতে লাগলেন।

ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর মৃত্যুর পর তাকে সাধারণ কবরস্থানে দাফন না করে পৃথক স্থানে দাফন করা হল। খলীফা মনছুর তাঁর জানাযার নামাজ পড়তে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, ইমাম সাহেবকে সাধারণ কবরস্থানে দাফন না করে অন্যত্র দাফন করার কারণ কি?

উত্তরে বলা হল ইমাম সাহেব অছিয়ত করে গেছেন যে, তাকে যেন পৃথক স্থানে দাফন করা হয়। কারণ ইমাম সাহেবের মতে বাগদাদ শহরের ভূমি ভূমির মালিকদের থেকে জোরপূর্বক ছিনিয়ে আনা হয়েছে। এ ভূমির ব্যাপারে ইমাম সাহেবের ফতোয়া এটাই ছিল। আর তাঁর অছিয়ত এটাই ছিল যে, তাঁকে যেন এগন স্থানে দাফন না করা হয় যা অবৈধ উপায়ে অর্জিত হয়েছে।

এ কথা শুনে খলীফা মনছুর বলে উঠল, তাঁর জীবদ্দশায় এবং মৃত্যুর পর কে আমাদের তাঁর থেকে রক্ষা করবে!

সন্তান-সন্ততি

ইমাম সাহেবের সন্তানদের মধ্যে হাম্মাদ ব্যতীত অন্য কারো সন্ধান পাওয়া যায় না। তার নাম স্বীয় উস্তাদ হাম্মাদের নামানুসারে রেখেছেন। তিনি তাঁর পিতার উত্তরাধিকারী ছিলেন এবং তাকওয়া পরহেযগারীতে তার নমুনা ছিলেন। ফিকাহ এবং হাদীছের উসূল সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন। তার ছেলে ইসমাঈল মাগুনের খিলাফতের সময় বসরার কাযী ছিলেন। তিনি ছাড়াও আবু হাব্বান, উছমান এবং উমর নামে হাম্মাদের তিন পুত্র ছিলেন।

ইমাম সাহেবের জ্ঞানসূলভ কয়েকটি বাণী

জ্ঞান এবং প্রজ্ঞায় ইমাম সাহেব সমকালীন সবার শীর্ষে ছিলেন। তাঁর উপস্থিত বুদ্ধি এবং অনুধাবন শক্তি সর্বজনস্বীকৃত ছিল। তাঁর জ্ঞান-সূলভ বাণী বিভিন্ন কিতাবে উল্লেখ রয়েছে। তার কিছুমাত্র এখানে উল্লেখ করা হল।

☆ উলামায়ে দ্বীনের ঘটনা বর্ণনা করা, তাদের মজলিসে বসা আমাদের মতে অনেক ফিকহী মাসয়ালার আলোচনা হতেও উত্তম। কারণ তাদের বাণীতে এবং মজলিসে তাদের আদব এবং আখলাক ফুটে উঠে।

☆ কোন প্রয়োজনীয় কাজ সামনে এলে তা সমাধান না করে খাবার খেয়ো না। কারণ খাবার বুদ্ধি হ্রাস করে।

☆ সময়ের পূর্বেই যে ব্যক্তি মান সম্মান এবং নেতৃত্বের আশা করে, সারাজীবন সে অপমানিত থাকবে।

☆ যে ব্যক্তি দুনিয়ার জন্য ইলমে-দ্বীন শিখবে, সে তার বরকত থেকে বঞ্চিত হবে। তার অন্তরে ইলম দৃঢ় হবে না এবং তদ্বারা সে কাউকে উপকৃত করতে পারবে না।

☆ আল্লাহর উপর ঈমান আনা সবচেয়ে বড় ইবাদত এবং কুফর সবচেয়ে বড় পাপ।

☆ যে ব্যক্তি ফিকাহর জ্ঞান ব্যতীত হাদীছ অধ্যয়ন করে সে ঐ ব্যক্তির মত, যে ঔষধ বিক্রয় করে, কিন্তু সে জানে না কোনটি কি রোগের জন্য। তা চিকিৎসকরা জানে। অদুপ মুহাদ্দিছগণ হাদীছ জানেন। কিন্তু ফকীহর মুখাপেক্ষী হন।

☆ কোন স্থান থেকে কোন মহিলা উঠে গেলে ঐ স্থান যতক্ষণ পর্যন্ত উষ্ণ থাকে বসবে না।

☆ প্রথমাবস্থায় আমি গোনাহর কাজ অপমান এবং অসম্মানের ভয়ে বর্জন করতাম। পরে তা আমার দ্বীন এবং দিয়ানতে পরিণত হয়ে গেলো।

☆ কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে আমাকে দাঁড় করান হলে হযরত আলী এবং হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। বরং যে সব কাজের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, সে সম্পর্কেই আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ঐ সব কাজে লিপ্ত থাকাই আমার জন্য উত্তম।

ইমাম সাহেব এ কবিতা পড়তেন,

‘তোমাদের দান হতে আরশের অধিপতির দান উত্তম। তাঁর দান অতি প্রশস্ত যার আশা এবং প্রতীক্ষা করা হয়। তোমরা যে অনুগ্রহ কর তা তোমাদের বলে বেড়ানোর দ্বারা বিনষ্ট হয়ে যায়। আর আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ এসব দোষ হতে পবিত্র।’

ইমাম আযম আবু হানিফা (রহঃ) তাঁর দুই বিশিষ্ট ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইউসুফ বিন খালেদ (রহঃ)-এর নিকট দু’টি চিঠি লিখেন। এ চিঠি দু’টিতে মূলতঃ ইসলামী শিক্ষার সারমর্মের সমাবেশ ঘটেছে। নিম্নে চিঠি দু’টির অনুবাদ উল্লেখ করা হল।

প্রথম চিঠিটি ইমাম আবু ইউসুফের (রহঃ) নামে,

হে ইয়াকুব! (ইমাম আবু ইউসুফের নাম ইয়াকুব) বাদশার সম্মান কর এবং তার মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখ। তার সামনে কখনো মিথ্যা কথা বলো না। কোন ইলমী প্রয়োজন ব্যতীত তার নিকট যখন তখন উপস্থিত হয়ো না। কারণ, তুমি যদি তার সাথে অধিক মেলামেশা কর তবে তার দৃষ্টিতে হীন হয়ে পড়বে এবং তোমার মর্যাদা কমে যাবে। সুতরাং তুমি তার সাথে এমন আচরণ কর যেমনটি আঙনের সাথে কর। তার দ্বারা উপকৃত হবে এবং তার নিকট থেকে দূরে থাকবে, তার নিকট যাবে না। কারণ বাদশাহ অপরের প্রতি সে মনোযোগ দেয় না যা নিজের প্রতি দেয়। তার সামনে অধিক কথা বলো না। কারণ সে তার নিকট উপস্থিত ব্যক্তিদের নিকট একথা প্রমাণ করার জন্য তোমার ভুল ধরবে যে, সে তোমার চেয়ে অধিক জ্ঞান রাখে। আর সে তোমার ভুল ধরার কারণে তার সহচরদের দৃষ্টিতে তুমি হেয় হয়ে যাবে। তুমি যখন তার নিকট যাবে তখন তোমার মর্যাদা এবং অন্যদের মর্যাদার মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তার প্রতি যেন লক্ষ্য থাকে।

আর যখন তার নিকট তোমার অপরিচিত কোন আলেম উপস্থিত থাকে

তখন তার নিকট যেয়ো না, কারণ তুমি যদি ইলমী মর্যাদায় তার চেয়ে হীন হও আর অজ্ঞতাবশতঃ তার চেয়ে জ্ঞানী প্রমাণ করতে চাও তবে তোমার ক্ষতি হবে। আর যদি তার চেয়ে জ্ঞানী হও এবং কোন ব্যাপারে তাকে ধমক দাও, তবে বাদশার সুদৃষ্টি তোমার উপর থাকবে না।

আর যখন সে তোমাকে কোন পদ দান করে তবে তা গ্রহণ করো না। তবে তুমি যদি জানতে পার যে, সে তোমার মাযহাবের ইলম এবং কাযা (বিচার) সম্পর্কে নিশ্চিত, তবে তা গ্রহণ করতে পার। এটা এ কারণে যে, যেন অন্য কোন মাযহাব অনুসারে ফয়সালা করতে না হয়। বাদশার সহচর কিংবা বন্ধুবান্ধবদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করবে না। শুধুমাত্র সুলতানদের সাথে সম্পর্ক রাখবে এবং তার সহচরবৃন্দ থেকে দূরে থাকবে। এতে তোমার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকবে।

সাধারণ লোকদের সামনে দ্বীনি মাসয়ালা কিংবা প্রয়োজনীয় কথা ব্যতীত অন্য কথা বলবে না। আর সাধারণ লোক কিংবা ব্যবসায়ীদের সাথে শুধুমাত্র ইলম সম্পর্কিত কথাবার্তা বলবে, যেন তাদের এধারণা না হয় যে মালের প্রতি তোমার আসক্তি রয়েছে। কারণ এতে তোমার প্রতি তাদের ধারণা খারাপ হয়ে যাবে এবং এ বিশ্বাস করবে যে, তাদের নিকট থেকে তোমার ঘুষ নেয়ার লিপ্সা রয়েছে। সর্বসাধারণের সামনে তুমি হাসবে না এবং বাজারে অধিক যাবে না। শূশ্রহীন বালকদের সাথে কথা বলো না। এতে ফিতনায় পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। তবে শিশুদের সাথে কথা বলায় এবং তাদের মাথা মুছে দেয়ার কোন দোষ নেই।

বয়োবৃদ্ধ এবং সাধারণ লোকদের সঙ্গে একসাথে রাস্তায় চলো না। কারণ তুমি যদি তাদের আগে যেতে দাও তবে ইলমে দ্বীনের অপমান হবে। আর যদি তাদের আগে যাও তাও দোষনীয়। কারণ রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করেনা এবং বড়দের সম্মান দেখায় না সে আমাদের মধ্য হতে নয়।

মানুষ চলার পথে বসো না। যদি বসার প্রয়োজন হয় তবে মসজিদে গিয়ে বসো। বাজারে কিংবা মসজিদে কিছু খেয়ো না। পানির 'সবীল' (যেখানে ভ্রমণকারীদের জন্য বিনামূল্যে পানির ব্যবস্থা রয়েছে।) হতে কিংবা সেখানকার নির্ধারিত ব্যক্তির হাতে পানি পান করো না। দোকানে বসো না। মখমল, অলংকার এবং রেশমী পোষাক পরিধান করো না। এতে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি হয়।

স্বীয় প্রাকৃতিক প্রয়োজন মিটানোর সময় প্রয়োজনীয় কথাবার্তা ব্যতীত স্ত্রীর

সাথে বিছানায় অধিক কথা বলো না। তার সাথে অধিক ছোঁয়াছুয়ি করো না। আল্লাহর যিকির ব্যতীত তার নিকট যেয়ো না।

অন্যদের স্ত্রী কিংবা বাঁদী সম্পর্কে তার সাথে কথা বলো না। এতে সে তোমার সাথে কথাবার্তায় বেপরোয়া হয়ে যাবে। এরও সম্ভাবনা রয়েছে যে, তুমি যখন অন্যের স্ত্রী সম্পর্কে আলাপ করবে সেও তোমার সামনে অন্য পুরুষ সম্পর্কে আলাপ করবে।

আর সম্ভব হলে এমন মেয়েকে বিয়ে করো না যার পূর্ব স্বামী কিংবা পূর্বস্বামীর দিকের কন্যা বা পিতা রয়েছে। হ্যাঁ এ শর্তে বিবাহ করতে পার যে, তার কোন আত্মীয় তোমার ঘরে তার নিকট আসবে না।

কারণ মেয়েলোক যদি সম্পদশালী হয় তবে তার পিতা দাবী করে যে, সমস্ত সম্পদ তার এবং এখন তা তার নিকট ধারস্বরূপ এবং এ শর্তে যে, যথাসম্ভব সে তার পিতার ঘরে যাবে না। আর বিয়ের পর তুমি শ্বশুরালয়ে বাসররাত্রি যাপন করতে সম্মত হয়ো না। নচেৎ তারা তোমার মাল নিয়ে নিবে এবং মেয়ের ব্যাপারে অনেক কিছুর লালসা করবে।

এমন মেয়েলোককে বিয়ে করো না যার সন্তান-সন্ততি রয়েছে। কারণ সে সমস্ত সম্পদ তাদের জন্য সঞ্চয় করে রাখবে এবং তোমার মাল থেকে নিয়ে তাদের জন্য ব্যয় করবে। কারণ তার সন্তান তার নিকট তোমার চেয়ে অধিক প্রিয়। দু'স্ত্রীকে এক বাড়ীতে রেখো না। স্ত্রী পরিজনের ব্যয় বহন করার ক্ষমতা না হওয়া পর্যন্ত বিয়ে করো না।

প্রথমে জ্ঞান অর্জন কর। এরপর মাল সঞ্চয় কর এবং এরপর বিবাহ কর। কারণ তুমি যদি শিক্ষার সময় মালের অধ্বেষণে থাক তবে শিক্ষার্জন থেকে অপারগ হয়ে পড়বে। সঞ্চিত সম্পদ তোমাকে দাস-দাসী ক্রয় করার প্রতি উৎসাহিত করবে। এভাবে শিক্ষা গ্রহণের পূর্বেই তুমি দুনিয়া এবং স্ত্রীদের সংস্রবে থাকার কারণে সময়ের অপব্যবহার হবে এবং পরিবার-পরিজন বেড়ে যাবে। তাদের প্রয়োজন মিটাতে তোমাকে ব্যস্ত থাকতে হবে। ফলে ইলম শিখা হবে না।

যৌবনের প্রথম থেকেই ইলম অর্জন করা শুরু কর-যখন তোমার দিল ও দেমাগ দুনিয়ার ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকে। এরপর মাল সঞ্চয় কর। কারণ সন্তান-সন্ততির আধিক্য অন্তরকে অস্থির করে তুলে। যখন মাল সঞ্চয় হবে তখন বিয়ে করো।

সর্বদা অন্তরে আল্লাহর ভয় রেখো। আমানত আদায় করো। সর্বশ্রেণীর লোকদের উপকার করো। লোকদের হয়ে জ্ঞান করো না। নিজের এবং লোকদের ইয়্যত করো। তাদের মেলামেশার পূর্বে তুমি তাদের সাথে অধিক মেলামেশা করো না। মাসয়ালার আলোচনার মাধ্যমে তাদের সাথে মেলামেশা করো। তাদের মধ্যে যদি যোগ্য লোক থাকে তবে উত্তর দিবে।

সাধারণ লোকের সাথে ইলমে কালাম (আকীদা জাতীয়শাস্ত্র) নিয়ে আলোচনা করো না, তারা তোমার অনুসরণ করে এতে লিপ্ত হতে পারে। (যা তাদের জন্য ক্ষতিকর।)

কেউ যদি তোমাকে কোন মাসয়ালার জিজ্ঞেস করে তবে শুধুমাত্র সেটার উত্তর দিও। এর সাথে অন্যকিছু সংযোজন করো না। কারণ এতে তার প্রশ্নের উত্তর তোমাকে দুষ্চিন্তায় ফেলতে পারে।

ইলম হতে কোন সময়েই বিমুখ হয়ো না, যদিও দশ বছরেও জীবিকা অর্জিত না হয়। কারণ যদি ইলম হতে বিমুখ হও তবে তোমার জীবিকা সংকীর্ণ হয়ে যাবে।

যারা তোমার নিকট ফিকাহ শিখতে আসবে তাদের প্রতি স্বীয় ছেলের মত লক্ষ্য রাখবে। এতে শিক্ষার প্রতি তাদের আগ্রহ বাড়বে।

সাধারণ লোক কিংবা বাজারের লোক যদি ঝগড়া করে তবে তাদের সাথে ঝগড়া করতে যেয়ো না। এতে তোমার অসম্মান হবে।

সত্য কথা বলার সময় কারো মাহাত্ম বা ঐশ্বর্যের প্রতি লক্ষ্য করো না- যদিও সে সুলতান বা বাদশাহ হয়।

অন্যেরা যে পরিমাণ ইবাদত করে তুমি তার চেয়ে অধিক ইবাদত করো। কারণ সাধারণ লোক যে পরিমাণ ইবাদত করে তুমি যদি তার অধিক ইবাদত না কর তবে তারা ধারণা করবে যে, ইবাদতের প্রতি তোমার আগ্রহ কম। এরূপ ধারণাও করবে যে, তাদের অজ্ঞতা তাদেরকে যে উপকার দিয়েছে তোমার জ্ঞান তোমাকে তার অধিক কিছুই দেয়নি।

যদি এমন কোন শহরে যাও যেখানে আহলে ইলম রয়েছেন, তবে সেটাকে আপন ধর্ম মত প্রচারের স্থল হিসাবে গ্রহণ করো না। বরং সাধারণ একজন শহরবাসীর মতই সেখানে অবস্থান করো যেন তারা জানতে পারে যে, তাদের মান-সম্মানের সাথে তোমার কোন সম্বন্ধ নেই। নচেৎ তারা তোমার বিরুদ্ধাচরণ শুরু করবে এবং তোমার মায়হাব সম্পর্কে বিদূষ করবে। আর সাধারণ লোকও

তোমার বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং হীন দৃষ্টিতে তোমার দিকে তাকাবে ফলে তুমি অনর্থক তাদের দৃষ্টিতে ভৎসনার পাত্র হবে।

আর যদি তোমাকে কোন মাসয়ালা জিজ্ঞেস করে তবে মুনাযারা-মুবাহাছা করো না। সুস্পষ্ট প্রমাণ ব্যতীত তাদের নিকট কোন কিছু উল্লেখ করো না। আর তাদের উস্তাদ সম্পর্কে ভৎসনা করো না নচেৎ তারাও তোমাকে বিদূপ করবে। অন্যদের সম্পর্কে সতর্ক থাকো।

তোমার বাহ্যিক অবস্থার মত তোমার ভিতরের অবস্থাও খালেছ আল্লাহর জন্য কর। আর ইলম ততক্ষণ পর্যন্ত সংশোধন হবে না যতক্ষণ না তার বাতেন অর্থাৎ ভিতরের অবস্থাকে যাহের অর্থাৎ বাহিরের অবস্থার মত করা হয়।

সুলতান বা রাষ্ট্রপতি তোমাকে কোন দায়িত্ব অর্পণ করেন যা তোমার জন্য সমীচীন নয় তবে তা গ্রহণ করো না। হ্যাঁ, তুমি যদি জানতে পার যে, তোমার ইলমের জন্যই এ দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তবে গ্রহণ করো। ভীত অবস্থায় চিন্তা-ভাবনামূলক কথা বলা না। কারণ এতে কথাবার্তায় ভুল-ত্রুটি হয় এবং জিহ্বায় জড়তার সৃষ্টি হয়। অধিক হেসো না। এতে অন্তর মরে যায়। নিশ্চিত হয়ে চলো। কাজকর্মে তাড়াহুড়া করো না। যদি কেউ পশ্চাৎ হতে তোমাকে ডাকে তবে তার জবাব দিও না। কারণ পশুদের পশ্চাৎ হতে ডাকা হয়। কথাবার্তার সময় চিৎকার করো না এবং উচ্চ আওয়াজে কথা বলা না। নীরবতা এবং ধীরস্থিরতা অবলম্বন কর। এতে মানুষের নিকট তোমার দৃঢ়তা প্রকাশ পাবে। মানুষের সামনে আল্লাহর যিকির অধিক কর যেন লোকজন তোমার নিকট থেকে এ গুণ অর্জন করতে পারে। নামাযের পর আল্লাহর যিকির ও কোরআন তেলাওয়াতের নিয়ম করে নিবে। আল্লাহ তাআলা তোমাকে ধৈর্যের যে গুণ দিয়েছেন এবং অন্যান্য যে নেয়ামত দিয়েছেন তার জন্য আল্লাহর শোকর আদায় কর। প্রতিমাসে নির্দিষ্ট কিছুদিন রোযা রাখার অভ্যাস গড়ে তোল, যেন অন্যেরা এ বিষয়ে তোমার অনুসরণ করতে পারে। তুমি নিজের প্রতিটি কাজকর্মের প্রতি লক্ষ্য রাখবে এবং অন্যের প্রতি দৃষ্টি রাখবে যেন তোমার ইলম দ্বারা দুনিয়া এবং আখেরাতে উপকৃত হতে পার।

তুমি নিজে ক্রয়-বিক্রয় করো না। বরং এমন একজন খাদেম রাখ যে সঠিকভাবে তোমার এসব প্রয়োজন মেটাতে এবং তুমি তার উপর এসব ব্যাপারে নির্ভর করতে পারবে।

তুমি দুনিয়া কিংবা তোমার বর্তমান থেকে নিশ্চিত থাকো না। কারণ আল্লাহ তাআলা তোমাকে এসব কিছু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। শাশুবিহীন

বালক গোলাম ক্রয় করো না।

সুলতানদের সাথে তোমার নৈকট্য এবং বিশেষ সম্পর্কের কথা কারো নিকট প্রকাশ করো না, যদিও তোমার আপনজন হয়। কারণ মানুষ সুলতানদের সাথে তোমার নৈকট্যের বিষয় জানতে পারলে সুলতানদের নিকট তাদের প্রয়োজনের কথা উত্থাপন করতে বলবে। তুমি যদি তা কর তবে তোমার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে আর যদি না কর তোমাকে দোষী করবে।

ভুল বিষয়ে মানুষের অনুসরণ করো না। বরং সঠিক বিষয়ে তাদের অনুসরণ কর। কোন ব্যক্তির মধ্যে যদি কোন দোষ দেখ তবে তার সে দোষসহ তার আলোচনা করো না বরং তার কোন ভাল গুণের অনুসন্ধান করে তা সহ তার আলোচনা কর। তবে দ্বীনের ব্যাপারে যদি কোন দোষ দেখ, তা মানুষকে জানিয়ে দাও যেন তারা তার অনুসরণ না করে তার থেকে দূরে থাকে। রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ‘ফাসেক ব্যক্তি যে খারাপগুণে লিপ্ত তা প্রচার করে দাও যেন লোকজন তার অপকার থেকে বেঁচে থাকতে পারে। যদিও সে সম্মানী ব্যক্তি হয়।

কারো মধ্যে ধর্মীয় ব্যাপারে যে ত্রুটি দেখ তাও বর্ণনা করে দাও। তার মান-মর্যাদার দিকে লক্ষ্য করে ভীত হয়ো না। কারণ আল্লাহ তাআলা তোমার এবং দ্বীনের সহায়ক। একরূপ যদি একবার কর, তবে মানুষ তোমাকে ভয় করবে এবং কেউ দ্বীনের মধ্যে বিদআত সৃষ্টি করতে সাহস পাবে না।

সুলতানদের মধ্যে যদি ইলমে দ্বীনের পরিপন্থী কোন বিষয় দেখ, তবে তার আনুগত্য প্রকাশ করে তাকে তা প্রকাশ করে দাও কারণ তার হাত তোমার হাত হতে অধিক শক্তিশালী। তুমি একরূপ বলবে, আপনার রাজত্বের প্রতি এবং ক্ষমতার প্রতি আমার আনুগত্য আছে। তবে আপনার অমুক অভ্যাস যা ইলমে দ্বীনের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, সে ব্যাপারে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। একরূপ একবার করলেই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। বারবার একরূপ করলে তোমার সাথে তাদের কঠোর আচরণের সম্ভাবনা রয়েছে-যা দ্বীনের জন্য অপমানজনক। সে যদি একবার কিংবা দু’বার খারাপ আচরণ করে এবং দ্বীনি বিষয়ে তোমার প্রচেষ্টা এবং সংকাজে আদেশের প্রতি তোমার আগ্রহ দেখে আবার সে কাজে লিপ্ত হয় তবে এককভাবে তার নিকট গিয়ে তাকে নসীহত কর। সে যদি বিদআতী হয় তার সাথে মুনাযারা কর। আর যদি সুলতান হয় তবে কোরআন হাদীছের যা কিছু তোমার স্মরণে আছে তা তাকে স্মরণ করিয়ে দাও। সে যদি তা কবুল করে তবে তো ভাল। নচেৎ আল্লাহর নিকট দোয়া কর যেন তিনি তোমাকে তার

অনিষ্ট থেকে হিফায়তে রাখেন আর মৃত্যুর স্মরণ করতে থাক।

তোমার শিক্ষকদের জন্য, যাদের নিকট থেকে ইলম অর্জন করেছ ইস্তেগফার করতে থাক। সবসময়ে কোরআন তিলাওয়াত করতে থাক। কবরস্তান, মাশায়েখ এবং পবিত্রস্থানগুলো অধিক পরিমাণ যিয়ারত করতে থাক।

সাধারণ লোকের স্বপ্ন, যা নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিংবা মুয়ুর্গদের সম্পর্কীয় হয় মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করো। দ্বীনের দিকে আহবান করার উদ্দেশ্য ব্যতীত দুনিয়াদার লোকদের সাথে বসো না। অধিক খেলাধুলা এবং গালাগালি করো না।

আযান হয়ে গেলে মসজিদে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ কর যেন সাধারণ লোকেরা তোমার আগে যেতে না পারে। সুলতানের কাছাকাছি বসবাস করো না। তোমার প্রতিবেশীর মধ্যে দোষণীয় কোন কিছু পেলে তা সুলতানের নিকট প্রকাশ করো না। এটা আমানতদারী। মানুষের গোপন কথা প্রকাশ করো না। কেউ যদি তোমার নিকট কোন পরামর্শ কামনা করে, তবে তোমার জ্ঞানানুসারে তাকে সঠিক পরামর্শ দাও। এতে তুমি আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে।

আমার এ নসীহতগুলো তুমি গ্রহণ কর। ইনশাআল্লাহ ইহকালে এবং পরকালে উপকৃত হবে।

কৃপণতা করো না। এতে লোক ঘৃণিত হয়। অধিক লালায়িত কিংবা মিথ্যাবাদী হয়ো না। সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না। প্রত্যেক বিষয়ে তোমার মনুষ্যত্ব হিফায়ত করো। সর্বাবস্থায় সাদা পোশাক পরিধান কর।

দুনিয়ার প্রতি অনীহা দেখিয়ে স্বীয় ঐশ্বর্য প্রকাশ কর। নিজেকে ঐশ্বর্যশালী প্রকাশ কর। তুমি গরীব হলেও তা প্রকাশ করো না।

সাহসী হও। যার সাহস কম তার মর্যাদাও কম। রাস্তায় চলাকালে এদিক ওদিক তাকিও না। হাম্মামখানায় গেলে তার ভাড়া এবং বৈঠকখানার ভাড়া অন্যদের সমান দিও না। বরং তার চেয়ে অধিক দিও। এতে তাদের মাঝে তোমার দানশীলতা প্রকাশ পাবে এবং তোমাকে সম্মান করবে। নিজ হাতে গোলা কিংবা কারিগরের নিকট স্বীয় জিনিসপত্র দিবে না। বরং এ সমস্ত কাজের অন্য নির্ভরযোগ্য একজন কর্মচারী রাখ।

দিনার ও দেহহাম বেচাকেনায় সতর্ক থাকো। দেহহামের ওজন নিজে করো না। এ ব্যাপারে অন্যের উপর নির্ভর করো। দুনিয়ার সম্পদ যা আহলে ইলমদের নিকট মূল্যহীন সেটাকে হীন জ্ঞান করো। কারণ আল্লাহর নিকট যা আছে তা এ

থেকে অনেক উত্তম। তোমার সর্বপ্রকার কাজকর্ম অন্যের উপর ন্যস্ত করে দাও। যেন ইলমে দ্বীনের প্রতি অধিক মনোযোগী হতে পারে। এ পদ্ধতিতে কাজ করলে তোমার প্রয়োজন অধিকতর সুন্দরভাবে মিটবে।

অপ্রকৃতস্থ লোকদের সাথে এবং আহলে ইলমদের মধ্যে যারা মুনাযারার নিয়ম-কানুন সম্পর্কে অজ্ঞ তাদের সাথে আলোচনা করো না। যারা মান সম্মানের আকাজ্বী, তারা অন্যদের ব্যাপারে আশ্চর্য মাসয়ালা বর্ণনা করে। তারা তোমাকে লজ্জিত করতে চাইবে। তোমার মর্যাদার প্রতি তারা ক্রক্ষেপও করবে না। যদিও তুমি সত্যের উপর থাক।

যদি কখনও মর্যাদাশীল লোকদের নিকট যাও তবে তাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দেখাতে যেও না- যে পর্যন্ত তারা তোমাকে শ্রেষ্ঠত্বের দরুন মর্যাদা না দেয়। নচেৎ তাদের পক্ষ থেকে তোমার ক্ষতি হতে পারে।

মানুষের সামনে নিজে এগিয়ে ইমামতি করতে যেয়ো না। যদি না তারা তোমাকে সম্মান দেখিয়ে ইমামতির অনুরোধ করে।

দুপুরে কিংবা সকালে হাম্মামে যেয়ো না। ভ্রমণাস্থানে কখনও যেয়ো না। বাদশাহর জুলুমের স্থানে উপস্থিত থেকো না। তবে তোমার যদি এ বিশ্বাস হয় যে, জুলুম থেকে তাদেরকে বিরত রাখতে পারবে তাহলে যেয়ো। কারণ তোমার উপস্থিতিতে যদি অন্যায় কাজ হয় তবে তোমার বাধা না দেয়ার কারণে মানুষ সেটাকে বৈধ মনে করতে পারে।

শিক্ষা মজলিসে কখনও ক্রোধান্বিত হয়ো না। সাধারণ লোকের নিকট কখনও কিস্সা কাহিনী বর্ণনা করো না। কারণ কিস্সা বলতে গিয়ে মিথ্যে বলতে হয়।

তুমি এ উদ্দেশ্যে কোথাও বসো না যে, তোমার উপস্থিতিতে কেউ দরস বা শিক্ষা দান করবে আর তুমি তার যোগ্যতা যাচাই করবে; বরং এর জন্য অন্য কাউকে পাঠিয়ে তার মাধ্যমে অবস্থা জেনে নাও।

কেউ যদি কোন ঝিকির বা ওয়াজ মাহফিল করে আর সেখানে তোমার উপস্থিতি কামনা করে এজন্য যে, তুমি উক্ত মাহফিলে তার সাফাই বর্ণনা করবে তাহলে তুমি নিজে সেখানে যেয়ো না বরং কোন শাগরেদদের সাথে নির্ভরযোগ্য অন্যান্য লোকদেরকে পাঠিয়ে দাও।

বিবাহ পড়ানোর কাজ অন্য কোন লোক খতীব ও ইমামের উপর ন্যস্ত করে দাও। এমনিভাবে ঈদ ও জুমআর নামাযের ইমামতের দায়িত্বও অন্যকে অর্পণ করে দাও।

সর্বশেষ উপদেশ হল নেক দোয়ায় আমাকে কখনও ভুলবে না। আর এসব উপদেশ আমার পক্ষ থেকে মনে প্রাণে গ্রহণ করে নাও। সাথে সাথে এটাও মনে রেখো যে, এসব উপদেশ আমি তোমাকে নিছক দ্বীন স্বার্থে দান করেছি।

ইউসুফ বিন খালেদ সমতী (রহঃ) ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) থেকে শিক্ষা গ্রহণ শেষে স্বদেশ বসরায় প্রত্যাবর্তনের অনুমতি চাইলে তিনি বললেন, আমি তোমাকে কিছু নসীহত করব যা তোমার জন্য সর্বক্ষেত্রে উপকারী প্রমাণিত হবে। এ নসীহতগুলো দ্বীন এবং দুনিয়ার প্রতি পর্যায়ে কাজে লাগবে।

স্মরণ রেখো! তুমি যখন লোক সমাজকে খারাপ জানবে, তখন তারা তোমার শত্রুতে পরিণত হবে। এমনকি তোমার মাতা-পিতা হলেও। আর যখন তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে তারা তোমার জন্য মাতা-পিতার ন্যায় হয়ে যাবে।

ইউসুফ বিন খালেদ বলেন, অতঃপর ইমাম সাহেব আমাকে বললেন, ধৈর্য সহকারে আমাকে কিছু কথা বলতে দাও। আমি তোমাকে এমন সব বিষয় বলব যেগুলো তুমি স্বীকার করে নিয়ে শুকরিয়া আদায় করতে বাধ্য হবে।

একটু পরে বললেন- মনে কর আমি তোমার সাথে রয়েছি তুমি বসরায় প্রবেশ করলে এবং তোমার প্রতিদ্বন্দীদের প্রতি মনোযোগ দিলে, নিজেকে তাদের উপর মর্যাদা দিতে লাগলে। ইলমের কারণে নিজেকে তাদের চেয়ে বড় মনে করতে লাগলে, তাদের সাথে চলাফেরা করা থেকে দূরে রইলে। তাদের বিরোধিতা শুরু করলে। তারাও তোমার বিরোধিতা করতে লাগল। তুমি তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে। তারাও তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল। তুমি তাদের গালি দিলে। তারাও তোমাকে গালি দিল। তুমি তাদের পথভ্রষ্ট বললে। তারাও তোমাকে তা বলল। পরিণামে তোমাকে সেখান থেকে দূরে কোথাও সরে যাওয়ার দরকার হলো। এটা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। সে ব্যক্তিকে কখনও জ্ঞানী বলা যায় না যার সৌজন্যমূলক আচরণ করার প্রয়োজন অথচ সে তা করে না।

তুমি বসরায় প্রবেশ করলে লোকেরা তোমাকে অভ্যর্থনা জানাবে। তোমার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসবে। তোমার হুক (অধিকার) জানবে। প্রত্যেককেই তার মান অনুপাতে মর্যাদা দিও। সম্মানিতদের সম্মান দেখাও। আহলে ইলমদের তায়ীম কর। বৃদ্ধদের শ্রদ্ধা কর। অল্প বয়স্কদের সাথে নম্র ব্যবহার কর। সাধারণ লোকদের নিকটে থাকো। ভাল-মন্দ প্রত্যেকের সাথে ভদ্র ব্যবহার কর। সুলতানকে অপমান করো না। কাউকে হীন জ্ঞান করো না। ভদ্রতা দেখাতে

ক্রটি করো না। কারো নিকট নিজের গোপন কথা বলো না। পরীক্ষা করা ব্যতীত কারো উপর বিশ্বাস রেখো না। অভদ্র এবং হীন চরিত্রের লোকদের বিশ্বাস করো না। যে তোমাকে অপছন্দ করে তার সাথে মহব্বত প্রকাশ করো না। আহমকদের সাথে মিলিত হয়ে খুশী প্রকাশ করো না। তার দাওয়াতেও যেও না। হাদিয়াও গ্রহণ করো না।

সর্বদা নম্র ব্যবহার করবে। ধৈর্য-সহ্যের গুণ তোমার মধ্যে থাকা চাই। সুন্দর চরিত্র অবশ্যই নিজের জন্য আবশ্যকীয় করে নিবে। অন্তর প্রশস্ত রাখবে। উত্তম পোষাক পরিধান করবে এবং সুগন্ধী ব্যবহার করবে। একটা সময় নির্দিষ্ট করে নিয়ে, স্বীয় সাথীদের খোঁজ-খবর রাখবে। অধিক তিরস্কার-ভৎসনা করো না। এতে উপদেশদাতা অপমানিত হয়। তোমাকে আদব বা শিষ্টাচার শিখাবে ঐ সুযোগ দিও না।

নামাযের পাবন্দী করো। দানশীলতা অবলম্বন কর। কারণ কৃপণ কখনো নেতৃস্থানীয় হতে পারে না। মানুষের অবস্থা সম্পর্কে তোমাকে অবগত করার মত একজন লোক থাকা চাই। যখন কোন দোষ জানতে পারবে অতিসত্ত্বর তা সংশোধন করবে আর যদি কোন গুণ সম্পর্কে জানতে পার তবে সে ব্যাপারে তাকে আরও উৎসাহিত করবে।

যে তোমার সাথে দেখা সাক্ষাৎ করতে আসে তার সাথেও তুমি সাক্ষাৎ করতে যেয়ো। আর যে ব্যক্তি না আসে তার সাথেও সাক্ষাৎ কর।

সদাচারী ও অসৎ আচরণকারী উভয়ের সাথে তুমি সদাচার করো। ক্ষমার গুণ অবলম্বন কর। সৎকাজের নির্দেশ দাও। অনর্থক কাজের প্রতি মোটেই অক্ষিপ করো না। যে তোমাকে কষ্ট দেয় তাকে পরিহার করে চলো। অন্যের অধিকার আদায় করতে সচেষ্ট থেকো। তোমার ভাইদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে তুমি স্বয়ং গিয়ে তার পরিচর্যা করো। মাঝে মধ্যে অন্যের মাধ্যমেও তার খবরাখবর নিও।

যদি কেউ তোমার নিকট আসা-যাওয়া বন্ধ করে দেয় তবে তুমি তার নিকট যাওয়া-আসা বন্ধ করো না। কেউ তোমার উপর অত্যাচার করলে তুমি তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করো। কেউ তোমার নিকট আসলে তাকে সম্মান করো। কেউ তোমার সাথে অন্যায্য করলে তুমি তাকে ক্ষমা করে দিও। তোমার সম্পর্কে যদি কেউ বদমাম করে তুমি তার সম্পর্কে ভাল কথা বলো। কেউ মারা গেলে তুমি অধিকার (প্রাপ্য) আদায় করে দিও। কারো সুসংবাদ এলে তুমি তাকে অভিনন্দন জানিও এবং মুসিবতের সময় তাকে সমবেদনা জানিও।

কারো উপর যদি মুসিবত এসে পড়ে তবে তাতে দুঃখ প্রকাশ করো। কেউ যদি তোমার দ্বারা কোন কাজ করিয়ে নিতে চায় তবে তা করে দিও। তোমার নিকট কোন ফরিয়াদকারী এলে তার ফরিয়াদ শ্রবণ করো। কেউ সাহায্য চাইলে তাকে সাহায্য করো। মানুষের প্রতি ভালবাসা দেখিও। সকলের মাঝে সালাম ধ্যাপক করো। কেউ মসজিদে কিংবা তোমার নিকট কোন মাসয়ালা বর্ণনা করলে তার বিরোধিতা করো না।

তোমাকে যদি কোন মাসয়ালা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয় তবে মানুষের যা জানা থাকে তাই বলো। অতঃপর এরূপ বলো যে, এখানে আরও একটি মত রয়েছে। তা এরূপ এবং সেটা এ দলীলের ভিত্তিতে। তারা তোমার এরূপ কথা শুনলে তাদের অন্তরে তোমার মর্যাদা বাড়বে। কেউ তোমার সাথে মতবিরোধ করলে তাকে চিন্তা-ভাবনার মত ইলম দাও। ইলমের যা স্পষ্ট তা বলো। সূক্ষ্ম কথা বলো না। তাদের সাথে স্নেহ-ভালবাসা দেখিও। মাঝে মধ্যে হাসি কৌতুক করো। এতে মানুষের মাঝে তোমার ভালবাসা সৃষ্টি হবে এবং ইলমের চর্চা থাকি থাকবে। কখনো কখনো তাদের আহ্বার করিয়ে দিও। তাদের ছোট ছোট অপরাধের প্রতি শৈথিল্য দেখিও। তাদের প্রয়োজন মিটিয়ে দিও। তাদের সাথে মম্ব ব্যবহার করো। তাদের ক্ষমা করে দিও। কারো ব্যাপারেই মনের সংকীর্ণতা কিংবা কঠোরতা দেখিও না। তুমি তাদের সাথে এমনভাবে চলবে যেন তুমি তাদেরই একজন। তুমি তাদের জন্য তা পছন্দ করো যা নিজের জন্য কর।

তুমি স্বীয় নফসের হিফায়ত কর এবং তার অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখ। ফিৎনা থেকে দূরে থেকে। যে তোমার সাথে কঠোর আচরণ করে তুমি তার সাথে রুঢ় ব্যবহার করো না। কেউ যদি তোমার কথা মনোযোগ সহকারে শুনে তুমি তার কথা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করো। মানুষ তোমাকে যে কাজের জন্য মুকাল্লাফ (গাধ্য) করেনি তুমিও তাদের সে কাজের জন্য মুকাল্লাফ করো না। তারা নিজেদের ব্যাপারে যে বিষয়ের উপর সন্তুষ্ট, তুমিও তাদের জন্য সে বিষয়ের উপর সন্তুষ্ট থেকে। নেক নিয়তের সাথে মানুষকে স্বাগত জানাও। সর্বদা সততা অবলম্বন করো। অহংকার যেন তোমাকে স্পর্শ করতে না পারে।

কেউ তোমাকে ধোকা দিলেও তুমি কাউকে ধোকা দিও না। আমানত আদায় করো। যদিও কেউ তোমার খিয়ানত করে। অঙ্গীকার রক্ষা কর। ঠাকওয়া অবলম্বন কর। আহলে কিতাবদের সাথে সেরূপ আচরণ কর, যেরূপ তারা তোমার সাথে করে। তুমি যদি আমার এ নসীহত অনুযায়ী চল, তবে পক্ষল বিপদ হতে মুক্ত থাকবে বলে আশা করি।

আমার নিকট থেকে তোমার দূরে সরে যাওয়াটা আমাকে দুঃখিত করছে। আর এ ভেবে খুশী লাগছে যে, তুমি ভাল-মন্দের পরিচয় লাভ করবে। চিঠিপত্রের মাধ্যমে আমার সাথে সম্পর্ক রাখবে। তোমার প্রয়োজন সম্পর্কে আমাকে অবহিত করবে। এ সব বিষয়ে তুমি আমার জন্য সন্তান-স্বরূপ। কারণ আমি তোমার জন্য আপন পিতার মত।

রাজনৈতিক জীবন

ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর রাজনৈতিক জীবনকে তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম দুটি পর্যায় অপেক্ষার ছিল। এ সময়ে বিপ্লব করা যেতো, নিজের জীবন দিয়ে দেয়া যেতো। কিন্তু এতে ব্যক্তিগত উপকার অর্থাৎ শহীদ হওয়া ব্যতীত জাতির কোন উপকার হতো না। এ কারণে এ সময়ে ঘরোয়াভাবে পরিকল্পনার সাথে সাথে আইন প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়িত করার জন্য ব্যাপকভাবে আন্দোলন চালিয়ে যান। এ আন্দোলন সম্পূর্ণ রূপে সফল হয়।

যখন অপেক্ষার পালা শেষ হলো, আইন প্রণয়ন মজলিস স্বীয় কাজ সমাপ্ত এবং বিপ্লব দ্বারা ইসলামের স্বার্থ রক্ষা হবে বলে বিশ্বাস হল, তখন ইমাম সাহেব স্বীয় জীবন উৎসর্গ করে ব্যক্তিগত স্বার্থের সাথে সাথে জাতির রক্ষায় প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখেন- যা ইসলামী রাজনীতির ময়দানে অনুসরণীয় হয়ে থাকবে। এ পর্যায়টি হচ্ছে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর রাজনৈতিক জীবনের তৃতীয় পর্যায়।

ইমাম সাহেবের রাজনৈতিক জীবনের প্রথম পর্যায় কায়রোর বনী উমাইয়্যার অত্যাচার, এ সময়ে ইমাম সাহেবের রাজনৈতিক কর্মধারাঃ হযরত যায়দের সমর্থনে ফতোয়া এবং ব্যক্তিগতভাবে সহযোগিতা, গভর্নর ইবনে ছবায়রার নির্মম অত্যাচার এবং বনী উমাইয়্যার বিরুদ্ধে আব্বাসীয়দের আন্দোলনের সময়ে ইমাম সাহেবের হারমাইন শরীফে হিজরত।

দ্বিতীয় যুগে- আবু মুসলিম খোরাসানীর অন্যায়ের বিরুদ্ধে এককভাবে ইব্রাহীম সায়েগের বিদ্রোহ, ইমাম সাহেবের তাকে ব্যাপক বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা বুঝানো সত্ত্বেও তার ঈমানী আবেগের কারণে এককভাবে ঝাঁপিয়ে পড়া, জাতীয় স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রেখে ইমাম সাহেবের আইন প্রণয়ন এবং সংকলনের প্রতি মনোনিবেশ করা।

তৃতীয় যুগ- যা ইমাম সাহেবের রাজনৈতিক জীবনের শেষ পর্যায়ঃ যখন খলীফা আবু জাফর মনসুরের শাসনামলে ফিকাহ এবং ইসলামী আইন

সংকলনের কাজ সমাপ্ত হয় ইমাম সাহেব থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মীরা বিভিন্ন স্থানে কাজ শুরু করে দেন। অপর দিকে মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ নফসে যাকিয়্যা এবং ইব্রাহীম নফসে রাযিয়্যার নেতৃত্বে বিরাট একটি আন্দোলনের জাল বিস্তারের কাজ সম্পন্ন হয়েছিল। এ আন্দোলনটি সফল হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় ইমাম সাহেব এতে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েন।

কিন্তু তদবীরের মোকাবেলায় তকদীর ছিল শক্তিশালী; তাই দৃশ্যতঃ আন্দোলনকে দমন করে দেয়া হয়েছে। ইমাম সাহেবকে প্রতিশোধমূলক হত্যা করা হয়। এর বিনিময়ে ইমাম সাহেব ব্যক্তিগত স্বার্থ শাহাদাৎ লাভ ছাড়াও জাতীয় পর্যায়ে এতটুকু লাভ হয়েছে যে ফিকাহে হানাফীর সংকলিত আইন ৫৩০ বছর পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বে বাস্তবায়িত ছিল যার কোন নজীর মানব জগতে দেখা যায় না। শুধু তাই নয় বরং হানাফী ফকীহ এবং কাযীদের সম্মুখে আব্বাসীয়দেরকে অত্যাচারী খলীফাদের নত থাকতে হয়েছে।

ইমাম আযম আবু হানিফা (রহঃ) তখন আবির্ভূত হন যখন সারা বিশ্ব বনী উমাইয়্যার অত্যাচারে জর্জরিত ছিল। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রপৌত্রদ্বয়কে শহীদ করা হয়েছিল, হাররার ঘটনায় মদীনা মুনাওয়ারার পবিত্রতা নস্যাত করা হয়েছিল। দীর্ঘদিন যাবৎ মসজিদে নববীতে নামায পড়ার মত সায়ীদ মুসাইয়্যেব ব্যতীত আর কেউ ছিল না। হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রাঃ) কে বাইতুল্লাহর প্রান্তে শহীদ করা হয়েছিল।

ইমাম সাহেবের জন্মের সময় ইবনে যিয়াদ এবং এরপর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ গরীব এবং অসহায়দের উপর অত্যাচার চালায়।

হাসান বসরী, ইবনে সিরিন, ইব্রাহীম নখরী এবং ইমাম শাবী (রহঃ)-এর মত আহলে ইলম এবং বুয়ুর্গদের নিশ্চুপ থাকা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

মুসলিম বিশ্বের এ নাজুক অবস্থায় আল্লাহ তাআলা তাঁর দ্বীনের হিফাযতের জন্য এমন একজনকে খলীফা মনোনীত করলেন যিনি অন্যায-অত্যাচার করার পরিবর্তে মানুষের নিকট ঘোষণা করলেন যে, আল্লাহর নাফরমানীতে তোমরা আমার আনুগত্য করো না। এ সময় ইমাম সাহেব যৌবনে পদার্পণ করেছেন। খলীফা উমর বিন আব্দিল আযীযের এ ঘোষণায় তিনি প্রভাবান্বিত হন। তিনি হাম্মাদ বিন আবি সুলাইমানের দরসে শরীক হন।

এ দিকে খলীফা উমর বিন আব্দিল আযীযের মৃত্যু হলে ইয়াযীদ ক্ষমতায় আসে। ইয়াযীদের পর ছয়জন বনী উমাইয়্যা একে একে খলীফা নিযুক্ত হয়।

তাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে ইমাম সাহেব মক্কায় হিজরত করেন আব্বাসীয়দের ক্ষমতায় আসা পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করেন।

কুফায় প্রত্যাবর্তনের পর ইমাম সাহেব ফিকাহ এবং আইন সংকল সাথে সাথে এগুলো প্রয়োগের জন্য এমন রাজনৈতিক পদ্ধতি অবলম্বন ক যাতে প্রচলিত রাজনীতির মত প্রোপাগাণ্ডা, মিছিল প্রভৃতি ছিল না। ই সাহেব স্বীয় প্রসিদ্ধি এবং পরিচিতির পরিবর্তে আইনের ক্ষমতা দে চাইতেন।

আব্বাসী খলীফা আবু জাফর মনসুর ইমাম সাহেবকে কাযীর পদ করার জন্য বাধ্য করতে চাইলে তিনি তাকে লক্ষ্য করে বললেন, আ চতুরপাশ্বেষে সমস্ত লোক রয়েছে তাদের প্রয়োজন এমন শাসকের যিনি আ কারণে তাদেরকে সম্মান করবেন। এ কথা দ্বারা ইমাম সাহেব এ দিকে ই করলেন যে, আপনার সহচরদের কেউ ন্যায় বিচারের আকাঙ্ক্ষী নয়। খলীফাকে লক্ষ্য করে আরও বলেন, যদি আপনার বিরুদ্ধে কোন মোক দায়ের হয় আর আপনি আমার পক্ষ থেকে এটা চান যে, আমি আইনানুগ া না করি এবং আমাকে এ হুমকি দেন যে, যদি এরূপ না কর তবে তো সমুদ্রে ডুবিয়ে মারা হবে, তবে স্বরণ রাখুন, আমি ডুবে যাওয়াটা পছন্দ ক কিন্তু অন্যায় বিচার করা আমার দ্বারা সম্ভব হবে না।

একবার খলীফা আবু জাফর মনসুর ইমাম সাহেবের নিকট কিছু পাঠালেন। ইমাম সাহেব তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। বন্ধুরা এ প দিলেন, এগুলো গ্রহণ করে সদকা করে দিন। ইমাম সাহেব বললেন, ত নিকট হালাল কিছু আছে কি?

ইমাম সাহেবের মৃত্যুর পর তাঁকে যখন সাধারণ কবরস্থান হতে দাফন করা হল তখন খলীফা মনসুর ইমাম সাহেবের কবরে নামায পড়তে জিজ্ঞেস করলেন যে, তাকে সাধারণ কবরস্থান হতে পৃথক স্থানে কেন দ করা হল? লোকজন উত্তরে বলল যে, ইমাম সাহেবের মতে বাগদাদের ‘আরদে মগসুবা’ (জবরদখলকৃত) আর ইমাম সাহেবের এ ফতোয়া অসিয়ত ছিল যে, তাঁকে যেন এমন স্থানে দাফন করা না হয় যা অবৈধ উ অর্জিত হয়েছে। খলীফা মনসুর কবরের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, জীবদ এবং মরনের পর আপনার হাত থেকে আমাকে কে বাঁচাবে।

উম্মতে মুহাম্মদীর উপর অত্যাচারী শাসক গোষ্ঠীর অত্যাচার দেখে ই সাহেব সব সময় চিন্তিত ছিলেন যে, কিভাবে এদের হাত থেকে উ

মুহাম্মদীকে নিষ্কৃতি দেয়া যায়। তার সামনেই ইমাম যয়নুল আবেদীনের সাহেবজাদা হযরত যায়দকে শহীদ করা হয়। আবার মুহাম্মদ নফসে যাকিয়াকে হত্যা করা হয়। হযরত যায়দের শাহাদতের ঘটনা স্মরণ হলেই তিনি কেঁদে উঠতেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইরের সাহেবজাদা হাসান বর্ণনা করেন, আমি আবু হানিফাকে দেখেছি যে, তিনি মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ বিন হাসানের শাহাদতের পর তার কথা আলোচনা করেছেন। তার চোখ দু'টো থেকে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছিল।

মুসলিম বিন সালেম বলেন, আমি অনেক বড় বড় আলেমের সাথে সাক্ষাৎ করেছি। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা হতে উম্মতে মুহাম্মদীর প্রতি অধিক শ্রদ্ধাশীল অন্য কাউকে দেখিনি।

উম্মতে মুহাম্মদীর প্রতি অধিক শ্রদ্ধাশীল হওয়ার কারণেই তিনি স্বয়ং বিছানা হিসেবে চাটাই ব্যবহার করতেন। খোরাকী বাবদ মাসে দু' দিরহামের অধিক ব্যয় করতেন না। কিন্তু অধিক অর্থ আয়ের জন্য তিনি ব্যাপকভাবে ব্যবসা শুরু করেন। এ অর্থ দিয়ে গরীব মিসকীনদের, আলেমদের, শিক্ষার্থীদের সহায়তা করা উদ্দেশ্য ছিল। তিনি তাদের সর্বদা আর্থিক সহায়তা করার কারণে তাঁর মজলিসকে 'মজলিসুল বারাকা' বলা হত।

এদিকে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর বাসস্থান কূফায় ইবনুনা সরানিয়া খালেদ ১০৫ হিজরী হতে ১২০ হিজরী পর্যন্ত গভর্নর নিযুক্ত ছিল। গভর্নর খালেদের হাতে কূফাবাসী দীর্ঘ পনের বছর পর্যন্ত নির্যাতিত এবং নিপীড়িত ছিল। মুসলমানদের মসজিদের মিনার ভেঙ্গে ফেলা হয়েছিল। মুসলমানদের অর্থ দ্বারা খৃষ্টানদের গির্জা তৈয়ার করা হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর খলীফাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছিল। হযরত আলী (রাঃ) এবং হযরত উছমান (রাঃ)কে অভিসম্পাত করা হয়েছিল। প্রজাদের ক্ষুধায় মারা হয়েছিল। গভর্নর খালেদের অপসারণের পর ইউসুফ নামক অন্য একজন গভর্নর নিযুক্ত হয়। সেও খালেদ হতে কম অত্যাচারী ছিল না। তার আমলে দিনকে দিন বলাও অপরাধ ছিল রাত বলাও অপরাধ ছিল।

ঠিক এমনি সময়ে হযরত যায়দ বিন আলী বনী উমাইয়্যার সাথে মুকাবিলা করার জন্য কূফায় আগমন করেন। ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর প্রিয়ভাজন হযরত মনসুর বিন মু'তামির প্রকাশ্যে বনী উমাইয়্যার সাথে মুকাবিলা করার জন্য হযরত যায়দের পক্ষ হতে বায়য়াত লওয়া শুরু করেন। এ আন্দোলনে চার হাজার ব্যক্তি হযরত যায়দের সাথে মিলে বনী উমাইয়্যার বিরুদ্ধে লড়তে

প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। হযরত সুফিয়ান ছাওরী এবং ইমাম আমাশ (রহঃ)ও তার সমর্থন করেন। হযরত যায়দ একজন বিশেষ দূত ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর খিদমতে পাঠিয়ে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করলে ইমাম সাহেব তার সমর্থনে ফতোয়া প্রদান করেন যে, এ সময় অন্যান্যের প্রতিবাদে হযরত যায়দের দাঁড়ানো রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বদরের ময়দানে গমন করার শামিল। জালেম শাসকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করে নিশ্চুপ থাকা ইমাম সাহেবের মতে সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ করার কোরআনী নির্দেশ রহিত করার নামাস্তুর। আবার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি যদি বুঝতে পারতেন যে, এ ক্ষেত্রে অসৎকাজের প্রতিবাদ করতে গেলে আরো খারাপ একটা মন্দ কাজের প্রচলন হবে, তবে সে ক্ষেত্রে তিনি সতর্কতা অবলম্বন করতেন। এটাও তিনি কোরআনের নির্দেশ মত করতেন।

فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ *

‘নসীহত কর যদি নসীহত উপকারে আসে।’

এ বিষয়ে হানাফী মাযহাব হচ্ছে যে, যদি সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজ হতে নিষেধ করাটা উপকারে না আসে, যাদেরকে খারাপ কাজ হতে বিরত করা প্রয়োজন তাদের মুকাবিলা করার শক্তি না থাকে এবং তা করতে গেলে আরো খারাপ অবস্থার সম্মুখীন হওয়াটা নিশ্চিত হয় তবে এ সময়ে প্রত্যেকেই নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে রাখবে।

এ সময় সম্পর্কেই বলা হয়েছে যে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا هَدَيْتُمْ *

‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের প্রতি লক্ষ্য রাখ। পথভ্রষ্টরা তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না- যদি তোমরা সঠিক পথে চল।’

এমন ছোট ছোট দলের কোরবানী যার উপকার নিজেদের শহীদ হওয়া পর্যন্ত সীমিত থাকে। জনগণের কোন উপকারে আসেনা। এটা হতে- এমন একটি বড় দলের কোরবানী যার সুফল জনগণ পর্যন্ত পৌছে- অধিক প্রয়োজনীয়। ইমাম সাহেব বলেন,

যদি সৎ সহযোগীর দল মিলে যায় এবং তাদের মধ্য হতে একজন নেতৃত্ব দেয় এবং সে এমন ব্যক্তি হয় যে আল্লাহর দ্বীনের বিষয়ে নির্ভরযোগ্য এবং স্বীয় পথ হতে না ফিরে তখন মুসলমানদের এ সম্মিলিত দায়িত্ব আদায়ের জন্য এ ময়দানে অটল থেকে অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে এক সীসাঢালা দেয়ালের

মত হয়ে যাওয়া চাই।

এতদসত্ত্বেও কেউ যদি ইসলামী বিপ্লবের আশা নিয়ে এককভাবে এ পথে এসে নিজেকে শহীদ করে দেয় তবে সে ব্যক্তি ছওয়াবের অধিকারী হবে।

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী বলেন,

সে যদি বুঝতে পারে যে, প্রতিদ্বন্দ্বীদের মারধর সে সহিতে পারবে, কারো নিকট তার অভিযোগ করবে না এবং স্বেচ্ছায় খারাপ কোন কিছুর কারণও হবে না, তবে এমন ব্যক্তি সৎকাজে আদেশ এবং অসৎকাজে নিষেধ করতে পারে। বরং এমন ব্যক্তিকে মুজাহিদ বলা যাবে।

হযরত যায়দ কুফায় জালেম শাসকদের বিরুদ্ধে দল গঠন করেছিলেন। ব্যক্তি হিসেবেও তিনি নির্ভরযোগ্য ছিলেন। কিন্তু তিনি যাদের নিয়ে দল গঠন করেছিলেন তাদের সম্পর্কে ইমাম সাহেব সম্যক অবগত ছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে এরা শেষ মুহূর্তে তাকে একা ফেলে পালিয়ে যাবে। এ কারণে ইমাম সাহেব তার সাথে সরাসরি শরীক হননি। তিনি বলেন, যদি আমি জানতাম যে লোকজন হযরত যায়দকে ছেড়ে যাবে না, তারা তার সাথে যুদ্ধে দাঁড়াবে, তবে অবশ্যই আমি হযরত যায়দের সাথে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করতাম। কারণ ইনি সঠিক ইমাম। তবে ইমাম সাহেব হযরত যায়দকে তার জিহাদে দৈহিকভাবে সহযোগিতা না করে থাকলেও আর্থিকভাবে সহযোগিতা করেছেন। তিনি হযরত যায়দের দূত ফোযাইলের হাতে দশ থলি মুদ্রা দিয়ে বলেছিলেন, আমি এ মাল দিয়ে হযরত যায়দের খেদমত করছি। তার নিকট এ আরজ করবে যে, তার শত্রুদের মুকাবিলায় যেন এ অর্থ ব্যয় করেন।

বনী উমাইয়্যার সাথে ইমাম সাহেবের সম্পর্ক কিরূপ ছিল এ সম্পর্কে ইবনে আসাকের হাকাম বিন হিশামের বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, আমাদের প্রশাসন চাইল যে, তার ধনাগারের চাবি আবু হানিফার নিকট সমর্পণ করে দিবে অথবা সে তার পিঠে কোড়া গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে। ইমাম আবু হানিফা শাসকদের শাস্তিকে গ্রহণ করলেন।

ইমাম সাহেবের ব্যাপারে বনী উমাইয়্যা প্রথমে নরম আচরণ করে। কিন্তু এতে যখন তাদের উদ্দেশ্য পূরণ হয়নি তখন তারা কঠোরতা অবলম্বন করে। বনী উমাইয়্যার শাসকদের মধ্যে ইবনে হুবাইরা এ কৌশল অবলম্বন করে।

ইবনে হুবাইরা ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর নিকট আরজ করল “হে শায়খ! আপনি যদি আমাদের নিকট একটু বেশী আসা-যাওয়া করেন তবে

আমরাও আপনার দ্বারা উপকৃত হব-আর আপনিও আমাদের দ্বারা উপকৃত হবেন।”

জবাবে ইমাম সাহেব বললেন, তোমার নিকট এসে আমি কি করব? যদি তুমি আমাকে তোমার নৈকট্য দান কর তবে আমাকে ফিৎনায় ফেলবে। আর যদি আমাকে দূরে রাখ অথবা নৈকট্যদানের পর দূরে সরিয়ে দাও- তবে অনর্থক আমাকে চিন্তায় ফেলা হবে। তোমার নিকট এমন কোন কিছুই নেই যার কারণে আমি তোমাকে ভয় করব।

এতে যখন গভর্নর ইবনে হুবারার ইচ্ছা পূরণ হল না তখন সে অন্য কৌশল অবলম্বন করল। গভর্নরের পর সর্বোচ্চ পদটি গ্রহণে তাকে আবেদন করল।

রবীর মাধ্যমে ইমাম সাহেবকে এ প্রস্তাব দিল যে, গভর্নরের সীলমোহর তার হাতে সমর্পণ করা হবে যেন যদি কোন নির্দেশ প্রকাশিত হয় কিংবা সরকারের পক্ষ হতে কোন কাগজ প্রচারিত হয় অথবা কোঁষাগার হতে কোন মাল বের করা হয় সব যেন ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর তত্ত্বাবধানে হয়।

ইমাম সাহেব এ পদ গ্রহণেও অস্বীকৃতি জানালেন। ইমাম সাহেবের এ অস্বীকৃতির ভয়াবহ পরিণামের প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রমুখ প্রসিদ্ধ উলামায়ে কিরাম ইমাম সাহেবের খিদমতে এসে তাঁকে বুঝাতে লাগলেন “আমরা আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি-আপনি নিজেকে ধংস করবেন না। আমরা আপনারই ভাই-বন্ধু। শাসনের সাথে এ সম্পর্কে আমরাও অপছন্দ করি কিন্তু এ মুহূর্তে তা গ্রহণ করা ব্যতীত আমরা অন্য কোন উপায় দেখছি না।”

কিন্তু ইমাম সাহেব এ মঙ্গলকামীদের উত্তরে বললেন, এ চাকুরি তো অনেক বড় ব্যাপার। প্রশাসন যদি আমাকে শহরের মাঝের দরজাগুলো গণনা করার দায়িত্বও দেয় তবুও আমি তা গ্রহণ করব না।

অস্বীকৃতির পরিণাম নিয়ে উলামাদের এ দলটি চিন্তিত ছিলেন। এ দিকে ইবনে হুবারাও ইমাম সাহেবকে রাজি করানোর জন্য সর্বপ্রকার ক্ষমতা প্রয়োগের কসম করে বসেছে। ঐ দিকে ইমাম সাহেবও প্রশাসনে শরীক না হওয়ার কসম করেছেন। “খোদার কসম! আমি কখনও নিজেকে এতে জড়িত করব না।”

তখন ইবনে আবি লাইলা এ কথা বললেন, তোমরা তোমাদের সাথীকে সত্যের উপর ছেড়ে দাও। তিনি ব্যতীত অন্যেরা ভুলের উপর আছে।

ইমাম সাহেবের এ অসহযোগিতা এক মুহূর্তের জন্যও সহ্য হয়নি। গভর্ণর ইবনে হুবাইরা ইমাম সাহেবকে পনের দিনের জন্য জেলখানায় পাঠিয়ে দিল। সেখানেও ইমাম সাহেবকে বিভিন্ন প্রলোভন দেখানো হল। বিভিন্ন পদের প্রস্তাব দেয়া হল। ইমাম সাহেব সেগুলোও প্রত্যাখান করলেন। এতে ইবনে হুবাইরা রাগে ফেটে পড়ল। কসম করল 'যদি সে এরূপ না করে (আমার প্রস্তাব গ্রহণ না করে) তবে তাকে অবশ্যই কোড়া মারব।'

কিন্তু ইমাম সাহেব এতে মোটেই ভীত হলেন না বরং তিনি আরো কঠিন শপথ করলেন—

'খোদার কসম! আমাকে যদি হত্যাও করা হয় তবু আমি তা গ্রহণ করব না।'

ইমাম সাহেবের এ উত্তর গভর্ণরের মর্যাদার মিনারায় কুঠারাঘাত করল। ইমাম সাহেবকে জেলখানা থেকে বের করে সামনে উপস্থিত করা হল। তাঁকে মৃত্যুদণ্ডের হুমকি দেয়া হল। ইমাম সাহেব শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে বললেন—

'মৃত্যুতো একটাই,

ইবনে হুবাইরার ইঙ্গিতে জল্লাদ ইমাম সাহেবের খালি মাথায় কোড়া দ্বারা আঘাত করতে লাগল। প্রহারের পর যখন ইমাম সাহেবকে পুনরায় জেলখানায় নেয়া হচ্ছিল তখন তার মাথায় আঘাতের চিহ্ন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

১৩০ হিজরী। আবু মুসলিম খোরাসানী বনী উমাইয়্যার বিরুদ্ধে আব্বাসীদের ষড়যন্ত্র শুরু করল। ইব্রাহীম বিন মায়মুন এবং মুহাম্মদ বিন ছাবেত আবদী সহ অনেকে তার সাথে হাত মিলাল। কিন্তু ইমাম সাহেব আবু মুসলিমের অত্যাচার এবং এ বিপ্লবের পরিণামের প্রতি লক্ষ্য রাখলেন। এ বিপ্লব যদিও বনী উমাইয়্যার বিরুদ্ধে চলছিল এবং ইমাম সাহেব তাদের দ্বারা অত্যাচারিত হওয়ার কারণে মানবিক চাহিদা মুতাবেক আবু মুসলিম খোরাসানীর সাথে মিলে বনী উমাইয়্যা থেকে প্রতিশোধ নেয়াটাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু যেহেতু এ বিপ্লবে কোন সুফলের আশা ছিল না। বরং পরিবর্তনই এর উদ্দেশ্য ছিল। তাই ইমাম সাহেব তার সাথে সহযোগিতা করেননি।

ঠিক যে সময় আব্বাসীয়দের বিপ্লব প্রকাশ পেলো এবং দেশের বিভিন্ন এলাকায় বনী উমাইয়্যার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ল— সে সময় ইমাম সাহেব হারামাইন শরীফাইনে হিজরত করেন। বনী উমাইয়্যাদের পরাজিত করে আব্বাসীয়দের নিজেদের হাতে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়া পর্যন্ত তিনি সেখানে

অবস্থান করেন।

আবু মুসলিম খোরাসানী খোরাসানের স্বাধীন শাসক ছিল। ১৩১ হিজরী হতে ১৩৬ হিজরী পর্যন্ত তার শাসনকাল ছিল। ক্ষমতার নেশায় মত্ত হয়ে সে সামান্য কারণেই মানুষকে হত্যা করত। কালো পোষাক কেন পরিধান করেছেন? এ ক্ষুদ্র প্রশ্নের কারণে প্রশ্নকারীকে হত্যা করা হয়েছে। তার জুলুম অত্যাচারের শিকারের সংখ্যা ইতিহাসবিদদের বর্ণনামতে ছয় লক্ষ। তার নির্মম কার্যকলাপ হাজ্জাজ বিন ইউসুফ হতে কোন অংশেই কম নয়।

বনী উমাইয়্যার বিরুদ্ধে যারা আবু মুসলিম খোরাসানীকে সৎ উদ্দেশ্যে সাহায্য করেছিলেন- তার অমানুষিক কার্যকলাপ প্রকাশ পাওয়ার পর তারা সবাই তাদের ভ্রান্তি বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হলেন। ইমাম সাহেব প্রথমেই তার ভেতরের কুকুরটি দেখতে পেয়েছিলেন। তাই তিনি তাকে কোনরূপ সাহায্য করেননি।

ইব্রাহীম আসসায়েগের নিকট যখন আবু মুসলিমের সত্যিকার রূপ প্রকাশ পেল তখন তার অন্তরে সত্য প্রকাশের আগুন জ্বলে উঠল। আবু মুসলিমকে তার কপটতার এবং অন্যায় অত্যাচারের শাস্তি দেয়ার এবং একটি ইসলামী বিপ্লবের রূপ দেয়ার সিদ্ধান্ত তিনি গ্রহণ করেন।

এ বিষয়ে তিনি ইমাম আযম আবু হানিফা (রহঃ)-এর সাথে আলোচনা করেন। উভয়ে এ ব্যাপারে একমত হন যে, আবু মুসলিমের মুকাবিলা করা এ মুহূর্তে ফরয। এরপর ইব্রাহীম আসসায়েগ ইমাম সাহেবকে বললেন,

আপনি হাত বাড়ান। আমি আপনার হাতে বায়যাত করব।

ইব্রাহীম সায়েগ ইমাম সাহেবকে যে কাজের জন্য উৎসাহিত করতে চাইলেন-তাঁর দৃষ্টি এর চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজের প্রতি নিবন্ধ ছিল। তিনি অবসর সময়ে শরীয়তের আইন প্রণয়নে ব্যস্ত থাকতেন। বাহ্যতঃ দেখা যেত তিনি ব্যবসা-বানিজ্য এবং ছাত্রদের শিক্ষা নিয়ে ব্যস্ত আছেন।

এদিকে ইব্রাহীম সায়েগ তাঁকে যে পথের পথিক হবার আহ্বান জানিয়েছেন, সে পথের উপযুক্ত এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক পথিক এবং পাথেয় অপরিাপ্ত হওয়ার কারণে ব্যর্থ হওয়াটা প্রায় নিশ্চিত ছিল। আর তা হলে ইমাম সাহেব যে নীরব জিহাদ তথা শরীয়তের আইন প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের অক্লান্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন সেটাও সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হবে। এসবদিক চিন্তা করেই ইমাম সাহেব ইব্রাহীম সায়েগের প্রদর্শিত পথে পা দেননি। বরং স্বপথে

স্বীয়গতিতে তিনি এগিয়ে যেতে লাগলেন এবং স্বীয় লক্ষ্যে তিনি সফল হলেন। তিনি ফিকাহবিদ, মুজতাহিদ, কাযী এবং মুফতিদের একটি দল তৈরী করেন।

শাসকগণ তাঁর মুখাপেক্ষী হল। খলীফাদের দরবারে তাঁর আলোচনা হতে লাগল। লক্ষ্যনীয় বিষয় হল, ইমাম সাহেব সারাজীবন শাসকদের থেকে দূরে ছিলেন, প্রশাসন থেকে বিমুখ ছিলেন, রক্তের সাগর বয়ে যেতে দেখেও বন্ধুদের তথা শিক্ষার্থীদের ছেড়ে আসেননি। এসব বিষয়ে অবশ্য অনেকে তার সাথে শরীক ছিলেন। কিন্তু তাঁর বিশেষত্ব ছিল তিনি শাসকদের থেকে দূরে ছিলেন। অথচ তাদেরকে তাঁর মুখাপেক্ষী করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। স্বীয় মজলিস খলীফাদের আলোচনা হতে মুক্ত রাখেন। কিন্তু তাদের মজলিসে তাঁর আলোচনা পৌঁছিয়ে দেন। শুধু তাই নয়, বরং তিনি সুকৌশলে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন যে, খলীফাগণ, ইমামগণ এবং হাকেমগণ তাঁর সংকলিত আইনানুসারে ফয়সালা করতে লাগলেন। মানুষের গতি তাঁর দিকে ফিরে গেল। বড় বড় আমীর এবং হাকেমগণ তাঁর সম্মান করতে লাগল। তিনি এমন কাজ করে দেখালেন যা অন্যের দ্বারা সম্ভব হয়নি।

মোটকথা, ইমাম সাহেবের ইলমী এবং আমলী প্রচেষ্টায় এবং কৌশলে পরিবেশ এমন সৃষ্টি করে রেখেছিলেন যে, প্রশাসনিক কাজে ইমাম সাহেবকে আহ্বান করা একটি সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যেমন খলীফা আবু জাফর মনসুর বাগদাদ শহর পত্তন করার সময় বিভিন্ন কাজে ইমাম সাহেবের সহযোগিতা নিয়েছিলেন।

এরপর ইমাম সাহেব খলীফা আবু জাফর মনসুরের সাথে সাক্ষাতের সময় এ প্রচেষ্টাই করতেন যে, তিনি সারাজীবন চেষ্টা করে যে সব ইসলামী আইন সংকলন করেছেন সেগুলো যেন জন-জীবনে বাস্তবায়িত করা হয়।

এ সময় খলীফার পক্ষ হতে ইমাম সাহেবের নিকট বিভিন্ন প্রকারের হাদিয়া তোহফা আসতে লাগল। এতে খলীফার উদ্দেশ্য ছিল ইমাম সাহেবকে তার সমর্থক বানানো। ইমাম সাহেব এ সবকিছু বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি সরকারী সকল প্রকার উপটোকন প্রত্যাখ্যান করেন।

এর মাঝেই একদিন খলীফা আবু জাফর মনসুর ইমাম সাহেব, ইমাম মালেক এবং ইবনে আবি যিব এদের তিনজনকে তার দরবারে ডাকালেন। তাঁদের তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সত্য করে বলুন তো প্রশাসনের ক্ষমতা যা আমাদের হাতে এসেছে বস্তুতঃ আমরা তার উপযুক্ত কিনা।

এর জবাবে ইমাম সাহেব খলীফার দরবারে যে দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন তার সারাংশ হচ্ছে কোন প্রকারেই তোমাদের প্রশাসন শরীয়ত সমর্থিত এবং আইনানুগ নয়। তোমরা যখন প্রশাসনের ক্ষমতা হাতে নাও তখন দু'জন মুফতিও তোমাদের খেলাফতের ব্যাপারে একমত হননি।

এ বক্তব্যে খলীফা মনসূর ইমাম সাহেবের উপর রাগান্বিত হলেও তাঁর বিরুদ্ধে কোন কিছু করতে স্মৃহস করেননি। তিনি ইমাম সাহেবকে নির্বিঘ্নে বাড়ী ফেরার অনুমতি দিলেন।

ইমাম সাহেবের এ বক্তব্য দ্বারা তাঁর সম্পর্কে খলীফার যে সন্দেহ ছিল তা বিশ্বাসে পরিণত হল, ইমাম সাহেবের ব্যাপারে খলীফা কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেননি যে তাকে কিভাবে দমানো যেতে পারে।

এদিকে মুহাম্মদ বিন আদিল্লাহ নফসে যাকিয়্যা মদীনায় বিদ্রোহ এবং প্রশাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত করেছেন। তার এ আন্দোলনটি ব্যাপক এবং বিপ্লবাত্মক আন্দোলন ছিল। সমস্ত মুসলিম বিশ্বে একই দিনে অভ্যুত্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মদীনায় এমন কেউ ছিল না যে তার সমর্থক ছিল না। এ আন্দোলনের নেতা মুহাম্মদ নফসে যাকিয়্যা এবং তার ভাই ইব্রাহীম নফসে রাযিয়্যা উভয়ই যোগ্য ছিলেন।

এদিকে ইমাম সাহেব যে মহৎকাজ শুরু করেছিলেন তা সম্পন্ন হয়ে গেছে। আর তিনি যেরূপ নিয়মতান্ত্রিক ব্যাপক আন্দোলনের প্রত্যাশী ছিলেন, নফসে রাযিয়্যা এবং নফসে যাকিয়্যা ভ্রাতৃত্বের নেতৃত্বে তা-ও আত্মপ্রকাশ করেছে। তাই তিনি প্রশাসন হতে সম্পূর্ণরূপে বেপরোয়া হয়ে এ আন্দোলনের প্রকাশ্যে সমর্থন করেন। তিনি লোকদের দিয়ে প্রশাসনের তথা আব্বাসী খেলাফতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করেন।

খলীফা মনসূর বিদ্রোহ দমন করার জন্য কুফায় আগমন করেন। তার কর্মীরা সন্দেহভাজন প্রত্যেক ব্যক্তিকেই হত্যা করত। এ সময়ে হাশবীয়ারা এবং মুহাদ্দেছীনদের একদল এ ফতোয়া দিল যে, “এ মুহূর্তে প্রশাসনের বিরোধিতা করা, কোন নেক কাজ তো নয়ই বরং এতে ফিৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি হয়।”

ইমাম সাহেব এসবদিক ভ্রঙ্ক্ষেপ না করে জিহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তিনি এ ফতোয়া প্রচার করলেন যে, এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা পঞ্চাশবার হজ্জ করা হতেও উত্তম।

এ আন্দোলনের ব্যাপারে ইমাম সাহেবের প্রেরণা এবং উদ্দীপনা শেষ পর্যায়ে

গিয়ে পৌঁছেছিল। এতে তাঁর সাথে সম্পৃক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের উপর বিপদের আশংকা দেখা দিয়েছিল।

এদিকে ইমাম সাহেব খলীফা মনসুরের প্রধান সেনাপতি হাসান বিন কাহতাবাকে নিজেদের দলে ভিড়িয়ে নিয়েছিলেন। তার পিতা কাহতাবা ছিলেন আব্বাসী খলীফার দক্ষিণ হস্ত।

আব্বাসীয়দের খেলাফত প্রতিষ্ঠার সময় তিনি গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সমাধা করেন। তার মৃত্যুর পর তার ছেলে হাসান তার স্থলাভিষিক্ত হন এবং তার ছেলে তারই মত আব্বাসীয়দের অনুগত ছিলেন। বিদ্রোহের পূর্বক্ষণে এমন এক ব্যক্তিকে তাদের (সরকারী) দল থেকে সরিয়ে এনে নিজেদের দলে ভিড়ানো; এটা ছিল ইমাম সাহেবের কারামত অথবা অসাধারণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞা।

ইমাম সাহেবের এ রাজনৈতিক কৌশলের সামনে খলীফা মনসুর নিজেকে অসহায় বোধ করলেন। নিজে একজন সাহসী যোদ্ধা হওয়া সত্ত্বেও তিনি কূফা শহরের প্রতিটি দরজায় দ্রুতগামী ঘোড়ার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। যেন প্রয়োজনের সময় যদিকে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ আসে পালাতে পারেন। এসব সত্ত্বেও ইমাম সাহেবের উপর হাত তোলার সাহস খলীফার হয়নি। কারণ তিনি তখন শুধু ইরাকেরই নয় বরং সমস্ত প্রাচ্যের নেতা ছিলেন। সরাসরি তাঁর উপর হাত তোলার ভয়াবহ পরিণতির কথা অবিদিত ছিল না।

একটা অভ্যুত্থানের সমস্ত আয়োজন সঠিকভাবে সম্পন্ন করা হয়েছিল। কিন্তু ভাগ্য ছিল বিরূপ। এ আন্দোলনের নেতৃত্বকে শহীদ করা হয়। ফলে আন্দোলন দমে যায়। কিন্তু তবুও ইমাম সাহেবের দিকে খলীফা হাত বাড়াননি।

বিদ্রোহ দমনের পর খলীফা আবু জাফর মনসুর বাগদাদ শহর পত্তনের দিকে মনোনিবেশ করলেন। এর সাথে সাথে যারা এ বিদ্রোহে জড়িত ছিল তাদেরকে বেছে বেছে প্রতিশোধ নিতে লাগলেন। ইমাম মালেক (রহঃ) তার বিরুদ্ধে ফতোয়া দেয়ার কারণে তাঁকে ৩০টি কোড়া এবং অন্য বর্ণনামতে ১০০ কোড়া মারা হয়।

ইমাম সাহেবকে দমন করার জন্য খলীফা বিভিন্ন পন্থা খুঁজতে লাগলেন। তিনি এর জন্য দু'টি পথ দেখতে পেলেন। হয়ত তাঁকে সরকারী কোন পদে অধিষ্ঠিত করে স্বীয় অনুগত করে নেয়া। অথবা কোন অজুহাতে তাঁর মুখ চিরতরে বন্ধ করে দেয়া।

তিনি প্রথমে প্রথম পন্থা অবলম্বন করতে চাইলেন। তাঁকে কূফা থেকে

বাগদাদে ডেকে এনে কাযীর পদ গ্রহণ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে লাগলেন। প্রথমে স্থানীয় কাযী হওয়ার জন্য বললেন। এতে তিনি অস্বীকৃতি জানালে কয়েকটি প্রদেশের কাযী হওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। এতেও তিনি রাযী না হলে সমস্ত মুসলিম বিশ্বের প্রধান কাযীর পদ গ্রহণ করার জন্য তাঁকে বলা হল।

এ পদগুলো গ্রহণ করাটাই বাহ্যিক দৃষ্টিতে ইমাম সাহেবের জন্য সমীচীন ছিল। কারণ এতে তাঁর সংকলিত ইসলামী আইন মানবজীবনে প্রতিষ্ঠার সুযোগ ছিল। কিন্তু ইমাম সাহেবের দূরদৃষ্টিতে খলীফার দূরভিসন্ধি ধরা পড়ে ছিল। এ জন্য তিনি খলীফার ফাঁদে পা দেননি। অবশ্য তার জন্যও দুটি পথ খোলা ছিল। হয়ত খলীফার প্রস্তাব গ্রহণ করে প্রাণে বেঁচে যাওয়া-অথবা নিজের মিশনকে বাকী রাখার জন্য স্বীয় জীবনকে বিপদে ফেলা। দ্বিতীয় পথটিই ইমাম সাহেবের নিকট কামিয়াবীর একমাত্র পথ মনে হল। তাই তিনি এ পথটি অবলম্বন করলেন। তিনি তাঁর শাগরেদদের কূফার জামে মসজিদে সমবেত করে তাদের উদ্দেশ্যে বিশেষ বক্তব্য রাখেন। তার অংশ বিশেষ এরূপ—

তোমরা আমার হৃদয়ের আনন্দ। তোমাদের মাধ্যমেই আমি আমার ব্যথা-বেদনা দূর করব। আমি অবস্থা এমন করে দিয়েছি যে, মানুষ তোমাদের পদাংক অন্বেষণ করে তা অনুসরণ করবে। তোমাদের প্রতিটি কথা মানুষ তালাশ করবে। তোমাদের চলার পথ সহজ করে দিয়েছি।

অতঃপর তাঁর চল্লিশজন বিশেষ শাগরেদকে নিকটে ডেকে বললেন, “এখন তোমরা আমাকে সাহায্য করার সময় এসেছে। আমি এ কথা বলতে চাই যে, তোমাদের এ চল্লিশজনের প্রত্যেকেই কাযী হওয়ার যোগ্যতা নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করে নিয়েছ। তন্মধ্যে দশজন এমন যে, তারা কাযীদেরও সুন্দরভাবে শিক্ষা দিতে পারবে। তোমাদের নিকট আমার এ আকাঙ্ক্ষা যে, তোমরা ইলমকে অপমানের হাত থেকে বাঁচাবে। কাযীর পদে ততক্ষণ পর্যন্ত অধিষ্ঠিত থাকা বৈধ যতক্ষণ তার ভিতর এবং বাহির একরূপ থাকবে। এমন ব্যক্তির জন্যই অযিফা (বেতন) নেয়া বৈধ। মুসলমানদের কোন বাদশাহ কিংবা আমীর যদি কোন মানুষের সাথে অন্যায় আচরণ করে তবে তার নিকটতম কাযীর দায়িত্ব তাকে এমন অন্যায় থেকে ফিরিয়ে রাখা।

খলীফা মনসুর ইমাম সাহেবের এ বক্তব্যের কথা শুনে বিচলিত হলেন। তিনি ঈসা বিন মুসার নিকট নির্দেশ পাঠিয়ে ইমাম সাহেবকে বাগদাদে তলব করলেন।

ইমাম সাহেবকে বাগদাদে খলীফার দরবারে পৌঁছানো হল। সেখানে তাঁকে

প্রধান বিচারপতির পদের প্রস্তাব দেয়া হয়। তিনি বললেন ‘আমার মধ্যে এর যোগ্যতা নেই।’

খলীফা বললেন, ‘বরং তুমি এর যোগ্য।’

ইমাম সাহেব যখন আবার বললেন, আমি এর যোগ্য নই। তখন খলীফা রাগান্বিত হয়ে বললেন, তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি নিশ্চয়ই এর যোগ্য। ইমাম সাহেব নিশ্চুপ রইলেন না। তিনি বেপরোয়াভাবে বললেন, ‘আপনি স্বয়ং আপনার বিরুদ্ধে ফয়সালা করেছেন, আপনার দৃষ্টিতে যে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী তাকে কাযী বানানো আপনার জন্য বৈধ হবে কি?’

ইমাম সাহেবের এ উত্তরের সামনে খলীফা পরাজিত হয়ে অপমানে আরও অধিক রাগান্বিত হয়ে কসম করলেন যে, ইমাম সাহেবের দ্বারা অবশ্যই এ কাজ করিয়ে ছাড়বেন।

ইমাম সাহেবও কসম করলেনঃ খোদার কসম কখনও আমি এ কাজ করব না।

এতে খলীফা রাগে দিশেহারা হয়ে ইমাম সাহেবকে প্রহার করার নির্দেশ দিলেন। তাঁকে-তিরিশটি কোড়া মারা হল। এরপর তাঁকে যখন বাইরে আনা হল তখন তাঁর পরিধানে একটি পাজামা ব্যতীত অন্য কোন পোশাক ছিল না। তাঁর সমস্ত দেহ রক্তাক্ত ছিল। এ কঠোর শাস্তি সত্ত্বেও ইমাম সাহেব কোন পদ গ্রহণে রাযী হননি। পরে খলীফা আবু জাফর তাকে জেলখানায় পাঠিয়ে দিলেন এবং এ নির্দেশ দিলেন যে, তার সাথে যেন কঠোর আচরণ করা হয়।

ইমাম সাহেবের বয়স তখন প্রায় সত্তর বছর। এ বৃদ্ধদেহে তিরিশটি কোড়া মারা হয়েছে। আবার জেলখানার কষ্টসহ অন্যান্য কষ্টের কারণে তাঁর দেহ ভেঙ্গে পড়েছিল। তাঁর জীবনীশক্তি ফুরিয়ে গিয়েছিল। তিনি মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পেলেন। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে দিলেন। সেজদার অবস্থায় সৃষ্টির নিকট প্রাণ সমর্পন করলেন।

অবশ্য কোন কোন বর্ণনামতে তাঁকে বিষপান করানো হয়েছিল।

ইমামে দারুল হিজরত মালেক বিন আনাস আছবাহী (রহঃ)

নাম এবং বংশ পরম্পরা

তাঁর নাম এবং বংশ পরম্পরা এরূপ; ইমামে দারুল হিজরত আবু আদিল্লাহ মালেক বিন আনাস বিন মালেক বিন আবু আমের নাফে' বিন আমর বিন হারেছ বিন উছমান বিন জুছয়েল বিন আমর বিন হারেছ যু-আছবাহ আল আছবাহী আল হিমইয়ারী আল মাদানী (রহঃ)। কেউ কেউ উছমানের স্থানে গায়মান উল্লেখ করেছেন। তাঁর বংশ ইয়ামানের খ্রিস্ট গোত্র হিমইয়ার বিন সাবার সাথে মিলিত হয়; যার সম্পর্ক ছিল ইয়ারব বিন কাহতানের সাথে।

ইমাম সাহেবের পিতামহ মালেক বিন আবু আমের নাফে ইয়ামানের একটি এলাকায় ছদকা এবং যাকাত আদায়ের কাজে নিয়োজিত ছিলেন। কোন কোন হাকেমের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মদীনা মুনাওয়ারায় চলে আসেন এবং কোরাইশ বংশের শাখা বনী তামীম বিন মুররার সাথে সম্পর্ক এবং বন্ধুত্ব স্থাপন করে তাদের সঙ্গে বাস করতে থাকেন।

বনু তামীমের সাথে বন্ধুত্ব

ইমাম সাহেবের পিতৃব্য আবু সহল বলেন, আমরা যু-আছবাহ গোত্রের লোক। আমাদের পিতামহ মদীনায় এসে বনী তামীমে বিবাহ করেন। এজন্য আমরা সেদিকে সম্পর্কিত হই। এ সম্পর্ক এবং বন্ধুত্ব ছিল তালহা বিন উবাইদুল্লাহ তায়মীর ভাই হযরত উছমান বিন উবাইদুল্লাহ তায়মীর সাথে।

ইমাম সাহেবের মাতার নাম ছিল আলীয়া। ইনি ছিলেন শরীফ বিন আদির রহমান বিন শরীকের ছাহেবজাদী। কাযী আব্দুর রহমান তায়মী বলেন, ইমাম মালেক ছিলেন হিমইয়ার গোত্রের। তাদের এবং আমাদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। অবশ্য তার মাতা ছিলেন আমার পিতৃব্য উছমান বিন উবাইদুল্লাহর বাদী।

আবু আমের নাফে' বিন আমর ছাহাবী ছিলেন। বদরের যুদ্ধ ছাড়া অন্যান্য সকল যুদ্ধে তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলেন। মালেক বিন আবি আমের ছিলেন বিশিষ্ট তাবেঈদের মধ্যে। তিনি অভিজ্ঞ

আলেম এবং বুয়ুর্গ ছিলেন। কয়েকজন ছাহাবী থেকে হাদীছ রেওয়ায়েত করেন। তিনি নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিছ ছিলেন। তাঁর চারজন ছাহেবজাদা ছিলেন। আনাস, উয়াইস, আবু সহল নাফে এবং রবী। এদের প্রত্যেকেই তার থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। সম্ভবতঃ আনাস ছিলেন সবার বড়। এ কারণে তার কুনিয়াত ছিল আবু আনাস। চার ভাইয়ের প্রত্যেকেই তৎকালীন উলামা এবং মুহাদ্দিছদের মধ্যে গণ্য ছিলেন। ইমাম সাহেবের পিতা থেকে তার দুই পুত্র মালেক ও মুহাম্মদ বিন শিহাব যুহরী হাদীছ রেওয়ায়েত করেন।

বাসস্থান

মদীনা মুনাওয়ারা হতে কয়েক মাইল দূরে আকীক নামক উপত্যকা। ওখানেই ছিল 'জুরুফ' নামক প্রসিদ্ধ নিম্নভূমি। ওখানে চাষোপযোগী জমি এবং বাগান ছিল। সেখানেই ছিল হযরত উমর (রাঃ)-এর জায়গীর। এ স্থানটি সবুজ-শ্যামল হওয়ার কারণে বড়ই আকর্ষণীয় ছিল। ঐ এলাকাতেই ছিল ইমাম সাহেবের পিতার সুরম্য প্রাসাদ, যা কছবুল মুকআদ নামে পরিচিত ছিল। কাযী 'আয়ায লিখেন,

و كان ابو مالك بن انس مقعدا و كان له قصر بالعرف يعرف بقصر المقعد *

ইমাম মালেকের পিতা আনাস মুকআদ ছিলেন। জুরুফে তার একটি প্রাসাদ ছিল। তা কছবুল মুকআদ নামে পরিচিত ছিল।

মুকআদুনসব এবং মুকআদুল হসব এমন ব্যক্তিকে বলা হয় যার বংশে ছোট অথবা যে বংশহীন। এতে বোঝা যায় ইমাম সাহেবের পরিবার যখন ইয়ামান থেকে আগমন করে তখন তার সদস্য সংখ্যা কম এবং অপরিচিত ছিল।

ইমাম মালেক (রহঃ)-কে লোকেরা একবার 'আকীক' এ থাকার কারণ জিজ্ঞেস করল এবং বলল যে, এতে ত আপনার মসজিদে নবুবীতে আসা-যাওয়ায় কষ্ট হয়। ইমাম সাহেব বললেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আকীক উপত্যকাকে ভালবাসতেন এবং সেখানে তাশরীফ নিতেন। কোন কোন ছাহাবা সেখান থেকে স্থানান্তরিত হয়ে মসজিদে নবুবীর নিকট আসতে চাইলে তিনি বললেন, তোমরা কি মসজিদ পর্যন্ত আসা-যাওয়ায় ছওয়াব মনে কর না? অবশ্য পরে ইমাম সাহেব মদীনায়ে চলে আসেন। ইবনে বুকাইর বর্ণনা করেন ইমাম সাহেব প্রথমে 'আকীক' এ থাকতেন পরে মদীনায়ে চলে আসেন। এখানে তিনি হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)-এর বাড়ীতে অবস্থান করতেন, যা হযরত উমর (রাঃ)-এর বাড়ীর নিকট মসজিদে নবুবীর

সাথে মিলিত ছিল। এতেকাফ করার সময় রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিছানা-পত্র ঐ বাড়ীতে রাখা হত।

জন্ম এবং বাল্যকাল

ইমাম মালেক (রহঃ) ৯৩ হিজরীতে জুরুফ এলাকার যি-মেরওয়া নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। কেউ কেউ তাঁর জন্ম সাল ৯০ হিজরী, ৯৪ হিজরী বা ৯৫ হিজরী বলেছেন।

জীবনী-লেখকদের অনেকের মতে ইমাম সাহেব মাতৃগর্ভে তিন বছর ছিলেন। আবার কেউ কেউ দুই বছরের কথা উল্লেখ করেছেন।

আবু হানিফা (রহঃ) ইমাম মালেক (রহঃ) হতে তের বছরের বড় ছিলেন। ইমাম মালেক বাল্যকালেই তাঁকে দেখেছিলেন। একবার ইমাম আবু হানিফাকে লোকেরা জিজ্ঞেস করল যে, মদীনার নবীন ছেলেদেরকে আপনি কেমন পেয়েছেন? তিনি বললেন, তাদের মধ্যে কেউ যদি উন্নতি লাভ করে তবে সে হবে মালেক।

এক বর্ণনায় ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) বলেন, আমি মদীনায় ইলম বিক্ষিপ্তভাবে দেখেছি। যদি কেউ তা সুবিন্যস্ত করে, তবে এ ছেলেটিই করবে। ইবনে গানেস বলেন, আবু হানিফার এ কথাটি পরে আমি ইমাম মালেকের নিকট বলেছি। তিনি বললেন, আবু হানিফা সত্য বলেছেন। আমি তাঁকে দেখেছি। তিনি খুবই বুদ্ধিমান ছিলেন। হায়! তিনি যদি ফিকাহর ভিত্তি আছিল অর্থাৎ মদীনাবাসীর 'আছর' বা হাদীছের উপর রাখতেন।

হাদীছ শিক্ষার পূর্বে কাপড়ের ব্যবসা

নিয়মিতভাবে হাদীছ শিক্ষার পূর্বে তিনি তাঁর ভাই নযরের সাথে সুত্তি কাপড়ের ব্যবসা করতেন। এ ব্যবসায় তিনি তার অংশীদার ছিলেন। পরে তিনি হাদীছ শিক্ষা লাভ করেন।

এ কারণে প্রথমতঃ তাঁর ভাই নযরের সাথে সম্পর্কিত করে তাঁর পরিচয় দেয়া হত। বলা হত *مالك اخو النظر* নযরের ভাই মালেক। হাদীছ শিক্ষায় মেহনত করার কারণে তাঁর প্রসিদ্ধি ছড়িয়ে পড়লে বিপরীতভাবে পরিচয় হতে লাগল এবং লোকেরা মালেকের ভাই নযর বলে তাঁর ভায়ের পরিচয় দিতে লাগল।

ইমাম সাহেবের শায়খ নির্বাচন বৈশিষ্ট্য

ইমাম মালেক (রহঃ) শুধুমাত্র সে সমস্ত শায়খদের থেকেই রেওয়ায়াত গ্রহণ করতেন— যাদের যোগ্যতা, সততা, বুদ্ধিমত্তা এবং তাকওয়া-বুয়ুর্গী প্রশ্নাতীত ছিল। যাদের স্মৃতিশক্তি প্রখর নয় কিংবা ফিকাহ সম্বন্ধে অগাধ জ্ঞান নেই তিনি কখনো এমন লোকের মজলিসে বসতেন না। তিনি প্রায়শঃ বলতেন, ফিকাহবিদ না হলে আমি কখনো কোন বুয়ুর্গের মজলিসে বসতাম না। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেন, এ গুণটি ইমাম মালেক (রহঃ)-এর চরিত্রে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হত।

ইমাম মালেক (রহঃ) প্রায়ই বলতেন, এই মসজিদে নববীর স্তম্ভের পাশে আমি সত্তরজন শায়খকে রাসূলে করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীছ বর্ণনা করতে শুনেছি। কিন্তু একদিনও আমি তাদের কারো নিকট বসি নাই। কখনও কখনও এরূপ বলতেন, মদীনায় এমন অনেক লোক ছিলেন যাদের নিকট হতে লোকেরা ইলম শিখেছে কিন্তু আমি তাঁদের নিকট হতে কোন ইলম শিখি নাই।

মুতাররাফ বিন আদিল্লাহ বলেন, আমি স্বয়ং ইমাম সাহেবকে বলতে শুনেছি, আমি এ শহরে অনেক নেককার ভাল লোককে পেয়েছি। কিন্তু তাদের নিকট হতে আমি হাদীছ গ্রহণ করি নাই। লোকেরা তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, তারা যা কিছু বলেন, নিজেরাই সেটার অর্থ বোঝেন না।

তখন অনেক প্রকার লোকই প্রকাশ পেয়েছিল। কেউ কেউ নিজের অজ্ঞাতসারে মিথ্যা বলত। কেউ কেউ এমন ছিল যে, প্রকৃত জ্ঞানের খবরও তার নিকট ছিল না। আবার অনেকে ছিল সম্পূর্ণ মূর্খ।

ইমাম সাহেবের স্বনামধন্য শাগরেদ আব্দুল ওহ্‌হাব বলেন, ইমাম সাহেব বলেছেন, মদীনাতে এমনও অনেক লোক রয়েছেন যারা বৃষ্টির জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করলে সে দোয়া কবুল হবে। তারা অনেক মাসয়ালা মাসায়েল এবং হাদীছ সম্বন্ধেও অবগত আছেন। কিন্তু আমি কখনো তাদের থেকে কোন ফায়দা গ্রহণ করিনি। কারণ তারা শুধুমাত্র মুত্তাকী এবং বুয়ুর্গ ছিলেন। কিন্তু রেওয়ায়াত এবং ফতোয়ার কাজ শুধুমাত্র বুয়ুর্গী এবং তাকওয়ার দ্বারা চলে না। তার সাথে সাথে জ্ঞান বুদ্ধিরও বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। হাদীছ রেওয়ায়াত করা এবং ফতোয়া দেওয়া সহজ ব্যাপার নয়। অজ্ঞ এবং অসতর্ক লোকেরা যারা হাদীছ রেওয়ায়াত করে এবং ফতোয়া দেয় কিয়ামতের দিন তাদের এ পরিণাম ফল খুবই খারাপ হবে।

ইমাম সাহেবের ভাগিনা ইসমাঈল বর্ণনা করেন, আমি আমার মামাকে বলতে শুনেছি এই ইলমে হাদীছও দ্বীন। কাজেই কার নিকট হতে গ্রহণ করছ তৎপ্রতি লক্ষ্য রেখো। আমি মসজিদে তাদের নিকট হতে একটি অক্ষরও শিখিনি। অথচ তাদের মধ্যে এমন একজনও ছিলেন না যে, তার নিকট লক্ষ টাকা আমানত রাখলে একটা কপর্দক বিনষ্ট হবার আশঙ্কা থাকবে। কিন্তু বাস্তব সত্য এই যে, তাঁরা এ বিষয়ের উপযুক্ত লোক নহেন।

ইমাম সাহেবের শায়খ নির্বাচনের সময় এদিকেও লক্ষ্য রাখতেন যে, যাঁর থেকে তিনি হাদীছ গ্রহণ করবেন তিনি যেন বার্বাক্যে উপনীত না হয়ে থাকেন। ইমাম সাহেব বলেন, মদীনাতে আমি এমন অনেক লোককে দেখেছি যে, তারা একশত বছর বা একশত পাঁচ বছর জীবিত ছিলেন। কিন্তু একজন বৃদ্ধ লোকের নিকট হতেও কোন হাদীছ গ্রহণ করা চলে না। কারণ এসব লোক হতে হাদীছ গ্রহণ করা হলে তাতে দোষ-ত্রুটি থেকে যেতে পারে।

ইমাম মালেক (রহঃ)-এর এ কথাটি অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত। কারণ বার্বাক্যের কারণে যে বুদ্ধি এবং স্মৃতিশক্তি লোপ পায় তা অনস্বীকার্য। ইমাম সাহেবের এ সূক্ষ্মদৃষ্টি এবং সতর্কতার ফলে-অবস্থা এমন হল যে, ইমাম সাহেব যাঁর থেকে হাদীছ গ্রহণ করতেন তাকে বিশ্বাসযোগ্য এবং নির্ভরযোগ্য মনে করা হত। ইয়াহুয়া বিন মাঈন বলেন, ইমাম মালেককে সম্মুখে রেখে আমরা সব কাজ করে যেতাম। প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁকে অনুসরণ করতাম। যখনই কোন শায়খের নাম আমাদের সামনে আসত তখন আমরা লক্ষ্য করতাম যে, ইমাম মালেক তাঁর থেকে কোন রেওয়াজাত গ্রহণ করেছেন কি না। যদি তিনি গ্রহণ করে থাকতেন তবে আমরাও তার থেকে গ্রহণ করতাম। অন্যথা গ্রহণ করতাম না।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের নিকট কোন এক ব্যক্তি জনৈক রাবী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, আমার বিবেচনায় তিনি গ্রহণযোগ্য। কেননা ইমাম মালেক তাঁর থেকে রেওয়াজাত গ্রহণ করেছেন।

ইমাম সাহেবের দাদা মালেক বিন আবি আমের যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন তার বয়স ছিল বার বা তের বছর। কিন্তু তার থেকে তিনি কোন হাদীস গ্রহণ করেননি। তদ্রূপ সালেম বিন আদ্দিল্লাহ এবং সুলাইমান বিন ইয়াসার প্রমুখকে তিনি পেয়ে থাকলেও কোন মাধ্যম ব্যতীত সরাসরি তাদের হাদীছ গ্রহণ করেননি। কারণ এঁদেরকে তিনি তাঁদের বার্বাক্যাবস্থায় পেয়েছিলেন।

শায়খ নির্বাচন

ইমাম মালেক (রহঃ)-এর জমানায় প্রত্যেক ইমামেরই অসংখ্য 'শায়খ' তথা শিক্ষক থাকত। এটাকে তারা গৌরবের এবং বরকতের বিষয় মনে করতেন। কিন্তু ইমাম মালেক (রহঃ) ছিলেন এর ব্যতিক্রম। তিনি শায়খের সংখ্যাধিক্যকে গৌরবের বিষয় মনে করতেন না।

সাহাবাদের যুগ শেষ হওয়ার পর তাবেয়ীদের যুগ শুরু হল। এটা ছিল দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ যুগ। তখনকার জনসাধারণের চরিত্র ছিল নিষ্কলুষ। অন্তর ছিল পবিত্র। মিথ্যা বলাকে পাপ মনে করত। তথাপি এ কথা বলা যাবে না যে, তখনকার দিনে মিথ্যা কথা বলতে দ্বিধাবোধ করবে না এমন লোক ছিল না। তদুপ এমন লোকও বিরল ছিল না যারা অন্যদেরকে নিজেদের মত সরল সত্যবাদী মনে করে যে কারো রেওয়াজাত গ্রহণ করতেন। নিজেদের অজ্ঞাতেই তারা মিথ্যার আশ্রয় বনে যেতেন। এমনও অসংখ্য রেওয়াজাতকারী দেখা দিল যারা তাদের রেওয়াজাতকৃত হাদীছের গুচতত্ত্ব অবগত থাকা তো দূরের কথা সে সম্বন্ধে তাদের মোটামুটি জ্ঞানও ছিল না। এজন্যই ইমাম মালেক (রহঃ) যাচাই বাছাই করে শায়খ নির্বাচন করতেন।

আবু হাযেম সালমা বিন দীনার

ইমাম মালেক (রহঃ) হযরত আবু হাযেম হতেও হাদীছের শিক্ষা গ্রহণ করেন। আবু হাযেম একজন প্রসিদ্ধ তাবেয়ী ছিলেন। তিনি হযরত সহল বিন সায়ীদ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং তার থেকে হাদীছ রেওয়াজাত করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। হযরত সহল বিন সায়ীদ (রাঃ) মদীনার সর্বশেষ ছাহাবী ছিলেন। তিনি একশত বছর বয়সে ৮৮ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। হযরত আবু হাযেম সালমা বিন দীনার হযরত সহল বিন সায়ীদ (রাঃ) ব্যতীতও অপরাপর ছাহাবী থেকে হাদীছ রেওয়াজাত করেন যদিও তিনি তাদের থেকে হাদীছ শ্রবণ করেননি।

তাবেয়ীদের মধ্য হতে তিনি হযরত মুহাম্মদ বিন মুনকাদের, সা'য়ীদ ইবনে মুসাইয়েব প্রমুখ হতে হাদীছের শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ইমাম ইবনে শিহাব যুহরী হতে বয়স্ক ছিলেন। এতদসত্ত্বেও তার থেকে তিনি হাদীছের শিক্ষা গ্রহণ করতেন। ইমাম মালেক, ইবনে উয়াইনা, সুফিয়ান ছওরী, হাম্মাদ প্রমুখ তাঁর ছাত্র ছিল।

মুহাদ্দেছদের মধ্য হতে তিনি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ছিলেন। তিনি অনেক

হাদীছ রেওয়াজাত করেন। কোন কোন সময় তিনি মসজিদে নবুবীতে ওয়াজ করতেন। তাঁর শিক্ষা মজলিসে বহু শ্রোতার সমাবেশ ঘটত। কখনো কখনো এমনও হতো যে, বিলম্বে আসলে মজলিসে স্থান পাওয়া যেত না।

একদিন ইমাম মালেক (রহঃ)-এর তার শিক্ষা মজলিসে আসতে বিলম্ব হয়ে গেল। তিনি সেখানে এসে দেখলেন যে; মজলিসে তিল ধারনেরও ঠাই নেই। তাই তিনি ফেরৎ চলে এলেন।

লোকেরা তাঁকে ফিরে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাদীছ শ্রবণ করা আমার নিকট পছন্দ হয়নি।

এরূপ বলার উদ্দেশ্য তাঁর এই ছিল যে, স্বস্তির সাথে নিকটে বসতে না পারলে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা যায় না।

আবু হাযেম সালমা বিন দীনার ১৪০ হিজরীতে ইত্তিকাল করেন।

ইবনে শিহাব যুহরী

তাঁর প্রকৃত নাম মুহাম্মদ বিন মুসলেম বিন উবাইদুল্লাহ বিন শিহাব আয-যুহরী আল কুরাইশী। তবে তিনি ইবনে শিহাব যুহরী নামে সর্বাধিক পরিচিত। তাবেয়ীদের মধ্যে হাদীছ এবং রেওয়াজাতের ব্যাপারে যাদেরকে স্তম্ভ হিসেবে গণ্য করা হয় তাদের মধ্যে সা'য়ীদ ইবনে মুসাইয়্যেবের পরেই তাঁর স্থান। সিহাহ-সিত্তার প্রতিটি কিতাবেই তার বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা পর্যাপ্ত। আবু বকর ইবনে হযমের পর তিনি দ্বিতীয় হাদীছ সংকলক হিসাবে পরিচিত। ছাহাবাদের মধ্য হতে তিনি হযরত আনাস (রাঃ), হযরত জাবের (রাঃ), ইবনে উমর (রাঃ) সহ আরো অনেক ছাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ করার এবং তাদের থেকে হাদীছ রেওয়াজাত করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমরের (রাঃ) আযাদকৃত গোলাম ছিলেন হযরত নাফে'। তাঁর যোগ্যতা এবং ইলমের প্রতি তাঁর আগ্রহ দেখে তিনি তাঁকে মুক্ত করে দেন। যোগ্যতা থাকলে ইসলাম দাসকেও মর্যাদার আসনে আসীন হওয়াতে আপত্তি করে না। এমনকি তাকে নেতার আসনেও বসাতে দ্বিধাবোধ করে না।

হযরত নাফে' সুদীর্ঘ ত্রিশ বছর যাবৎ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ)-এর খিদমতে ছিলেন। ইবনে উমর ব্যতীতও তিনি হযরত আয়েশা, উম্মে সালামা, আবু হুরায়রা, আবু সাযীদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ হতে হাদীছ রেওয়াজাত করেন।

খলীফা উমর বিন আব্দিল আযীয তাকে মিসরবাসীদের শিক্ষাদানের জন্য প্রেরণ করেন। ১১৭ হিজরীতে তাঁর ইত্তিকাল হয়।

হযরত জাফর সাদেক

ইমাম জাফর সাদেকের বংশ পরম্পরা ছিল এরূপ- জাফর বিন মুহাম্মদ বিন হুসাইন বিন আলী বিন আবি তালেব। তিনি জাফর সাদেক নামে পরিচিত ছিলেন। ইমাম মুহাম্মদ বাকের, উরওয়া বিন যুবাইর, আত্তার মুহাম্মদ বিন মুনকাদের প্রমুখ হতে হাদীছ রেওয়াজাত করেন।

ইমাম আবু হানিফা (রাহঃ), ইমাম মালেক, সুফিয়ান ছাওরী, শো'বা, আবু আহেম, ইয়াহয়া প্রমুখ তার থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেন।

আবু হাতেম বলেছেন, জাফর সাদেক কিরূপ বুয়ুর্গ লোক এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাও তাঁর জন্য অপমানজনক।

ইবনে হাব্বান বলেন, তিনি হযরত আলী (রাঃ)-এর বংশধর ছিলেন। তিনি তাবেয়ীদের অন্তর্গত ছিলেন। তিনি মদীনার একজন বিখ্যাত আলেম ছিলেন।

তিনি মাঝে মধ্যে ছাত্রদেরকে পরীক্ষা করতেন। একবার তিনি ইমাম আবু হানিফাকে প্রশ্ন করলেন, বল তো; কেউ যদি মুহরেম অবস্থায় হরিণের উপরের মাঁড়ীর চারটি দাঁত ভেঙ্গে ফেলে তবে তার কিরূপ শাস্তি হতে পারে? ইমাম আবু হানিফা আরয করলেন, হে রাসূলের বংশধর! আমি তা অবগত নই।

ইমাম জাফর বললেন, হে আবু হানিফা! তুমি তো বড় সাবধানী লোক। তুমি কি জান না যে, হরিণের উপরের মাড়িতে কখনো চার দাঁত থাকে না।

ইমাম মালেক (রাহঃ) ইমাম জাফর সাদেক হতে অনেক হাদীছ গ্রহণ করেছেন, তন্মধ্যে হতে বেশ কিছু হাদীছ তিনি মুয়াত্তা কিতাবে উল্লেখ করেছেন।

আল্লামা যাহরী মুছ'আব বিন আব্দিল্লাহ হতে দু'টি রেওয়াজাত বর্ণনা করেছেন। একটি হচ্ছে এই যে, ইমাম মালেক বনী উমাইয়াদের রাজত্বকাল পর্যন্ত ইমাম জাফর সাদেক হতে কোনও হাদীছ রেওয়াজাত করেননি। আব্বাসীদের রাজত্বকাল আরম্ভ হলে তিনি ইমাম জাফর সাদেকের নিকট হতে রেওয়াজাত করা শুরু করেন।

এ রেওয়াজাতটি সঠিক হতে পারে। তবে প্রশ্ন থেকে যায়, যে ভয়ে তিনি উমাইয়াদের রাজত্বকালে ইমাম জাফর সাদেকের হাদীছ রেওয়াজাত করেননি, আব্বাসীদের রাজত্বকালেও তো সে ভয়টি বিরাজমান ছিল। অপর রেওয়াজাতটি

এরূপ যে, ইমাম জাফর সাদেকের বর্ণিত হাদীছের অন্য কোন সমর্থক রেওয়াজাত না পেলে তিনি তা গ্রহণ করতেন না। এ রেওয়াজাতটি ভিত্তিহীন বলে মনে হচ্ছে। কারণ ইমাম মালেক (রহঃ) তার কিতাব 'মুয়াত্তা'য় ইমাম জাফর সাদেকের অনেক হাদীছ যেগুলোর সমর্থনে কোন হাদীছ তিনি উল্লেখ করেননি রেওয়াজাত করেছেন, যার উল্লেখ ইতিপূর্বে করা হয়েছে।

কোন কোন রেওয়াজাতে এরূপ বর্ণনা দেখা যায় যে, ইমাম জাফর সাদেকের ইত্তিকালের সময় তিনি ইমাম মালেককে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে যান। তবে নির্ভরযোগ্য ইতিহাসে এর কোন প্রমাণ মিলে না।

ইমাম মালেক (রহঃ) যদিও হযরত নাফে' ইবনে হুরমুয প্রমুখ হতে ফিকাহ্‌শাস্ত্র শিক্ষা গ্রহণ করেন। কিন্তু ফিকাহুর সিংহভাগই তিনি বরীয়াতুর রায় হতে অর্জন করেন। তার প্রতি ইমাম মালেক (রহঃ) এতই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন যে, ইতিহাস এবং 'রিজালু' সম্পর্কিত কিতাবে তাঁকে শায়খে মালেক (মালেকের শিক্ষক) বলিয়া অভিহিত করা হয়। এমন কি এটি তার নামের অংশ বিশেষে পরিণত হয়। ইজতিহাদ এবং স্বীয় মত প্রকাশে তিনি এরূপ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন যে, তাকে রায়ী (মতবাদী) উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

ইবনে শায়বার মতে তিনি ছিলেন খুবই বিশ্বাসযোগ্য। মদীনার অন্যতম মুফতী খতীব লিখেছেন, তিনি ফকীহ আলেম এবং ফিকহ ও হাদীছ উভয় শাস্ত্রের হাফেয ছিলেন।

মদীনা তখন সর্বশ্রেষ্ঠ ফিকাহ্‌বিদ এবং মুহাদ্দেহীনদের কেন্দ্র ছিল। সেখানে জ্ঞানী এবং উপযুক্ত লোক ব্যতীত অন্য কারও পক্ষে ফতোয়া দেওয়া অশোভনীয় বরং অসম্ভব ছিল। জ্ঞানে গুণে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে তখন মদীনায় ফতোয়া দেওয়া সম্ভবপর হয়েছিল।

তার মাসয়লা এবং ইজতিহাদ অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর ছিল। ইমাম মালেক (রহঃ) যখন মদীনায় তালীম এবং তাদরীসের কাজে নিযুক্ত ছিলেন তখন তিনি বরীয়াতুর রায়ীর হাদীছ এবং ইজতিহাদের উল্লেখ করতেন। মানুষের নিকট সেগুলো এতই হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছিল যে, তিনি যখন তা বর্ণনা করে চুপ হয়ে যেতেন তখন তারা আরো শুনার আগ্রহ প্রকাশ করত। ইমাম সাহেব তখন আরো হাদীছ এবং ইজতিহাদের কথা বর্ণনা করতেন। এতেও মানুষের আগ্রহ হ্রাস পেত না। তারা আরো অধিক হাদীছ এবং ইজতিহাদ শুনতে আগ্রহ প্রকাশ করত।

ইমাম মালেক (রহঃ) প্রায়শঃ বলতেন, রায়ীর মৃত্যুর পর ফিকাহর স্বাদ চলে গিয়েছে।

তার জীবনের একটি অদ্ভুত ঘটনা রয়েছে। তিনি যখন মাতৃগর্ভে তখন তার পিতা ফররুখ সৈনিক হিসাবে খেরাসানের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে যান। যাবার সময় স্ত্রীর নিকট চল্লিশ হাজার দিরহাম দিয়ে যান। দীর্ঘ আটাশ বছর পর বাড়ী ফিরে এসে তিনি কারো অনুমতির অপেক্ষা না করে নিজ বাড়ীতে প্রবেশ করতে অগ্রসর হলেন। এমন সময় রবীয়াতুর রায়ী দেখতে পেলেন যে, এক অপরিচিত লোক কোন প্রকার অনুমতি ছাড়াই বাড়ীতে প্রবেশ করছে। তিনি বললেন, খবরদার! আর এক পাও সম্মুখে এগুবেন না। তার ঘরে এক অপরিচিত যুবাকে দেখতে পেয়ে তিনিও অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলেন। অপরিচিত পিতা পুত্রের উভয়েই তখন আস্তিন গুটাতে আরম্ভ করলেন। একটি মহা শোরগোল আরম্ভ হল। এ সংবাদ ইমাম সাহেবের নিকট পৌঁছতেই তিনি দৌড়িয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। ইমাম সাহেবকে দেখে লোকেরা নিশ্চুপ হল। তিনি তাকে লক্ষ্য করে বললেন, জনাব! ঘর তো আরও অনেক রয়েছে। আপনি সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছেন না কেন?

আগন্তুক ব্যক্তি বললেন, আমি অন্যত্র যাব কেন? এ তো আমারই বাড়ী, আমার নাম ফররুখ।

এ সময়ে স্ত্রী স্বামীর আওয়ায চিনতে পারলেন। তিনি ঘর হতে বেরিয়ে এসে পিতা পুত্রের মধ্যে পরিচয় করিয়ে দিলেন। পিতা পুত্র একে অপরের গলা জড়িয়ে ধরলেন। পরিস্থিতি শান্ত হবার পর ফররুখ স্ত্রীকে টাকা পয়সা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। স্ত্রী বললেন, সেগুলো আমি অতি যত্নসহকারে পুতে রেখেছি। রবীয়াতু রায়ীর পিতার গচ্ছিত সমস্ত অর্থ তার মাতা তার শিক্ষার পিছনে ব্যয় করেছিলেন। শিক্ষা গ্রহণ শেষে তিনি তখন মসজিদে নবুবীতে শিক্ষাদান কার্যে নিয়োজিত ছিলেন।

ফররুখ যখন মসজিদে নবুবীতে নামায আদায় করতে গেলেন সেখানে তার পুত্রের মান-সম্মান এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখে আনন্দে তার চোখের পানি বইতে লাগল।

সেখান হতে বাড়ী ফিরে আসলে তার স্ত্রী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার নিকট আপনার এ পুত্র অধিক প্রিয়, নাকি আপনার ধন? তিনি বললেন, আমার এ পুত্রের সাথে দুনিয়ার কোন ধন-দৌলতেরই তুলনা হতে পারে না। তখন স্ত্রী বললেন, এ পুত্রের শিক্ষাদানেই সমস্ত সম্পদ ব্যয় করেছি।

বাল্যকালে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ এবং রবীয়ার দরসে অংশ গ্রহণ

ইমাম সাহেবের পরিবারটি ছিল দ্বীনি এবং ইলমী পরিবার। মদীনায় হাদীছের রেওয়াজে ব্যাপক ছিল। বাল্যকালে হাদীছ শিক্ষা শুরু করার ঘটনা তিনি স্বয়ং বর্ণনা করেন। আমি আমার মাকে বললাম, আমিও ইলম শিখতে যাব। তিনি বললেন, আস আমি তোমাকে ইলমে দ্বীনের উপযুক্ত পোশাক পরিয়ে দেই। তিনি আমাকে উত্তম পোশাক পরিয়ে দিলেন। মাথায় কালো লম্বা টুপি রেখে তার উপর পাগড়ী বেঁধে দিয়ে বললেন, তুমি রবীয়ার নিকট যাও। ইলম শিখার পূর্বে তাঁর থেকে আদব শিখ। অন্য এক বর্ণনা মতে তাঁর মাতা বলেছিলেন, এখন যাও। হাদীছ লিখ।

যোবায়রী বলেন, মালেককে আমি রবীয়ার দরসে দেখেছি। সে সময় তার কানে বর্ণালংকার ছিল।

আবু উছমান রবীয়া বিন আবি আব্দির রহমান ফররুখ আওয়ামী আল মাদানী রবীয়াতুর রাঈ নিসবত বা সম্বন্ধ দ্বারা প্রসিদ্ধ। তিনি আনাস বিন মালেক (রহঃ) এবং অন্যান্য অনেক ছাহাবী থেকে হাদীছ রেওয়াজে করেন। তিনি বহু হাদীছ রেওয়াজে করেছেন। তিনি একজন নির্ভরযোগ্য রাবী, মুহাদ্দিছ এবং ফকীহ ছিলেন। মদীনার অনেক প্রসিদ্ধ আলেম এবং ফকীহ তাঁর দরসে অংশ নিতেন। তাঁর এ দরসী হলকা মসজিদে নববীতে হত, যেখানে চল্লিশজন পাগড়ী পরিধানকারী মাশায়েখ ছিলেন।

ইবনে উমরের (রাঃ) মাওলা নাফে' এবং আব্দুর রহমান বিন হুরমুযের শিষ্যত্ব

এ সময়েই ইমাম সাহেব ইবনে উমরের মাওলা (আযাদকৃত গোলাম) নাফে থেকেও ইলম হাছেল করছিলেন। তিনি বলেন, আমি বাল্যকালে আমাদের জৈনিক কর্মচারীর সাথে ইবনে উমরের মাওলা নাফে'র নিকট যেতাম। তিনি উপর থেকে নেমে সিঁড়ির উপর বসে যেতেন এবং আমাকে হাদীছ বর্ণনা করে শুনাতেন। দুপুরে আমি তাঁর নিকট যেতাম। রাস্তায় কোথাও ছায়াও থাকত না। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করতাম— অমুক অমুক মাসয়ালায় ইবনে উমর কি বলেছেন। তিনি তা বর্ণনা করতেন। আর আব্দুর রহমান বিন হুরমুযের নিকট সকালে যেতাম এবং রাত্রে সেখান থেকে ফিরে আসতাম।

মুছআব বর্ণনা করেন, নাফে' দৃষ্টিহীন হওয়ার পর ইমাম মালেক তাঁকে তাঁর

বাড়ী থেকে যাবকী'র দিকে অবস্থিত মসজিদে নবুবীতে নিয়ে যেতেন এবং তাঁকে হাদীছ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। ইমাম সাহেব বলেন, আমার এক ভাই আমার চেয়ে বয়সে বড় যিনি ইবনে শিহাবের সম-বয়সী ছিলেন। একদিন পিতা আমাদের উভয়কে একটি মাসয়ালা জিজ্ঞেস করলেন। আমার ভাই সঠিক উত্তর দিলেন আর আমি উত্তরে ভুল করলাম। পিতা বললেন, কবুতর তোমাকে পড়ালেখা থেকে গাফেল করে দিয়েছে। এ কথাটি আমার মনে খুবই রেখাপাত করল। আমি আব্দুর রহমান বিন হুরমুয়ের দরসী হলকায় যেতে লাগলাম। সেখানে সাত বছর আমি শিক্ষা গ্রহণ করেছি। এ সময়ে অন্য কোন শায়খের নিকট যাইনি। খেজুর নিয়ে আমি তার নিকট যেতাম। বাচ্চাদের খেজুর দিয়ে বলতাম, শায়খ সম্পর্কে কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবে তিনি এখন ব্যস্ত। একদিন আমি ইবনে হুরমুয়ের বাড়ী গিয়ে পৌঁছলে তিনি বাঁদীর মাধ্যমে খবর নিলেন কে এসেছে। সে গিয়ে বলল, সেই আশকার (লাল-গোরা) লোকটি। ইবনে হুরমুয় বললেন, তাকে আসতে দাও, সে ইমাম। মসজিদে নবুবীতে ইবনে হুরমুয়ের দরসী হলকায় বসত।

আবু দাউদ আব্দুর রহমান বিন হুরমুয় আল আরাজ আলমাদানী (রহঃ) হযরত আবু হোরায়ারা (রাঃ)-এর জামাতা ছিলেন। তিনি তাঁর ইলমের ওয়ারেছ ছিলেন। অনেক তাবেঈ থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তিনি অনেক হাদীছ রেওয়ায়েত করেছেন। তিনি নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিছ ছিলেন। এর সাথে সাথে বংশ পরম্পরা, আরাবিয়াত এবং কিরআত সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান রাখতেন।

ছাফওয়ান বিন সুলাইমানের শিষ্যত্ব

ইমাম সাহেবের বাল্যকালীন শিক্ষকদের মধ্যে ছাফওয়ান বিন সুলাইমান একজন বুয়ুর্গ আলেম ছিলেন। একদিন তিনি তাঁর শাগরেদ মালেকের নিকট একটি স্বপ্নের তাবীর জিজ্ঞেস করলেন। শাগরেদ আরয় করলেন, জনাব! আপনার মত বুয়ুর্গ আমার নিকট কোন কিছু জানতে চাওয়া আশ্চর্যজনক ব্যাপার। শিক্ষক বললেন, ভাতিজা! এতে কোন অসুবিধা নেই। স্বপ্ন দেখতে পেলাম যে, আমি আয়না দেখছি। শাগরেদ তৎক্ষণাৎ বললেন, জনাব! আপনি আপনার পরকাল সজ্জিত করছেন এবং স্বীয় প্রভুর নৈকট্য লাভের উপকরণ পাঠাচ্ছেন। এ তাবীরে উস্তাদ খুশী হয়ে বললেন,

আজ তুমি মুওয়াইলাক, যদি তুমি বেঁচে থাক তবে মালেক হয়ে যাবে। হে মালেক! যখন তুমি সত্যিকারে মালেক হবে তখন আল্লাহকে ভয় করবে। নচেৎ তুমি হালেক (ধ্বংসপ্রাপ্ত) হয়ে যাবে।

ইমাম সাহেব বলেন, ঐ সময় লোকেরা আমাকে আদর করে ‘মুওয়াইলাক’ বলে ডাকত। ছাফওয়ান বিন সুলাইম আমাকে প্রথমবার আবু আদিল্লাহ কুনিয়াতে ডেকেছেন, এটা তারই দান।

আবু আদিল্লাহ ছাফওয়ান বিন সুলাইম আলকুরাশী আলযুহদী আলমাদানী (রহঃ) হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর এবং কিবারে তাবেরীদের নিকট থেকে হাদীছ রেওয়াজেত করেছেন। তার যুহদ এবং তাকওয়া এমন ছিল যে, যদি তাকে সংবাদ দেয়া হত যে, আগামীকাল কেয়ামত ঘটবে তবে তার অতিরিক্ত আমল করার দরকার পড়ত না। ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, ছাফওয়ান শীতকালে রাত্রে ছাদে এবং গরমকালে ঘরের ভিতর নামায পড়তেন যেন শীত এবং গরমের কারণে রাত্রি জাগরণ সহজ হয়।

ইবনে শিহাব যুহরীর দরসী হলকায়

ইমাম সাহেবের শিক্ষক এবং শায়খ ছিলেন মদীনার প্রধান প্রধান আলেমগণ যারা উলূমে নবুওয়্যাতে র স্তম্ভরূপ ছিলেন। এঁদের মধ্যে ইবনে শিহাব যুহরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইমাম সাহেব তাঁর নিকট অনেক শিক্ষা লাভ করেছেন। তিনি বলেন, আমরা হাদীছের শিক্ষার্থীরা ইবনে শিহাবের বাড়ীতে ভিড় করতাম। তাঁর দরজায় বসে থাকতাম। দরজা খুললে ভিতরে যাবার সময় ধাক্কা-ধাক্কি শুরু হয়ে যেত। হলকায়ে দরস-এ ইবনে শিহাব বলতেন, **قال ابن** **كذا وكذا** ইবনে উমর এই এই বলেছেন, আর আমরা শুনে যেতাম। হলকা শেষে তাকে জিজ্ঞেস করা হত যে, ইবনে উমরের এ কথা আপনার নিকট কিভাবে পৌঁছেছে? তিনি বলতেন, তাঁর পুত্র সালেম এগুলো বর্ণনা করেছেন।

ইমাম সাহেব বলেন, একবার ঈদের দিন আমি— এ ভেবে যে, আজ ইবনে শিহাব অবসর থাকবেন ঈদগাহ থেকে সরাসরি তাঁর বাড়ীতে গেলাম। ইবনে শিহাব কর্মচারীকে বললেন, দেখত দরজায় কে? সে গিয়ে সংবাদ দিল আপনার আশকার মাওলা (বন্ধু) মালেক। অনুমতি পেয়ে ভিতরে গেলাম। তিনি আমাকে দেখেই বললেন, আমার ধারণা তুমি বাড়ী যাওনি। ঈদগাহ থেকে সরাসরি এখানে চলে এসেছ। খানা খেয়ে নাও। আমি বললাম খাওয়ার প্রয়োজন নেই। আপনি হাদীছ বর্ণনা করুন। তিনি তখন সতেরটি হাদীছ বর্ণনা করলেন। পরে বললেন, এতে তোমার কি লাভ হবে যে, আমি হাদীছ বর্ণনা করব আর তুমি সেগুলো মুখস্থ করবে না। আমি বললাম আপনি বললে আমি সব কটি হাদীছ শুনিয়ে দিই। আর ঐ সময়েই সেগুলো মুখস্থ শুনিয়ে দিলাম।

এক বর্ণনায় এরূপ রয়েছে, আমি আমার তখতীগুলো তাকে দেখালে তিনি আরও চল্লিশটি হাদীছ লেখালেন। তিনি বললেন, তুমি যদি এগুলো মুখস্থ করে নাও তবে এগুলোর হাফেজ হয়ে যাবে। আমি বললাম, এগুলো আমি এখনই মুখস্থ শুনাতে পারব। ইবনে শিহাব বললেন, শুনাও। আমি সে হাদীছগুলো গুনিয়ে দিলাম। তিনি বললেন, 'উঠ তুমি ইলমের ভাণ্ডার। অথবা বললেন, তুমি ইলমের কতই না উত্তম ভাণ্ডার।'

মুতাররাফ বিন আব্দিল্লাহ বর্ণনা করেন, একবার ইমাম মালেক বললেন, মদীনায় আমি একজন মুহাদ্দিছকেই ফকীহ পেয়েছি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কে? তিনি বললেন, ইবনে শিহাব যুহরী। ইমাম সাহেব বলেন, ইবনে শিহাব সর্বপ্রথম সনদসহকারে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। আমরা ইমাম সাহেবের নিকট ভিড় করে বসে থাকতাম। ইয়াহয়া বিন মাস্নিন বলেন, ইবনে শিহাবের শাগরেদদের মধ্যে মালেক সবচেয়ে বেশী নির্ভরযোগ্য। এরপর মামার।

আলী বিন মাদীনী সুফিয়ান ছাওরীকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি ইমাম মালেককে দেখেছেন? তিনি বললেন হ্যাঁ, ইবনে শিহাবের নিকট তাকে দেখেছি। আমি হিসাব করে দেখলাম ঐ সময় তাঁর বয়স আটাইশ বছর। এর পূর্বে তিনি নাফে'র দরসী মজলিসে বসতেন।

ফকীহ আবু বকর মুহাম্মদ বিন মুসলিম বিন উবাইদুল্লাহ বিন আব্দিল্লাহ বিন শিহাব আলকুরাশী আল যহরী আলমাদানী (রহঃ) হেজাজ এবং সিরিয়ার আলেম ছিলেন। তিনি অনেক সম্মানিত এবং বড় তাবেঈন থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ফিকাহ এবং হাদীছ উভয় বিষয় সম্পর্কে তিনি পারদর্শী ছিলেন।

মদীনা মুনাওয়ারা দ্বীনি এবং ইলমী কেন্দ্র

ইমাম মালেক (রহঃ) মদীনায় জনগৃহণ করেন এবং সেখানেই শিক্ষা সমাপন করেন। শিক্ষা অর্জনার্থে তাঁর মদীনার বাইরে যাওয়ার কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। ঐ সময় মদীনা ছিল দ্বীন এবং উলামায়ে দ্বীনের কেন্দ্রস্থল। ইসলামী জগতের সকল আহলে-ইলম এ কেন্দ্রে আগমন করতেন। আবু আলীয়া বছরী (রহঃ) বলেন, আমরা বছরায় ছাহাবায়ে কিরাম হতে বর্ণিত হাদীছ শ্রবণ করতাম, কিন্তু যে পর্যন্ত মদীনায় এসে স্বয়ং ঐ ছাহাবায়ে কিরাম থেকে হাদীছ শ্রবণ না করতাম, নিশ্চিত হতাম না। এজন্যই ইমাম মালেক (রহঃ) মদীনায় অবস্থান করে সর্তকতা এবং দায়িত্ব সহকারে ইলম অর্জন করেছেন।

তিনি বলেন, আমি এ মদীনা শহরে এমন বুয়ুর্গদেরকে পেয়েছি, যদি তাদের অসীলা দিয়ে আল্লাহর নিকট বৃষ্টি প্রার্থনা করা হত তবে অবশ্যই বৃষ্টি হত। তারা হাদীছ রেওয়াজে তও করেছেন। কিন্তু আমি তাদের থেকে হাদীছ গ্রহণ করিনি। কারণ তারা আল্লাহর ভয়, যুহদ এবং তাকওয়ার জীবন গ্রহণ করেছেন। আর এ ইলমে দ্বীন তথা ইলমে হাদীছের ফিকাহর জন্য যুহদ, তাকওয়া এবং খোদাভীতির সঙ্গে গভীর জ্ঞান এবং মেধারও প্রয়োজন রয়েছে যেন বর্ণনাকারী বুঝতে পারে যে, সে কি বর্ণনা করেছে এবং আগামীতে এর পরিণাম কি দাঁড়াবে? যে আলেমের মধ্যে এ গুণাবলী না থাকবে সে নিজেও দলীল হতে পারে না এবং তার নিকট থেকেও ইলমে দ্বীন অর্জন করা যায় না। তাকে সন্দেহযুক্ত করার অধিকার আমাদের নেই। কিন্তু সে ইলমে দ্বীনের বাহক হতে পারে না।

ইমাম সাহেব আরও বলেন, আমি এমন অনেক আহলে ইলম দেখেছি যারা বহু ছাহাবাকে পেয়েছেন কিন্তু তাদের নিকট থেকে ইলম হাছেল করেননি।

একবার লোকেরা ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি আমার বিন দীনারের নিকট হাদীছ পড়েছেন? তিনি বললেন, তিনি হাদীছ বর্ণনা করছিলেন। আর শিক্ষার্থীরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লিখছিল। দাঁড়িয়ে হাদীছ লেখাটা আমার নিকট পছন্দ লাগেনি।

ইমাম সাহেব একবার আবু যিনাদের দরসী হুকুম নিকট দিয়ে গেলেন। কিন্তু সেখানে বসেননি। পরে আবু যিনাদ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আমার ওখানে কেন বসেননি? ইমাম সাহেব বললেন, জায়গা সংকীর্ণ ছিল। আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীছ হাছেল করা আমি সমীচীন মনে করিনি।

ছাত্রজীবনে আর্থিক সংকট

ইমাম সাহেবের পরিবার অত্যন্ত কষ্টে জীবিকা নির্বাহ করত। কাযী ইয়ায তাঁর পিতা সম্পর্কে লিখেন, ইমাম সাহেবের পিতা তীর তৈরী করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

আগেই বলা হয়েছে যে, ইমাম সাহেবের ভাই নযর সুতী কাপড়ের ব্যবসা করতেন। ইমাম সাহেব তার সাথে এ ব্যবসায় শরীক ছিলেন। কিন্তু এতে এ পরিমাণ আয় হতো না যদ্বারা ইমাম সাহেব নিশ্চিতাবে ছাত্রজীবন কাটাতে পারেন। পরে আল্লাহ তাআলা তাঁকে প্রাচুর্য এবং সচ্ছলতা দান করেছেন এবং

সুখী জীবন যাপন করেছেন।

একবার ইমাম সাহেব খলীফা আবু জাফর মনসূরকে প্রজাদের খবরাখবর নেয়ার জন্য নছীহত করলেন। তিনি বললেন, ঘটনা কি এরূপ নয় যে, আপনার ছোট মেয়ে ক্ষুধায় কাঁদতে ছিল আর আপনি খাদেমাকে চাকী চালনার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যেন প্রতিবেশীরা কান্নার আওয়াজ না পায়। এ ঘটনা যখন আমি জানি তখন কি প্রজাদের অবস্থা আমার জানা নেই?

দুঃখ কষ্টের এ অবস্থা অনেক সময় বড় কঠিন হয়ে দাঁড়াত। এ কষ্টের পর তাঁর সুখের জীবন আসল। ইবনে কাসেম বলেন, শিক্ষা জীবন ইমাম মালেককে এ অবস্থায় পৌঁছিয়ে দিয়েছে যে, তিনি ঘরের ছাদের কাঠ বিক্রয় করতে বাধ্য হয়েছেন। পরে পার্থিব সম্পদ তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়েছে।

ঐ অভাব-অনটনের সময় ইমাম সাহেবের অবস্থা এরূপ ছিল যে, তিনি মানুষের নিকট থেকে পৃথক হয়ে গাছের ছায়ায় বসে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীছ মুখস্থ করতেন। তাঁর বোন পিতার কাছে তাঁর সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন যে, সে একা বসে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীছ মুখস্থ করছে।

কয়েকজন প্রসিদ্ধ শায়খ এবং উস্তাদ

ইমাম মালেক (রহঃ) যাদের নিকট থেকে ইলমে দ্বীন অর্জন করেছেন তাদের সংখ্যা অনেক। এঁদের মধ্যে বিশিষ্ট তবেঈন, প্রসিদ্ধ ফকীহ এবং মুহাদ্দিছ রয়েছেন।

যুরকানী বলেন, ইমাম মালেকের শিক্ষকের সংখ্যা নয় শতাধিক। গাফেকী পঁচানব্বই জনের নাম উল্লেখ করেছেন। কয়েকজনের নাম নিম্নে দেয়া হলঃ

রবীয়া রাঈ, নাফে' মাওলা ইবনে উমর, মুহাম্মদ বিন মুসলিম বিন শিহাব যুহরী, আমের বিন আদ্দিল্লাহ বিন যুবাইর, নাঈম বিন আদ্দিল্লাহ আল মুহমার, যায়েদ বিন আসলাম, হুমাইদুত্তবিল, সায়ীদ মাকবুরী, আবু হাযেম সালামা বিন দীনার, শরীক বিন আদ্দিল্লাহ বিন আবু নোমায়ের, ছালেহ বিন কায়সান, ছাফওয়ান বিন সুলাইম, আবুযযিনাদ, মুহাম্মদ বিন মুনকাদের, আব্দুল্লাহ বিন দীনার, আবু তেওয়াল্লা, আব্দুর রাব্বি বিন সায়ীদ, উমর বিন আবি আমর 'আলা বিন আদ্দির রহমান, হিশাম বিন উরওয়া বিন যুবাইর, ইয়াযীদ বিন মুহাজির, ইয়াযীদ বিন আদ্দিল্লাহ বিন খুসাইফা, আবুয যুবাইর মক্কী, ইব্রাহীম ইবনে উকবা, মুসা বিন উকবা, আইয়ুব সাখতিয়ানী। ইসামাঈল বিন আবি হাকীম,

হুসাইন বিন আদ্রির রহমান, জাফর ছাদেক বিন মুহাম্মদ, হুসাইন বিন কায়স মক্কী, দাউদ বিন হুসাইন, যিয়াদ বিন সাদ, যায়েদ বিন রাবাহ, সালেম বিন আবিনুদর, সুমাই মাওলা আবি বকর বিন আদ্রির রহমান, সুহাইল বিন আবি ছালেহ, ছাযফী মাওলা আবি আইয়ুব, হামযা বিন সায়ীদ, তুলহা বিন আদ্রিল মালেক আয়লী, আব্দুল্লাহ বিন আবি বকর বিন হযম, আব্দুল্লাহ বিন ফযল হাশেমী, আব্দুল্লাহ বিন ইয়াযীদ, আব্দুর রহমান বিন আদ্রিল্লাহ বিন ছা'ছা, আব্দুর রহমান বিন কাসেম, উবাইদুল্লাহ বিন আদ্রিল্লাহিল আগার, আমর বিন মুসলেম বিন উমারা, আমর বিন ইয়াহয়া বিন উমারা, কুতুব বিন ওহব, আবুল আসওয়াদ, ইয়াতীম, উরওয়া, মুহাম্মদ বিন আমর বিন হালহালা, মুহাম্মদ বিন ইয়াহয়া বিন হাব্বান, মাখরামা বিন-বুকাইর প্রমুখ।

ইরাকী শায়খ

ইমাম মালেক (রহঃ)-এর ইরাকের কোন শায়খ ছিলেন না। তাঁর বিশিষ্ট ছাত্র আবু মুছ'আব বলেন, কোন এক ব্যক্তি ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনি ইরাকী শায়খদের কোন রেওয়য়াত গ্রহণ করেন না কেন? জবাবে তিনি বলেছিলেন, আমি তাদেরকে দেখেছি যে, তাঁরা এমন লোকের নিকট হতে হাদীছ শিক্ষা করেন যাঁদের উপর কখনো বিশ্বাস করা যায় না। এরপরও তাদের থেকে কিভাবে আমি রেওয়য়াত করতে পারি?

আবু মুছ'আবও এ বিষয়ে একমত যে, ইরাকী লোকেরা তাদের নিজেদের দেশে এমন লোকদের থেকে হাদীছ শিক্ষা করে যাদের উপর নির্ভর করা যায় না।

শুয়াইব বিন হারবও ইমাম সাহেবকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি জবাবে বলেছিলেন, আমাদের বুয়ুর্গগণও তাদের বুয়ুর্গদের নিকট হতে কোন রেওয়য়াত গ্রহণ করেন নাই। এজন্য আমিও তাদের নিকট হতে কোন রেওয়য়াত গ্রহণ করি না।

মদীনার বাইরের শায়খদের নিকট হতে রেওয়য়াত গ্রহণ করতে ইমাম সাহেব খুবই যাচাই বাছাই করে নিতেন।

ইরাকের শায়খদের মধ্য হতে তিনি শুধু আইয়ুব সাখতিয়ানী হতে হাদীছ গ্রহণ করেছেন। তিনি বিখ্যাত তাবেয়ীদের মধ্যে গণ্য ছিলেন।

সায়ীদ বিন মুসাইয়েব তার উচ্চ প্রশংসা করেছেন। শো'বা তাকে 'সাইয়েদুল ফুকাহা' বলেছেন।

ইমাম সাহেব বলেন, আমি হজ্জের মৌসুমে মক্কা শরীফে তাকে দুই হজ্জে দু'বার দেখেছি। কিন্তু তাঁর নিকট হতে তখন কোন হাদীছ লিখিনি। তৃতীয় বছর তাকে যমযম কূপের নিকট উপবিষ্ট দেখতে পেলাম। রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র নাম মুবারক শুনা মাত্র তিনি এরূপ ক্রন্দন করতে লাগলেন যে, আমি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠলাম। তাঁর এ অবস্থা দেখার পর হতে আমি তার নিকট হতে হাদীছ লিখতে শুরু করি।

দরস ও ইফতার আসনে

মেধা, প্রচেষ্টা এবং আগ্রহের কারণে ইমাম সাহেব সতের বছর বয়সে সমস্ত দ্বীনি ইলম অর্জন করে ফেলেছেন। ঐ বয়সেই তিনি তাঁর উস্তাদদের অনুমতিক্রমে এবং তাঁর যোগ্যতার সাক্ষ্যদানক্রমে দরস এবং ইফতার আসনে বসেন। তিনি স্বয়ং বর্ণনা করেন, সত্তরজন উলামায়ে কেরাম আমার যোগ্যতা সম্পর্কে সাক্ষী দেয়ার পূর্বে আমি ফতোয়া দেইনি।

তখনও তাঁর কয়েকজন শায়খ জীবিত ছিলেন। তিনি তাদের জীবদ্দশায়ই ফতোয়া দিতেন। আইয়ুব সাখতিয়ানী বলেন, হযরত নাফে' বেঁচে থাকাকালে আমি মদীনা গিয়েছিলাম। তখন ইমাম মালেকের দরসী হলকা কায়েম ছিল। ইবনে মুনযের বর্ণনা করেন, ইমাম মালেক (রহঃ) তাঁর শায়খ নাফে' এবং যায়দ বিন আসলামের জীবদ্দশায়ই ফতোয়া দেয়া শুরু করেন। মুসআবের বর্ণনানুসারে নাফে'র জীবদ্দশায়ই ইমাম মালেকের দরসী হলকা বেশ বড় ছিল। শো'বাও তদুপ বর্ণনা করেন।

ইমাম সাহেবের ইফতার এবং দরসী হলকায় তাঁর অনেক শায়খও অংশ নিতেন। তিনি বলেন, আমার শিক্ষকদের মধ্যে এমন লোক কমই আছেন যাঁরা মৃত্যুর পূর্বে আমার নিকট এসে ফতোয়া জিজ্ঞেস করেননি। ইমাম সাহেবের ইফতার এবং দরসী হলকা দু' জায়গায় অনুষ্ঠিত হত। একটি হচ্ছে মদীনায় মসজিদে নবুবীর রওযায়ে জান্নাতে, যেখানে বসে তিনি নাফে'র নিকট থেকে ইলম অর্জন করেছেন। অপরটি হচ্ছে আকীক উপত্যকার জুরুফ নামক স্থানে। যেখানে তাঁর নিজস্ব বাড়ী ছিল।

বাড়ীতে যে মজলিস হত সেখানে ইমাম সাহেবের ডানে বাঁয়ে শিরোধান রাখা হত। সুগন্ধির জন্য 'উদ কাঠ' জ্বালানো হত। পাখা রাখা হত। মজলিসে কোনরূপ আওয়াজ হত না। কুরাইশ এবং আনছার ব্যতীতও বাইরের অনেক ছাত্রের ভিড় জমত। কিন্তু মজলিসের আদব, নীরবতা এবং গাভীর্যে কোন

পরিবর্তন হত না। বাহিরের ছাত্ররা কোন প্রশ্ন করলে তিনি পালাক্রমে সেগুলোর উত্তর দিতেন। হাদীছে রাসূলের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আদব সর্ববস্থায়ই রক্ষা করা হত।

ইমাম মালেকের শিক্ষা মজলিস

হযরত নাফে' (রহঃ) যিনি হযরত ইবনে উমর (রাঃ)-এর স্থলাভিষিক্ত ছিলেন। তিনি মৃত্যুবরণ করলে ইমাম মালেক (রহঃ) তার স্থলাভিষিক্ত হন। কুফার সর্বশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস শো'বা বলেন, আমি হযরত নাফে'র ইত্তিকালের পর মদীনায় এসে দেখলাম, ইমাম মালেক ধর্মজগতের সর্বশ্রেষ্ঠ পদে অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন।

শো'বার এ উক্তি দ্বারা বুঝা যায় যে, ইমাম মালেক (রহঃ) ১১৮ হিজরীতে তাঁর শিক্ষা মজলিস কায়েম করেন। কারণ ১১৭ হিজরীতে হযরত নাফে'র মৃত্যু হয়। অবশ্য কোন কোন বর্ণনামতে বুঝা যায় যে, হযরত নাফে'র জীবদ্দশায়ও ইমাম মালেক ফতোয়া দিতেন এবং তার দরসী হলকা কায়েম ছিল।

হাদীছ বর্ণনা করার পূর্বে ইমাম সাহেব অযু-গোসল করে অতি মূল্যবান উত্তম পোশাক পরিধান করতেন। তিনি কেশ বিন্যাস এবং সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। এ সমস্ত কাজ করার পর তিনি বাড়ী হতে বের হতেন।

শিক্ষা মজলিস শুরু হলে শিক্ষার্থী এবং শ্রোতাগণ নীরবে বসে যেতেন। এমন কি ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)ও যখন সে মজলিসে যোগ দিতেন তখন তিনিও সেখানে বিনয়ের সাথে বসে যেতেন। মজলিসে নীরবতা বিরাজ করত।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন, সভার নীরবতা বিনষ্ট হবার আশংকায় আমরা কিতাবের পাতাও অতি সতর্কতার সহিত উল্টাতাম। এসব নিয়মনিষ্ঠা এবং জাঁকজমকের সামনে রাজদরবারের জাঁক জমকও ম্লান হয়ে যেত।

ইমাম সাহেবের শিক্ষা মজলিসের প্রশংসা করতে গিয়ে জনৈক কবি বলেন, ইমাম সাহেব যদি জবাব না দিতেন তবে তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং গাভীর্যতার কারণে কারো কোন প্রশ্ন করার সাহস হত না।

তিনি এত গুরুগম্ভীর ছিলেন যে, তাঁর গাভীর্যতার প্রতি সকলেরই গভীর শ্রদ্ধা ছিল সকলই প্রভাবিত ছিলেন। মানুষ তাকে ভয় করত। অথচ তার মাথায় কোন রাজ মুকুটও ছিল না। কিংবা তাঁর হাতে কোন রাজদণ্ডও ছিল না। তবে এ কথা সত্য যে রাজদণ্ডের অধিকারীরা তার খিদমতে এসে বিনীত হয়ে বসে থাকতেন।

খলীফা হারুনুর রশীদ যখন মদীনায় আসলেন তখন তিনি ইমাম সাহেবের নিকট মুয়াজ্জা কিতাবের ব্যাখ্যা শুনার বাসনা প্রকাশ করলেন। ইমাম সাহেব বললেন, আগামীকাল এ সম্বন্ধে আলোচনা হবে। খলীফার ধারণা ছিল আগামীকাল ইমাম সাহেব খলীফার দরবারে উপস্থিত হবেন। কিন্তু ইমাম সাহেব খলীফার দরবারে না গিয়ে নিয়মিত শিক্ষা মজলিসে শিক্ষাদান আরম্ভ করলেন। খলীফা হারুনুর রশীদ এ বিষয় জানতে চাইলে ইমাম সাহেব বললেন, ইলমের নিকট লোক আসবে। ইলম কারো নিকট যাবে না।

শেষ পর্যন্ত খলীফা হারুনুর রশীদ সেই দরবারে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন যেই দরবারে সাধারণ শ্রোতা এবং অসাধারণ শ্রোতার মধ্যে কোন পার্থক্য চলে না। তিনি সেখানে উপস্থিত হয়ে সাধারণ লোকদের তথা শ্রোতাদের বের করে দিতে বললেন। ইমাম সাহেব বললেন, ব্যক্তিগত স্বার্থে জনগনের স্বার্থ বরবাদ করা চলে না।

ইমাম মালেক (রহঃ) হাদীছের আলোচনা এবং চর্চা মসজিদে নবুવી এবং শিক্ষা মজলিসের বাইরে করতেন না। একারণেই খলীফা হারুনুর রশীদের দরবারে হাদীছের আলোচনা করতে ইমাম সাহেব সম্মত হননি।

রাস্তায় চলাকালে কিংবা কোন কাজে ব্যস্ত থাকলে তিনি হাদীছ বর্ণনা করতেন না। একে তিনি আদবের খেলাফ মনে করতেন। অধিকন্তু কোন কিছু পরিপূর্ণভাবে শ্রবণ করতে এবং তার মর্ম অনুধাবন করতে পূর্ণ একাগ্রতার প্রয়োজন যা এরূপ অবস্থায় অসম্ভব প্রায়। উলামাদের মজলিসে উচ্চস্বরে কথা শলাটাও আদবের পরিপন্থী। একবার খলীফা আবু জাফর মনসুর ইমাম সাহেবের মজলিসে কোন বিষয়ে তর্ক বিতর্ক করার সময় তার কণ্ঠস্বর উচ্চ হয়ে যায়। ইমাম সাহেব তাকে শাসাতে গিয়ে একটি আয়াত পাঠ করলেন, যার অর্থ হচ্ছে- 'নবীর আওয়াজ থেকে তোমাদের আওয়াজ উঁচু করো না।'

ইমাম সাহেবের নিয়ম ছিল ফজরের নামাযের পর হতে সূর্য উদয় পর্যন্ত তিনি নামাজের বিছানাতে বসেই দোয়া দরুদ পড়তেন এবং যিকর আযকার করতেন। সূর্যোদয়ের পর লোক সমাগম আরম্ভ হলে ইমাম সাহেব তাদের প্রতি মনোনিবেশ করতেন। ইমাম সাহেব আন্তে আন্তে গম্ভীরস্বরে হাদীছের আলোচনা করতেন। একটি হাদীছ শেষ না করে অপর হাদীছ শুরু করতেন না।

মালেকী ফিকহ

ইমাম মালেক (রহঃ)-এর ফিকাহর ভিত্তি মদীনার ফিকাহ। মদীনায়

অবস্থানকারী ছাহাবীদের থেকে তাবেয়ীরা যে ফিকাহ গ্রহণ করেছিলেন। ইমাম মালেক (রহঃ) তার উপরই তাঁর ফিকাহর ভিত্তি রাখেন।

শাহ ওলীউল্লাহ (রহঃ) লিখেন, ইমাম মালেক (রহঃ)-এর ফিকাহকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীছের ছায়ারূপে মনে হয়।

এতে স্থান পেয়েছে ফারুকে আ'যমের শাসন পদ্ধতি। এই ফিকাহর ফতোয়াসমূহ ইবনে উমর এবং অন্যান্য ছাহাবায়ে কিরামের ফতোয়ার প্রতিধ্বনি করত।

মুয়াত্তা কিতাবের দলিলাদি হাদীছ সমূহ এবং 'আছার' গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করলে এটাই প্রতীয়মান হবে যে, ইমাম মালেক (রহঃ)-এর ফিকাহ এবং ফতোয়া হুকুমতে এলাহীর প্রতিধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই নয়।

মদীনার শায়খগণ ইমাম সাহেবের জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব এবং মর্যাদার স্বীকার করা সত্ত্বেও সত্তরজন আলেমের অনুমোদন না হওয়া পর্যন্ত তিনি ফতোয়া দেননি।

সরকারী ঘোষণা

শুধু মদীনা এবং হেজাজ হতে নয় বরং বিভিন্ন দেশ হতে আগত প্রশ্নকারীরা ইমাম সাহেবের নিকট ভিড় লাগিয়ে থাকত।

হজ্জের মৌসুমে মুসলিম বিশ্বের মুসলমানগণ যখন 'আরাফার ময়দানে সমবেত হত এবং কূফা, বসরা ও খোরাসানের উলামায়ে কিরাম হরম শরীফে একত্রিত হতেন, তখন সরকারীভাবে ঘোষণা করে দেওয়া হত যে, ইমাম মালেক এবং ইবনে আবী যি'ব ব্যতীত অপর কেউ যেন ফতোয়া না দেন।

মাসআলার ব্যাপারে ইমাম সাহেবের অনড়তা

ইমাম মালেক (রহঃ)-কে খিলাফতের পক্ষ হতে যে অসাধারণ সম্মান দেওয়া হয়েছিল, অপর কাউকে যদি এরূপ সম্মান দেখানো হতো তবে তিনি খলীফার রীতিমত তোয়াজ করে চলতেন। কিন্তু ইমাম মালেক (রহঃ) ছিলেন ভিন্ন প্রকৃতির। তাই তো তিনি শরীয়তের কোন মাসআলার ব্যাপারে কোরআন হাদীছের আলোকে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন তা প্রকাশ করতে রাজকীয় মতবাদে কোন তোয়াক্কা করেননি।

প্রশ্ন উঠল, কোন ব্যক্তি যদি অপরের জোর প্রয়োগের কারণে বাধ্য হয়ে নিঃস্বীকৃতি তালাক দেয় তবে কি এ তালাক পতিত হবে? ইমাম আবু হানিফা

(রহঃ)-এর মতে এ তালাক পতিত হবে কিন্তু ইমাম মালেক (রহঃ) এবং অধিকাংশ মুহাদ্দেছগণের মতে তালাক সাব্যস্ত হবে না।

মদীনার গভর্নর ছিলেন জাফর বিন সুলাইমান। তিনি ছিলেন আব্বাসীয় বংশের সন্তান। খলীফা আবু জাফর মনসুরের চাচাত ভাই। তিনি ইমাম মালেক (রহঃ)-এর উপর এই নির্দেশ জারী করলেন যে, তিনি যেন 'বাধ্য হয়ে যে তালাক দেয়' তার তালাক পতিত না হওয়া সম্পর্কিত পূর্বের অভিমত অনুযায়ী ফতোয়া না দেন।

কিন্তু ইমাম সাহেব স্পষ্টভাবে প্রকাশ্যে তার স্বীয়মত ঘোষণা করলেন। ইমাম সাহেবকে তার এ সম্পর্কিত মতবাদ হতে বিরত রাখার জন্য সরকারী নির্দেশে দুররা মেরে শাস্তি দেওয়া হল। কিন্তু এতে কোন ফল ফলল না। তাঁকে নির্দয়ভাবে বেদম প্রহার করা হল। তথাপি ইমাম সাহেবের যতক্ষণ কথা বলার শক্তি ছিল; দুররা মারার সাথে সাথে বলতে ছিলেন মালেক বিন আনাস ফতোয়া দিচ্ছে যে, জোর জবরদস্তিতে বাধ্য হয়ে তালাক দিলে তালাক পতিত হবে না।

জবাবে চিন্তা এবং অনুসন্ধিৎসা

ইমাম মালেক (রহঃ) মাসায়েল বর্ণনা করার সময় এবং ফতোয়া দেওয়ার সময় যুগোপযোগী দৃষ্টিভঙ্গি সহকারে খোঁজ খবর নিয়ে সুচিন্তিতভাবে জবাব দিতেন।

ইবনে আবী উয়াইস বলেন, একবার ইমাম সাহেব বললেন, মাঝে মধ্যে এমন মাসয়ালা পেশ হয় যে, তাতে আমার আহার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটায়। আমি বললাম, আপনার কথা লোকেরা পাথরে খোদিত বাণীর ন্যায় শিরোধার্য মনে করে থাকে। তথাপি আপনি এমন মাথা ঘামান কেন? ইমাম সাহেব তখন অতি সূক্ষ্ম উত্তর দিয়ে বললেন, হে ইবনে আবী উয়াইস! এজন্যই তো আমার আরো অধিক সতর্ক এবং সাবধান হওয়া উচিত।

এতদসত্ত্বেও যদি তার কোন মাসয়ালা ভুল হয়ে যেত এবং কেউ তা সংশোধন করে দিতেন তবে তিনি তা মেনে নিতেন।

জনৈক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞাসা করল, অযুর সময় পায়ের আঙ্গুল খিলাল করা কি আবশ্যিকীয়? ইমাম সাহেব বললেন, এটা আবশ্যিকীয় নয়। ইবনে ওহ্‌হাব নামক ইমাম সাহেবের এক ছাত্র সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, খিলাল সম্পর্কিত একটি হাদীছ আমার নিকট রয়েছে। ইমাম সাহেব হাদীছটি শ্রবণ করে বললেন, হাদীছটি গ্রহণযোগ্য; এরপর থেকে ইমাম সাহেব সর্বদাই

সে হাদীছ অনুযায়ী ফতোয়া দিতেন।

দীর্ঘ প্রায় ষাট বৎসরকাল ক্রমাগতভাবে ইমাম ফিকহ এবং ফতোয়া সংকলন করেছেন। কাযী আসসাদ বিন ফোরাত আফ্রিকী নামক তাঁর জনৈক ছাত্র এ সম্পর্কিত সর্বপ্রথম কিতাব প্রণয়ন করেন। কিতাবটির নাম দেওয়া হয়েছিল আস'আদীয়া। ইবনে কাসেম নামক তার অপর এক শাগরেদ আল মুদাওয়ানা নামক অপর একটি কিতাব সংকলন করেন। এ কিতাবটিই সর্ব প্রসিদ্ধ। তাঁর অপর এক শিষ্য ইবনে ওহ্‌হাব মিসরী আল মুজালাছাত আন মালেক নামক আরেকটি কিতাব সংকলন করেন। এ কিতাবসমূহে ইমাম সাহেবের অজস্র ফতোয়ার সমাবেশ ঘটেছে।

আল মুদাওয়ানা কিতাব সংকলক ইবনে কাসেম সম্পর্কে বলা হয় যে, ইমাম সাহেবের চল্লিশ হাজার মাসয়ালা তার মুখস্ত ছিল।

ইমাম সাহেবের গুণ-গরিমা

ফিকহ ও হাদীছ শাস্ত্রের পাণ্ডিত্য পরিমাপের যদি কোন মাপকাঠি থেকে থাকে তবে এ কথা নির্দিষ্টায় বলা যাবে যে সে মাপকাঠি অনুযায়ী ইমাম সাহেবের স্থান অনেক উর্ধ্বে। তাঁকে আবরাবে রায় বা বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে গণ্য করা হয়।

ইয়াহয়া বিন মাঈন হাদীছ এবং রিজালের পরীক্ষক ছিলেন। তিনি ইমাম মালেক (রহঃ)কে আমিরুল মুমিনীন ফিল হাদীছ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

সুফিয়ান বিন উলাইয়া যিনি একজন প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ ছিলেন। তিনি বলেন, ইমাম মালেকের তুলনায় আমরা অতি নগণ্য। তোমরা-আমরা প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁর অনুসরণ করে থাকি। ইমাম মালেক যে শায়খের নিকট থেকে হাদীছ গ্রহণ করেছেন আমরাও তার থেকে হাদীছ গ্রহণ করেছি। আর তিনি যার রেওয়য়াত গ্রহণ করেন নাই আমরাও তার কোন রেওয়য়াত গ্রহণ করি নাই।

আব্দুর রহমান বিন মাহদী বলেন, এ বিশ্ব চরাচরে ইমাম মালেকের চেয়ে হাদীছে নববীর অধিক আমানতদার আর কেউ ছিলেন না। অপর করো উপর অধিক গুরুত্ব দেয়া চলে না।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তিনি যদি কারও হাদীছ হিফজ করতে চান তবে কার হাদীছ হিফজ করবেন? ইমাম আহমদ বললেন, মালেক বিন আনাসের হাদীছ হিফজ করব।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ ইমাম মাহদীকে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, আমি শুনেছি যে, আপনি বলে থাকেন, ইমাম মালেক ইমাম আবু হানিফা হতে ও শ্রেষ্ঠ ফিকাহবিদ। তিনি বললেন, আমি তা বলি না। কিন্তু আমি এ কথা বলে থাকি যে, ইমাম মালেক ইমাম আবু হানিফার উত্তাদ হান্মাদের চেয়ে বড় ফকীহ।

ইবনে মাঈন বলেন, যুহরীর শিষ্যদের মধ্য হতে ইমাম মালেকের চেয়ে অধিক নির্ভরযোগ্য আর কেউ ছিলেন না। তিনি আরও বলেছেন, ইমাম মালেক খোদার তরফ হতে সৃষ্টি জগতের জন্য একটি প্রমাণ স্বরূপ।

ইমামুল হাদীছ ইয়াহয়া বিন সায়ীদ আল কাত্তান বলেছেন, মালেক উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য রহমতস্বরূপ।

জনৈক বুয়ুর্গ বলেছেন, ইমাম মালেকের চেয়ে বড় আলেম আমি আর কাউকে দেখিনি।

আত্ম-সম্মানবোধ

আলেমদের আত্ম-সম্মানবোধ না থাকার অর্থ হল ইলমের সম্মান না করা। তাদের যথেষ্ট আত্ম-সম্মানবোধ থাকা চাই। তাদের জীবনধারণ এমন হওয়া চাই যে, তাদেরকে দেখে মানুষ যেন ইলমের প্রতি আগ্রহশীল হয়ে উঠে। ইমাম মালেক (রহঃ) সব সময়ই এ দিকে লক্ষ্য রাখতেন।

বড় বড় আমীর ওমরা ও বিচারকগণ ইমাম সাহেবের খিদমতে উপস্থিত হতেন। তাদের অনেকে ইমাম সাহেবের ভয়ে কম্পমান থাকতেন।

হারুনুর রশীদ তাঁর তাঁবুতে হাদীছের আলোচনা করার জন্য ইমাম সাহেবকে আমন্ত্রণ করেছিলেন। ইমাম সাহেব তা প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন, মানুষ ইলমের নিকট আসবে; ইলম মানুষের নিকট যাবে না। খলীফা ইমাম সাহেবের খিদমতে উপস্থিত হলেন। তিনি সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন হতে চাইলেন। ইমাম সাহেব জানিয়ে দিলেন শিক্ষা মজলিসের আদব রক্ষা করা উচিত। খলীফা নিম্নে আসন গ্রহণ করে বললেন, আপনি মুয়াত্তা পাঠ করুন। ইমাম সাহেব বললেন, ইহা আমার অভ্যাস বহির্ভূত। অতঃপর তাঁর ইঙ্গিতে জনৈক শাগরেদ পড়তে শুরু করেন।

উলামাদের প্রতি শ্রদ্ধা

খলীফা হারুনুর রশীদ যখন ইমাম সাহেবের খিদমতে উপস্থিত হলেন খলীফা হওয়া সত্ত্বেও তাকে উচ্চাসনের আশা ত্যাগ করে নিম্ন আসনে বসতে হয়েছে।

পক্ষান্তরে একবার যখন ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) তাঁর খিদমতে উপস্থিত হলেন তখন ইমাম মালেক (রহঃ) তাঁকে এরূপ সম্মান প্রদর্শন করলেন যে, তাঁর নিজের চাদর ফরাশের উপর বিছিয়ে দিলেন। ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) চলে যাওয়ার পর ইমাম মালেক (রহঃ) তাঁর ছাত্রদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, ইনি ইরাকের আবু হানিফা। তিনি যদি একটি স্তম্ভকে স্বর্ণে পরিণত করতে চান তবে তাঁর জন্য তাও সম্ভব।

এরপর কূফার মুহাদ্দিছ সুফিয়ান আগমন করেন, তাঁর প্রতি ইমাম মালেক (রহঃ) সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন।

আব্দুর রহমান বিন কাসেমের নিকট কোন পত্র লিখাকালে ইমাম মালেক (রহঃ) তাকে মিসরের ফকীহ বলে সম্বোধন করতেন।

একদা কা'নাবী নামক জনৈক মুহাদ্দিছ তাঁর খিদমতে গেলে তিনি ছাত্র সহকারে গিয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানালেন।

ইমাম সাহেবের দরসের পদ্ধতি

ইমাম সাহেবের দরসে তাঁর ব্যক্তিগত কাতেব (লেখক) হাবীব হাদীছ পড়তেন আর দরসে অংশগ্রহণকারী অন্যান্যরা শুনতেন। ইমাম সাহেবের ভয়ে কেউ নিজের কিতাব দেখত না এবং তাকে কোন প্রশ্ন করত না। হাবীব কোন ভুল করলে ইমাম সাহেব তা সংশোধন করে দিতেন। তিনি নিজে তু পড়ে শুনাতেন না। দরজায় ছাত্রদের ভিড় লেগে গেলে তাদেরকে ভিতরে ডাকার নির্দেশ দিতেন। প্রথমে বিশেষ ছাত্রদেরকে এবং পরে সাধারণ ছাত্রদেরকে ডাকতেন। কখনও কখনও আবার ইমাম সাহেব নিজেই ছাত্রদের সামনে স্বীয় কিতাব পাঠ করে শুনাতেন। ইয়াহয়া বিন বুকাইর বলেন, আমি ইমাম সাহেব থেকে চৌদ্দবার তাঁর কিতাব শুনেছি।

ছাত্র যদি স্বীয় উস্তাদের সামনে হাদীছ পাঠ করে তবে তাকে মুহাদ্দিছদের পরিভাষায় 'আরয' বলা হয়। এমতাবস্থায় ছাত্র **حاضر** বলতে পারে। আর যদি এর বিপরীত উস্তাদ ছাত্রের সামনে হাদীছ পাঠ করে শুনান তবে এমতাবস্থায় হাদীছ বর্ণনা করার সময় **خبرنا** বলা চাই। ইমাম সাহেব উভয় প্রকারই আমল করেছেন।

ইমাম সাহেবের কন্যা ফাতেমার 'মুয়াত্তা' মুখস্থ ছিল। দরস চলাকালে তিনি দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকতেন। যদি কোন পাঠক ভুল পড়ত তিনি নখ দিয়ে দরজায় খটখটাতেন। এতে ইমাম সাহেব বুঝে নিতেন এবং তা সংশোধন করে

দিতেন। কখনও কখনও ইমাম সাহেবের পুত্র ইয়াহয়া বে-পরওয়াভাবে দরসে এসে যেতেন। ইমাম সাহেব শাগরেদদেরকে লক্ষ্য করে বলতেন, একমাত্র আল্লাহই আদব শিখান, এ আমার ছেলে আর এ আমার মেয়ে। কিছুকাল পরে আর ইয়াহয়া বিন ইমাম মালেকের এ বেপরওয়াভাব রয়নি। তিনি মুয়াত্তা বর্ণনা করেন এবং একজন বিশিষ্ট আলেম হিসাবে প্রসিদ্ধ হন। তার নিকট থেকে ইয়ামানে মুয়াত্তা রেওয়ায়েত করা হয়। তিনি মিশর গিয়ে হাদীছের দরস দেন।

দরসী মজলিসে খলীফার পুত্র

একবার হজ্ব উপলক্ষে খলীফা মাহদী মদীনা মুনাওয়ারা গমন করেন। ইমাম মালেক তার সাক্ষাতে গেলে তিনি বড়ই তাযীমের সহিত তাঁর সাথে মিলিত হন এবং তার দুই ছাহেবজাদা মুসা এবং হারুনকে নির্দেশ দিলেন যেন তারা ইমাম সাহেবের নিকট হাদীছ পড়ে।

সরকারী কর্মকর্তারা তাঁকে ডেকে পাঠালে তিনি যাননি। খলীফা এর কারণ জানতে চাইলেন। ইমাম সাহেব বললেন, আমীরুল মু'মেনীন! ইলম সম্মানের বস্তু। তার নিকট আসা চাই। খলীফা এ কথা মেনে নিলেন এবং ছেলেদেরকে তাঁর খিদমতে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁকে বলা হল যেন তিনি তাদের হাদীছ পড়ে শুনান। ইমাম সাহেব বললেন, এ শহরে উস্তাদের সামনে ছাত্ররা পড়ে-যেমনভাবে বাচ্চারা উস্তাদের সামনে বসে পড়ে, আর যখন কোন ভুল করে তখন উস্তাদ তা শুধরিয়ে দেন। পুত্রদয় খলীফার নিকট গিয়ে এ কথা বলল। খলীফা লোক মারফতে ইমাম সাহেবকে বললেন, মুসা এবং হারুনকে ডেকে নেয়ার পর আপনি নাকি তাদেরকে পড়াতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন? ইমাম সাহেব উত্তর লিখে পাঠালেন, আমীরুল মু'মেনীন! আমি ইবনে শিহাবকে বলতে শুনেছি যে, আমরা সাযীদ বিন সুমাইয়্যের, আবু সালমা, উরওয়া বিন যুবাইর, শালেম, খারেজা, সুলাইমান এবং নাফে' থেকে এ স্থানে এভাবেই ইলম অর্জন করেছি। ইবনে হুরমুয, আবুয যিনাদ, রাবীয়া, বাহরোল উলূম ইবনে শিহাব প্রমুখের সামনে হাদীছ পাঠ করা হত। তাঁরা নিজেরা পড়তেন না। এরপর খলীফা মাহদী তার ছেলেদেরকে বললেন, তোমার গিয়ে নিজেরা পাঠ কর। এরা দুইনের ইমাম; অনুসরণীয় এবং অনুকরণীয়। অতঃপর মুআল্লিম ইমাম সাহেবের সামনে হাদীছ পাঠ করেন আর তারা শ্রবণ করে।

এক বর্ণনানুসারে-এর ঘটনা হারুন-অর-রশিদের সাথে ঘটেছে। তার পুত্র আকীক উপত্যকায় ইমাম সাহেবের বাড়ীতে যেত। দরজা খোলা পর্যন্ত বাইরে থাকা বালিতে বসে থাকত।

দরসী মজলিসে জনৈক আলেম

উপরোল্লিখিত ঘটনা খলীফার সাথে সম্পৃক্ত ছিল। ইমাম সাহেব খলীফার পুত্রদ্বয়কে পড়াতে অস্বীকার করেছেন এবং এরই উপর অটল ছিলেন। এর বিপরীতে একজন যাহেদ আলেমের ঘটনা শুনুন যাকে ইমাম সাহেব হাদীছ পাঠ করে শুনিয়েছেন।

আব্দুল মালেক বিন আব্দিল আযীয মাজেশুন বর্ণনা করেন, আমি ইমাম সাহেবের মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। ছুফী শ্রেণীর একজন আলেম এসে ইমাম সাহেবকে বললেন, আপনি আমাকে তিনটি হাদীছ বর্ণনা করুন। ইমাম সাহেব বললেন, তোমার প্রয়োজন হলে সেগুলো পড়ে আমাকে শুনিয়ে আমার পক্ষ থেকে রেওয়ায়েত কর। উক্ত আলেম বললেন, আবু আব্দিল্লাহ! আমাদের মাঝে ‘আরয’ (শাগরেদ উস্তাদের সামনে পড়বে) এর প্রচলন নেই। ইমাম সাহেব বললেন, তুমি এ সম্বন্ধে ভাল জ্ঞান রাখ। তিনি বার বার এ কথা বলছিলেন। আর ইমাম সাহেব এ উত্তর দিচ্ছিলেন। ইমাম সাহেব যখন মজলিস থেকে উঠে যাচ্ছিলেন, সে ব্যক্তি ইমাম সাহেবের কাপড় আঁকড়ে ধরে বললেন, একবরবাসীর প্রতিপালকের কসম, যে পর্যন্ত আপনি আমাকে হাদীছ তিনটি বর্ণনা না করেন আপনার দামান (আঁচল) ছাড়ব না।

ইমাম সাহেব তাঁর শাগরেদ আবু তালহাকে বললেন, আমাকে তার হাত থেকে বাঁচাও। সে পাগল মনে হচ্ছে। আবু তালহা বললেন, পাগল মনে হয় না। আপনি যদি সমীচীন মনে করেন, তবে হাদীছ তিনটি বর্ণনা করুন। এরপর ইমাম সাহেব তাকে বললেন, আচ্ছা আস, কি চাও বল। তিনি বললেন, প্রথম হাদীছটি এই যে, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় প্রবেশ করার সময় কি তাঁর মাথায় শিরস্ত্রান ছিল? ইমাম সাহেব বললেন—

حدثني الزهري عن انس ان النبي صلى عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح و
على رأسه المغفرة، فقال ابن شهاب و لم يكن رسول الله صلى عليه وسلم يومئذ

محرما *

‘হযরত আনাস (রাঃ) থেকে ইমাম যুহরী আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিরস্ত্রান পরিহিত অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করেন। মালেক বলেন, অতঃপর ইবনে শিহাব বললেন, ঐ দিন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহরিম (এহরামকারী) অবস্থায় ছিলেন না।’

ঐ ছুফী আলেম বললেন, দ্বিতীয় হাদীছটি হচ্ছে, ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, এক ব্যক্তির দুই স্ত্রী; তন্মধ্যে একজন একটি বালককে অপরজন আরেকটি বালিকাকে দুধ পান করিয়েছে। ইমাম সাহেব বললেন,

حدثني ابن شهاب عن عمرو بن الشريد ان ابن عباس سئل عن دخل له امرأتان

ارضعت احدهما غلاما و الاخرى جارية اتناكحان؟ قال لا الفطام واحد *

‘আমর বিন শারীদ হতে ইবনে শিহাব আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, ইবনে আব্বাসকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। যার দু’জন স্ত্রী। একজন একটি ছেলেকে এবং অপরজন একটি মেয়েকে দুধ পান করাল। তাদের উভয়ের মধ্যে কি বিবাহ হতে পারবে? তিনি বললেন, না, কারণ তারা উভয়ই এক দুধ পান করেছেন।’

ছুফী আলেম বললেন, ইবনে উমর কি বকী থেকে একামত শুনেছেন? ইমাম সাহেব বললেন,

حدثني عن ابن عمر انه سمع الاقامة وهو بالبيقع فاسرع المشى *

‘ইবনে উমর থেকে নাফে আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, বকী’ (মদীনার একটি কবরস্থান) থেকে তিনি একামত শুনে পেয়েছেন। অতঃপর তিনি দ্রুত চলা শুরু করলেন।’

স্পেনীয় এক তালাবে ইলম

ইমাম সাহেবের ছাত্রদের মধ্যে আবু মুহাম্মদ ইয়াহয়া বিন ইয়াহয়া আললায়ছী একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি স্পেন থেকে মদীনায় এসে ইমাম মালেক (রহঃ)-এর দরসী হলকায় শরীক হন। একদিন বাহিরে শোর উঠল, হাতি এসেছে! হাতি এসেছে! সমস্ত ছাত্র হাতি দেখার জন্য বাইরে চলে গেল। কিন্তু তিনি স্থায়ী স্থান থেকে উঠেননি। ইমাম সাহেব তার মনের দিকে চেয়ে বললেন, তুমিও যাও হাতি দেখে এস। যোগ্য ছাত্র তার শিক্ষকের স্নেহ এবং ভালবাসার যে উত্তর দিয়েছেন, তা বর্তমান শিক্ষক-ছাত্র সবার জন্য একটা দৃষ্টান্ত হতে পারে। তিনি বলেছেন,

‘আমি আপন শহর থেকে আপনাকে দেখার এবং আপনার নিকট থেকে ইলম আদব শিক্ষা গ্রহণের জন্য এসেছি। আমি হাতি দেখার জন্য আসিনি।’

ইমাম সাহেব তাঁর প্রিয় ছাত্রের এ উত্তর শুনে খুবই আনন্দিত হলেন এবং

তাকে **عاقل اهل الاندلس** 'স্পেনের বুদ্ধিমান' উপাধি দ্বারা ভূষিত করলেন।

ইয়াহয়া বিন ইয়াহয়া স্পেনে যান। সেখানে তার ইলম এবং জ্ঞানের প্রসিদ্ধি ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে তার ইলমী এবং দ্বীনি প্রচেষ্টায় মালেকী মাযহাবের প্রসার ঘটে। বিশেষ করে তার নিকট থেকে মুয়াত্তা ইমাম মালেক রেওয়াজেত করা হয়। মুয়াত্তা ইমাম মালেকের কয়েকটি কপি রয়েছে। তন্মধ্যে ইয়াহয়া বিন ইয়াহয়া মছমুদী কতৃক বর্ণিত কপি সবচেয়ে বেশী প্রচলিত এবং প্রসিদ্ধ।

শিষ্য এবং ছাত্র

ইমাম মালেক (রহঃ)-এর দরসগাহ থেকে দ্বীনি এবং ইলমী ফয়েযপ্রাপ্ত ছাত্রদের সংখ্যা অনেক বেশী। কাযী ইয়ায তরতীবুল মাদারেক কিতাবে আরবী বর্ণমালার ক্রমানুসারে তাদের নাম সংগ্রহ করেছেন। সেখানে তাদের সংখ্যা তের শতাধিকে উন্নীত হয়।

যাহবী লিখেন, ইমাম মালেক হতে এত অধিক সংখ্যক লোক হাদীছ বর্ণনা করেছেন যাদের সংখ্যা গণনা করা মুশকিল।

ইমাম মালেক (রহঃ) হতে তাঁর যে সমস্ত উস্তাদ এবং শায়খ হাদীছ রেওয়াজেত করেছেন ইবনে হজর তাদের নাম বর্ণনা করেছেন। ইবনে শিহাব যুহরী, ইয়াহয়া বিন সায়ীদ আলকারী, ইয়াযীদ বিন আদ্দিল্লাহ বিন হাদ এবং অন্যান্য অনেকে। সম-সাময়িকদের মধ্যে আওয়াযী, সুফিয়ান হুওরী, ওয়ারকা বিন উমর, শো'বা বিন হাজ্জাজ, ইবনে জুরাইজ, ইব্রাহীম বিন তাহ্মান, লাইছ বিন সাদ মিছরী, সুফিয়ান বিন উয়াইনা প্রমুখের নাম উল্লেখ করেছেন। এঁদের পরে ইয়াহয়া বিন সায়ীদ কান্তান, আব্দুর রহমান বিন মাহদী, ইমাম শাফেঈ, আব্দুল্লাহ বিন মুবারাক, ইবনে ওহব, ইবনে কাসেম, আবু আছেম, আবুল ওলীদ তায়ালেসী, মা'আন বিন ঈসা, সায়ীদ বিন মনছুর, মক্কী বিন ইব্রাহীম, ইয়াহয়া বিন আদ্দিল্লা বিন বুকাইর এবং অন্যান্যদের নাম উল্লেখ করেছেন।

ফিকাহ এবং ফতোয়া

ইমাম মালেক (রহঃ) ফুকাহায়ে হাদীছের মধ্যে গণ্য। তাঁর ফেকহী মসলাক (মতবাদ) ছিল মদীনাবাসী; বিশেষ করে আব্দুল্লাহ বিন উমরের (রাঃ) মসলাক অনুরূপ। কিয়াস দ্বারাও তিনি মাসয়ালার সমাধান দিতেন। তাঁর প্রথম উস্তাদ রবীয়া রাঈ সন্বকে তিনি মন্তব্য করেন, রবীয়ার মৃত্যুর পর ফিকাহর স্বাদ চলে গেছে।

ইমাম মালেক (রহঃ) তাঁর দ্বিতীয় উস্তাদ ইবনে শিহাব যুহরী সম্পর্কে যে মন্তব্য করেন, মুতাররফ বিন আদ্দিল্লা তা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন,

ما ادرکت بامدينة فقیها محدثا غیر واحد، فقلب من هو؟ فقال ابن شهاب

الزهری

আমি মদীনায় একজনকেই ফকীহ মুহাদ্দিছ পেয়েছি। আমি জিজ্ঞেস করলাম তিনি কে? তিনি বললেন, ইবনে শিহাব যুহরী।

ইমাম আবু হানিফার (রহঃ) উস্তাদ হাম্মাদ বিন আবি সুলাইমান ফিকাহ এবং ফতোয়ায় হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) এবং হযরত আলীর (রাঃ) অনুসারী ছিলেন। মুহাদ্দেছদের এক জামাত তাঁর ফিকাহ এবং ফতোয়ার খেলাফ ছিলেন। কিন্তু ইমাম মালেককে (রহঃ) তাঁর কোন কোন ছাত্র হাম্মাদ বিন আবি সুলাইমান হতেও ফিকাহ সম্বন্ধে অধিক জ্ঞানী বলে মন্তব্য করেছেন। আব্দুর রহমান বিন রস্তা বর্ণনা করেন, আমার সামনে একবার আব্দুর রহমান বিন মাহদীকে বলা হয়েছে, আবু সায়ীদ! জানতে পারলাম যে, ইমাম মালেককে (রহঃ) আপনি ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) হতেও বিজ্ঞ ফিকাহবিদ মনে করেন। ইবনে মাহদী বললেন, আমি শুধু এতটুকু বলি না, বরং বলি যে, মালেক আবু হানিফার উস্তাদ হাম্মাদ হতেও বড় ফিকাহবিদ। এক বর্ণনায় রয়েছে, ইবনে মাহদী ইমাম মালেককে ইমাম আবু হানিফা হতে বড় ফিকাহবিদ বলেছেন।

ইবনে হযম ইমাম মালেককে ‘আলফকীহ’ বলেছেন। যাহবী তাকে ‘ফকীহুল উম্মাহ’ উপাধিতে আখ্যায়িত করেছেন। ইবনে হজরও আলফকীহ বলেছেন। ইবনে কুতাইবা ‘আছহাবুর রায়’ এ ইমাম সাহেবের নাম উল্লেখ করেছেন। ‘আখবারুল ফোকাহা’ কিতাবে ইবনে নদীম সর্বপ্রথম তাঁর আলোচনা করেছেন।

ইবনে ওহব বর্ণনা করেন, আমি মদীনায় ঘোষণা করতে শুনেছি যে, মালেক এবং ইবনে আবি যি’ব ব্যতীত অন্য কেউ লোকদেরকে ফতোয়া দিবেন না। তাঁরই বর্ণনা, ১৪০ হিজরীতে আমি হজ্জ করেছি। তখন ঘোষণাকারীকে বলতে শুনেছি যে, মালেক, ইবনে আবি যি’ব এবং আব্দুল আযীয মাজেশুন ব্যতীত অন্য কেউ ফতোয়া দিবেন না।

ইমাম সাহেবের ভাগিনা ইসমাঈল বিন আবি উয়াইস বলেন, আমার মামা لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ব্যতীত ফতোয়া দিতেন না।

ফতোয়ায় বিশেষ সতর্কতা

ইমাম সাহেব বলেন, আমার নিকট এটাই খুব কঠিন মনে হয় যে, আমাকে হালাল-হারাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। মদীনায় আমি এমন আলেম এবং ফকীহ দেখেছি, যাদের নিকট ফতোয়া দেওয়া হতে মৃত্যু উত্তম ছিল। আর বর্তমানে লোকদেরকে দেখা যাচ্ছে যে, তারা ফিকাহ এবং ফতোয়ার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করছে। এর পরিণাম পরে কি হবে তা যদি জানত তবে এ কাজ থেকে তারা বিরত থাকত। হযরত উমর এবং হযরত আলী (রাঃ) শ্রেষ্ঠ ছাহাবী ছিলেন। যদি তাঁদের সামনে কোন মাসয়ালা আসত তবে তাঁরা সকল ছাহাবাদেরকে সমবেত করে পরামর্শ করতঃ ফতোয়া দিতেন। আর আমাদের যামানায় ফতোয়া দেওয়া গর্বের বিষয়। এজন্যই তাদেরকে সে পরিমাণ ইলম দেয়া হয়েছে। প্রকৃত ইলম থেকে তারা বঞ্চিত। আমাদের পূর্বসূরীদের পদ্ধতি ছিল যে, তাঁরা বলতেন এটাকে আমি খারাপ মনে করি, এটাকে আমি পছন্দ করি। সরাসরি কোন বিষয়কে হালাল বা হারাম বলতেন না। কারণ হালাল-হারাম এমন দু'টি বিষয় যা আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

কা'নাবী বর্ণনা করেন, ইমাম সাহেবের মৃত্যু-রোগের সময় আমি তাঁকে দেখতে গেলাম। সালাম করে বসে গেলাম। দেখলাম তিনি কাঁদছেন। আমি তাঁকে কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, কা'নাব তনয়! আমার চেয়ে কাঁদার অধিক হকদার কে? খোঁদার কসম! আমার আকাঙ্ক্ষা, যে সমস্ত মাসয়ালা আমি নিজের রায় অনুযায়ী ফতোয়া দিয়েছি, সেগুলোর পরিবর্তে আমাকে দুর্ভা মারা হত এবং আমার পদস্থলনগুলো ক্ষমা করা হত। হায় আফসোস! আমি যদি আমার রায় অনুসারে ফতোয়া না দিতাম।

আব্দুর রহমান বিন মাহদী বলেন, আমরা ইমাম সাহেবের নিকট বসা ছিলাম। এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে বলল, হে আবু আদ্দিন্লাহ! আমি ছয় মাসের দূরত্ব অতিক্রম করে আপনার নিকট এসেছি। আমার শহরবাসী কয়েকটি মাসয়ালা জিজ্ঞেস করার জন্য আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছে। অতঃপর সে কয়েকটি মাসয়ালা জিজ্ঞেস করল। সেগুলো শুনে ইমাম সাহেব বললেন, حسن অর্থাৎ, এ সম্বন্ধে আমার তাহকীক নেই। এ কথা শুনে সে খুবই আশ্চর্য হয়ে গেল। বলল, আমি আমার শহরবাসীদেরকে কি জবাব দিব? ইমাম সাহেব বললেন, তুমি গিয়ে শহরবাসীদের বলবে যে, মালেক বলেছে তার এ সম্বন্ধে ভালরূপে তাহকীক নেই।

হুছাইম বিন জুবাইল বলেন, আমার সামনে ইমাম সাহেবকে আটচল্লিশটি মাসয়ালা জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তন্মধ্যে তেত্রিশটির ব্যাপারে তিনি বলেছেন,
 لا أدري 'আমার জানা নেই।

খালেদ বিন খেরাশ বলেন, আমি ইমাম সাহেবকে চল্লিশটি মাসয়ালা জিজ্ঞেস করেছিলাম। তন্মধ্যে তিনি পাঁচটি মাসয়ালার উত্তর দিয়েছেন।

ইবনে ওহব বলেন, অধিকাংশ মাসয়ালায়ই ইমাম সাহেব لا أدري (আমার জানা নেই) বলতেন।

ইমাম সাহেব বলেন, কোন কোন মাসয়ালার ব্যাপারে গবেষণা করতে গিয়ে আমি সারা রাত কাটিয়ে দেই। একটি মাসয়ালা নিয়ে দশ বছর পর্যন্ত চিন্তা করছি কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি।

সলফদের ইত্তেবা (অনুসরণ) এবং বেদআতের প্রতি ঘৃণা

সুন্নতের অনুসরণে ইমাম সাহেব অনেক অগ্রগামী ছিলেন। বিদআত এবং মুহদাছাত (ধর্মে নবসংযোজিত বিষয়সমূহ)-কে খুবই ঘৃণা করতেন। আকায়েদের বিষয়ে কিতাব এবং সুন্নাহর শক্ত পাবন্দ ছিলেন। প্রতিটি দ্বীনি বিষয়ে সলফে ছালেহীনদেরকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে নিতেন। তাঁর সময়ই ই'তেযাল, ইলমে কালাম, জবর, কদর, রিফয, খুরুজ এবং অন্যান্য অনেক মাসয়ালা এবং মতবাদ সৃষ্টি হয়। কিন্তু তিনি এসব কিছু হতে দূরে থেকে সলফদের পথে চলতেন। এক ব্যক্তি ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞেস করল,

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

রহমান আরশের উপর অধিষ্ঠিত। এর মর্ম কি?

ইমাম সাহেব উত্তর দিলেন,

لا استواء منه معلوم، و الكيف منه غير معقول و السؤال عن هذا فرعة و

الإيمان به واجب *

আবু জুওয়াইরা নামক এক ব্যক্তির মুরজিয়া ফেরকার সাথে সম্পর্ক ছিল। একদিন সে ইমাম মালেককে বলল, হে আবু আদ্দিনাহ! আপনার সাথে আমি কিছু কথা বলতে চাই। আপনি শুনুন। এ সম্পর্কে আমি আপনার সাথে বহু-মুবাহাছা (তর্ক-বিতর্ক) করব। ইমাম সাহেব বললেন, তুমি আমাকে

তোমার উপর সাক্ষী করো না। আবু জওয়াইরা বলল, আল্লাহর কসম! সত্যের অনুসন্ধানই আমার উদ্দেশ্য। আপনি সেগুলোর জবাব দিন। যদি সত্য হয় তবে আমি তা মেনে নেব। নচেৎ আপনি আমাকে তা মেনে নেয়ার জন্য যুক্তি দিবেন। ইমাম সাহেব বললেন, যদি এ তর্কে তুমি জয়ী হয়ে যাও? সে বলল, এমতাবস্থায় আপনি আমার কথা মেনে নিবেন। ইমাম সাহেব বললেন, যদি আমি বিজয়ী হয়ে যাই? সে বলল, তবে আমি আপনার কথা মেনে নেব। ইমাম সাহেব বললেন, যদি তৃতীয় কোন ব্যক্তি আমাদের মাঝে এসে যায় এবং আমাদের উভয়ের উপর জয়ী হয়ে যায়। সে বলল, তবে আমরা উভয়ই তার কথা মেনে নেব।

একথায় ইমাম সাহেব বললেন, হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহ তাআলা মুহাম্মদ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একটি মাত্র দ্বীন দিয়ে পাঠিয়েছেন। আর তোমাকে দেখছি তুমি এক দ্বীন ছেড়ে অন্য দ্বীন গ্রহণ করছ। উমর বিন আব্দিল আযীয বলেছেন, যে ব্যক্তি দ্বীনকে লড়াই ঝগড়ার বস্তু বানিয়ে নেয়, সে দ্বীন পরিবর্তন করতে থাকে।

এক ব্যক্তি ইমাম মালেক (রহঃ)-কে বাতেনী ইলম সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করল। ইমাম সাহেব রাগান্বিত হয়ে বললেন, বাতেনী ইলম সে আলেমই জানতে পারে যে যাহেরী ইলম জানে। কলবের মধ্যে নূর সৃষ্টি হলেই এ ইলম মিলবে। অতঃপর তাকে বললেন,

তুমি সঠিক দ্বীন অবলম্বন কর। সাবধান! তা থেকে মোটেই বিচ্যুত হবে না। তুমি যা জান, তা অবলম্বন কর, আর যা জান না, তা ছেড়ে দাও।

যখন কোন বক্ত্র আকীদার লোক এসে তার সাথে কথা বলতে চাইত, তখন তিনি তাকে এ কথা বলে বিদায় করে দিতেন যে, আমি তো আমার প্রভুকেই দলীল হিসেবে মেনে নিয়েছি। তুমি দ্বিধা-দ্বন্দ্ব পড়ে আছ। তুমি তোমার মত আরেকজনের সাথে গিয়ে তর্ক-বিতর্ক কর।

সুফিয়ান বিন উয়াইনা বলেন, আমি এমন ব্যক্তি সম্পর্কে যে হজ্জের ইচ্ছা করল এবং মীকাতের পূর্বে এহরাম বেঁধে ফেলল ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এ কাজ আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের নির্দেশের পরিপন্থী। এমন ব্যক্তি সম্বন্ধে আমি দুনিয়াতে ফিতনা এবং আখেরাতে কঠোর শাস্তির আশংকা করছি। তুমি কি আল্লাহ তাআলার এ বাণী শুননি-

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ *

“যারা আল্লাহর আদেশের বিরোধিতা করে তারা যেন এ বিষয়ের আশংকা করে যে, তাদের উপর কোন ফেৎনা এসে যাবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক আযাব এসে যাবে।”

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মীকাত থেকে এহরাম বাঁধার নির্দেশ দিয়েছেন।

যুহদ, তাকওয়া, ইবাদত এবং রিয়াযত

সলফে ছালেহীনদের নিকট ইলম, আমল, যুহদ, তাকওয়া, ইবাদত এবং রিয়াযত এ সবকিছুর অর্থই হচ্ছে দীন। আর ইমাম মালেক (রহঃ) এসব গুণে গুণান্বিত ছিলেন। তাঁর মধ্যে পূর্ণভাবেই এ গুণাবলীর সমাবেশ ছিল।

ইমাম সাহেব বলতেন, যে ব্যক্তি চায় যে, তার অন্তর উজ্জ্বল হোক, মৃত্যুর কষ্ট থেকে নাজাত লাভ হোক, কিয়ামতের বিতীষিকা থেকে নিরাপদে থাকুক, তার যাহেরী আমল হতে বাতেনী আমল অধিক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

মুছআব বিন আদিল্লাহ বর্ণনা করেন, যখন ইমাম সাহেবের সামনে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম নৈয়া হত এবং তাঁর আলোচনা হত তখন তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে যেত এবং মাথা নীচু হয়ে যেত। আর বলতেন, আমি যা কিছু দেখেছি তা যদি তোমরা দেখতে তবে আমার এ অবস্থা দেখে আশ্চর্য হতে না। মুহাম্মদ বিন মুনকাদের সাইয়েদুল কোররা ছিলেন। আমরা তাঁর নিকট কোন হাদীছ জিজ্ঞেস করলে তিনি কান্না শুরু করতেন। দীর্ঘদিন পর্যন্ত আমি তাঁর নিকট আসা-যাওয়া করেছি। সবসময়েই তাঁকে তিন অবস্থার কোন এক অবস্থায় পেয়েছি। হয়ত নামায়রত অবস্থায় পেতাম, নচেৎ রোযাদার অবস্থায় পেতাম অথবা কোরআন তেলাওয়াতের অবস্থায় থাকতেন। অসুস্থকারে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীছ বর্ণনা করতেন। তিনি আবেদ এবং যাহেদ ছিলেন। আমি তাঁর নিকট গেলে তিনি তাকিয়া (উপাধান) রেখে দিতেন। অন্তরে যখন কঠোরতা বা গাফলতি অনুভব করি ওখন মুহাম্মদ বিন মুনকাদিরকে এক নয়র দেখে নেই। এতে কয়েকদিন পর্যন্ত আমার অন্তর তাঁর নেক প্রভাবে প্রভাবিত থাকে। প্রত্যেক মাসের প্রথম ৩০তারিখের পুরো রাত্রিটিই ইমাম সাহেব ইবাদতে কাটিয়ে দিতেন। কেউ এ অবস্থায় তাঁকে দেখলে বুঝতে পারত যে, তিনি এ মাসকে ইবাদত দ্বারা শুরু করেছেন এবং সম্ভাষণ জানাচ্ছেন। ইমাম সাহেবের কন্যা ফাতেমা বলেন, প্রত্যেক রাতেই ইমাম সাহেব তাঁর অযিফা আদায় করতেন। শুক্রবারের পুরো রাতে তিনি ইবাদতে কাটিয়ে দিতেন।

মুগীরা বর্ণনা করেন, একরাত্রে আমি, ইমাম সাহেবের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি আলহামদুলিল্লাহ আলহাকুমুত্তাকাহুর সূরা পড়ছিলেন। আমি সেখানে দাঁড়িয়ে গেলাম। ইমাম সাহেব যখন **لَتَسْتَلْنَ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ** পর্যন্ত পৌঁছিলেন তখন দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত কাঁদতে থাকলেন এবং এ আয়াতই বার বার পড়ছিলেন। তাঁর এ অবস্থা দেখে আমি সেখানে রয়ে গেলাম। ফজর হয়ে যাবে এমন সময় তিনি রুকু করলেন। আমি অযু করে মসজিদে প্রবেশ করলাম, দেখলাম তিনি ঐ অবস্থায়ই আছেন। তাঁর চেহায়ায় নূর চমকাচ্ছিল।

নফল নামাযে তিনি দীর্ঘ রুকু এবং দীর্ঘ সেজদা করতেন। দুররার শান্তি প্রাপ্তির পর লোকেরা তাঁকে বলল, আপনি সংক্ষিপ্ত নামায পড়ুন। তিনি বললেন, বান্দার তো উচিৎ আল্লাহর জন্য যে আমল করবে তা যেন ভালভাবে করে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا *

নিশ্চয় তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন তোমাদের মধ্যে কে উত্তম আমলকারী।

ইমাম সাহেবের অবস্থা গোপন করার নমুনা এমন ছিল যে, তিনি রুমাল ভাঁজ করে রাখতেন। নামাযের সময় তার উপর সেজদা করতেন। তিনি বলতেন, এরূপ আমি এ কারণে করি যেন, সেজদার চিহ্ন আমার কপালে না থাকে। কারণ মানুষ এটা দেখে ভাববে যে, আমি রাত্রি জাগরণ করি। তিনি বলতেন, আমি যদি জানতে পারি যে, আবর্জনাস্থলে গিয়ে বসলে আমার আত্মার পরিশুদ্ধি লাভ হবে তাহলে আমি সেখানে গিয়েই বসব।

ইমাম সাহেব নির্জনস্থানে নফল ইবাদত করতেন যেন কেউ তাঁকে না দেখে এবং তাঁর বুয়ুর্গী প্রকাশ না পায়।

ইমাম সাহেবের গুণ ও স্বভাব চরিত্র

ইমাম সাহেব ঐ সমস্ত গুণে গুণান্বিত ছিলেন যেগুলো ছাহাবায়ে কিরাম এবং তাবেঈদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। যে গুণে গুণান্বিত ব্যক্তি ইসলামী তা'লীমাতের নমুনা এবং আদর্শ ছিলেন। আকীক উপত্যকাস্থ ইমাম সাহেবের বাড়ীর দরজায় লেখা ছিল **ما شاء الله**। কেউ তাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, কোরআন শরীফে বর্ণিত এক ঘটনায় রয়েছে—

و لو لا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله *

“তুমি যখন আপন বাগানে প্রবেশ করলে তখন মা-শাআল্লাহ বললে না কেন?”

ইমাম সাহেব মদীনার অপর একটি বাড়ীতে ভাড়া কুরে থাকতেন যার প্রকৃত মালিক ছিলেন হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)।

একবার খলীফা মাহদী তাঁকে তার ব্যক্তিগত বাড়ী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমার নিকট বর্ণনা করা হয়েছে যে, ان نسب المرء داره (মানুষের সম্বন্ধই হচ্ছে তার বাড়ী)। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)-এর বাড়ীর সম্বন্ধই যথেষ্ট। তাঁর বাড়ীতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ফুরশ বিছানো থাকত। তাঁর আবাসগৃহ শাহী দরবার মনে হত। তিনি উত্তম এবং মূল্যবান কাপড় ব্যবহার করতেন। তিনি বলতেন, এতে আল্লাহ তাআলার নেয়ামতের প্রকাশ পায় এবং আমলী শুকরিয়া আদায় হয়। একবার কেউ তাঁকে বলল, আপনার ঘরে ছবি রয়েছে। তিনি বললেন, এ পর্যন্ত আমি তা দেখিনি। যা হোক তুমি মিটিয়ে দাও।

তিনি মদীনায় কখনও সওয়ারীতে চলতেন না। তিনি বলতেন, যে মাটিতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাফন হয়ে আছেন এবং যেখানে তিনি চলাফেরা করতেন তার উপর সওয়ারীর উপর আরোহণ করে চলা আদবের খেলাফ।

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, একবার আমি ইমাম সাহেবের ঘরের সামনে উত্তম খোরাসানী ঘোড়া এবং মিশরীয় খচ্চর দেখতে পেলাম। এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এগুলো আমি দান করলাম। আমি বললাম, কমপক্ষে একটা রেখে দিন। এতে তিনি বললেন, আমি আল্লাহ তাআলার নিকট লজ্জাবোধ করছি যে, একটি চতুষ্পদ জন্তু দ্বারা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমীন পদদলিত করব।

কোন কোন বর্ণনামতে ইমাম সাহেব মদীনার বাইরে সওয়ার হতেন। আব্দুস সামহ বর্ণনা করেন, একবার আমি ইমাম সাহেবকে একটি উন্নত খচ্চরের উপর সওয়ার দেখেছি। সেটার উপর উন্নতমানের গদি ছিল। এর উপর কাপড় ছিল। খাদেম তাঁর পিছে পিছে চলছিল। এভাবেই তিনি আকীক উপত্যকাস্থ বাড়ীর দরজা পর্যন্ত গেলেন।

খুবই উন্নতমানের খানা-পিনার ব্যবস্থা ছিল। তাঁর ভাগিনা ইসমাঈল বিন আবি উওয়াইস বলেন, দৈনিক দুই দেহহামের গোস্ত কেনা হত। এতে নাগা

(বিরতি) হত না। কখনও কখনও এর জন্য ব্যবসার সামান্য বিক্রয় করতে হত। তার বাবুর্চী সালমাকে নির্দেশ দিতেন যেন শুক্রবার দিন খানা বেশী পাক করা হয়। পানীয় দ্রব্য গরমকালে চিনি এবং শীতকালে মধু ব্যবহার করতেন।

ইমাম সাহেব কলা খুবই পছন্দ করতেন। বলতেন, এ ফলে মাছিও বসে না এবং অপরিষ্কার হাতও লাগে না। এটা জান্নাতের ফলের অনুরূপ। শীত গরম প্রত্যেক মৌসুমেই পাওয়া যায় যা জান্নাতের ফলের বিশেষত্ব।

তিনি সন্তান-সন্ততি এবং ঘরের অন্যান্যদের সাথে সদাচরণ করতেন। বলতেন, এতে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি পাওয়া যায়। সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং হায়াত বৃদ্ধি পায়; রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন ছাহাবার বর্ণনা থেকে এরূপই বুঝা যায়।

তিনি খুবই কম কথা বলতেন। কখনও হাসতেন না। বরং মুচকি হাসি হাসতেন। ইমাম সাহেবের নিকট চারশো দীনার ছিল। তিনি সেগুলোর দ্বারা ব্যবসা করতেন। লভ্যাংশ দ্বারা পরিবারের ব্যয় বহন করতেন। একবার তাঁকে তিন হাজার দীনার দেয়া হয়েছিল। তিনি সেগুলো গ্রহণ করেননি। বাড়ীও বানাননি বা ব্যবসায়ও লাগাননি। আগেই বলা হয়েছে যে, ইমাম সাহেবের পিতা নেযা বা বর্শা তৈরী করতেন এবং এটাই ছিল তার জীবিকার মাধ্যম। আর ইমাম সাহেবের ভাই নয়র বাযযায (সুতি কাপড় বিক্রেতা) ছিলেন। প্রথমতঃ ইমাম সাহেবও সে ব্যবসায় শরীক ছিলেন।

ইমাম সাহেব জ্ঞান-বুদ্ধিতে বাল্যকাল থেকেই প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর প্রথম উস্তাদ রবীয়া রাঈ তাঁকে আসতে দেখলে বলতেন 'আকেল' অর্থাৎ জ্ঞানী আসছে। ইবনে মাহদী বলেন, আমি মালেক, সুফিয়ান, শো'বা এবং ইবনুল মুবারকের মধ্যে মালেককেই সর্বাধিক বুদ্ধিমান পেয়েছি। আমার দু'চোখ তাঁর চেয়ে গম্ভীর, জ্ঞানী-বুদ্ধিমান এবং মুত্তাকী আর কাউকে দেখেনি।

ইবনে ওহব (রাহঃ) বলেন, আমরা ইমাম সাহেব থেকে ইলম অপেক্ষা আদব বেশী শিখেছি। ইমাম সাহেব স্বয়ং বলেন, আমি কখনো বোকা অথবা বাজে মানুষের সাথে বসি না।

ইয়াহয়া বিন ইয়াহয়া মছমুদী উন্দুলসী ইমাম সাহেব থেকে ইলম অর্জন করার পর এক বছর তাঁর খেদমতে থেকে ইসলামী আদব শিখেন। তিনি বলেন আমি ইমাম মালেকের অভ্যাস এবং গুণাবলী শেখার জন্য অবস্থান করি। কারণ এটা ছাহাবা এবং তাবেঈদের চরিত্র এবং গুণ। এজন্যই ইমাম মালেককে 'আকেল' বলা হত।

সততা ও নির্ভীকতা

সততা এবং নির্ভীকতা উলামায়ে ইসলামের বিশেষ গুণ। এ বিষয়েও ইমাম সাহেব সলফে ছালেহীনদের পথ অবলম্বন করেছেন। কয়েকটি ঘটনা আগে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি খলীফা এবং আমীরদের সাথে মিলিত হয়ে নির্ভীকতার সাথে তাদের সামনে সত্য কথা বলে আসতেন। একবার লোকেরা ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কেন যালেম-অত্যাচারী শাসকদের নিকট আসা-যাওয়া করেন? ইমাম সাহেব বললেন, তাদের নিকট নয় তো সত্য কথা কাদের নিকট বলা হবে।

ইমাম সাহেব বলেন, আমি আবু জাফর মনছুরের নিকট অনেক বার গিয়েছি। কিন্তু একবারও তার হাতে চুমো দেইনি। অথচ হাশেমী, অহাশেমী প্রত্যেকেই তার হাতে চুমো দিয়েছে।

আবু জাফর মনসুর ১৫০ হিজরীতে একবার মদীনায় আগমন করেন। আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি বললেন, মালেক! আপনার চুল অনেক বেশী সাদা হয়ে গিয়েছে। আমি বললাম, আমীরুল মুমেনীন! যার বয়স অধিক হয় তার চুলও অধিক সাদা হয়। অতঃপর তিনি বললেন, মালেক! ছাহাবায়ে কিরাম থেকে আপনি হযরত ইবনে উমরের (রাঃ) মতের উপর অধিক নির্ভর করেন। এর কারণ কি? আমি বললাম, আমীরুল মু'মেনীন! আমাদের এখানে তিনিই সর্বশেষ জীবিত ছিলেন। প্রয়োজনের সময় লোকেরা তাঁকে মাসয়লা জিজ্ঞেস করত এবং তদানুসারে আমল করত। এ কথা শুনে আবু জাফর মনছুর বললেন, নিঃসন্দেহে আপনার নিকট সত্য রয়েছে।

ইমাম সাহেব বর্ণনা করেন, একবার আবু জাফর মনছুর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, পৃথিবীতে কি আপনার চেয়েও বড় আলেম রয়েছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাদের নাম বলুন, আমি বললাম তাদের নাম আমার স্মরণ নেই। এরপর তিনি বললেন, আমি চাই যে, আপনার ইলম (মুয়াত্ত্বা) সারাদেশে চালু করে দেই। সেনাপতি এবং কাযীদের নিকট নির্দেশ পাঠিয়ে দেই যেন তারা এ ইলম শিখে এবং সারাদেশে ছড়িয়ে দেয়। আর যে ব্যক্তি এর বিরুদ্ধাচরণ করবে, যেন তার গর্দান উড়িয়ে দেয়। আমি বললাম, আমীরুল মুমেনীন! রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের জন্য আদর্শ ছিলেন। গয়ওয়া এবং জিহাদের জন্য তিনি সৈন্য পাঠাতেন। তাঁর জীবদ্দশায় অনেক দেশই বিজয় হয়নি। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে হযরত আবু বকর (রাঃ) এ দায়িত্ব পালন করেন। তখনও

অনেক দেশ বিজয় হয়নি। এরপর হযরত ওমর (রাঃ)-এর যুগ আসে। তাঁর হাতে অনেক দেশ বিজয় হয়। তিনি বিজিত দেশগুলোতে ছাহাবায়ে কিরামকে মুআল্লেম হিসেবে পাঠান। তাঁদের কাছ থেকে ইলমে দ্বীন হাছেল করা হত। এমনকি বর্তমানেও এ ধারা প্রচলিত রয়েছে। এখন আপনি যদি ছাহাবা কিরামের ছাত্রদের মধ্যে আমারই ইলম প্রবর্তন করেন তবে তাদের নিকট যে ইলম রয়েছে তার বিপরীত এই ইলম অপরিচিত মনে হবে; ফলে ফিতনা সৃষ্টি হবে। কাজেই প্রত্যেক শহরবাসী তাদের ইলমের উপর থাকতে দিন। আপনি নিজে আমার ইলমের উপর আমল করুন। এ কথা শুনে আবু জাফর বললেন, এটা তো অত্যন্ত দূরদর্শিতার কথা। আপনি আমার ছেলে মাহদীর জন্য এ ইলম (মুয়াত্ত্বা) লিখে দিন।

হুসাইন বিন উরওয়া বলেন, একবার হজ্জের সময় বাদশা হারুনুর রশীদ মদীনা আগমন করেন। ইমাম সাহেবের খিদমতে পাঁচশ দীনারের একটি থলি তিনি প্রেরণ করলেন। হজ্জ সমাপ্ত করে তিনি আবার মদীনায় আগমন করেন এবং ইমাম সাহেবের নিকট তিনি এ পয়গাম পাঠান যে, আমীরুল মুমেনীনের ইচ্ছা যে, মালেক বাগদাদ পর্যন্ত তার সফরসঙ্গী হোন।

এর জবাবে ইমাম সাহেব দূতকে বললেন, তুমি গিয়ে বল যে, ঐ থলি এখনও মোহর মারা আছে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন-

* المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون *

অর্থাৎ মদীনা তাদের জন্য উত্তম যদি তারা জানত। এ কথা শুনে হারুনুর রশীদ তার ইচ্ছা থেকে বিরত হলেন।

ইমাম সাহেবের প্রতি বিদ্রোহ পোষণকারীরা একবার আবু জাফর মনছুরের নিকট গিয়ে বলল, মালেক আপনাদের বাইয়াত বৈধ মনে করেন না এবং আব্বাসীয় খিলাফত স্বীকার করেন না। এতে আবু জাফর মনছুর রাগান্বিত হয়ে ইমাম সাহেবের দেহ নিরাবরণ করে কোড়া মারলেন। এতে তাঁর হাত ভেঙ্গে যায় এরপরও আরো অনেক শাস্তি দেয়।

কিন্তু এর ফলে ইমাম সাহেবের মর্যাদা আরো বৃদ্ধি পেল। এ.কোড়া যেন তাঁর জন্য অলংকার হল। তাঁর জনপ্রিয়তা আরো বেড়ে গেল।

সমকালীন হাদীছ ও ফিকাহবিদগণের দৃষ্টিতে ইমাম সাহেব

সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা ও আব্দুর রাজ্জাক সানআনী বলেন, হযরত আবু হোরায়রাহ হযুর ছান্নাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে যে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, “অচিরেই বহু দূর-দূরান্ত থেকে কিছু লোক ইলম হাসিল করার উদ্দেশ্যে সফর করে আসবে তখন তারা মদীনার আলেমের চেয়ে বড় কোন আলেম পাবে না।” আমাদের মতে তিনিই হচ্ছেন ইমাম মালেক।

ইমাম শাফীঈ (রহঃ) বলেন, যদি ইমাম মালেক এবং সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা না থাকতেন, তাহলে হেযাজ হতে ইলম শেষ হয়ে যেত।

ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) বলেন, ইমাম মালেক হাদীছের অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর নিকট থেকে যে ব্যক্তি হাদীছ গ্রহণ করেছে তার সম্পর্কে আর কিছু জিজ্ঞেস করতে হবে না। এ ধরনের আরো বহু হাদীছ ও ফিকাহ বিশারদগণ তাঁর ইলমী পরিপক্বতার সাক্ষাৎ প্রদান করেছেন।

ইমাম সাহেব অত্যন্ত গভীর ব্যক্তি ছিলেন। তাঁকে দেখলেই ভয়ের সঞ্চার হতো। কারো তাঁর সামনে কথা বলার সাহস হত না। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, তিনি খোশকছুফি ছিলেন। বরং স্থান বিশেষে তিনি হাসি কৌতুকও করতেন।

একবার কবি ইবনে সরজুন তার কবিতা ইমাম সাহেবকে শুনানোর প্রস্তাব দিল। ইমাম সাহেব ভাবলেন কারো নিন্দা সম্পর্কিত কবিতা হতে পারে, তাই তিনি শুনতে অস্বীকৃতি জানালেন। কিন্তু ইবনে সরজুন বার বার অনুরোধ জানালে তিনি শেষ পর্যন্ত শুনতে সম্মত হলেন। কবিতাটি এই—

سلوا مالك المفتى عن الهوى والفتاء + وحب الحسان المعجبات العوارك

فيفتيتكم انى مصيب واثما + اسلى هموم انفس عنى جذاك

فهل فى محب يكتم الحب و الهوى + ااثام و هل فى ضمة المتهاك

অর্থঃ মুফতী মালেককে প্রেম যৌবন এবং সুন্দরীদের ভালবাসা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস কর। তিনি ফতোয়া দিবেন যে আমি ভুল করিনি। এসব দ্বারা তো আমি শুধু চিন্তা দূর করি। যে প্রেমিক প্রেম এবং ভালবাসা গোপন রাখে, সে কি গুনাহগার? এবং সে কি ধ্বংস হচ্ছে?

এ কবিতা শুনে ইমাম মালেক (রহঃ) হেসে উঠলেন। অথচ তিনি এরূপ খুব কমই হাসতেন।

মুহাম্মদ বিন ফযল মক্কী বর্ণনা করেন, একবার ইমাম মালেক (রহঃ) এক গায়িকাকে এ কবিতাগুলো গাইতে শুনলেন—

انت اختى و انت حرمة جارى - و حقيق على حفظ الجوار
انا للجار ما تغيب عنى + حافظ للمغيب فى الاسرار
ما ابالى اكان بالباب ستر + مسبل ام بقى بغير استار

অর্থঃ তুমি আমার বোন। তুমি আমার প্রতিবেশীর ইয্যত। প্রতিবেশীর হিফায়ত করা আমার কর্তব্য। যতদিন সে অনুপস্থিত থাকে, আমি তার রক্ষক। তার অনুপস্থিতিতে আমি তার বিষয়াদি দেখাশুনা করি। প্রতিবেশীর দরজার পর্দা ঝুলানো থাকুক বা না-ই থাকুক; সর্ববস্থায়ই আমি তার হেফায়ত করি।

এ কবিতা শুনে ইমাম সাহেব বললেন, এগুলো যদি কা'বার পাশে শুনানো হয়, তবু জায়েয হবে। তোমরা তোমাদের যুবকদের এধরনের কবিতা মুখস্থ করাও।

আবু হাযেম বললেন, জাহেলিয়াতের যমানার লোকেরা তোমাদের চেয়ে উত্তম প্রতিবেশী ছিলেন। তদানীন্তনকালের এক কবি বলেন,

نارى و نار الجار واحدة + و اليه قبلى تنزل القدر
ماضر جار لى انى اجاوره + ان لا يكون لبابه ستر
اعمى اذا ما جارنى برزت + حتى يوارى جارنى الحدر

অর্থঃ আমার আগুন এবং প্রতিবেশীর আগুন এক। আমার আগেই তার ওখানে পাতিল নামান হয়। আমি যে প্রতিবেশীর প্রতিবেশী তার দরজার পর্দা না থাকায় কোন অসুবিধা নেই। যখন আমার প্রতিবেশী বের হয়, সে পর্দার আড়ালে যাওয়া পর্যন্ত আমি অন্ধ হয়ে থাকি।

এ ধরনের কবিতা শুনায় বা শুনানোতে কোন অসুবিধা নেই। ইমাম সাহেবের ভাগিনা ইবনে আবি উওয়াইস বলেন, আমি ইমাম সাহেবের সাথে হেঁটে চলছিলাম। আমার খাদেমা পানির পাত্র মাথায় নিয়ে বলছিল,

ليتنى ارض سلمى + فتطاني قدماها
ليتنى درع سلمى + ترديني من وراها

ليتنى خادم سلمى + قاعد حيث يراها

অর্থঃ এমন যদি হত! আমি সালমার ঘমীন হতাম আর সে আমাকে তার দু'পা দিয়ে পদদলিত করে যেত। এমন যদি হত! আমি সালমার জামা হতাম। সে আমাকে পরে তার উপর চাদর জড়াত! এমন যদি হত! আমি সালমার খাদেম হতাম (এমন খাদেম) যে এমন জায়গায় বসে আসে যেখান থেকে তাকে দেখা যায়।

এ কবিতা শুনে ইমাম সাহেব বললেন, ইসমাঈল! এ পুরুষ না মেয়ে? আমি বললাম, এ হচ্ছে বনী আমারার দাসী গাযাল। তিনি বললেন, সে বড়ই বাকপটু, সাহিত্য সম্বন্ধেও ভাল জ্ঞান রাখে।

ইমাম সাহেব একজন যুবককে দেখতে পেলেন যে, সে দাঙ্কিতার সাথে চলছে। ইমাম সাহেব সে যুবকের পাশে গিয়ে তার মত হাঁটতে লাগলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমার এ চলনটা কি ভাল? সে বলল, এ চলনটা ঠিক নয়। ইমাম সাহেব বললেন, তবে তুমি কেন এভাবে চল? এ কথা শুনে সে তার চলনভঙ্গি সংশোধন করে নিল।

ইবনে মাহদী একবার ইমাম সাহেবকে বললেন, অনেকদিন হল মদিনায় এসেছি। বাড়ীর অবস্থা কেমন চলছে জানা নেই। ইমাম সাহেব মুচকি হেসে বললেন, ভাতিজা! আমার ছেলে সন্তান আমার নিকটেই আছে কিন্তু আমার জানা নেই, তারা কি অবস্থায় আছে। ইবনে আবি মরিয়ম বলেন, একবার ইমাম সাহেব আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে মিশরীয়! তোমাদের ওখানে মসজিদে কি দারোয়ান থাকে? আমি বললাম, হ্যাঁ থাকে। তিনি বললেন, তবে তো এটা মসজিদ নয়; জেলখানা।

ইমাম সাহেব বললেন, একবার ইবনে শিহাব যুহরী মদীনায় আগমন করলেন। তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য খুব ভোরেই তাঁর নিকট গেলাম। তিনি মসজিদের দিকে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যেই তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হয়ে গেল। ঐ সময় তাঁর সাথে ছিল তার গোলাম আনাস। ইবনে শিহাব তার এক বাঁদীর বিবাহ তার সাথে করে দিয়েছিল। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বিবিকে কেমন পেয়েছ? আনাস উত্তর দিল। জনাব! তাকে জান্নাত পেয়েছি। এ কথা শুনে ইবনে শিহাব বললেন, আল হামদুলিল্লাহ! আর আনাসের কথার অর্থ বুঝতে পেরে আমি হেসে উঠলাম। ইবনে শিহাব আমাকে হাসার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম, গোলামের কথার অর্থ হল তার বিবির সাথে তার মিল হয়নি। জান্নাতে প্রশস্ততা এবং শীতলতা রয়েছে। ইবনে শিহাব আনাসকে

জিজ্ঞেস করলেন, এমন নাকি? সে বলল, ব্যাপারটা ঠিক এরকমই। আমার কথায় ইবনে শিহাব অনেক হাসলেন।

সমসাময়িকদের সমালোচনা

হাদীছ বর্ণনাকারীদের সম্বন্ধে ইমাম সাহেব যথেষ্ট জ্ঞান রাখতেন। তিনি তাদের সমালোচনায় (জরাহ-তাদীল) স্বীয়মত জনসমক্ষে প্রকাশ করতেন। এ ব্যাপারে তার নিকট কোন কোন আলেম সম্বন্ধে এমন সব মন্তব্য পাওয়া যায় যাতে সম-সাময়িকতার আভাস রয়েছে। যেমন তার শাগরেদ মুহাম্মদ বিন ফুলাইহ বর্ণনা করেন, দু'জন কুরাইশী শায়েখ থেকে বর্ণনা করতে ইমাম সাহেব আমাকে নিষেধ করেছেন। তিনি নিজে সে দুজন থেকে কয়েকটি রেওয়ায়েত 'মুয়াত্তায়' উল্লেখ করেছেন এবং এ উভয় শায়েখই হুজ্জাত। এ বর্ণনাটি উল্লেখ করার পর ইব্রাহীম বিন মুনযের বলেন, একে অপরের প্রতি মন্তব্য এবং সমালোচনা করা থেকে অনেক লোকই বাঁচতে পারেনি। যেমন ইমাম শাবী সম্বন্ধে ইব্রাহীম নখরী মন্তব্য করেছেন। আবার ইকরামা সম্বন্ধেও স্বয়ং ইমাম শাবীর মন্তব্য রয়েছে। এ ধরনের সমসাময়িকীয় মন্তব্যের প্রতি আহলে ইলমগণ ভূক্ষেপ করেননি এবং এর দ্বারা আদালতও বিনষ্ট হয় না। তবে এর সাথে সাথে যদি প্রমাণ পাওয়া যায় তবে আদালত থাকবে না। কারণ অস্পষ্ট জারাহ বা অভিযোগ গ্রহণযোগ্য নয়।

ইমাম মালেক এবং ইবনে ইসহাক

ইমাম মালেক (রহঃ) একবার মদীনার প্রসিদ্ধ মুহাদ্দীছ এবং সমর-ইতিহাসবিদ মুহাম্মদ বিন ইসহাকের সমালোচনা করেন। ইবনে আদ্দিল বারবার এ সম্বন্ধে লিখেন যে, এ মন্তব্য গ্রহণযোগ্য নয়।

و كَذَا كَلَامَ مَالِكٍ فِي مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ شَيْءٌ بَلَغَهُ عَنْهُ تَكَلَّمَ بِهِ فِي نَسَبِهِ وَعِلْمِهِ

অর্থঃ তদ্রূপ মুহাম্মদ বিন ইসহাক সম্বন্ধে ইমাম মালেক (রহঃ)-এর মন্তব্য। তার কারণ এ ছিল যে, তার নিকট তাঁর ইলম এবং বংশপরম্পরা সম্বন্ধে কোন তথ্য পৌঁছেনি।

ইবনে ইদ্রীস বর্ণনা করেন, আমি ইমাম সাহেবের নিকট উপস্থিত ছিলাম। এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আবু আদ্দিল্লাহ! আমি 'রায়' দেশের উযীর আবু উবাইদিদ্দাহর মজলিসে বসি ছিলাম। সেখানে মুহাম্মদ বিন ইসহাকও উপস্থিত ছিলেন। কথা প্রসঙ্গে তিনি বললেন, আমার সামনে মালেকের ইলম (মুয়াত্তা)

উপস্থিত কর। আমি ঐটির চিকিৎসক। এ কথা শুনে ইমাম সাহেব বললেন, সে তো দাজ্জালদের মধ্যে একজন।

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, ইমাম সাহেব বললেন, সে তো দাজ্জালদের মধ্য হতে এক দাজ্জাল। তাকে আমরা মদীনা শহর থেকে বের করে দিয়েছি।

ইবনে হাব্বান বলেন, এ কথাটি ইমাম সাহেব একবার মাত্র বলেছিলেন। এরপর তিনি তার সাথে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করেন। অধিকন্তু ইমাম সাহেব হাদীছের বিষয়ে ইবনে ইসহাক সন্মুখে সমালোচনা করেননি। বরং তার কারণ এই যে, নও-মুসলিম ইয়াহুদীদের সম্মান থেকে যারা খায়বার এবং অন্যান্য যুদ্ধের ঘটনা মনে রেখেছে মুহাম্মদ বিন ইসহাক গয়ওয়া (যুদ্ধ) সম্পর্কিত রেওয়ায়েত গ্রহণ করতেন। ইমাম মালেক (রহঃ) এ বিষয়টি অপছন্দ করতেন। অথচ ইবনে ইসহাকও এ ধরনের রেওয়ায়েত দলীল মনে করতেন না। আর ইমাম মালেক (রহঃ) রেওয়ায়েতের ব্যাপারে এত কঠিন ছিলেন যে, তিনি শুধুমাত্র নির্ভরযোগ্য রাবীদের রেওয়ায়েতই জায়েয মনে করতেন।

কারো কারো ধারণা এরূপ যে, ইবনে ইসহাক সন্মুখে ইমাম মালেকের (রহঃ) মন্তব্য করার কারণ এ ছিল যে, তার দিকে শিয়া এবং কদরীয়া মতবাদের সন্মুখ করা হয়েছিল। তবে হিফজ (স্মরণশক্তি) এবং ছিদক (সত্যবাদিতা, বিশ্বস্ততা) এর ব্যাপারে বলা যায় যে, তিনি ছদুক (খুবই বিশ্বস্ত) এবং হাফেযে হাদীছ ছিলেন। ইবনে শিহাব যুহরী তার প্রশংসা করেছেন। শো'বা, সুফিয়ান ছাওরী, সুফিয়ান বিন উয়াইনা প্রমুখসহ ইমামদের একদল তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। এক বর্ণনা মতে বুঝা যায় যে, হিশাম বিন উরওয়ার অনুকরণ করে তার সন্মুখে একথা বলেছেন। এক বর্ণনায় এরূপও রয়েছে যে, ইমাম সাহেব সন্মুখে মুহাম্মদ বিন ইসহাক বলেছেন যে, তিনি কুরাইশদের গোত্র বনু তাইমের 'মওলা (আযাদকৃত দাস) ছিলেন। ইমাম সাহেব সে কথাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং সম্পূর্ণ মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করেছেন। একথাগুলো সাময়িক ছিল। কিন্তু পরবর্তী আহলে ইলমগণ একে খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন। ঐ দুজন বুয়ুর্গের মনে যা ছিল না তা বর্ণনা করা হয়েছে।

জ্ঞানের বাণী

মহৎ ব্যক্তিদের কথা তাদের অভিজ্ঞ জীবনের আয়না এবং অপরের জন্য পথপ্রদর্শক তাদের সাধারণ কথাও বিরাট ফলদায়ক হয়ে থাকে। সেগুলো মনে আমল করে জীবন সৌন্দর্যমণ্ডিত করা যায়। ইমাম মালেক (রহঃ)-এর এ

ধরনের অনেক বাণীই কিতাবে উল্লেখ রয়েছে। কয়েকটি বাণী উল্লেখ করা হচ্ছে—

আহলে ইলম অনেক রকমের রয়েছে। ১। যে আলেম নিজের ইলমানুসারে আমল করে। এমন ব্যক্তি সম্বন্ধে আল্লাহ তাআলা বলেন—

أَمَّا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ *

“আল্লাহর বান্দাদের মধ্য হতে একমাত্র আলেমরাই আল্লাহকে ভয় করে।”

২। যে আলেম নিজে ইলম অর্জন করে অপরকে তা শিক্ষা দেয় না তার সম্বন্ধে আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন,

“যারা আমার নাযিলকৃত প্রমাণসমূহ এবং হেদায়াত গোপন করে।”

৩। যে আলেম নিজে ইলম অর্জন করার পর তা অপরকে শিক্ষা দেয় কিন্তু নিজে তদনুসারে আমল করে না। এমন ব্যক্তি সম্বন্ধে আল্লাহ বলেন—

أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ *

“তারা ত চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়।”

যুবাইরী বলেন, আমি ইমাম সাহেবকে বললাম, যখন আমি সংকাজে আদেশ দেই তখন কেউ কেউ আমার কথা মেনে নেয়। আবার কেউ কেউ আমাকে কষ্ট দেয়, আমার ক্ষতি করে এবং আমার সাথে খারাপ আচরণ করে। এমতাবস্থায় আমার কি করা উচিত? ইমাম সাহেব বললেন, যদি তুমি বুঝতে পার যে, লোকেরা তোমার কথা গ্রহণ করবে না, তবে তুমি তাদের ছেড়ে দাও। মনে মনে তাদের পাপকার্য ঘৃণা কর। এ সুযোগ তোমার রয়েছে। আর যে ব্যক্তি থেকে তোমার ক্ষতির কোন আশংকা নেই তুমি তাকে ভাল কাজের নির্দেশ দাও এবং মন্দকাজ থেকে নিষেধ কর। এ কাজটা তুমি আল্লাহ তাআলার নির্দেশ হিসাবে কর। এর ফল তুমি ভালই দেখবে। বিশেষ করে যখন তোমার মধ্যে এ ব্যাপারে নম্রতা পাওয়া যায়। আল্লাহ মুসা এবং হারুনকে (আঃ) নির্দেশ দিয়েছেন যেন তারা বৈআউনের সাথে নম্র ব্যবহার আচরণ করে। এরূপ করলে শ্রবণকারী তে তার প্রতি মনোযোগ দিবে, তা গ্রহণ করবে।

☆ বাতেলের নৈকট্য ধ্বংসের কারণ। বাতেলের মধ্যে এবং হকের মধ্যে অনেক দূরত্ব রয়েছে। ধর্ম এবং মর্যাদা বিনষ্টের পর যে পার্থিব সম্পদ লাভ হয় তার মধ্যে কোনই মঙ্গল নেই। যদিও তা অনেক হয়।

☆ আমি জানতে পেরেছি যে, কিয়ামতের দিন যেসব প্রশ্ন নবীদেরকে করা

হবে, আলেমদেরকেও সে সব প্রশ্ন করা হবে।

☆ মসজিদে মুনাফিকদের উপমা সে পাখীর মত যাকে খাঁচায় আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। যখনই দরজা খোলা হল পাখী উড়ে গেল।

☆ রেওয়ায়েতের আধিক্য দ্বারা ইলমে দীন অর্জিত হয় না। বরং তা এমন একটি নূর যা আল্লাহ তাআলা মানুষের অন্তরে ঢেলে দেন। ইলমে দীন অর্জন করা খুবই উত্তম। তবে তোমাদের দেখতে হবে যে, তজ্জন্য সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কি করতে হবে— সেটা অবলম্বন করা চাই।

☆ একবার ইমাম সাহেব মুতাররফকে জিজ্ঞেস করলেন, মানুষ আমার সম্পর্কে কি বলে? মুতাররফ বললেন, বন্ধুরা প্রশংসা করে আর শত্রুরা নিন্দা করে। ইমাম সাহেব বললেন, মানুষের অবস্থা এই যে, তার শত্রু-মিত্র উভয়ই থাকে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মানুষের মন্দ বলা থেকে নিরাপদে রাখুন।

☆ এ উম্মতের শেষ স্তরের লোক ঐ জিনিস দ্বারাই কল্যাণ পেতে পারে যদ্বারা তার প্রথমস্তরের লোকেরা কামিয়াব হয়েছে।

☆ অহংকার, হিংসা এবং কার্পণ্য থেকে পাপের সৃষ্টি হয়।

☆ যে বস্তুকেই চাও তুমি খেলার বস্তু বানাও, কিন্তু নিজের দীনকে নয়।

☆ আল্লাহ তাআলার ‘আরশের উপর মুস্তাবী’ আছে। কিন্তু তার অবস্থা (ধরন) অজানা। এ সম্পর্কে কথা হওয়া জানা বলা বিদআত।

☆ যদি দু’টি বিষয়ে তুমি দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাক তবে যেটা তোমার অনুকূলে সেটা অবলম্বন কর।

☆ তুমি ইলম হাছেল করার পূর্বে হিল্ম (গাণ্ডীর্থ্য) হাছেল কর।

☆ যে ব্যক্তি কথাবার্তায় সততা অবলম্বন করবে। মৃত্যু পর্যন্ত সে তার আকল বা জ্ঞান দ্বারা উপকৃত হতে থাকবে এবং বৃদ্ধাবস্থায় প্রলাপ থেকে নিরাপদে থাকবে।

☆ আল্লাহ তাআলার আদব কোরআনে রয়েছে, তাঁর রাসূলের (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আদব সুনাত হাদীছে রয়েছে এবং ছালেহীনদের আদব ফিকাহতে রয়েছে।

অবয়ব এবং পোষাক-পরিচ্ছদ

ইমাম সাহেবের দেহের বর্ণ সাদা-লাল মিশ্রিত ছিল। তিনি দীর্ঘাঙ্গী ছিলেন। তার মাথা ছিল বড়, চক্ষুদ্বয় ছিল আয়ত। তাঁর চেহারা ছিল সুন্দর ও কান্তিময়।

তার শাশু ছিল দীর্ঘ। গোঁফ ছিল পরিমিত। তিনি খেযাব ব্যবহার করতেন না। তিনি খুবই উত্তম পোশাক ব্যবহার করতেন এবং উত্তম খাদ্য আহার করতেন। আদন, খোরাসান, মরভ এবং ত্বারাযের উন্নত কাপড় ব্যবহার করতেন। সাধারণতঃ তাঁর পোশাক সাদা রংয়ের হত। কখনও কখনও হালকা হলুদ রংয়ের কাপড়ও ব্যবহার করতেন। তাঁর আংটিতে কালপাথর খচিত থাকত। সেখানে **حسبنا الله و نعم الوكيل** খোদিত ছিল। উত্তম সুগন্ধি এবং আতর ব্যবহার করতেন। সাধারণতঃ সুখ-সমৃদ্ধি প্রকাশ করতেন, যেন ইলমী মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। কখনও কেউ এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে বলতেন, এতে আল্লাহ তাআলার প্রদত্ত নেয়ামতের প্রকাশ পায়।

রচনা

ইমাম সাহেবের যমানায় হাদীছ এবং ফিকাহর সংকলন শুরু হয়েছিল। ১৪০ হিজরী থেকে ১৫০ হিজরীর মাঝে ইসলামী জগতের প্রধান শহরগুলোতে উলামায়ে কিরাম ফিকাহর ক্রমানুসারে কিতাব লিখেন। এর প্রায় ত্রিশ বছর পরে ১৭৯ হিজরীতে ইমাম সাহেবের মৃত্যু হয়। এ সময়ে অনেকেই কিতাব রচনা করেন। তন্মধ্যে ইমাম সাহেব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর রচিত কিতাবগুলোর মধ্যে 'কিতাবুল মুয়াত্তা' মাইলপোষ্টের মত।

কাযী আযায় ইমাম সাহেবের রচিত কিতাব থেকে এ কিতাবগুলো চিহ্নিত করেছেন।

১। কিতাবুল মুয়াত্তা ২। রিসালাতুহ ইলা ইবনে ওহব ফিল কদর। ৩। কিতাবুননুজুমি ওয়া হিসাবি মাদারিয যমান ওয়া মানাযিলিল কমার। ৪। রিসালাতু মালেক ফিল আকযিয়া। ৫। রিসালাতুহ ইলা আবি গাস্‌সান ফি ফাতওয়া ৬। রিসালাতুহ ইলা হারুনির রাশীদ ফিল আদাবি ওয়াল মাওয়ায়েহ ৭। আত্‌তাফসীর লিগারীবিল কোরআন। ৮। কিতাবুস সিয়ার ৯। রিসালাতু ইলালায়েছ ফি ইজমায়ে আহলিল মদীনা।

মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেক

মুয়াত্তা সম্বন্ধে ইমাম শাফেয়ী বলেন,

* ما في الارض كتاب من العلم اكثر صوابا من مؤطا مالك

অর্থাৎ পৃথিবীর বুকে 'মুয়াত্তা মালেক' হতে অধিক নির্ভুল কিতাব আদ্বিতীয়টি নেই।

কথিত আছে যে, বাদশাহ হারুনুর রশিদের অনুরোধে তিনি এ কিতাব লিখেন।

আতীক যুবাইরী বলেন, প্রায় দশ হাজার হাদীছ থেকে নির্বাচন করে ইমাম সাহেব মুয়াত্তা সংকলন করেন এবং প্রতি বছর তাহকীক তানকীহ (অনুসন্ধান এবং সত্যতা যাচাই) করতে থাকেন। এভাবে এ কিতাবটি সংক্ষিপ্ত হতে থাকে। একারণেই ইয়াহয়া বিন সায়ীদ কাত্তানের মন্তব্য রয়েছে যে, মানুষের ইলম দিনদিন বাড়তে থাকে আর ইমাম মালেকের কমতে থাকে। তিনি যদি আরও কিছু দিন বেঁচে থাকতেন তবে তা শেষ হয়ে যেত। সুলাইমান বিন বিলাল বলেন, মুয়াত্তায় প্রথমে চার হাজার বা তারও অধিক হাদীছ ছিল। কিন্তু তাঁর ইচ্ছেকালের সময় এক হাজারের কিছু বেশী হাদীছ বাকী রয়ে গেছে। ইমাম সাহেব প্রতি বছর তা সংক্ষিপ্ত করতে থাকেন প্রাচ্য পাশ্চাত্যের বহু আলেম ইমাম সাহেব থেকে মুয়াত্তা রেওয়াজেত করেছেন। আবার অনেকে তাঁর মৃত্যুর পর রেওয়াজেত করেছেন। এ কারণে মুয়াত্তার অনেক নুশখা। কাযী আয়ায এর সংখ্যা প্রায় বিশটি উল্লেখ করেছেন। আবার কেউ কেউ ত্রিশ উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে আবার কয়েকজন রাবী নিজের পক্ষ থেকে কিছু বাড়িয়ে কমিয়ে ভিন্ন কিতাবের রূপ দিয়েছেন। যেমন মুয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ। মূলতঃ সেটা ইমাম মালেকের মুয়াত্তা। কিন্তু এখন একটি ভিন্ন কিতাবের রূপ নিয়েছেন।

মুয়াত্তার বিভিন্ন রেওয়াজাত

ইমাম মালেক (রহঃ) হতে মুয়াত্তা পাঠকারীর সংখ্যা অনেক। এদের প্রত্যেকেই যখন পরবর্তীতে মুয়াত্তা বর্ণনা করেন, তখন সেখানে কিছু কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এরূপ পার্থক্যের কারণে ইমাম মালেক (রহঃ)-এর মুয়াত্তার রেওয়াজ ত্রিশ রকমের হয়ে যায়। এগুলোর মধ্যে ইয়াহয়া ইবনে বুকাইর, আবু মাসহাব ইবনে ওহূহাব প্রমুখসহ মোট এগারজনের রেওয়াজাত নির্ভরযোগ্য। এদের মধ্যে আবার ইয়াহয়া উন্দুলসীর রেওয়াজাতটিই সর্বাধিক প্রামাণ্য, সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত এবং গ্রহণযোগ্য। এর রেওয়াজাতের হাদীছগুলো সুনানের ক্রমানুসারে বিন্যস্ত রয়েছে।

ইয়াহয়া বিন ইয়াহয়া আল মসমুদী আল উন্দুলসী ছিলেন বরবর নামক স্থানের অধিবাসী। সর্বপ্রথম তার দাদা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। আবু আদ্দিন আহমদ যিয়াদ বিন আদ্রির রহমান বিন যিয়াদ আল খামসী ছিলেন ইমাম মালেক (রহঃ)-এর একজন বিশিষ্ট ছাত্র। ইনি কর্ডোভায় শিক্ষাদান করতেন। ইয়াহয়া

প্রথমে তার নিকট পূর্ণ মুয়াত্তা পাঠ করেন। এরপর তিনি মদীনায় আগমন করে ইমাম মালেক (রহঃ)-এর নিকট হতে মুয়াত্তা পাঠ করতে থাকেন। কিন্তু পূর্ণ মুয়াত্তা পাঠ করার পূর্বেই ইমাম সাহেবের ইত্তিকাল হয়ে যায়।

ইমাম সাহেব ইয়াহয়াকে অত্যন্ত সম্মান করতেন। স্পেনের শাসনকর্তাও তাঁকে পরম শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। ১৫২ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৮২ বছর বয়সে ২৩৪ হিজরীতে তিনি ইত্তিকাল করেন। চারটি মাসয়ালা ব্যতীত অন্যান্য সব মাসয়ালায় তিনি ইমাম সাহেবের অনুসরণ করতেন।

আব্দুল্লাহ বিন ওহাব মিশরীও মুয়াত্তা লিপিবদ্ধকারীদের একজন। বিখ্যাত মুহাদ্দিস লাইন্দ্ বিন সায়ীদ মিশরীর নিকট হতে তিনি হাদীছ শিক্ষা লাভ করেন। ইমাম মালেক (রহঃ)-এর খ্যাতির কথা শুনে তিনি মদীনায় গমন করেন। সেখানে ইমাম মালেক (রহঃ)-এর সঙ্কলন ও কিতাবাদি লিপিবদ্ধ করার কাজে তিনি নিয়োজিত হন। মসমুআতে ইমাম মালেক নামে তিনি তিন খণ্ডের একটি কিতাব লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর রচিত কিতাবগুলোতে এক লক্ষ বিশ হাজার হাদীছ স্থান পেয়েছে। সব হাদীছই বিশুদ্ধ।

ইবনুল কাসেম মালেকী ছিলেন মালেকী মাযহাবের একজন বিখ্যাত ফকীহ। তিনি মালেকী মাযহাবের প্রখ্যাত কিতাব আল মুদাউওয়ানা তুল কুবরা সঙ্কলন করেন। ইমাম সাহেবের সমস্ত ফতোয়াকে তিনি কিতাবাকারে সঙ্কলন করেন। ১৯১ হিজরীতে তিনি ইত্তিকাল করেন।

মা'ন বিন ঈসা ছিলেন ইমাম সাহেবের শিক্ষা মজলিসের হাদীছ পাঠক। খলীফা হারুনুর রশীদ ইমাম সাহেবের শিক্ষা মজলিসে তারই পাঠদান শ্রবণ করেছিলেন। ইমাম সাহেবের চল্লিশ হাজার ফতোয়া তাঁর মুখস্থ ছিল। তিনি ইমাম বোখারী, মুসলিম এবং তিরমিযীর শায়খ ছিলেন। ১৯৮ হিজরীতে মদীনায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মুয়াত্তা কিতাবের মর্যাদা

বোখারী, মুসলিম এবং মুয়াত্তার মধ্যে তুলনা করলে মুয়াত্তার স্থান কোথায়, উলামাদের মধ্যে এ ব্যাপারে বিভিন্ন মত রয়েছে। সাধারণতঃ এই কিতাবকে তিরমিযীর পরে স্থান দেওয়া হয়। আবার অনেকে সিহাহ সিত্তার পরে স্থান দেন। কিন্তু পূর্ববর্তী মুহাক্কেকীন বা হাদীছতাত্বিকগণ এবং পরবর্তীতে শাহ ওলীউল্লাহ, শাহ আব্দুল আযীয প্রমুখ মুয়াত্তাকে বোখারীরও উপরে স্থান দিয়েছেন।

মুয়াত্তার সর্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য এই যে, এটি ইসলামের প্রথম কিতাব।

কিতাবুল্লাহর পরেই হাদীছের স্থান। আর এই কিতাবটির মধ্যেই হাদীসে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রকাশ পেয়েছে সর্বপ্রথম। কাশফুযযুনুন কিতাবে বলা হয়েছে, মুয়াত্তা ইমাম মালেকই ইসলামের সর্বপ্রথম রচিত কিতাব।

এ কিতাবের ব্যাখ্যায় ইবনুল আরাবী উল্লেখ করেছেন যে, ইসলামী শরীয়ত সম্পর্কে লিখিত কিতাবের মধ্যে এটিই সর্বপ্রথম।

সুফিয়ান বলেছেন, বিশুদ্ধ কিতাব সর্বপ্রথম ইমাম মালেকই লিখেন।

ইমাম মালেক (রহঃ)-এর মুয়াত্তা যে তার সমকালীন কিতাবগুলোর মধ্যেই শ্রেষ্ঠ তা নয়; পরবর্তীতে সঙ্কলিত কিতাবগুলো হতেও শ্রেষ্ঠ। তাই ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন, কিতাবুল্লাহর পরে পৃথিবীর বুকে ইমাম মালেকের মুয়াত্তার চেয়ে বিশুদ্ধ কিতাব আর দ্বিতীয়টি নেই।

মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যাকারী ইমাম নবুবী বলেন, আমি এমন একটি কিতাব পেয়েছি যা বোখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈ হতে শ্রেষ্ঠ। যদিও এ সমস্ত কিতাব উত্তম, কিন্তু মুয়াত্তা এমন এক কিতাব যার সঙ্কলনকারী সমস্ত মুহাদ্দেছের শায়খদেরও শায়খ।

ইমাম মালেক (রহঃ)-এর রেওয়ায়াত গ্রহণের উৎস এবং ইমাম বোখারী ও মুসলিমের রেওয়ায়াতের উৎসের মর্যাদার মধ্যে অনেক তফাৎ রয়েছে। কাজেই মুয়াত্তার রেওয়ায়াত এবং অন্যান্য কিতাবের রেওয়ায়াতের মধ্যেও পার্থক্য থাকবে। আর এটাই স্বাভাবিক।

মুজতাহিদদের মধ্যে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এবং ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এবং মুহাদ্দেছগণের মধ্যে অনেকেই 'মুয়াত্তা' কিতাব হতে রেওয়ায়াত করেছেন। মুহাদ্দেছগণের মধ্যে আব্দুল্লাহ বিন মুবারক হাশেম জামীল, ইমাম মনসুর বিন সালামা, আব্দুল্লাহ বিন ওহ্‌হাব, ইয়াহয়া প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সূফীকুল শিরমণি য়ুনুন মিসরীও মুয়াত্তা হতে রেওয়ায়াত করেছেন।

খলিফাদের মধ্য হতে হাদী, মাহদী, হারুনুর রশীদ, আল মামুন, আল আমীনও এ কিতাব হতে রেওয়ায়াত গ্রহণ করেছেন। সাধারণ আলেমদের মধ্য হতে এ কিতাবের রেওয়ায়াত গ্রহণকারীর সংখ্যা অগণিত।

তানবীরুল হাওয়ালেক নামক কিতাবে আল্লামা সুয়ুতী লিখেন, ইমাম মালেকের নিকট হতে যত সংখ্যক রেওয়ায়াতকারী রয়েছেন অন্যান্য ইমামদের বেলা তা দেখা যায় না।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হাদীছ বর্ণনাকারীর মধ্যে মাধ্যম সংখ্যা যত কম হবে হাদীছের গুরুত্ব এবং মর্যাদাও তত অধিক হবে। এ বিষয়েও ইমাম মালেক (রহঃ)-এর মুয়াত্তা, বোখারী মুসলিম হতেও অনেক উর্দে রয়েছে। কারণ মুয়াত্তার তিনের অধিক মাধ্যম নেই। পক্ষান্তরে বোখারী, মুসলিমের অধিকাংশ হাদীছেই পাঁচ ছয়জন মাধ্যম রয়েছে। বোখারী শরীফে মাত্র গুটি কয়েক হাদীছ রয়েছে। যেগুলোর মাধ্যম তিনজন। অথচ মুয়াত্তায় তিনের অধিক মাধ্যম কোন রেওয়াজাতেই নেই। বরং এমন কিছু রেওয়াজাত রয়েছে যেগুলোর মাধ্যম মাত্র দু'জন।

মুয়াত্তা ও সমসাময়িক কিতাব

মুয়াত্তার কিতাবের সমসাময়িক এবং তৎপূর্বে সঙ্কলিত সনদ সম্বলিত হাদীছের কিতাব যেগুলো বর্তমানে বিদ্যমান রয়েছে, সেগুলোর সাথে ইমাম মালেক (রহঃ)-এর এ কিতাবটির তুলনা করলে দেখা যাবে যে, বোখারী শরীফ এবং বায়হাকী শরীফ সঙ্কলকের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে ঠিক ততটুকু পার্থক্য রয়েছে মুয়াত্তার সঙ্কলক এবং তার সমসাময়িক ও তার পূর্বকার কিতাব সঙ্কলকগণের মধ্যে।

মুয়াত্তার পূর্বে সঙ্কলিত কিতাবগুলোর মধ্যে সাহাবা এবং তাবেয়ীদের 'আছার' এবং ফতোয়ার উপর অধিক নির্ভর করা হয়েছে। পক্ষান্তরে মুয়াত্তার মধ্যে অকাট্য সনদ সম্বলিত হাদীছ এবং 'মুরসাল হাদীছের উপর নির্ভর করা হয়েছে অধিক। তারপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে 'আছার' এবং ফতোয়ার উপর।

অন্যান্য কিতাবগুলোর সাথে মুয়াত্তার একটি বিশেষ পার্থক্য এও যে, মুয়াত্তা কিতাবে সে সমস্ত হাদীছ সঙ্কলন করা হয়েছে যেগুলোর বিশুদ্ধতার বিষয়ে কোন অভিযোগ নেই। পক্ষান্তরে অন্যান্য কিতাবের হাদীছ অভিযোগমুক্ত নয়।

অধিকন্তু মুয়াত্তা সঙ্কলিত হয়েছে মদীনায়। ফলে এতে রয়েছে হেজাজী রেওয়াজাত। যে রেওয়াজাতের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে হাদীছ বিশারদগণ একমত। পক্ষান্তরে অন্যান্য কিতাবে হেজাজ ব্যতীত কুফা, বসরা, খোরাসান, সিরিয়া প্রভৃতি স্থানের রেওয়াজাত স্থান পেয়েছে।

'মুয়াত্তা' কিতাবের নামকরণের সার্থকতা

'মুয়াত্তা' শব্দটি তাওত্বীয়া (توطية) শব্দের কর্মকারক। এ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো, কোন কিছুর উপর দিয়ে চলা। যে পথে ইমাম, আল্‌ম

এবং বুয়ুর্গগণ চলেছেন মুয়াত্তা শব্দ দ্বারা কেউ কেউ সে পথকে বুঝে থাকেন। এ কিতাবের নাম মুয়াত্তা রেখে এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ কিতাবের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সবাই একমত। এ কিতাবের রচনা শেষে হাদীছের শায়খদের নিকট পেশ করা হলে তারা সবাই এ কিতাবের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে একমত হয়েছেন এবং একে সমর্থন করেছেন। এ কারণে কিতাবটি মুয়াত্তা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

কেউ কেউ মুয়াত্তা শব্দের এই অর্থ গ্রহণ করেছেন, যে পথে অধিকাংশ লোক যাতায়াত করে তাকে মুয়াত্তা বলা যেতে পারে। এ অর্থেই কিতাবের নাম মুয়াত্তা রাখা হয়েছে। এটা সে পথ, যে পথে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবাগণ চলে গিয়েছেন।

মুয়াত্তা সঙ্কলন

ইমাম মালেক (রহঃ) সর্বদাই মদিনায় অবস্থান করতেন। ফলে এ কথা সহজেই বলে দেওয়া যায় যে, মদীনা মুনাওয়ারাতেই মুয়াত্তার সঙ্কলন হয়েছিল। তবে কোন্ সনে সঙ্কলন হয়েছে তা সঠিকভাবে বলা মুশকিল। একটুকু বলা যেতে পারে যে, হিজরী ১৩০ সন হতে ১৪০ সনের মধ্যে কিতাবটি সঙ্কলিত হয়েছিল।

১৩০ হিজরীতে বনী উমাইয়াদের পতনের সূচনা ঘটে। এর পূর্বে কিতাব রচনায় কিংবা সঙ্কলনে খুব বেশী লোক হাত দেননি।

খলীফা মনসুর ১৪৪ হিজরীতে সর্বশেষ হজ্জ করেন। সে সময়েই মুয়াত্তা' সর্বপ্রথম প্রচারিত হয় এবং প্রসিদ্ধি লাভ করে।

এক বর্ণনা এরূপ রয়েছে যে, খলীফা মনসুরের আদেশক্রমেই মুয়াত্তা কিতাব সঙ্কলন করেন।

ইমাম সাহেবের মুয়াত্তা সঙ্কলনের কাজ আরম্ভ করার কথা মদিনায় রটে গেলে অন্যান্য আলেমগণও নিজ নিজ হাদীছসমূহ সঙ্কলন করতে আরম্ভ করলেন। ইমাম সাহেব এ কথা শুনে বললেন, শুধু নেক নিয়তই বাকী থাকবে।

ইমাম সাহেবের এ কথা অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হল। এ কারণেই দেখতে পাই মুয়াত্তা কিতাব আজও সবার নিকট সমাদৃত। অথচ অন্যান্য কিতাবগুলির নাম পর্যন্ত কেউ অবগত নয়।

ইমাম মালেক (রহঃ) সঙ্কলনকার্য সমাপ্ত করে কিতাবটি হাদীসের শায়খদের খিদমতে পেশ করলেন। তাদের সকলেই কিতাবটিকে অত্যন্ত পছন্দ করলেন। মদিনাবাসী এতে আনন্দিত হল। মজলিসে যখন আলেমগণ ইমাম মালেকের মুয়াত্তার প্রশংসা করছিলেন, তখন সা'য়ীদ নামক জনৈক কবি একটি কবিতা পাঠ করলেন যার অর্থ নিম্নরূপ—

আমি তাদেরকে আহ্বান করছি যাঁরা হাদীছ রেওয়াজাত করেন এবং লিপিবদ্ধ করেন, ফিকহর রাস্তায় বিচরণ করেন এবং এ সমস্ত জানতে কৌতুহলী। আপনি যদি চান যে, পৃথিবীর বুকে আপনি আলেম হিসাবে পরিচিত হবেন তবে শরীয়তের বাইরে কখনো পা বাড়াবেন না। আপনি কি সেই ঘর পরিত্যাগ করতে চান যে ঘরে আল্লাহর প্রিয় জিবরাঈল (আঃ) আসা-যাওয়া করতেন এবং যে ঘরে আল্লাহর রাসূল ইন্তেকাল করেছেন। তাঁর ইত্তিকালের পর তাঁর ছাহাবাগণ সেটাকে স্বযত্নে হিফায়ত করেছেন। আপনারা লক্ষ্য রাখবেন, যেন ইমাম মালেকের মুয়াত্তা বিনষ্ট না হয়ে যায়। যদি বিনষ্ট হয় তবে সত্য নিরাশ্রয় হয়ে পড়বে। আপনি মুয়াত্তার খাতিরে অন্য সব কিছু পরিত্যাগ করতে পারেন। কারণ মুয়াত্তা সূর্য স্বরূপ এবং অন্যগুলো তারকা স্বরূপ।

ইত্তিকাল

ইমাম সাহেব জীবনের শেষ বছরগুলোতে নির্জনতা ও একাকী জীবন গ্রহণ করে নেন। এমনকি জামাত বা জুমআর জন্যও বের হতেন না। তিনি বলেন, প্রত্যেকেই তার ওয়র প্রকাশ করতে পারে না। এতদসত্ত্বেও তাঁর মকবুলিয়াত বা মর্যাদায় কোন পার্থক্য আসেনি।

এক বর্ণনামতে অবশেষে তিনি বলেছেন যে, আমি বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছি। এ অবস্থায় আমি মসজিদে নববীতে যেতে চাই না। কারণ এতে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তায়ীম অক্ষুণ্ণ রাখতে পারব না। আর আমি আমার অসুস্থতার কথা জানিয়ে আল্লাহর নিকট অভিযোগ করতে চাই না। ইমাম সাহেব ২২ দিন অসুস্থ ছিলেন। ১৪ রবিউল আউয়াল, ১৭৯ হিজরী শনিবার দিন তিনি ইন্তেকাল করেন। ইবনে কেনান এবং ইবনে যুবাইর তাঁকে গোসল দেন। আর তাঁর পুত্র ইয়াহয়া এবং কাতেব হাবীব পানি ঢেলে সহযোগিতা করছিলেন। তাঁর অছিয়্যত অনুসারে সাদা কাপড় দ্বারা কাফন দেয়া হয়। মদীনার আমির আব্দুল আযীয বিন মুহাম্মদ জানাযার নামায পড়ান। মৃত্যুর পূর্বে তিনি (কলেমায়ে শাহাদাত) পড়েন এবং এ বাক্য বলেন **لله الامر من قبل و**

من بعد “আল্লাহর জন্যই সমস্ত ক্ষমতা আগেও পরেও।” জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়।

মুসলিম বিশ্বের জন্য ইমাম সাহেবের মৃত্যু ছিল একটি হৃদয় বিদারক ঘটনা।

উলামায়ে কিরাম সমবেদনা প্রকাশ করলেন, তার উচ্চ মর্যাদার স্বপ্ন দেখেন। কবিগণ শোকগাঁথা পড়লেন। যেখানেই এ সংবাদ পৌঁছিল, সেখানেই শোকের ছায়া নেমে পড়ল।

আসাদ বিন খাররাত বর্ণনা করেন, আমরা বাগদাদে ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান শাইবানীর দরসী হালকায় বসা ছিলাম। একব্যক্তি অনেক কষ্টে তার নিকট গেল। এরপর ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) پَدَّه اَنَا لِلَّهِ وَاَنَا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ পড়ে বললেন,

مصيبة ما اعظمها مات مالك بن انس مات امير المؤمنين في الحديث *

কত বড় মুছিবত এসে পড়েছে! মালেক বিন আনাস ইন্তেকাল করেছেন। হাদীছের সম্রাট ইন্তেকাল করেছেন।

মসজিদে যখন এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল তখন চারিদিকে শোকের এক অপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয়ে গেল।

সন্তান-সন্ততি

ইবনে হযম লিখেন, ইমাম মালেকের দু'জন ছেলে ছিলেন। একজন ইয়াহয়া অপরজন মুহাম্মদ। মুহাদ্দিছদের দৃষ্টিতে এ দুজনই যযীফ তথা দুর্বল। তাঁর এক পৌত্র আহমদ বিন ইয়াহয়া বিন মালেক ছিলেন। উওয়াইস, আবু সহল নাফে এবং রবী)- তিনজনই মালেক বিন আবি আমের নাফে-এর সন্তান ছিলেন।

ইমাম মুহাম্মদ বিন ইদ্রীস শাফেয়ী (রাহঃ)

জন্ম ও বংশ পরিচয় : ইমাম শাফেয়ীর (রাহঃ) বংশধারা তাঁর ছাত্র রবী বিন সুলাইমান মুরারী তাঁর থেকে এরূপ বর্ণনা করেন—

ইমাম আবু আদিল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইদ্রীস বিন আব্বাস বিন উছমান বিন শাফে বিন সায়েব বিন উবাইদিল্লাহ বিন আবদ ইয়াযীদ বিন হাশেম বিন মুত্তালেব বিন আবদে মানাফ আলকুরাশী, আলমুত্তালেবী আল হাশেমী (রাহঃ)।

সায়েব বিন উবাইদিল্লাহ (রাঃ) বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে বন্দী হবার পর ইসলাম গ্রহণ করেন। বনী হাশেমের ঝাঞ্জ তার হাতে ছিল। ফিদইয়া (রক্তপণ) আদায় করার পর মুসলমান হলে লোকেরা বিস্ময় প্রকাশ করে। তিনি বললেন, আমি মুসলমানদেরকে তাদের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করতে চাইনি। এক বর্ণনা মতে তাঁর বাহ্যিক আকার-আকৃতি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। একবার সায়েব বিন উবাইদিল্লাহ (রাঃ) অসুস্থ হলে হযরত উমর (রাঃ) তাকে দেখতে যান।

কৈশোরে একবার শাফে বিন সায়েব তার পিতার সাথে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাতের সৌভাগ্য অর্জন করেন। তিনি তাকে দেখে বললেন—

من سعادة المرء ان يشبه اياه *

অর্থাৎ পিতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়াটা সৌভাগ্য।

ইমাম সাহেবের মাতার নাম ফাতেমা বিনতে আদিল্লাহ বিন হাসান বিন আলী বিন আবি তালিব। কিন্তু খতীবে বাগদাদী এবং কাযী আয়ায লিখেন যে, তার মাতা ছিলেন বনু ইয়্দ গোত্রের যাদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ইয়্দ হচ্ছে আরবের উপাদান।

জন্ম এবং বাল্যকাল

ইমাম সাহেব বর্ণনা করেন, আমি ১৫০ হিজরীতে সিরিয়ার গাযা শহরে জন্মগ্রহণ করেছি। দুই বছর বয়সে আমাকে মক্কায় নিয়ে আসা হয়। এ বর্ণনাটিই

অধিক প্রসিদ্ধ। অন্য এক বর্ণনা মতে আমি 'আসকালানে জন্মগ্রহণ করি। আমার দু বৎসর বয়সে মা আমাকে নিয়ে মক্কায় আসেন। অন্য এক বর্ণনা মতে তিনি বলেন, ইয়ামানে আমার জন্ম হয়। আমার মায়ের আশঙ্কা হল যে, ইয়ামানে আমার নস্ব (বংশ) নষ্ট হয়ে যাবে। এ কারণে তিনি দশ বছর বয়সে আমাকে নিয়ে মক্কায় চলে আসেন। তাঁর মাতা বর্ণনা করেন যে, যখন শাফেয়ী মাতৃগর্ভে ছিল তখন আমি স্বপ্নে দেখতে পেলাম যে, মুশতারী (মঙ্গল) তারকাটি আমার শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মিশরে পতিত হচ্ছে। তার আলো প্রতিটি শহরে গিয়ে পৌঁছল। স্বপ্ন ব্যাখ্যাকারীগণ বললেন যে, গর্ভ থেকে এমন একজন আলেম জন্ম নিবে, যার ইলম মিশর থেকে প্রতিটি শহরে ছড়িয়ে পড়বে।

ইমাম সাহেব পিতৃহীন ছিলেন। তাঁর জন্মের পূর্বেই অথবা তাঁর জন্মের পরপরই তাঁর পিতা মারা যান। তাঁর মাতা তাকে দু' বছর বয়সে মক্কায় নিয়ে আসেন।

ইমাম সাহেব বলেন, বাল্যকালে দুটি জিনিসের দিকে আমার সমস্ত মনোযোগ ছিল, তীর নিক্ষেপ এবং ইলম অর্জন। তীর নিক্ষেপে আমি এমন পারদর্শী হয়েছিলাম যে, দশটার মধ্যে দশটাই সঠিক লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছত। ঐ সময়ে ঘোড়ায় আরোহণের আগ্রহও ছিল। তীর নিক্ষেপ এবং ঘোড়সওয়ারী সম্বন্ধে 'কিতাবুস্‌সবক ওয়াররমী' রচনা করি। এ বিষয়ে এটাই ছিল সর্বপ্রথম কিতাব। সাথে সাথে পড়ালেখায় পুরো মনোযোগ ছিল। পিতৃহীনতা এবং দরিদ্রতা সত্ত্বেও রাত দিন পড়াশুনায় রত থাকতেন।

শিক্ষা শুরু

মক্কা মুকাররমায় থাকাকালে ইমাম সাহেব মকতব হতে শিক্ষা শুরু করেন। এরপর মদিনায় গিয়ে ইলম হাছেল করেন। মক্কা থাকাকালেই তিনি তীর নিক্ষেপ, ঘোড়সওয়ারীর সাথে সাথে মকতবের পড়ার অবসরে বনী হুযাইল গোত্র থেকে আরবীয়াত (আরবী ভাষা) এবং আরবী কবিতায় পারদর্শীতা অর্জন করেন। এর সাথে সাথে তাঁর চাচা মুহাম্মদ বিন শাফে এবং মুসলিম বিন খালেদ যঞ্জী প্রমুখ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেন।

ইমাম সাহেব তাঁর ছাত্রজীবনের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমি পিতৃহীন ছিলাম। আমার মা আমাকে লালন-পালন করতেন। মু'আল্লিমের খিদমত করার মত অর্থ আমার নিকট ছিল না। কিন্তু এমন সুযোগ সৃষ্টি হল যে, মু'আল্লিম আমাকে বিনা বেতনে পড়াতে রাযী হয়ে গেলেন। বাচ্চাদেরকে

তিনি যে সবক দিতেন তা আমি মুখস্থ করে নিতাম এবং তার অনুপস্থিতিতে বাচ্চাদেরকে আমি পড়াতাম। এতে তিনি আমার উপর সন্তুষ্ট হয়ে বিনা বেতনে পড়াতে রাখী হয়ে গেলেন।

মকতবের শিক্ষা শেষ করার পর বনী হুয়াইল গোত্রে চলে গেলাম। এরা ভাষা-অলঙ্কার শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ ছিল। সতের বছর পর্যন্ত তাদের সাথে ছিলাম। মক্কা ফেরৎ এসে তাদেরকে কবিতা শুনাতে লাগলাম। ঐ সময় আরবী ভাষা, সাহিত্য এবং কবিতার প্রতি আমার যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। ঐ সময়েই আমি আমার চাচা এবং মুসলিম বিন খালেদ যঞ্জী প্রমুখ থেকে হাদীছ রেওয়াজেত করতাম। উলামাদের শিক্ষা মজলিসে বসে হাদীছ এবং মাসয়ালা শুনে শুনে মুখস্থ করে নিতাম। আমার মায়ের নিকট কাগজ কেনার পয়সা না থাকায় এদিক ওদিক থেকে হাড়, মাটির পাত্রের ভাঙ্গা টুকরা এবং খেজুরের পাতা কুড়িয়ে সেগুলোতেই লিখে নিতাম। সাত বৎসর বয়সে কোরআন মজীদ এমনভাবে হিফয করে নিয়েছি যে তার সব অর্থ এবং মর্ম আমার নিকট স্পষ্ট ছিল। অবশ্য দু’টি জায়গা বুঝিনি। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে। আর দশ বৎসর বয়সে মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেক মুখস্থ করে নিয়েছিলাম।

ইমাম মালেকের (রহঃ) দরসী মজলিসে

ইমাম সাহেবের বর্ণনায় আগেই বলা হয়েছে যে, তিনি মক্কা মুকাররমায় মকতবের শিক্ষা (প্রাথমিক শিক্ষা) গ্রহণের পর সেখানকার মুহাদ্দেছীন এবং ফকীহদের নিকট হাদীছ এবং ফিকাহ অর্জন করেন। এরপর কাব্য-সাহিত্য এবং আরবদের ইতিহাস (আইয়্যামে আরব) সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করেন। যে সময়ে তিনি হুয়াইল গোত্রের কবিদের কবিতা শুনাতে, তখন এক বুয়ুর্গের পরামর্শ এবং নছীহত অনুযায়ী মদীনা মুনাওয়ারায় ইমাম মালেকের খিদমতে উপস্থিত হন।

তিনি বলেন, ঐ সময়ে যুবাইর পরিবারের জনৈক ব্যক্তির সাথে আমার সাক্ষাৎ হলে তিনি বললেন, এটা আমার নিকট খুবই খারাপ লাগছে যে, তোমার এত মেধা এবং স্মরণশক্তি থাকা সত্ত্বেও তুমি দ্বীনের ফিকাহ থেকে বঞ্চিত থাকবে এবং ধর্মীয় বিষয়ে নেতৃস্থান তোমার অর্জিত হবে না।

আমি বললাম, ফিকাহ অর্জন করার জন্য কার নিকট যাব? তিনি বললেন, তুমি মালেকের নিকট যাও। তিনি বর্তমানে মুসলমানদের নেতা। এরপর আমি নয় রাতে ইমাম মালেকের (রহঃ) মুয়াত্তা মুখস্থ করে নিয়েছি। এরপর মক্কার

আমীর থেকে একটি চিঠি মদীনার আমীর এবং একটি চিঠি ইমাম মালেকের নামে নিয়ে মদীনায় পৌঁছলাম। মদীনার আমীরকে চিঠি দিয়ে বললাম, আপনি এ চিঠিটি কারও মারফতে ইমাম মালেকের নিকট পাঠিয়ে তাকে এখানে ডেকে আনুন এবং আমার ব্যাপারে সুপারিশ করুন। তিনি বললেন, এটা কত ভাল হবে যে আমি নিজেই আপনার সাথে তাঁর খিদমতে উপস্থিত হব এবং তাঁর দরজায় এত দীর্ঘ সময় বসব যে আকীক উপত্যকার ধূলাবালি আমাদের উপর পড়বে এরপর ভিতরে যাবার অনুমতি মিলবে। আছরের পর মদীনার আমীর তার খাদেম এবং অনুচরদেরকে নিয়ে বের হলেন। আমিও সাথে ছিলাম। আমরা সবাই আকীক উপত্যকায় ইমাম সাহেবের বাড়ী গিয়ে পৌঁছলাম এবং অনুমতি চাইলাম। ভিতরে থেকে ইমাম সাহেবের বাঁদী বলল শায়খ বলেছেন যে, যদি আপনারা কোন মাসয়ালা জিজ্ঞেস করতে এসে থাকেন তবে একটি কাগজে লিখে পাঠিয়ে দিন— আমি উত্তর দিয়ে দিব। মদীনার আমীর বললেন, একটি প্রয়োজনীয় ব্যাপারে মক্কার আমীর চিঠি লিখেছেন। এ কথা শুনে বাঁদী ভিতরে গেল। কিছুক্ষণ পর ইমাম সাহেব স্বয়ং বেরিয়ে এলেন। মদীনার আমীর তাঁর হাতে মক্কার আমীরের চিঠি হস্তান্তর করলেন। চিঠি নিয়ে ইমাম সাহেব পড়তে লাগলেন। যখন সুপারিশ লিখা স্থান পড়লেন বললেন, সুবহানাল্লাহ! রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইলম সুপারিশের মাধ্যমে অর্জন করা শুরু হয়ে গেছে।

আমি দেখলাম, মদীনার আমীর ইমাম সাহেবের সাথে কথা বলতে ভয় পাচ্ছেন। তাই নিজেই অগ্রসর হয়ে বললাম, আমি একজন মুত্তালেবী ব্যক্তি। আমার এ ঘটনায় ইমাম সাহেব আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, এরপর নাম জিজ্ঞেস করলেন। আমি বললাম, আমার নাম মুহাম্মদ! ইমাম সাহেব বললেন, হে মুহাম্মদ! আল্লাহকে ভয় কর এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাক। কারণ ভবিষ্যতে তুমি মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তি হবে।

এরপর বললেন, ঠিক আছে আগামীকাল তুমি এসো। সাথে এমন কাউকে নিয়ে এসো যে তোমার জন্য মুয়াত্তা পাঠ করবে। আমি বললাম আমি নিজেই তা পাঠ করব। এরপর থেকে ইমাম সাহেবের দরসী হালকায় উপস্থিত হয়ে মুয়াত্তা পড়তাম এবং কিতাব আমার নিকটই থাকত। কখনও কখনও ইমাম সাহেবের ভয়ে পড়া বন্ধ করে দিলে তিনি পড়ার নির্দেশ দিতেন। এভাবে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই মুয়াত্তা পড়ে নিলাম এবং ইমাম সাহেবের ইত্তিকাল পর্যন্ত মদীনায় ছিলাম।

এ সম্পর্কে মুছইব বিন ছাবেত যুবাইরী থেকে অন্য একটি বর্ণনা রয়েছে। তিনি বলেন, ইমাম শাফেয়ী মদীনায়া আসার পর মসজিদে বসে কবিতা শুনাতেন। একদিন আমার পিতা তাঁকে বললেন, তুমি একজন কুরাইশী হয়েও শুধু এতটুকুতেই কি সন্তুষ্ট যে, তুমি একজন কবি হবে? ইমাম সাহেব বললেন, তবে করব কি? আমার পিতা বললেন, তুমি ইলমে ফিকাহ অর্জন কর। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

من يرد الله به خيرا يفقه في الدين *

অর্থাৎ আল্লাহ যার মঙ্গল চান তাকে দ্বীনের ফিকাহ দান করেন।

এরপর ইমাম সাহেব ইমাম মালেকের (রহঃ) খিদমতে যান এবং তাঁর কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন।

কয়েকদিন পর ইমাম সাহেব আমার পিতা ছাবেত বিন আদিল্লাহ বিন যুবাইরের নিকট বললেন, ইমাম সাহেব বলেন-

امرنا الذى عليه بلدنا و الذى عليه ائمة المسلمين الراشدين المعهدين *

“আমাদের মত সেটাই যার উপর আমাদের শহরবাসী রয়েছে এবং খোলাফায়ে রাশেদীন রয়েছে।” এ কথার মর্ম কি?

আমার পিতা বললেন, ধর্মীয় বিষয়ে মাপকাঠি এবং প্রমাণ হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এরপর হযরত আবু বকর (রাঃ), উমর (রাঃ) এবং উছমান (রাঃ) যাঁদের মৃত্যু এ শহরে হয়েছে। এরপর ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) ইমাম মালেকের (রহঃ) দরসে শরীক হতে লাগলেন।

ইয়ামানে সফর এবং সেখানকার

শাসনকর্তা নিয়োজিত হওয়া

মদীনায়া ইমাম মালেক (রহঃ)-এর দরসগাহ থেকে ইমাম সাহেব ধর্মীয় জ্ঞানে পারদর্শিতা অর্জন করেন। সেখান থেকে মক্কা ফিরে আসলে তাঁর ইলমী এবং দ্বীনি যোগ্যতার প্রসিদ্ধি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ঐ সময় ইয়ামানের আমীর মক্কায়া আগমন করেন। ইমাম সাহেব বলেন, কোরাইশের নেতৃবর্গ ইয়ামানের আমীরের সাথে আলোচনা করলেন, যেন তিনি আমাকে তার সাথে ইয়ামান নিয়ে যান। কিন্তু আমার মায়ের নিকট এই পরিমাণ অর্থ ছিল না যে, কাপড়-চোপড় কিনে সেখানে যাওয়ার প্রস্তুতি নিব। বাধ্য হয়ে মায়ের একটি চাদর ষোল দিনারের বিনিময়ে বন্ধক রেখে সকল সামানের ব্যবস্থা করলাম।

ইয়ামান পৌঁছার পর আমীর সাহেব আমাকে এক এলাকার শাসনকর্তা হিসাবে চাকুরি দেন। আমি খুবই যোগ্যতা এবং দায়িত্ববোধ সহকারে অর্পিত দায়িত্ব পালন করলাম। এতে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে আমার পদোন্নতি করে দিলেন। কিছুদিন পর আবারও পদোন্নতি করে দিলেন। আমি আমার সুচারু কার্যকর্ম দ্বারা যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করলাম। ঐ সময়েই ইয়ামান থেকে একটি দল উমরা করার জন্য মক্কায় আগমন করল। তারা এখানে এসে আমার ভাল আলোচনা করে গেল, যার ফলে মক্কা মুকাররমায় আমার প্রশংসা হতে লাগল।

ইয়ামান থেকে যখন মক্কায় এলাম এবং ইবনে আবি ইয়াহয়ার খিদমতে গিয়ে সালাম দিয়ে বসে পড়লাম, তিনি রুক্ষ ভাষায় আমাকে তিরস্কার করলেন। বললেন, তোমরা আমাদের সবকে বস। আর যখন কারো কোন কাজ মিলে যায় সে তাতে লেগে যায়। তিনি এ ধরনের আরও অনেক কথা বললেন। আমি তার নিকট থেকে চলে এলাম। এরপর সুফিয়ান বিন উয়াইনার নিকট গেলাম। আমি তাকে সালাম করলাম। তিনি হাসিমুখে আমাকে ধন্যবাদ ও সাদর সম্ভাষণ জানালেন। বললেন, আমরা তোমার আমীর হওয়ার সংবাদ পেয়েছি। তুমি সেখানে ইলমে দ্বীনের প্রচার করনি। আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার উপর যে দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল তা তুমি সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন করনি। এখন আর সেখানে যেয়ো না।

ইবনে আবি ইয়াহয়া হতে সুফিয়ান বিন উয়াইনার নসীহত আমার জন্য অধিক কার্যকরী প্রমাণিত হল।

বাগদাদে ইমাম মুহাম্মদের (রহঃ) দরসী মজলিসে

ইয়ামান থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর সুফিয়ান বিন উয়াইনার নসীহত অনুসারে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বাগদাদ গমন করেন। সেখানে ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান শাইবানীর নিকট থেকে ফিকাহ সম্পন্ন করেন। ইমাম মুহাম্মদ ছিলেন ইমাম আবু হানিফার বিশিষ্ট ছাত্র, তাঁর ইলম এবং ফিকাহর মুখপাত্র এবং প্রচারক। ইমাম শাফেঈ বলেন,

ইমাম মালেকের পর ইমাম মুহাম্মদের ওস্তাদ হওয়াটাকে আমি স্বীকার করি।

ইমাম সাহেব ইমাম মুহাম্মদ তাঁর ওস্তাদ হওয়ার এবং তিনি তাঁর শাগরেদ হওয়ার স্বীকারোক্তি করতে গিয়ে বলেন,

* سمعت من محمد بن الحسن رحمة الله وقر بعمر

আমি মুহাম্মদ বিন হাসান থেকে এক উষ্ট্র সম পরিমাণ হাদীছ শবণ করেছি।

তিনি আরও বলেন, মানুষ যদি ইনছাফের দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে তবে মুহাম্মদ বিন হাসানের মত ফকীহ দেখতে পাবে না।

আমি মুহাম্মদ বিন হাসান থেকে এক উষ্ট্র পরিমাণ হাদীছ লিখেছি। যদি তিনি না হতেন তবে ইলম সম্বন্ধে আমার এত জ্ঞান হত না। সমস্ত আহলে ইলম ফিকাহর বিষয়ে ইরাকবাসীদের মুখাপেক্ষী, ইরাকবাসীরা কূফাবাসীর প্রতি মুখাপেক্ষী আর কূফাবাসী আবু হানিফার মুখাপেক্ষী। আমি মুহাম্মদ বিন হাসান হতে অধিক বাগী এবেং অলঙ্কারশাস্ত্র বিশারদ কাউকে দেখিনি। তাঁকে কোরআন তেলাওয়াত করতে শুনলে মনে হত বুঝি কোরআন তাঁর ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। যেসব আলেমকে আমি ইলমী এবং ফিকহী বিষয় সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছি মুহাম্মদ বিন হাসান ব্যতীত অন্য সবার চেহারায় বিতৃষ্ণার ভাব প্রকাশ পেয়েছে। কিতাবুল্লাহ (কোরআন) সম্পর্কে মুহাম্মদ বিন হাসান হতে অধিক জ্ঞানী আমি আর কাউকে দেখিনি। যেন কোরআন তাঁর উপরই নাযিল হয়েছে।

ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান (রহঃ) তাঁর এ যোগ্য শাগরেদের প্রতি শুধু লক্ষ্যই রাখতেন না বরং তার সম্মানও করতেন। ইলমী বিষয়ে সহযোগিতার সাথে সাথে আর্থিক সহযোগিতাও করতেন। আবু উবাইদ বলেন, একবার আমি ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসানের দরসী মজলিসে ইমাম শাফেয়ীকে দেখলাম যে তিনি ইমাম মুহাম্মদকে একটি মাসয়ালা জিজ্ঞেস করলেন। ইমাম মুহাম্মদ উত্তর দিলেন। উত্তরটি ইমাম শাফেয়ীর খুবই পছন্দ হল। তিনি তা লিখে নিলেন। ইমাম মুহাম্মদ ইলমের প্রতি তাঁর এ আগ্রহ দেখে তাকে একশত দিরহাম দিয়ে বললেন, ইলমের প্রতি যদি আগ্রহ থেকে থাকে তবে এখানে থেকে যাও।

এ ঘটনার পর আমি ইমাম শাফেয়ীকে বলতে শুনেছি যদি ইমাম মুহাম্মদ না হতেন তবে ইলমী বিষয়ে আমার যবান (মুখ) খুলত না।

ইমাম সাহেব বলেন, আমি ষাট দিরহাম ব্যয় করে ইমাম মুহাম্মদের কিতাবগুলো সংগ্রহ করেছি এবং সেগুলোর প্রত্যেকটির পার্শ্বে দলীল হিসেবে হাদীছ লিখে নিয়েছি।

আবু হাসান যিয়াদী বর্ণনা করেন, মুহাম্মদ বিন হাসানকে আমি আহলে ইলমের তত সম্মান করতে দেখিনি যতটুকু তিনি শাফেয়ীর সম্মান করতেন।

একদিন মুহাম্মদ বিন হাসান কোথাও যাওয়ার জন্য সওয়ার হয়েছিলেন। ইত্যবসরে ইমাম শাফেয়ী এসে উপস্থিত হলেন। ইমাম মুহাম্মদ তৎক্ষণাৎ তাঁর সফর মূলতবী করে বাড়ী ফিরে এলেন। সারা রাত তাঁর সাথে ছিলেন। এর মধ্যে তৃতীয় কারো ভিতরে আসার অনুমতি ছিল না।

বাগদাদে ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসানের দরসগাহই ছিল ইমাম শাফেয়ীর শেষ শিক্ষা সফর। এখানে অবস্থানকালেই তিনি তাঁর ফিকহী রায় এবং মত সংকলন করেন। এগুলোকেই কওলে কদীম বা পূর্বমত বলা হয়।

কাযী আয়ায লিখেন, ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) ইমাম মালেক (রহঃ) থেকে মুয়াত্তা শ্রবণ করেছেন। এতে ইমাম মালেক অত্যন্ত খুশী হয়েছেন। এরপর ইমাম শাফেয়ী ইরাক গিয়ে মুহাম্মদ বিন হাসানের নিকট অবস্থান করেন। মদীনাবাসীর মাযহাব সম্বন্ধে তাঁর সাথে আলোচনা করেন। ইমাম মুহাম্মদের কিতাবগুলো তিনি লিখে নেন, সেখানেই তিনি তাঁর 'কওলে কদীম' সংকলন করেন যা যাকরানীর কিতাবে উল্লেখ রয়েছে।

বস্তুতঃ বাগদাদ আসার পরই ইমাম শাফেয়ীর ইলমের প্রসিদ্ধি ছড়িয়ে পরে। তাঁর মজলিসে বিপুল মানুষের সমাগম হতে থাকে।

বাগদাদে ইমাম সাহেব থেকে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল এবং

অন্যান্য আহলে ইলমের ইলম গ্রহণ

বাগদাদ অবস্থানকালে প্রত্যেক শ্রেণীর আহলে ইলম তাঁর নিকট থেকে ইলমে দ্বীন আহরণ করেন। ইমাম সাহেব দু'বার বাগদাদ আগমন করেন। প্রথম আগমন হয় ১৯৫ হিজরীতে।

হাসান বিন মুহাম্মদ যাকরানী বর্ণনা করেন, ইমাম সাহেব ১৯৫ হিজরীতে বাগদাদ আগমন করেন। সে সময় তাঁর চুলে খেযাব লাগান ছিল। সেবার দু'বছর আমাদের এখানে অবস্থান করেছিলেন। পরে মক্কায় চলে যান। দ্বিতীয়বার ১৯৮ হিজরীতে বাগদাদে আসেন এবং আমাদের নিকট মাত্র কয়েক মাস অবস্থান করে ফিরে যান। বাগদাদ অবস্থানকালে তাঁর দরসী মজলিসে সাহিত্যিক এবং লিখকগণ উপস্থিত হয়ে তাঁর নিকট হতে ফাছাহাত এবং ালাগাত অর্জন করতেন। সে সময়ে তাঁর মত আলেম কোথাও দৃষ্টিগোচর হয়নি।

আবুল ফযল যাজ্জাজ বলেন, ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) যখন বাগদাদ আগমন

করেন, তখন জামে মসজিদে চল্লিশ পঞ্চাশটি ইলমী এবং দরসী হালকা বসত। ইমাম সাহেব প্রতিটি হালকাতে বসে বলতেন **قال الله** এবং **قال الرسول** আর তারা বলতেন **قال اصحابنا**। ফল এই হল যে, কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর হালকা ব্যতীত অন্য কোন হালকা বাকী রইল না। ইমাম সাহেব স্বয়ং বলেন, বাগদাদে আমি **ناصر الحديث** (হাদীছের সহায়ক) উপাধিতে প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম।

ইমাম সাহেবের বাগদাদ অবস্থানকালে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বড়ই আদব সম্মান সহকারে তাঁর খেদমতে গিয়ে ইলম হাছিল করতেন। একবার ইয়াহয়া বিন ময়ীন ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের পুত্র ছালেহকে বললেন, আপনার পিতার কি লজ্জা করে না? আমি তাকে এ অবস্থায় দেখেছি যে, শাফেয়ী উপরে বসে চলেছেন আর আপনার পিতা তাঁর ঘোড়ার রিকাব (পা রাখার স্থান) ধরে পায়ে হেঁটে চলছেন। ইয়াহয়া বিন ময়ীনের এ কথাটি ছালেহ তার পিতাকে বললে তিনি বললেন, তাকে বলে দাও যে, আপনি যদি ফকীহ হতে চান তবে শাফেয়ীর সাওয়ারীর অন্য রিকাব ধরুন।

অন্য এক বর্ণনামতে ছালেহ বলেন, ইমাম শাফেয়ীর সাওয়ারীর সাথে আমার পিতাকে যেতে দেখে ইয়াহয়া বিন ময়ীন এ বলে পাঠালেন যে, হে আবু আব্দিল্লাহ! আপনি শাফেয়ীর সাওয়ারীর সাথে চলতে পছন্দ করেন? আমার পিতা উত্তরে বললেন, আবু যাকারিয়া! আপনি যদি তার বাম পাশ দিয়ে চলতেন তবে অধিক উপকৃত হতেন।

হাসান বিন মুহাম্মদ যাকারানী বলেন, ইমাম সাহেব বাগদাদ আগমন করলে আমরা ছয়জন শিক্ষার্থী তাঁর নিকট আসা-যাওয়া করতে লাগলাম। আহমদ বিন হাম্বল, আবু ছত্তর, হারেছ নাক্কাল, আবু আব্দির রহমান শাফেয়ী, আমি এবং অন্য একজন শিক্ষার্থী। আমরা যে কিতাবই ইমাম শাফেয়ীর নিকট পড়তাম আহমদ বিন হাম্বল উপস্থিত থাকতেন।

কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষক

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) মক্কা মুকাররমা, মদীনা মুনাওয়ারা এবং বাগদাদে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তিনি তৎকালীন প্রসিদ্ধ উলামায়ে কিরাম থেকে দ্বীন এবং ইলম অর্জন করেন। তন্মধ্যে বিশিষ্ট কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হচ্ছে—

পিতৃব্য মুহাম্মদ বিন আলী বিন শাফে, মুসলিম বিন খালেদ যজ্জী, মালেক বিন আনাস, সুফিয়ান বিন উয়াইনা, ইব্রাহীম বিন সাদ, সায়ীদ বিন সালেম আলকাররাহ, আব্দুল ওহ্‌হাব বিন আব্দিল মজীদ ছকফী, ইসমাঈল বিন

উলাইয়্যা, আবু দমরা, হাতেম বিন ইসমাইল, ইব্রাহীম বিন মুহাম্মদ বিন আবি ইয়াহয়া, ইসমাইল বিন জাফর, মুহাম্মদ বিন খালেদ জুনী, উমর বিন মুহাম্মদ বিন আলী বিন শাফে, আব্তাফ বিন খালেদ মাখযুমী, হিশাম বিন ইউসুফ ছনআনী, আব্দুল আযীয বিন আবি সালমা মাজেশুনী, ইয়াহয়া বিন হাস্‌সান, মারওয়ান বিন মু'আবিয়া, মুহাম্মদ বিন ইসমাইল, ইবনে আবি ফুদাইক, ইবনে আবি মাসলামা, কানাবী, ফুযাইল বিন আয়ায, মুহাম্মদ বিন হাসান শায়বানী, দাউদ বিন আদ্রির রহমান, আব্দুল আযীয বিন মুহাম্মদ দারাওরদী, আব্দুর রহমান বিন আবি বকর মুলাইকা, আব্দুল্লাহ বিন মুআম্মল মাখযুমী, ইব্রাহীম বিন আদ্রিল আযীয বিন আবি মাহযুরা, আব্দুল মজীদ বিন আদ্রিল আযীয বিন আবি রাদ্দাদ, মুহাম্মদ বিন উছমান বিন ছফওয়ান জুমাহী, ইসমাইল বিন জাফর, মুতাররাফ বিন মায়েন, হিশাম বিন ইউসুফ, ইয়াহয়া আবি হাস্‌সান তিন্নিসী প্রমুখ।

কয়েকজন শিক্ষকের সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখ করা হচ্ছে—

ইসমাইল বিন কুসতুনতীন মক্কী (রহঃ)

মক্কা মুকাররমায় সাত বছর বয়সে ইমাম সাহেব কোরআন হিফজ করেন এবং তাজবীদ শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর শিক্ষক ছিলেন সেখানকার প্রসিদ্ধ কারী ইসমাইল বিন আদ্রিল্লাহ বিন কুসতুনতীন মক্কী। তিনি বনী মখযুমের গোলাম ছিলেন। তিনি কসত উপাধিতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। নব্বই বছর বয়সে মারা যান। তিনি ইবনে কাছীরের সর্বশেষ শাগরেদ ছিলেন।

মুহাম্মদ বিন আলী বিন শাফে মক্কী (রহঃ)

মুহাম্মদ বিন আলী বিন শাফে বিন সায়েব বিন উবাইদ মুত্তালেবী মক্কী, ইমাম সাহেবের চাচা ছিলেন। তিনি আব্দুল্লাহ বিন আলী বিন সায়েব বিন উবাইদ এবং ইবনে শিহাব যুহরী থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। ইমাম সাহেব মক্কায় অবস্থানকালে তাঁর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। তার নিকট হতে ইব্রাহীম বিন মুহাম্মদ শাফেয়ী, হাসান বিন মুহাম্মদ বিন আযুন এবং ইউনুস বিন মুহাম্মদ মুআদ্দিব হাদীছ রেওয়ায়েত করেন। তিনি নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দীছ ছিলেন।

মুসলিম বিন খালেদ যঞ্জী ফকীহ মক্কী (রহঃ)

ইমাম সাহেবের মক্কী উস্তাদ এবং শায়খদের মধ্যে আবু খালেদ মুসলিম বিন খালেদ বিন ফারওয়াহ যঞ্জী মাখযুমী (মৃত্যু ১৮১ হিঃ) মক্কার ফকীহ এবং

শায়খ হরম (হরমের শায়খ) ছিলেন। তিনি যায়দ বিন আসলাম, আলাউদ্দিন বিন আদ্রির রহমান, মুহাম্মদ বিন শিহাব যুহরী প্রমুখ থেকে হাদীছ রেওয়াজেত করেন। তিনি ফকীহে মক্কা আব্দুল মালেক বিন আদ্রিল আযীয বিন জুরাইজের খিদমতে দীর্ঘদিন থেকে তাঁর নিকট হতে ফিকাহ এবং ফতোয়া শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি আবেদ এবং যাহেদ ছিলেন। তিনি ছায়েমুদ্দাহর অর্থাৎ সর্বদা রোযা পালনকারী ছিলেন। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) তার নিকট থেকেই ফিকাহ অর্জন করেন এবং তাঁরই অনুমতিতে ইফতার আসনে আসীন হন। ইবনে হজর লিখেন, ইমাম মালেকের শিষ্যত্ব গ্রহণের পূর্বে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) তাঁর নিকট থেকে ফিকাহ শিক্ষা লাভ করেন।

শামসুদ্দীন দাউদী (রহঃ) লিখেন, মুসলিম যঞ্জী প্রমুখ থেকে ইমাম শাফেয়ী ফিকাহর শিক্ষা লাভ করেন।

ইমাম যাহবী লিখেন,

و هو الذى اذن للشافعى فى الافتاء *

মুসলিম যঞ্জীই ইমাম শাফেয়ীকে ফতোয়া দেওয়ার অনুমতি দেন।

সামআনী লিখেন, মুসলিম যঞ্জী থেকে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) ইলমে হাদীছ এবং ফিকাহ শিক্ষা গ্রহণ করেন। ইমাম মালেকের সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার পূর্বে তিনি তাঁর হালকাতেই অংশ গ্রহন করতেন।

ইব্রাহীম বিন আবু ইয়াহয়া আসলামী মাদানী

আবু ইসহাক ইব্রাহীম বিন মুহাম্মদ বিন আবি ইয়াহয়া সামআনী আসলামী মাদানীও ইমাম সাহেবের একজন মাদানী শায়খ ছিলেন। তিনি ইমাম মালেক (রহঃ)-এর মুয়াত্তা হতে কয়েকগুণ বড় একটি কিতাব কিতাবুল মুয়াত্তা লিখেন। মুহাদ্দিছদের নিকট তিনি সন্দেহযুক্ত। ইবনে হাব্বান বলেন, শিক্ষা জীবনের প্রথম ভাগে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) ইব্রাহীমের দরসে অংশগ্রহণ করতেন।

মুহাদ্দিছ সাজী (রহঃ) বলেন,

لم يخرج الشافعى عنه حديثا فى الفرض و انما اخرج عنه فى الفضائل *

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) তার নিকট হতে ফরযের সাথে সম্পৃক্ত কোন হাদীছ গ্রহণ করেননি। তবে ফাযায়েলের বিষয়ে গ্রহণ করেছেন।

সুফিয়ান বিন উয়াইনা মক্কী (রহঃ)

ইমাম সাহেবের মক্কী শায়খদের মধ্যে 'মুহাদ্দিছুল হরম' সুফিয়ান বিন উয়াইনা (মৃত্যু ১৯৮ হিঃ) একজন উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে ইমাম সাহেব বলেন,

* لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهب علم الحجاز

যদি মালেক এবং সুফিয়ান বিন উয়াইনা না হতেন তবে হিজায় থেকে ইলম চলে যেত।

তিনি আরও বলেন, তিনি হিজায়ের হাদীছ সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় আলেম ছিলেন। তাঁর চেয়ে হাদীছের উত্তম ব্যাখ্যাকারী আমি কাউকে দেখিনি। আমি ত্রিশটি হাদীছ ব্যতীত আহকাম সম্পর্কিত সমস্ত হাদীছ ইমাম মালেকের নিকট পেয়েছি। সে ত্রিশটির ছয়টি হাদীছ ব্যতীত সবকয়টি হাদীছ সুফিয়ান বিন উয়াইনার নিকট পেয়েছি।

ইমাম মালেক বিন আনাস

ইমাম দারুল হিজরত মালেক বিন আনাস আছবাহী (মৃত্যু ১৭৯ হিঃ) ইমাম শাফেয়ীর সর্বপ্রধান মাদানী শিক্ষক ছিলেন। তিনি তাঁর নিকট হতে অনেক জ্ঞান লাভ করেছেন।

তিনি বলেন, উলামায়ে কিরামদের মধ্যে মালেক (রহঃ) উজ্বল তারকাসদৃশ। ইমাম মালেক (রহঃ)-এর মুয়াত্তা হতে অধিক নির্ভুল কিতাব আর দ্বিতীয়টি নেই। যদি ইমাম মালেক এবং সুফিয়ান বিন উয়াইনা না হতেন তবে হিজায় থেকে ইলমে দ্বীন শেষ হয়ে যেত। যদি কোন হাদীছ সম্বন্ধে তাঁর কোন সন্দেহ হত তবে পুরো হাদীছটাই বাদ দিয়ে দিতেন। মক্কায় অবস্থানকালে যুবা বয়সে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি মুয়াত্তা সম্পূর্ণটা মুখস্থ করে নেন। পরে মদীনায় গিয়ে ইমাম মালেকের সামনে তা পড়ে শুনান।

মুহাম্মদ বিন হাসান শায়বানী

ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান শায়বানী কূফী (মৃত্যু ১৮৯ হিঃ) ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর বাগদাদের উস্তাদ ছিলেন। তিনি ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর অল্প বয়স্ক শিষ্য ছিলেন। তিনি ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম মালেক (রহঃ)

থেকেও শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর শিক্ষক ছিলেন। আবার ছাত্রভাইও ছিলেন। তিনি ফিকাহ এবং হাদীছ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন। পূর্বের বর্ণনায় ছাত্র-উস্তাদের সম্পর্ক কিরূপ ছিল তা আলোচিত হয়েছে।

ইসমাঈল বিন উলাইয়্যা বছরী বাগদাদী

রায়হানাতুল কাযা ওয়াল মুহাদ্দেহীন আবু বিশর ইসমাঈল বিন ইব্রাহীম বিন মেকসাম আসাদী বছরী (মৃত্যু ১৯৪ হিঃ) ইমাম শাফেয়ীর বিশিষ্ট শিক্ষক ছিলেন। তাকে তার মায়ের সাথে সম্পর্কিত করে ইবনে উলাইয়্যা বলা হত। এ কুনিয়াতেই তিনি পরিচিত হন। তাঁর দাদা মেকসাম ছিলেন। সিন্দের কায়কান এলাকার অধিবাসী। তাকে যুদ্ধবন্দী করে আরব নিয়ে যাওয়া হয়। তবকাতে ইবনে সাদে এরূপই বর্ণিত রয়েছে।

যৌবনেই বহু গুণের সমাবেশ

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) অল্প বয়সেই ফিকাহ, ফতোয়া, হাদীছ, তাফসীর, স্বপ্নের ব্যাখ্যা, আরব ইতিহাস, আরবী কবিতা, আরবী ব্যাকরণ এবং ভাষা, তীর নিক্ষেপ, ঘোড়সওয়ার ইত্যাদি বিষয়ে বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। শিক্ষক-শায়খ এবং সমসাময়িকগণ তাঁর ইলম এবং যোগ্যতার স্বীকৃতি দিয়েছেন। বিশ বছরেরও কম বয়সে মুসলিম বিন খালেদ যঞ্জী হতে ফতোয়া দানের অনুমতিপ্রাপ্ত হন। আব্দুর রহমান দৃঢ়তার সাথে বলেন, ইমাম শাফেয়ী জ্ঞানী এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন যুবক। বশীর মুরাইসী (রহঃ) হজ্জ থেকে বাগদাদ গিয়ে বন্ধু বান্ধবদেরকে বলেন, আমি মক্কায় একজন কুরাইশী যুবক দেখেছি। তাঁর যোগ্যতায় আমি বিস্মিত হয়েছি। কুরাইশী যুবক বলতে ইমাম শাফেয়ীকে বুঝিয়েছেন।

আরবী ভাষা এবং কবিতার প্রসিদ্ধ আলেম আছমায়ী (রহঃ) বর্ণনা করেন, আমি গ্রাম্য কবিদের কবিতার সংশোধন কুরাইশ যুবক থেকে করেছি। যাকে মুহাম্মদ বিন ইদ্রিস বলা হয়। সুফিয়ান বিন উয়াইনা বলতেন, শাফেয়ী সমকালীন যুবকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যখন তাঁর নিকট তফসীর অথবা স্বপ্ন সম্পর্কিত কোন প্রশ্ন আসত তিনি বলতেন, ঐ যুবক অর্থাৎ শাফেয়ী থেকে জেনে নাও।

আব্দুর রহমান বিন মাহদী ইমাম শাফেয়ীকে তার যুবাকালে লিখলেন যে, আপনি আমার জন্য এমন একটি কিতাব লিখুন যেখানে হাদীছের সমস্ত বিষয় ইজমা, এবং কিতাব ও সুন্নাহর নাসেখ-মনসুখ বর্ণিত থাকবে, তখন ইমাম শাফেয়ী তাঁর প্রসিদ্ধ কিতাব 'আর-রিসালা' লিখেন।

মিশর সফর এবং ইবনে আব্দিল হাকীমের সাথে বিশেষ সম্পর্ক

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) ১৯৫ হিজরীতে প্রথমবার বাগদাদ ভ্রমণ করেন। সেখানে দু' বছর অবস্থান করে মক্কায় ফিরে আসেন। এরপর দ্বিতীয়বার ১৯৮ হিজরীতে তথায় গমন করেন সেখানে কয়েকমাস অবস্থান করে ১৯৯ হিজরী অথবা ২০১ হিজরীতে মিশর গমন করেন। বাকী জীবন সেখানেই কাটান এবং সেখানেই ইন্তেকাল করেন। এর মাঝে গাযা গিয়েছিলেন বলেও প্রমাণ রয়েছে।

ইবনে নদীম লিখেন, ইমাম সাহেব ২০০ হিজরীতে মিশর গমন করেন। সেখানে যাওয়ার সময় তিনি এই কবিতাটি পড়েন—

أخى أرى نفسى تتوق الى مصر + و من دونها المغاوير و الفقر
فوالله ما أدرى الحفظ الغنى + اساق اليها ام اساق الى قبر

ভাই আমার মন মিশর যেতে খুবই আগ্রহী। অথচ এ সফর বড়ই কষ্টসাধ্য। খোদার কসম! আমার জানা নেই যে, শান্তি এবং ধনের আশায় সেখানে যাওয়া হচ্ছে, না কবরে যাওয়ার জন্য।

ইমাম সাহেবের উভয় কথাই সেখানে প্রকাশ পেয়েছিল। সেখানে যাওয়ার পর তিনি ধনবানও হন এবং সেখানে মৃত্যুবরণও করেন।

সায়ীদ বিন আব্দিল্লাহ বিন আব্দিল হাকাম বর্ণনা করেন, ইমাম শাফেয়ী আমাদের এখানে আসার পর বেশ আর্থিক সংকটে ছিলেন। আমার ভাই মুহাম্মদ বিভিন্ন ধনীদের নিকট থেকে পাঁচশ দীনার সংগ্রহ করেন। আমার পিতাও পাঁচশ দীনার দান করেন। এভাবে এক হাজার দীনার ইমাম সাহেবের খিদমতে পেশ করা হয়। অন্য এক বর্ণনামতে, আব্দুল্লাহ বিন আব্দিল হাকাম নিজে এক হাজার দীনার দেন এবং বন্ধু-বান্ধবদের নিকট থেকে দু'হাজার দীনার সংগ্রহ করে মোট তিন হাজার দীনার তাঁর খিদমতে পেশ করেন। মিশরে ইবনে আব্দিল হাকামের সাথে ইমাম সাহেবের বিশেষ সম্পর্ক ছিল। এমন কি ইমাম সাহেব তাদের ওখানেই ইন্তেকাল করেন।

প্রত্যহ সকালে তিনি তাঁর নিকট যেতেন। তিনি অন্য কোথাও থাকলে জিজ্ঞেস করে সেখানে যেতেন।

আব্দুল্লাহ বিন আব্দিল হাকাম মিশরের প্রসিদ্ধ আলিম ছিলেন। তিনি মালেকী মাযহাবের ইমাম ছিলেন, তাঁর পুত্র মুহাম্মদ বিন মালেকের কিতাব

থেকে দু' খণ্ড নিয়ে যেতেন। পরদিন সেগুলো ফেরৎ দিয়ে অন্য দু' খণ্ড নিতেন।

ইবনে আদিল বারবার বর্ণনা করেন, আব্দুল্লাহ বিন আদিল হাকাম এবং তাঁর উভয় পুত্র ইমাম শাফেয়ী হতে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাঁর কিতাব লিখেছেন এবং আপন পুত্র মুহাম্মদকে তাঁর সোপর্দ করে দিয়েছিলেন।

মুহাম্মদ বিন আদিল্লাহ বর্ণনা করেন, যখন আমি ইমাম সাহেবের নিকট অধিক আসা-যাওয়া করতে লাগলাম, মালেকী মাযহাবের উলামাগণ আমার পিতার নিকট সমবেত হয়ে বললেন, আবু মুহাম্মদ! আপনার ছেলে মুহাম্মদ ঐ ব্যক্তির (শাফেয়ীর) নিকট আসা-যাওয়া করে এবং তার সাথে বেশ সম্পর্ক করে নিয়েছে। লোকেরা ধারণা করছে, মালেকী মাযহাবের প্রতি অনীহা হওয়ার কারণে সে এরূপ করছে। তাদের কথা শুনে আমার পিতা তাদেরকে নম্রভাবে বুঝালেন, বললেন, এ ছেলে এখনও যুবক। উলামাদের বিভিন্ন মত জানার এবং সেগুলো নিয়ে গবেষণা করার আগ্রহ রয়েছে। আর আমাকে একাকী বললেন, বেটা, তুমি তাঁর নিকট আসা-যাওয়া কর এবং তাঁর সঙ্গে থাক। যদি কখনও এ শহরের বাইরে যাও এবং আশহাবের রেওয়াজে ইমাম মালেকের কোন মত বর্ণনা কর তবে জিজ্ঞেস করা হবে আশাহাব কে?

এরপর আমি ইমাম শাফেয়ীর সঙ্গে আমার উপর বাধ্যতামূলক করে নিয়েছি। পিতার কথা স্মরণ রেখেছি। যখন মিশর থেকে ইরাকে গেলাম, সেখানকার কাযী কোন একটি মাসয়ালা নিয়ে আলোচনা করছিলেন। তখন কথা প্রসঙ্গে বললাম, আশাহাব মালেক হতে বর্ণনা করেছেন। জিজ্ঞেস করলেন, আশাহাব কে? এ কথা বলে উপস্থিত ব্যক্তিদের প্রতি লক্ষ্য করলেন। তাদের একজন বলল, এ ব্যক্তির আশাহাব এবং আবলাক সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নেই।

ইমাম সাহেবও তাঁর এ প্রিয় ছাত্রকে স্নেহ করতেন এবং ভালবাসতেন। মুযনী বর্ণনা করেন, আমরা ইমাম শাফেয়ী থেকে হাদীছ শ্রবণ করার জন্য গেলে প্রথমে তাঁর দরজায় বসে থাকতাম পরে ভিতরে যাওয়ার অনুমতি मिलত। আর মুহাম্মদ বিন আদিল্লাহ বিন আদিল হাকাম আসলে উপরে উঠে যেতেন এবং দীর্ঘক্ষণ তাঁর নিকট থাকতেন। কখনও কখনও তাঁর সাথে খানা খেয়ে নিতেন। এরপর ইমাম সাহেব নীচে এসে আমাদেরকে পড়াতেন। পড়া শেষে মুহাম্মদ বিন আদিল্লাহ তার সওয়ালীর উপর বসে যেতে থাকলে ইমাম সাহেব দীর্ঘক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকতেন এবং আকাঙ্ক্ষা করতেন, আমারও যদি এমন একটা ছেলে হত! ইমাম সাহেব তার বাড়ীতেও যেতেন। তার ভাই সায়ীদ বিন আদিল্লাহ বর্ণনা করেন, অনেক সময় ইমাম সাহেব সওয়াল হয়ে আমাদের

এখানে আসতেন এবং আমাকে বলতেন- মুহাম্মদকে ডাক। আমি তাকে নিয়ে এলে তিনি তার সাথে যেতেন এবং দীর্ঘক্ষণ থাকতেন এবং সেখানেই দুপুরের বিশ্রাম করতেন।

আকওয়ালে কাদীমা (পূর্বমত) এবং আকওয়ালেজাদীদা (পরবর্তী মত) এর রাবী

ইমাম সাহেবের ইলম তিনটি প্রধান শহরে প্রসার লাভ করে- মক্কা, বাগদাদ, এবং মিশর। তিনটি শহরেই তাঁর দরসী মজলিস কায়েম হয়। বাগদাদে ইমাম সাহেবের দু'বছর কয়েক মাস অবস্থানকালে সেখানকার আহলে ইলমগণ তাঁর নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি মিশরে চার, পাঁচ অথবা ছয় বৎসর অবস্থান করেন। এ সময়ের মধ্যে মিশরীয়রা ইমাম সাহেব থেকে এভাবে শিক্ষা লাভ করেন যে, তারা তাঁর ইলম এবং ফিকাহর প্রচারক এবং প্রসারক হন। বাগদাদে ইমাম সাহেব যে সমস্ত ফিকহী মত এবং রায় প্রদান করেছেন সেগুলোকে আকওয়ালে কাদীমা বলা হয়। তাঁর চারজন শাগরেদ থেকে সেগুলো বর্ণিত রয়েছে। ১। আবু আলী হাসান বিন মুহাম্মদ যাকরানী ২। আবু ছত্তর ইব্রাহীম বিন খালেদ ৩। আহমদ বিন হাম্বল ৪। হুসাইন বিন আলী কারাবেসী। আর মিশরে তিনি যে সমস্ত রায় এবং মত প্রদান করেছেন সেগুলোকে আকওয়ালে জাদীদা বলা হয়। সেগুলো ছয়জন রাবী থেকে বর্ণিত রয়েছে। ১। আবু ইব্রাহীম ইসমাঈল বিন ইয়াহয়া মুযানী ২। আবু মুহাম্মদ বিন সুলাইমান মরাভী ৩। আবু মুহাম্মদ রবী বিন সুলাইমান বিন দাউদ জীযী ৪। আবু ইয়াকুব ইউসুফ বিন ইয়াহয়া বুওয়াইতি। ৫। আবু হাফছ হারমালা বিন ইয়াহয়া ৬। আবু মুসা ইউনুস বিন আদিল আলা।

ইমাম সাহেবের ফেকহী মাযহাব

ইমাম সাহেবের সময় হাদীছ, ফিকাহ এবং ফতোয়ার দু'টি প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল হিজায় এবং ইরাক। এ উভয়টির মধ্যে কিছুটা পার্থক্য ছিল। ইমাম সাহেব এ উভয় কেন্দ্র থেকেই শিক্ষালাভ করেন এবং হিজায় মক্কার উলামায়ে কিরাম থেকে তার দলীল প্রমাণ সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবগতি লাভ করেন। তিনি মক্কা মুকাররমায় ইমাম মুসলিম বিন খালেদ যঞ্জী থেকে ফিকাহ শিক্ষা লাভ করেন। যিনি ছিলেন ইবনে জুরাইজের শাগরেদ আতা বিন আবি রাবাহ এর ফিকাহর প্রচারক এবং প্রসারক। মদীনায় তিনি ইমাম মালেক থেকে শিক্ষা লাভ করেন যিনি ছিলেন মদীনাবাসীর ইলম এবং জ্ঞানের তরজুমান ব্যাখ্যাকারী। এরপর

বাগদাদ গিয়ে ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান শায়বানীর শিষ্যত্বের সৌভাগ্য অর্জন করেন। যিনি ইমাম আবু হানিফার ফিকাহর তরজুমান হবার সাথে সাথে ইমাম মালেক থেকেও শিক্ষা লাভ করেছিলেন। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) ইমাম মালেক এবং ইমাম মুহাম্মদকে স্বীয় উস্তাদ এবং মুআল্লিম স্বীকার করতেন। বিশেষ করে ইমাম মালেকের মতকে অগ্রাধিকার দিতেন এবং তাঁর মত এবং রায় অনুসারে আমল করতেন। অবশ্য সে সময়ে যেমনিভাবে অন্যান্য শায়খদের সাথে তাদের শিষ্যদের মতভেদ হত, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেকের সাথে মতভেদ ছিল। এতে লোকেরা তাকে প্রশ্ন করলে তিনি এ সম্পর্কে এক কিতাব রচনা করেন।

আবু ইসহাক সিরায়ী বলেন, এ মতভেদ সত্ত্বেও আমরা ইমাম শাফেয়ীকে ইমাম মালেকের সঙ্গী মনে করতাম। ইমাম মালেকের সাথে ইমাম শাফেয়ীর যে পরিমাণ মতভেদ রয়েছে সেগুলো গণনা করলে দেখা যাবে- ইমাম মালেকের শিষ্য এবং সঙ্গী আব্দুল মালেক এবং অন্যান্যদের তাঁর সাথে যে মতভেদ রয়েছে ইমাম শাফেয়ীর মতভেদ সংখ্যা এর চেয়ে কমই হবে।

অন্য একজন আলেম বলেন, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম মালেকের মধ্যে যে মতভেদ রয়েছে তা ইমাম আবু ইউসুফ এবং ইমাম আবু হানিফার মধ্যকার মতভেদের চেয়ে কম।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) ফিকাহর বিষয়ে হিজ্জায় এবং ইরাকের ফিকাহবিদগণের মৌলিক এবং শাখা নীতিগুলোকে সামনে রেখে মধ্যপন্থা অবলম্বন করেন। তিনি কোরআনের প্রকাশ্য অর্থকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করতেন; যদি না এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় যে প্রকাশ্য অর্থ উদ্দেশ্য নয়। এরপর তিনি সুন্নাতে রাসূল থেকে দলীল গ্রহণ করতেন। এমন কি তিনি খবরে ওয়াহেদ দ্বারা প্রমাণিত নির্দেশকেও করণীয় বলতেন। যদিও তার বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য না হয়। তিনি ইমাম মালেকের মত মদীনাবাসীর তাআমূল বা কার্যধারাকে হাদীছে উল্লেখিত নির্দেশের সমর্থক হিসেবে গ্রহণ করতেন। এরপর তিনি ইজমাকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করতেন, যে পর্যন্ত না তার বিপরীত কিছু জানা যায়। তার ধারণায় পৃথিবীর সবাই কোন বিষয়ে একমত হওয়া অসম্ভব। এরপর কিয়াস অনুসারে আমল করতেন, যার সমর্থন কোরআন হাদীছে পাওয়া যেত।

ফকীহ, মুফতি এবং কাযীর জন্য ইমাম সাহেবের যে গুণাবলীর কথা উল্লেখ করেছেন এতে তার ফিকহী মতবাদ স্পষ্ট হয়ে উঠে। তিনি বলেন,

ان القاضى و المفتى لا يجوز ان يقضى او يفتى حتى يكون عالما بالكتاب و
ما قال اهل التاويل فى تاويله و عالما بالسنن و الاثار و عالما باختلاف العلماء حسن
النظر صحيح الاور و رعا، مشاورا فيما شئته عليه *

একজন কাযীর জন্য ফয়সালা করা বা একজন মুফতির জন্য ফতোয়া দেয়া তখনই জায়েয হবে যখন সে কোরআন এবং এর ব্যাখ্যা সম্বন্ধে সম্যক অবগত থাকে। সুনান এবং আছার সম্বন্ধে তার জ্ঞান থাকে, উলামাদের মতভেদ সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকে। সঠিক মেধা এবং দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন হয়, মুত্তাকী হয় এবং সন্দেহযুক্ত মাসয়ালার পরামর্শ করে।

ছাহাবাদের মতভেদ সম্বন্ধে ইমাম সাহেব বলেন, সেগুলোর যেটা কোরআন, সুন্নাহ, ইজমা বা কিয়াসের অনুরূপ হয় আমি সেটা গ্রহণ করি। তাদের কারো মত শুধুমাত্র তখনই গ্রহণ করি যখন সে সম্পর্কে কোরআন, হাদীছ অথবা ইজমা বা দলীলে কোন নির্দেশ না পাই।

ফতোয়া দেয়ার অনুমতি লাভ

ইমাম মালেক (রহঃ) ও মদীনার অন্যান্য আলেমবর্গ ইমাম শাফেয়ীকে চৌদ্দ পনের বৎসর বয়সেই ফতোয়া দানের অনুমতি দান করেন। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) মক্কা হতে ফিরার পথে তাঁর মক্কা শরীফের উস্তাদ মুসলিম বিন খালিদ জাজ্জীও তাকে ফতোয়া দেয়ার অনুমতি দান করেন।

ইমাম সুফিয়ান বিন উয়াইনা (রহঃ) ইমাম যুহরীর অতি প্রিয় ছাত্র ছিলেন। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) তাঁর নিকট হতেও অনেক জ্ঞান অর্জন করেন।

ইমাম সুফিয়ান বিন উয়াইনা ইমাম শাফেয়ীকে কয়েক বৎসর যাবৎ ফিকাহ, হাদীছ এবং তফসীরের শিক্ষা দান করেন। একবার তিনি তাকে প্রশ্ন করলেন, হে শাফেয়ী! ইমাম যুহরী হতে বর্ণিত হাদীছ এরূপ রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মুল মুমেনীন হযরত ছফীয়াসহ মসজিদে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে দু'জন লোকের সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, আমাদের সঙ্গে আমার বিবি উম্মুল মুমিনীন ছফীয়া। আবার তিনি একথাও বললেন যে, শয়তান রক্তের ন্যায় মানুষের রগ ও শিরায় চলাচল করে। এখন তোমার নিকট প্রশ্ন এই যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এসব বলার উদ্দেশ্য কি ছিল?

ইমাম শাফেয়ী বললেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরূপ

বলার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, তাদের মনে যেন এরূপ ধারণার সৃষ্টি না হতে পারে যে, একজন স্ত্রীলোক কিভাবে একজন নবীর সাথী হতে পারে?

অথবা এতে শয়তানের কুমন্ত্রণায় পড়ে তাদের মনে খারাপ ধারণার উদয় হতে পারে। সেসব চিন্তা করেই রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বপ্রথমেই পরিস্কার করে দিলেন যেন তাদের মনে কোনরূপ মন্দ ধারণাই জন্মিতে না পারে। আর অন্যদের জন্য এতে অনেক উপদেশ রয়েছে।

অথবা রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ সমস্ত বলার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, তিনি নবী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর প্রতি মন্দ ধারণা সৃষ্টি হতে পারত। কাজেই প্রত্যেক মানুষের সর্বদা এরূপ সাবধান থাকা উচিত যেন তাঁর প্রতি কারো পক্ষে কোনরূপ অপবাদ দেওয়ার সুযোগ না ঘটে। কারণ শয়তান রক্তের ন্যায় মানুষের শিরা উপশিরায় চলাচল করে।

সুফিয়ান বিন উয়াইনা (রহঃ) বললেন, আল্লাহ তাআলা তোমাকে পুরস্কৃত করুন। তোমার জবাবে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। এখন থেকে তুমি ফতোয়া দিতে পারবে।

জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা

কাজী ইয়াহয়া বিন আকসাম বলেন, ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর চেয়ে অধিক বুদ্ধিমান আমি আর কাউকে দেখি নাই।

ইমাম মুয়ানী বলেন, অর্ধজগতের লোকের বুদ্ধি এক পাল্লায় রেখে অপর পাল্লায় ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর বুদ্ধি রাখা হলে তাঁর বুদ্ধির পাল্লাই ভারী হবে।

ইমাম মালেক (রহঃ) বলেছেন, আমার নিকট যত ছাত্র শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছে তন্মধ্যে শাফেয়ীর চেয়ে অধিক মেধাবী এবং সমঝদার আমি আর কাউকে পাইনি।

স্বয়ং ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন, ইমাম মালেক বড় স্নেহ এবং আগ্রহ সহকারে আমাকে তাঁর সম্মুখে কিতাব পাঠ করতে দিতেন। তিনি আমাকে কিতাব পাঠ করে যেতে আদেশ করতেন। আমি পড়ে চুপ করলে তিনি বলতেন না তোমাকে আরো পড়তে হবে। আমার পাঠ-পদ্ধতি এবং বুঝবার ও বুঝাবার পন্থাকে তিনি অত্যন্ত পছন্দ করতেন।

আবু উবাইদ বলেন, ইমাম মালেক (রহঃ) ইমাম শাফেয়ীর তেজস্বিতা স্পষ্টবাদিতায় মুগ্ধ ছিলেন।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের সাথে জটনক বুয়ুর্গ হজে যান। তাঁরা উভয়ই একই স্থানে অবস্থান করছিলেন। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) প্রভাতে উঠে নীরবে হরম শরীফে চলে যান। তাঁর সঙ্গী বুয়ুর্গ ব্যক্তি ধারণা করলেন যে, তিনি সম্ভবতঃ সুফিয়ান বিন উয়াইনার শিক্ষা মজলিসে যোগদান করে থাকবেন। তিনি হরম শরীফে গিয়ে তাঁকে সুফিয়ান বিন উয়াইনার শিক্ষা মজলিসে খোঁজ করলেন। কিন্তু তাঁকে সেখানে পেলেন না। অন্যান্য সম্ভাব্য শিক্ষা মজলিসেও অনুসন্ধান করলেন কিন্তু কোথাও তাঁকে পাওয়া গেল না। পরিশেষে এক কোরাঈশী যুবকের মজলিসে তাঁকে উপবিষ্ট দেখা গেল।

তাঁর সঙ্গী বুয়ুর্গ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, সুফিয়ান বিন উয়াইনার মজলিস ত্যাগ করে এ যুবকের মজলিসে আগমনের কারণ কি? অথচ তিনি ইমাম যুহরী এবং আরো যুগশ্রেষ্ঠ ইমাম এবং তাবেরীগণের অতি প্রিয় ছাত্র।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) উত্তরে বললেন, আমি যদি এমন বুদ্ধিমান লোকের মজলিসে না বসি তবে কিয়ামত পর্যন্ত এমন সুযোগ আর আসবে না। কোরাঈশী এ যুবকের চেয়ে কিতাবুল্লাহ হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষমতা আমি আর কারো মধ্যে দেখি নাই।

শিক্ষা মজলিস

ইমাম সাহেবের শিক্ষা মজলিস শুরু হত সুবহে সাদেকের পর ফজরের নামাযের পর থেকে। সূর্যোদয় পর্যন্ত চলত ফিকাহর আলোচনা। এরপর হাদীছের আলোচনা চলত। হাদীছের শিক্ষার শেষে অনুষ্ঠিত হত ওয়াজ মজলিস। এরপর শুরু হত ইলমী তর্ক-বিতর্ক। যোহরের নামাযের পর সাহিত্য, কবিতা, ব্যাকরণ এবং ভাষাগত আলোচনা হতো। এরপর তিনি বিশ্রাম নিতে ঘরে যেতেন। আছর থেকে মাগরিব পর্যন্ত তিনি আল্লাহ তাআলার যিক্র আযকারে নিমগ্ন থাকতেন।

রাত্রিকে তিনভাগ করে প্রথমভাগে ঘুমাতেন। দ্বিতীয়ভাগে হাদীছ ও ফিকাহ সম্বন্ধে কিতাব লিখতেন। তৃতীয় ভাগ কোরআন তেলাওয়াত এবং নফল নামাযে কাটিয়ে দিতেন। এইরূপে সুবহে সাদেক পর্যন্ত কেটে যেত। কোরআন তিলাওয়াতের প্রতি তাঁর খুবই আগ্রহ ছিল।

ইমাম সাহেবের শিক্ষা মজলিস সে সময়ের মুহাদ্দেছীন এবং ফিকাহবিদগণের শিক্ষা মজলিসের অনুরূপ কয়েম হত। তিনি সে স্নেহ-ভালবাসা এবং ইখলাছ নিয়ে ছাত্রদেরকে পড়াতেন যা পূর্বের উলামাদের

নিয়ম-রীতি ছিল। এ সম্পর্কে ইমাম সাহেব তাঁর শাগরেদ রবী বিন সুলাইমান মারাভীকে উদ্দেশ্য করে যে কথা বলেছেন তা বর্তমান শিক্ষকদের জন্য শিক্ষাপ্রদ।

يا ربيع! لو امكننى ان اطعمك العلم لاطعمتك *

হে রবী! যদি তোমাকে ইলম খাইয়ে দেয়ার শক্তি থাকত তবে আমি তাই করতাম।

ইমাম সাহেব তার হলকায় অংশগ্রহণকারীদের প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞাত ছিলেন। তাদের আগ্রহ সম্পর্কেও অবগত ছিলেন। কখনও কখনও তিনি তাদের নিকট তা প্রকাশও করতেন। বাগদাদের ছাত্রদের মধ্যে আহমদ বিন হাম্বল সম্পর্কে বলতেন, বাগদাদ থেকে আসার সময় আহমদ বিন হাম্বল হতে অধিক সরল মুত্তাকী ফকীহ এবং আলেম কাউকে রেখে আসিনি। একবার তিনি বলেন, তিনজন উলামা এ যমানার আশ্চর্যজনক। প্রথম আরবী এক ব্যক্তি যে একটি শব্দও সঠিকভাবে আদায় উচ্চারণ করতে পারে না; এ হচ্ছে আবু ছত্তর। দ্বিতীয়, এ অনারব ব্যক্তি যে একটি শব্দও ভুল করে না; এ হচ্ছে হাসান য়াফরানী। তৃতীয় এক ছোট ব্যক্তি সে যখন কোন কথা বলে তখন বড় বড় উলামাম্বলে কিরামও তার সত্যতা স্বীকার করেন, এ হচ্ছে আহমদ বিন হাম্বল। তিনি একবার বলেন, আমি দু' ব্যক্তি হতে অধিক বুদ্ধিমান কাউকে দেখিনি- আহমদ বিন হাম্বল, সুলাইমান বিন দাউদ হাশেমী। এদের সবাই ইমাম সাহেবের ছাত্র।

তিনি তাঁর এক প্রিয় ছাত্র মুযনী সম্পর্কে বলেন, *المزنى ناصر مذهبي* মুযনী আমার মাযহাবের সাহায্যকারী। অপর আরেক ছাত্র রবী মুরাদী সম্বন্ধে বলেন- *الربيع رابى* রবী আমার কিতাবের রাবী।

বাগদাদের দরসী হলকায় হাসান য়াফরানী ইমাম সাহেবের কিতাব পড়ে শুনাতেন এবং অন্যান্য ছাত্ররা লিখে নিতেন। ফিকাহ এবং হাদীছ সম্বন্ধে ইমাম সাহেবের গভীর জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তিনি আহমদ বিন হাম্বল এবং আব্দুর রহমান বিন মাহদীকে বলতেন, হাদীছ সম্বন্ধে তোমরা আমার চেয়ে অধিক জ্ঞান রাখ। ছহীহ হাদীছ জানা থাকলে আমাকে বলো। আমি তা অবলম্বন করব।

রবী মুরাদী বর্ণনা করেন, ইমাম সাহেবের ইস্তিকালের সময় আমি তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলাম। সেখানে বুওয়াইতী, মুযনী এবং ইবনে আদিল হাকামও উপস্থিত ছিলেন। ইমাম সাহেব আমাদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, *يا ربيع! لو امكننى ان اطعمك العلم لاطعمتك* ইয়াকুব! (বুওয়াইতী) তুমি লোহার শৃঙ্খলে বেড়ি পরিহিত অবস্থায় মারা যাবে।

আর হে মুযনী! মিশরে তোমাকে নিয়ে সমালোচনা করা হবে। কিন্তু পরে গিয়ে তুমি তোমার যমানার শ্রেষ্ঠ ফেকহী কিয়াসকারী হবে। আর মুহাম্মদ (ইবনে আদিল হাকাম)! তুমি ইমাম মালেকের মাযহাব অবলম্বন করবে। আর আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে রবী! তুমি আমার কিতাবগুলোর প্রচার এবং প্রসারে সহায়ক হবে।

হে আবু ইয়াকুব! তুমি আমার দরসী হলকা পরিচালনা কর। রবী মুরাদী বলেন, ইমাম সাহেবের মৃত্যুর পর আমাদের প্রত্যেকের তাই হয়েছে যা তিনি বলে গিয়েছেন, যেন তিনি সূক্ষ্ম পর্দার আড়ালে সব দেখছিলেন।

বাগদাদের চার শাগরেদ

ইমাম সাহেব মিশর গমনের পূর্বে বাগদাদে দু' বৎসরেরও অধিক সময় দরসী হলকা কায়ম রাখেন। এ সময়ে সেখানকার উলামা, মুহাদ্দেছীন, ফিকাহবিদ, সাহিত্যিক, কবি সকলেই তাঁর দরসী হলকায় অংশ নিয়ে শিষ্যত্ব লাভ করেন। এদের মধ্যে চারজন শাগদের তাঁর ইলম, ফিকাহ এবং ফতোয়ার তরজুমান ছিলেন। এদের মাধ্যমেই ইমাম সাহেবের আকওয়ালে কাদীমা সংরক্ষিত হয়। যাফরানী, আবু ছত্তর, আহমদ বিন হাম্বল এবং কারাবেশী। নিম্নে এ চারজনের সংক্ষিপ্ত জীবনী বর্ণনা করা হচ্ছে।

হাসান বিন মুহাম্মদ যাফরানী বাগদাদী (রহঃ)

আবু আলী হাসান বিন মুহাম্মদ বিন ছাব্বাহ যাফরানী বাগদাদীর মূল বাসস্থান ছিল বাগদাদের নিকটবর্তী যাফরানীয়া গ্রামে। তিনি ফিকাহ এবং হাদীছের ইমাম ছিলেন। এ বিষয়ে তিনি কিতাবও রচনা করেছেন। ইমাম শাফেয়ীর খিদমতে থেকে জ্ঞানে গভীরতা অর্জন করেন।

তিনি বলতেন, মুহাদ্দিছগণ ঘুমিয়ে ছিলেন। ইমাম শাফেয়ী তাদেরকে জাগ্রত করেছেন। আর যে ব্যক্তিই হাদীছ লিখতে বসেছে তার উপর ইমাম শাফেয়ীর ইহসান রয়েছে। ইমাম শাফেয়ীর শিক্ষা মজলিসে তিনিই তাঁর কিতাব পাঠ করতেন এবং অন্যান্যরা শ্রবণ করতেন। তিনি বর্ণনা করেন, আমি ইমাম সাহেবের সম্মুখে তাঁর কিতাব 'আররিসালা' পাঠ করলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আরবের কোন গোত্রের। আমি উত্তর দিলাম, আমি আরবী নই। বরং যাফরানীয়া নামক গ্রামের বাসিন্দা। একথা শুনে তিনি বললেন, انت سيد هذه القرية তুমি তোমার গ্রামের সর্দার।

আহমদ বিন হাম্বল এবং আবু ছত্তরের উপস্থিতিতে য়াফরানী ইমাম সাহেবের সন্মুখে তাঁর কিতাব পাঠ করতেন। তিনি ইমাম সাহেবের আকওয়ালে কাদীমা বা পূর্বমতের রাবী ছিলেন। প্রথমে তিনি আহলে ইরাকের ফিকহী মতবাদের উপর ছিলেন। পরে তিনি ফিকহে শাফেয়ী তথা শাফেয়ী মতবাদের একজন বিশিষ্ট আলেম এবং প্রচারক হন।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল শায়বানী বাগদাদী (রহঃ)

আবু আব্দুল্লাহ আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল শায়বানী বাগদাদী (মৃত্যু ২৬৬ হিজরী) ইমাম শাফেয়ীর বাগদাদের ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন, বাগদাদ হতে বের হবার সময় ফিকাহ, তাকওয়া এবং ইলমে আহমদ বিন হাম্বল হতে বড় কাউকে রেখে আসিনি। ইমাম আহমদ বলেন, ইমাম শাফেয়ীর শিক্ষা মজলিসে বসার পূর্বে আমি হাদীছের নাসেখ-মনসুখ সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলাম। তিনি তাঁর উস্তাদ ইমাম শাফেয়ীর জন্য অনেক দোয়া করতেন। একবার তার পুত্র আব্দুল্লাহ জিজ্ঞেস করলেন শাফেয়ী কে যার জন্য আপনি এত বেশী দোআ করেন? তিনি বললেন, বেটা! শাফেয়ী দুনিয়ার জন্য সূর্য স্বরূপ এবং দেহের জন্য সুস্থতা স্বরূপ। এ দুটোর কি কোন পরিপূরক থাকতে পারে? আমি তিরিশ বৎসর থেকে ঘুমানোর পূর্বে ইমাম শাফেয়ীর জন্য দোআ এবং ক্ষমা প্রার্থনা (ইস্তিগফার) করে আসছি।

ইবনে জওয়ী লিখেন,

وكان اصحاب الامام الشافعى وخواصه ولم يزل مصاحبه الى ان ارتحل

الشفعى الى امصر

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ইমাম শাফেয়ীর অন্যতম শাগরেদ ছিলেন। মিশর যাওয়া পর্যন্ত তিনি সব সময় তাঁর সান্নিধ্যে থাকতেন।

আবু ছত্তর ইব্রাহীম বিন খালেদ বাগদাদী

আবু ছত্তর ইব্রাহীম বিন খালেদ বিন আবিল ইয়ামান কালবী বাগদাদী (রহঃ) (মৃত্যু ২৪০ হিজরী) প্রথমে ইরাকীদের মতবাদের উপর ছিলেন। ইমাম শাফেয়ীর শিক্ষা মজলিসে অংশগ্রহণের পর সে মত ত্যাগ করেন। তিনি তার সময় বাগদাদের মুহাদ্দিছ এবং ফিকাহ শাস্ত্রবিদদের মধ্যে গণ্য। কয়েকটি মাসয়ালায় তিনি অন্য ইমামদের থেকে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন।

আবু ছত্তর ইমাম সাহেবের পূর্বতম বর্ণনাকারীদের একজন। এতদভিন্ন

কয়েকটি মাসয়ালায় তিনি ইমাম সাহেবের সাথে মতভেদ করে নিজের ভিন্ন মাযহাব প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর কিতাবের অনুরূপ অনেক বড় কিতাব রচনা করেন। আযারবাইজান এবং আর্মেনিয়ার অধিকাংশ লোকই তার ফেকহী মতবাদের অনুসারী ছিলেন।

হুসাইন বিন আলী কারাবেসী বাগদাদী (রহঃ)

আবু আলী হুসাইন বিন আলী বিন ইয়াযীদ কারাবেসী আল বাগাদাদী (মৃত্যু ২৪৫ হিজরী) ইমাম শাফেয়ীর বাগদাদের ছাত্রদের মধ্যে অনেক প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি তাঁর প্রধান শাগরেদদের মধ্যে গণ্য ছিলেন। ইনিও প্রথমে ইরাকী উলামাদের ফিকহী মতের অনুসারী ছিলেন। ইমাম শাফেয়ীর শিষ্যত্ব গ্রহণের পর তাঁর মত অবলম্বন করেন। তিনি অনেক কিতাব রচনা করেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ আলেম, ফকীহ, মুহাদ্দিছ ও মুতাকাল্লিম (ইলমে কালাম বিশারদ) ছিলেন। বাগদাদে তাঁর যথেষ্ট মর্যাদা ছিল। ইমাম আহমদের সাথে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। কিন্তু খলকে কোরআনের ফিতনার সময় উভয়ের বন্ধুত্ব শত্রুতা রূপ নেয়।

মিশরের ছয় শাগরেদ

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) শেষ বয়সে মিশর গমন করেন। সেখানে তাঁর ইলমের যথেষ্ট প্রসার ঘটে। তথাকার ছাত্ররা তাঁর ফিকহী মত এবং রায়গুলো সংগ্রহ করেন। এদের মধ্যে ছয়জন উল্লেখযোগ্য- মুযনী, রবী, জীমী, রবী মুরাদী, বুওয়াইতী হারমালা এবং ইউনুস বিন আদিল আলা। তাদের মাধ্যমে তাঁদের শাগরেদদের মাধ্যমে এবং তাদের রচিত কিতাব দ্বারা ইমাম সাহেবের মাযহাব ছড়িয়ে পড়ে। তাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখ করা হচ্ছে।

ইসমাইল বিন ইয়াহয়া মুযনী আলমিছরী (রহঃ)

আবু ইব্রাহীম ইসমাইল বিন ইয়াহয়া বিন ইসমাইল আল মুযনী আল মিছরী (রহঃ) (মৃত্যু ২৬৪ হিজরী) সম্পর্কে ইবনে খিল্লিকান লিখেন-

তিনি শাফেয়ী মাযহাব অবলম্বনকারীদের ইমাম। তিনি ইমাম শাফেয়ীদে ফিকহী পদ্ধতি, তাঁর ফতোয়া এবং তাঁর মত সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত ছিলেন। তার সম্পর্কে ইমাম সাহেব বলেছিলেন, মুযনী আমার মাযহাবের সাহায্যকারী। তিনি খুবই নেককার, আবেদ-যাহেদ, আলেম ছিলেন। সূক্ষ্ম মাসয়ালা সম্পর্কে গভীর দৃষ্টি ছিল। উন্নত মর্যাদার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও ইমাম সাহেবের যে স

মাসয়ালা তাঁর নিকট ছিল না সেগুলো রবী মুরাদীর কিতাব থেকে সংগ্রহ করেন। ইমাম সাহেবের ইত্তিকালের পর তাকে গোসল দেয়া এবং দাফন কাফনের কাজ তিনি সমাধা করেন। তিনি ২৬৪ হিজরীর রমযান মাসে ইত্তিকাল করেন। মুকাত্তম পাহাড়ের নিকট ইমাম সাহেবের কবরের পাশে তাকে সমাধিস্থ করা হয়।

রবী বিন সুলাইমান জীযী আলমিছরী

আবু মুহাম্মদ রবী বিন সুলাইমান বিন দাউদ ইযদী আল জীযী আল মিছরী (রহঃ) (মৃত্যু ২৫৬ হিজরী) কায়রোর পশ্চিমে নীলনদীর তীরে জীযা নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। মৃত্যুর পর তাকে সেখানেই দাফন করা হয়। তিনি ইমাম শাফেয়ীর শাগরেদ ছিলেন কিন্তু তাঁর নিকট থেকে খুব কমই বর্ণনা করেছেন। তবে ইমাম সাহেবের ছাত্র আব্দুল্লাহ বিন আব্দিল হাকামের মাধ্যমে তাঁর ইলম অর্জন করেছেন। আবু দাউদ, নাসাঈ, তাহাবী প্রমুখ তাঁর নিকট থেকে হাদীছ রেওয়ায়েত করেন। তিনি নির্ভরযোগ্য, নেককার আলেম ছিলেন। তিনি 'কাছীরুল হাদীছ' অর্থাৎ অনেক হাদীছ সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন।

রবী বিন সুলাইমান মুরাদী আল মিছরী (রহঃ)

আবু মুহাম্মদ রবী বিন সুলাইমান বিন আব্দিল জাব্বার আল মুরাদী আল মিছরী (রহঃ) (মৃত্যু ২৭০ হিজরী) ইমাম শাফেয়ীর অধিকাংশ কিতাব রেওয়ায়েত করেন। ইমাম সাহেব বলতেন, রবী আমার মাযহাবের রাবী। রবী আমার নিকট থেকে যে পরিমাণ ইলম অর্জন করেছে তা অন্য কেউ করেনি। ইলমের প্রতি তাঁর আগ্রহ দেখে ইমাম সাহেব বলতেন, রবী! যদি সম্ভব হত তবে তোমাকেই ইলম খাইয়ে দিতাম। তিনি ইমাম সাহেবের মিশরের সর্বশেষ ছাত্র ছিলেন। 'আলমুয়াযযিন' উপাধিতে তিনি পরিচিত ছিলেন।

হারমালা বিন ইয়াহয়া আল মিছরী (রহঃ)

আবু আব্দিল্লাহ হারমালা বিন ইয়াহয়া বিন আব্দিল্লাহ তুজীবী আল মিছরী (রহঃ) (মৃত্যু ২৪৪ হিজরী) ইমাম শাফেয়ীর দরসে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি হাফেযে হাদীছ ছিলেন। তাঁর নিকট থেকে ইমাম মুসলিম অনেক হাদীছ রেওয়ায়েত করেছেন।

আব্দুল আযীয বিন উমর আল মিছরী বর্ণনা করেন, ইমাম শাফেয়ীর ইত্তিকালের পর আমি হারমালাকে জিজ্ঞেস করলাম, ইমাম শাফেয়ী থেকে যে

সমস্ত কিতাব শ্রবণ করেছেন, সেগুলোর একটা তালিকা দেখান। তিনি সাতটি কিতাবের নাম উল্লেখ করলেন এবং বললেন, ইমাম শাফেয়ীর এক কিতাবই আমার নিকট আছে। যেগুলো আমরা আরয (উস্তাদের সম্মুখে ছাড়া পাঠ) এবং সামা (স্বয়ং উস্তাদের পাঠ) করেছি। আবু আদিল্লাহ বুশবখী বলেছেন তিনি ইমাম সাহেব থেকে সত্তরটি কিতাব রেওয়াজেত করেছেন।

ইউনুস বিন আদিল আলা আল মিছরী (রহঃ)

আবু মুসা ইউনুস বিন আদিল আলা মিছরী (মৃত্যু ২৬৪ হিজরী) তাঁর শায়খ সম্পর্কে বলেন, যদি সমস্ত মানুষকে ইমাম শাফেয়ীর জ্ঞান বন্টন করা দেয়া হয় তবে সবার জন্য যথেষ্ট হবে। তিনি 'ওয়ারণ' এর কিরাআতের ইমাম ছিলেন। দারিদ্রতার সহিত জীবন-যাপন করতেন। তিনি খুবই মুত্তাকী এবং খোদাতীক আলেম ছিলেন। তাঁর দু'আয় বৃষ্টি চাওয়া হত। ইয়াহয়া বিন হাসসান তাঁর সম্পর্কে বলেন, তোমাদের এ ইউনুস ইসলামের রুকন (স্তম্ভ)। তিনি ইমাম শাফেয়ী ব্যতীতও সুফিয়ান বিন উয়াইনা, ওলীদ বিন মুসলিম, আশহাব প্রমুখ থেকে হাদীছ রেওয়াজেত করেন। আর তাঁর নিকট থেকে ইমাম মুসলিম নাসাঈ, ইবনে মাজা প্রমুখ হাদীছ রেওয়াজেত করেন।

ইউসুফ বিন ইয়াহয়া বুওয়াইতী (রহঃ)

আবু ইয়াকুব ইউসুফ বিন ইয়াহয়া বুওয়াইতী আল মিছরী (রহঃ) (মৃত্যু ২৩১ হিজরী) ইমাম শাফেয়ীর ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তিনি একজন আবেদ, যাহেদ, মুত্তাকী এবং নেককার আলেম ছিলেন। 'খলকে কোরআনের' ফিৎনার সময় তাঁকে মিশর থেকে বন্দী করে বাগদাদ নিয়ে যাওয়া হয়। এ বিষয়ে তিনি তাঁর মত পরিবর্তনের অস্বীকৃতি জানালে খলীফা ওয়াছেক তাকে জেলে প্রেরণ করেন এবং তিনি সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। সেখানে তিনি জুমআর আযান শুনে গোসল করে ধৌত কাপড় পরিধান করে জেলখানার দরজা পর্যন্ত আসতেন এবং বলতেন,

হে আল্লাহ! আমি নামাযের প্রতি তোমার আহ্বানকারীর সাড়া দিয়েছি কিন্তু তারা আমাকে বাধা দিয়েছে।

অন্যান্য শাগরেদ

বাগদাদ এবং মিশরের এ দশজন ছাত্র ইমাম সাহেবের বিখ্যাত ছাত্র-যাদে মাধ্যমে তাঁর মাযহাব সারা বিশ্বে প্রসারিত হয় এবং যাদের ইলম এবং জ্ঞানে

আলো দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। এদের ছাড়া তাঁর আরো অনেক শাগরুদ রয়েছেন যারা তাঁর ইলমী এবং দ্বীনি আমানত অন্যের নিকট পৌঁছিয়েছেন। তন্মধ্যে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হচ্ছে।

সুলাইমান বিন দাউদ হাশেমী, আবু বকর আব্দুল্লাহ বিন যুবাইরী হুমাইদী মক্কী, ইব্রাহীম বিন মুনযির হিয়ামী, ইব্রাহীম বিন খালেদ, আবু তাহের বিন সিরাজ, আমর বিন সাওয়াদ আমেরী, আবুল ওলীদ মুসা বিন আবিল জারুদ মক্কী, আবু ইয়াহয়া মুহাম্মদ বিন সায়ীদ বিন গালেব আত্তার, আবু উবাইদ, আহমদ বিন সিনান ওয়াসেতী, মুহাম্মদ বিন আব্দিল্লাহ বিন আব্দিল হাকাম, হারুন আইলী প্রমুখ ছাড়াও আরও বহু মুহাদ্দিছ এবং ফকীহ তাঁর নিকট থেকে শিক্ষা লাভ করেছেন।

আত্মবিশ্বাস

একবার ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ইসহাক বিন রাহওয়ে ও ইমাম ইয়াহয়া বিন ময়ীন পবিত্র মক্কায় সফর করেন। প্রত্যেকেই মুহাদ্দিছ আব্দুর রায়্যাক (রহঃ)-এর শিক্ষা মজলিসে যোগদান করার আকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তথায় গিয়ে তারা দেখতে পেলেন অত্যন্ত জাঁকজমকের সাথে এক যুবক আসনে বসে আছেন। তাঁর চারপাশে লোকদের ভিড়।

সে যুবকটি স্বগৌরবে শিক্ষা দান করছেন। আর বলছেন, ওহে সিরিয়াবাসী! হে ইরানবাসী!! আপনারা আমাকে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীছ সম্বন্ধে যে কোন প্রশ্ন করতে পারেন। তার সঠিক উত্তর দিতে আমি প্রস্তুত।

ইমাম ইসহাক বলেন, আমি বললাম, এ দাঙ্কি গর্বিত যুবকটি কে? মানুষ বলে দিল ইনি মুহাম্মদ বিন ইদ্রীস শাফেয়ী মুত্তালেবী।

ইমাম ইসহাক ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে বললেন, চলুন ইমাম শাফেয়ীকে পাখী উড়ানো সম্পর্কিত হাদীছটির তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করে আসি। ইমাম আহমদ বললেন, এর অর্থতো পরিস্কার। অর্থাৎ রাজিকালে পাখীগুলোকে সেগুলোর বাসায় ঘুমাতো দাও। কিন্তু আপনি যখন সেখানে যেতে চাচ্ছেন তখন আমিও আপনার সাথে যাব।

ইমাম আহমদ (রহঃ) ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)কে সেই হাদীছের মর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়ে দিলেন। বললেন, মূর্খযুগের

নিয়ম ছিল যে, রাতের বেলায় যদি কাউকে সফরে যেতে হত তখন পাথর নিষ্ক্ষেপ করে পাখীগুলোকে বাসার বাইরে বের করা হত। সেগুলো যদি উড়ে ডান দিকে যেতো তবে মঙ্গল ও শুভ মনে করা হত। আর যদি বাম দিকে যেতো, তবে অশুভ ও অমঙ্গলজনক মনে করা হত। হজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে যখন মূর্খ যুগের এ রীতির কথা উল্লেখ করা হল, তখন তিনি বললেন, পাখীগুলোকে তাদের বাসায় বিশ্রাম করতে দাও। আর তোমরা আল্লাহর উপর ভরসা কর।

তখন ইমাম ইসহাক (রহঃ) ইমাম আহমদ (রহঃ)কে বললেন, আমি যদি ইরাক হতে হেজাজ পর্যন্ত শুধু এ হাদীছের মর্ম উদ্ধার করার জন্য সফর করতাম, তবে তা সার্থক হত।

ইমাম আহমদ, ইসহাক এবং ইয়াহয়া বিন ময়ীন ইমাম শাফেয়ীর দক্ষতা এবং ইলমে হাদীছে তাঁর অগাধ জ্ঞানের স্বীকৃতি দিলেন।

তর্ক শাস্ত্রে বুৎপত্তি

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করে বিভিন্ন শায়খ থেকে জ্ঞান অর্জন করেন। অপর কোন ইমাম তাঁর মত দেশ-ভ্রমণ করেন নাই। তিনি বিভিন্ন দেশের আলেম-উলামা এবং জ্ঞানী-মনীষীদের নিকট হতে বহু শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করেন। বিভিন্ন শাস্ত্রে তিনি যেরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করেন তর্ক শাস্ত্রেও তিনি তদুপ খ্যাতি অর্জন করেন।

এখানে তার কিছুটা আলোচনা করা হচ্ছে।

ফিকাহ্ না তামাশা

একদা ইমাম শাফেয়ীকে ফকীহ রবী বললেন, কোন ব্যক্তি যদি রমজানের একটি রোজা কাযা করে তবে আমার মতে তার কাযা স্বরূপ বারটি রোযা রাখতে হবে। কেননা, এ মাসের একদিন অন্য মাসের বারদিনের সমান।

ইমাম সাহেব বললেন, ইহা কি ফিকাহ্ নাকি তামাশা। আপনি যদি এরূপ মন্তব্য করতে চান তবে আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি, যদি কোন ব্যক্তি লাইলাতুল কদরের নামায কাযা করে তবে আপনার রায় মতে সে হাজার মাস পর্যন্ত কিরূপে কাযা করবে? কেননা, কোরআনে বলা হয়েছে, লাইলাতুল কদর হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

এ জবাব শুনে রবী নিশ্চুপ হয়ে চলে গেলেন।

আহমদ বিন হাম্বলের বিরোধিতা

ইমাম সাহেব একবার ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি শুনেছি আপনি বলে থাকেন যে, কোন ব্যক্তি যদি এক ওয়াজ্ত নামায কাযা করে তবে সে ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল তা স্বীকার করলেন। তিনি বললেন, সে ব্যক্তি যদি পুনরায় মুসলমান হতে চায় তবে তাকে কি করতে হবে?

ইমাম আহমদ বললেন, তাকে আবার নামায পড়া আরম্ভ করতে হবে।

তখন ইমাম শাফেয়ী বললেন, দেখা যায় আপনার মতে কাফেরের পক্ষেও নামায পড়া শুদ্ধ হবে। অথচ নামায পড়ার জন্য প্রথম শর্ত হলো যে, নামাযী ব্যক্তির ঈমান থাকা চাই। অথচ কাফের ব্যক্তির ঈমান থাকে না।

তিনি তর্কিক নন

একবার ফযল বিন রবী ইমাম সাহেবের নিকট আরম্ভ করলেন, হাসান বিন যিয়াদ লুলুঈর সঙ্গে একদিন আপনার তর্ক শুনতে চাই। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বললেন, তিনি তো তর্ক করার মত উপযুক্ত লোক নন। আপনি একান্তই যদি তার তর্ক পরীক্ষা করতে চান তবে আমার যে কোন একজন ছাত্রের সঙ্গে তাকে তর্কে লাগিয়ে দিন। তবে আপনি আমার কথার সার্থকতা বুঝতে পারবেন।

হাসান বিন যিয়াদকে আমন্ত্রণ জানানো হল। ইমাম শাফেয়ীর একজন ছাত্র তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমাদের সঙ্গে কয়েকটি বিষয়ে মদীনাবাসীরা বিরোধিতা করে থাকেন। আশা করি আপনার নিকট হতে আমরা সেগুলোর মীমাংসা শুনতে পাব।

হাসান বিন যিয়াদ তা জানতে চাইলে ছাত্রটি বললেন, নামাযে থাকা অবস্থায় কোন ব্যক্তি যদি কোন সতী সাধ্বী স্ত্রীলোককে অপবাদ দেয় তবে তার হুকুম কি?

হাসান বললেন, তার নামায নষ্ট হয়ে যাবে। অযু সম্পর্কে হুকুম জানতে চাইলে হাসান বললেন, অযু বাকী থাকবে।

ছাত্রটি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা! কোন ব্যক্তি যদি নামাযে অটুহাসি হাসে তবে সে সম্পর্কে কি নির্দেশ রয়েছে। হাসান বললেন, নামায এবং অযু উভয়টিই নষ্ট হয়ে যাবে।

তখন ছাত্রটি বললেন, সতী সাধ্বী স্ত্রীলোকের প্রতি অপবাদ দেওয়া

অটহাসির চেয়ে কম নিন্দনীয় হতে পারে কিরূপে?

ফযল বিন রবী তা শুনে হেসে উঠলেন। ইমাম শাফেয়ীকে সব কথা খুলে বললে তিনি বললেন, আমি তো আগেই বলেছিলাম যে, হাসান বিন যিয়াদ তর্ক করার মত উপযুক্ত লোক নয়।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের অভিমত

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেন, আমি ইমাম শাফেয়ীর চেয়ে জ্ঞানী, প্রতুৎপন্নমতি, মাসয়ালার সহীহ এবং প্রামাণ্য জবাবদাতা আর কাউকে দেখি নাই।

১৯৫ হিজরী পর্যন্ত ইমাম সাহেব মক্কা শরীফের মুফতীরূপে নিযুক্ত ছিলেন। অতঃপর তিনি বাগদাদ গমন করেন।

খলীফা হারুনুর রশীদ তার শাহী দরবারে ওয়ায করার জন্য একদিন ইমাম সাহেবকে অনুরোধ করলেন, তিনি সেখানে গিয়ে ওয়ায করেন। তাঁর ওয়ায সবার মর্মস্পর্শ করল। সভাময় কান্নার রোল পড়ে গেল। স্বয়ং খলীফা হারুনুর রশীদও অধীরভাবে কাঁদতে লাগলেন।

সভাশেষে খলীফা তাঁকে পঞ্চাশ হাজার দেরহাম পুরস্কার প্রদান করলেন। ইমাম মুয়ানী এবং রবী বলেন, ইমাম সাহেব পঞ্চাশ হাজার দিরহাম হতে চল্লিশ হাজার দিরহাম ফকীর, মিসকীন, গরীব-দুঃখী এবং আলেম-ওলামাদের মধ্যে বিলিয়ে দেন।

মানুষে বলল, আপনি তো প্রায় সব অর্থই অপরকে বিলিয়ে দিচ্ছেন। তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে, তাদের মালের উপর ভিক্ষুক এবং বঞ্চিতের অধিকার রয়েছে। তাদের ভাগ্যের কারণেই এসব আমদানী হয়ে থাকে। তাই তাদের সম্পদ আমি তাদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে থাকি। আল্লাহ তাআলা আমাকে মধ্যস্থ লোক হিসাবে নিযুক্ত করেছেন। আমার মধ্যস্থতায় তাদের মাল তাদের নিকট পৌঁছে। আমি আশংকা করছি যে, যদি তাদের মাল যথাযথভাবে তাদের নিকট পৌঁছিয়ে না দেই তবে হাশরের দিন আল্লাহর সামনে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বাগদাদ হতে আবার মক্কা শরীফে চলে আসেন। ১৯৮ হিজরীতে হজ্জ সম্পাদনের পর বাগদাদ গমন করেন। সেখানে কয়েকমাস অবস্থানের পর তিনি আবার মিসর চলে যান। শেষ জীবন পর্যন্ত তিনি সেখানেই অবস্থান করেন এবং সেখানেই ইত্তিকাল করেন।

জ্ঞান-বুদ্ধি এবং বিচক্ষণতা

ইমাম সাহেব খুবই বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। অলঙ্কার শাস্ত্রেও তিনি পুসিদ্ধ ছিলেন। আবু উবাইদ বলেন, আমি ইমাম সাহেব হতে অধিক বুদ্ধিমান কাউকে দেখিনি। হারুন বিন সায়ীদ আইলী বলেন, ইমাম শাফেয়ী যদি চান যে, পাথরের এ স্তম্ভগুলো কাঠ প্রমাণ করবেন তবে তিনি পারবেন। মুহাম্মদ বিন আদিল হাকাম বলেন, যদি ইমাম শাফেয়ী না হতো তবে আমি কিছুই জানতাম না। তিনি আমাকে কিয়াস শিখিয়েছেন।

ইউনুস বিন আদিল আলা বলেন, যদি সমস্ত মানুষের আকল-বুদ্ধি ইমাম শাফেয়ীর বুদ্ধির সাথে মিলানো হয় তবে তাদের আকল-বুদ্ধি খুঁজে পাওয়া যাবে না। যে ব্যক্তি তাঁর কথা বুঝতে পারে সে নিশ্চয় খুবই জ্ঞানী। তিনি মানুষের সাথে তাদের জ্ঞানানুসারে কথা-বার্তা বলতেন। মুযনী বলেন, ইমাম শাফেয়ী কিছু বলতেন, পূর্ণরূপে যদি তা বুঝতাম তবে বিভিন্ন প্রকার ইলম এবং ধর্ম সম্পর্কে অবগত হতাম। এত জ্ঞান-বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও তিনি বিষয়র মোকাবেলায় একে কোন মূল্য দিতেন না। তিনি বলতেন,

إذا رويت حديثاً فلم اخذ به فاشهدوا ان عقلى قد ذهب *

যদি আমার নিকট কোন ছহীহ হাদীছ বর্ণনা করা হয় এবং আমি তা গ্রহণ না করি, তবে তোমরা সাক্ষী দিও যে, আমার আকল জ্ঞান চলে গেছে?

তীক্ষ্ণ বুদ্ধির একটি প্রমাণ

খলীফা হারুনুর রশীদের স্ত্রীর নাম ছিল যুবাইদা। একদা তাদের উভয়ের মধ্যে কোন বিষয় নিয়ে প্রচণ্ড বাক-বিতণ্ডা শুরু হয়। এ সময়ে হারুনুর রশীদের স্ত্রী ক্রোধভরে তাকে জাহান্নামী বলে সম্বোধন করলেন। তিনি গোস্বাভরে জবাব দিলেন যে, যদি আমি জাহান্নামী হই তবে তোমাকে তালাক।

এ কথার পর উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। অথচ তাদের উভয়ের মধ্যে প্রগাঢ় ভালবাসা ছিল। খলীফা নিজের এ কথার কারণে খুবই দুঃখিত হলেন। এ মাসয়ালার সমাধানে তিনি সমস্ত আলেমদের সমবেত করলেন। কিন্তু কেউ তাঁর কোন সদুত্তর দিতে পারলেন না। কারণ তালাক হওয়া না হওয়া নির্ভর করছে খলীফার জান্নাতী জাহান্নামী হওয়ার উপর। আর তা এমন বিষয় যে সম্বন্ধে মানুষ অবগত নয়। তাই তাদের পক্ষে জবাব দেওয়া সম্ভবপর হয়ে উঠেনি।

এ সময়ে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) দণ্ডায়মান হয়ে বললেন, 'আমি এ মাসয়ালার জবাব দিতে পারব।' তখন ইমাম সাহেবের বয়স মাত্র তের বৎসর।

যখানে সমস্ত আলেম উত্তর দিতে অপারগ সেখানে এই বালক উত্তর দিবে! কলেই আশ্চর্যান্বিত হলে। অনেকে হয়ত তাকে অপ্রকৃতিস্থ ভাবল। কিন্তু খলীফা তাকে জবাব দেয়ার অনুমতি দান করলেন।

ইমাম সাহেব বললেন, মাসয়ালার জবাব দেবার পূর্বে আমি জানতে চাই যে এখন কি আমি আপনার মুখাপেক্ষী নাকি আপনি আমার মুখাপেক্ষী? খলীফা বলেন, আমিই এখন আপনার মুখাপেক্ষী। ইমাম সাহেব বললেন, তবে এটা কেষ্ট করে হতে পারে যে, আপনি উচ্চাসনে বসে থাকবেন আর আমি নিম্নাসনে বসে থাকব? কারণ আলেমের স্থান অনেক উচ্চে। একজন আলেমের অপমান আধিরদাস্ত করতে রাজী নই; যদিও আমি আমার অপমান সহ্যে পারি।

খন খলীফা নিম্নে নেমে এসে ইমাম সাহেবকে খলীফার আসনে বসালেন।

রপর ইমাম সাহেব খলীফাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আচ্ছা বলুন তো! আপনার জীবনে কি এমন কোন ঘটনা ঘটেছে যে, আপনার পাপ করার ইচ্ছাও হয়েছিল; সে পাপ করার শক্তিও ছিল। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আল্লাহর ভয়ে আপনি সে পাপ পরিত্যাগ করেছেন?’

খলীফা বললেন, ‘এরূপ ঘটনা আমার জীবনে বহুবার ঘটেছে।’

খন ইমাম সাহেব বললেন, আমি ফতোয়া দিচ্ছি যে, আপনি বেহেশতী। কাজে আপনার বিবি তালাক হন নাই। উলামায়ে কিরাম ইমাম শাফেয়ীর নিকট তাঁর ফতোয়ার পক্ষে দলীল চাইলে তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন

وَلَمَنْ حَاقَّ مَقَامَهُ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ *

“আর যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয়ে নিজেকে পাপকার্য হতে বিরত রেখেছে, নিশ্চয়ই জান্নাত হচ্ছে তার বাসস্থান।”

ইমাম সাহেবের এ জবাব শুনে সবাই সন্তুষ্ট হলেন। তারা পরস্পরে বলাবলি করতে লাগলেন, ভবিষ্যতে যে এ বালকটি অদ্বিতীয় হবে এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

ইমাম শাফেয়ীর ধী শক্তি ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি

ইমাম মুহাম্মদ বিন জরীর তবরী বর্ণনা করেন, পবিত্র মদীনায শিক্ষাগ্রহণকালে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) একবার ইমাম মালেক (রহঃ)-এর শিক্ষা মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। এ সময় এক ব্যক্তি এসে ইমাম মালেক

(রহঃ)কে জিজ্ঞাসা করল জনাব, আমি তোতা পাখীর ব্যবসা করে থাকি। এক ব্যক্তির নিকট এই বলে আমি একটি তোতাপাখী বিক্রয় করলাম যে, পাখিটি খুব কথা বলতে পারে। কিছুক্ষণ পর ক্রেতা এসে বলল যে, তোতা পাখিটি কথা বলে না। এ নিয়ে আমাদের উভয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটি আরম্ভ হল। সে সময় আমি হঠাৎ করে বলে ফেললাম যে, আমার তোতা পাখি কখনো চুপ থাকে না। যদি চুপ থাকে তা হলে আমার স্ত্রী তালাক। এখন আপনি আমাকে বলে দিন যে, এ কথার কারণে আমার স্ত্রী তালাক হয়ে গিয়েছে কিনা? ইমাম মালেক (রহঃ) জবাবে বললেন যে তোমার স্ত্রী তালাক হয়ে গিয়েছে। সে ব্যক্তি অত্যন্ত বিষন্ন মনে বাড়ী ফিরল। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) সে ব্যক্তির পিছনে পিছনে গেলেন। কিছুদূর গিয়ে তাঁকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার পাখিটি অধিকাংশ সময় কথা বলে না কি অধিকাংশ সময় চুপ থাকে? সে ব্যক্তি বলল, পাখিটি অধিকাংশ সময় কথা বলে। তবে মাঝে মাঝে চুপও থাকে। তখন ইমাম শাফেয়ী বললেন, তুমি নিশ্চিত থাক। তোমার স্ত্রী তালাক হয় নাই। তাকে এ জবাব দিয়ে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) আবার শিক্ষা মজলিসে ফিরে আসলেন। প্রশ্নকারী ব্যক্তি ফিরে এসে ইমাম মালেক (রহঃ)কে বলল, হযরত! আমার মাসয়ালাটি আরেকটু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন। ইমাম মালেক (রহঃ) এবারও সে একই উত্তর দিলেন। তখন প্রশ্নকারী বলল, আপনার শিক্ষা মজলিসের এ নবাগত যুবকটি আমাকে নিশ্চিত করে বলেছে যে, আমার স্ত্রী তালাক হয় নাই। ইমাম মালেক (রহঃ) এতে রাগান্বিত হলেন। তার স্ত্রীর তালাক না হওয়ার কারণ জানতে চাইলে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বললেন, হযরত! আপনি নিজেই আব্দুল্লাহ বিন যিয়াদের রেওয়য়াত বর্ণনা করেছেন যে, কায়েস কন্যা ফাতেমা হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! মু'আবীয়া এবং আবু জাহম উভয়েই আমাকে বিবাহ করতে চায়। তখন হুযুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবু জাহম তো কখনো কাঁধ হতে লাঠি নামায় না। অথচ তিনি অবশ্যই জানতেন যে আবু জাহম শয়ন করে থাকে। অন্যান্য কাজকর্মও করে থাকে। রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ কথা হতে আমি বুঝে নিয়েছি যে, তিনি এ কথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, আবু জাহম প্রায়ই স্বন্ধে লাঠি রাখে। এর উপর ভিত্তি করেই আমি ফতোয়া দিয়েছি যে, যেহেতু তোতা পাখি প্রায় সময়ই কথা বলত কাজেই তার স্ত্রী তালাক হয় নাই।

তখন ইমাম মালেক (রহঃ) বললেন, হ্যাঁ ভাই! প্রকৃতপক্ষেই তোমার স্ত্রী তালাক হয় নাই। শাফেয়ীর দলীল গ্রহণযোগ্য।

ইমাম শাফেয়ীর সূক্ষ্ম বুদ্ধি দেখে ইমাম মালেক (রহঃ) তাকে বললেন, এখন তোমারও ফতোয়া দেওয়ার মত যোগ্যতা অর্জিত হয়েছে। ইমাম মালেক (রহঃ) ও মদীনার অপরাপর ফিকাহবিদগণ এবং মুহাদ্দেহীনগণ সর্বসম্মতিক্রমে ইমাম শাফেয়ীকে ফতোয়া দেওয়ার অনুমতি দান করলেন।

এরূপও কোন কোন বর্ণনা পাওয়া যায় যে, ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) যখন ইমাম মালেক (রহঃ)-এর নিকট পড়াশুনা করতেন তখন কেউ ফতোয়া চাইলে ইমাম মালেক (রহঃ) যখন ফতোয়া দিতেন; ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) তখন দরজায় বসে থাকতেন। ফতোয়ার কোন ভুল ধরা পড়লে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) তা পুনরায় বিবেচনা করতে ইমাম মালেক (রহঃ)কে অনুরোধ জানাতেন। ইমাম মালেক (রহঃ)ও তখন গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করে দেখতেন। নিজের ত্রুটি ধরা পড়লে ইমাম মালেক (রহঃ) তখন তা সংশোধন করে ফতোয়া দিতেন।

সকল মানুষের বুদ্ধিমত্তা সমান থাকে না। বহু অভিজ্ঞতা, সৎকর্ম সম্পাদন ও পূর্ণতা লাভের পরই মানুষের বুদ্ধি পরিপক্ব হয়।

হাদীছ শরীফে বর্ণিত রয়েছে, মুমিন ব্যক্তির বুদ্ধির প্রখরতা এবং তীক্ষ্ণতাকে ভয় কর। কেননা, সে আল্লাহর নূর দ্বারা দৃষ্টিপাত করে থাকে।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর বুদ্ধিমত্তার পরিপক্বতা সর্বজনবিদিত। হাফেজ ইবনে হজর আসকালানী এ সম্পর্কিত অনেক ঘটনা তাঁর রচিত কিতাব ‘মানাকেবে ইমাম শাফেয়ী’-এর মধ্যে উল্লেখ করেছেন।

ইমাম বোখারী (রহঃ)-এর শিক্ষক ছিলেন ইমাম হুমায়দী (রহঃ)। তিনি বলেন, আমি এবং ইমাম শাফেয়ী একদা মক্কার বাইরে গেলাম। পথে এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ হল। আমি ইমাম শাফেয়ীকে বললাম, আপনার ফেরাসত বা বুদ্ধিপ্রখরতা দ্বারা বলুনতো দেখি এ লোকটির জীবিকা নির্বাহের উপায় কি? তিনি বললেন, সে মশল্লা পেষার কাজ করে অথবা দর্জির কাজ করে। ইমাম হুমায়দী বলেন, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি কাজ কর? সে বলল, আমি আগে মশল্লা পেষার কাজ করতাম। এখন দর্জির কাজ করি।

ইমাম শাফেয়ী স্বয়ং বর্ণনা করেন, আমি ইয়ামান দেশ হতে ফেরাসত সম্পর্কিত জ্ঞান পরিপূর্ণভাবে লাভ করার পর দেশে ফিরবার পথে একটি ছোট শহরে পৌঁছার পর রাত্রি হল। রাত্রি যাপন করব কোথায়- এ নিয়ে চিন্তিত তলাম। সপ্তশস্য ললাট এবং নীল চক্ষু বিশিষ্ট এক ব্যক্তিকে তাঁর বাড়ীর আঙ্গিনায়

পায়চারী করতে দেখলাম। আমার ফেরাসতের শক্তি মোতাবেক সে ব্যক্তি কৃপণ। আতিথেয়তা করবে না তবুও প্রয়োজনের তাগিদে তাঁর নিকট প্রয়োজন পেশ করলাম। লোকটি আমার ফেরাসতকে আশ্চর্যান্বিত করে দিয়ে আমার সাথে নম্র ব্যবহার করলেন। একটি উত্তম ঘরে থাকার ব্যবস্থা করলেন। আহারেরও ব্যবস্থা করলেন। উত্তম বিছনাপত্র আয়োজনে কোনরূপ কার্পণ্য করলেন না। আমার ঘোড়ার ঘাস পানির ব্যবস্থায়ও কোনরূপ কসূর দেখা গেল না। তাঁর সদ্যবহারে এবং আতিথেয়তায় খুবই সন্তুষ্টি বোধ করলাম।

আমার ফেরাসত দ্বারা সে ব্যক্তি সম্পর্কে যা ধারণা করেছিলাম তা ভুল প্রমাণিত হল দেখে ভাবলাম আমার শিক্ষা ভুল হবে অথবা এ লোকটির স্বভাব অবশ্যই অন্যরূপ হবে।

পরদিন সকালবেলায় আমি আমার খাদেমকে প্রস্তুত হতে বলে বাড়ীর মালিকের নিকট বিদায় চাইলাম। তাঁর প্রতি অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার পর বললাম, আপনি যদি কোন সময় মক্কা শরীফে যান তবে 'যি-তাওয়া' নামক স্থানে গিয়ে মুহাম্মদ বিন ইদ্রীসের বাড়ী অনুসন্ধান করবেন। আমি আপনাকে আমাদের মধ্যে দেখতে পেলে খুবই আনন্দবোধ করব।

তখন লোকটি বললেন, 'আপনার ভদ্র ব্যবহারে আমি সন্তুষ্ট। তবে আমি মনে করি আপনি আমার নিকট পূর্বে কোন বস্তু আমানত রাখেননি। কোনদিন আমার কোন উপকার করেছেন বলেও স্মরণ করতে পারছি না। কাজেই আমার পরিশ্রমের বিনিময়ে আপনার নিকট পারিতোষিক দাবী করছি।'

ইমাম শাফেয়ী বললেন, আপনার নিকট আমি কোন আমানত রাখি নাই বা আপনার কোন উপকারও আমার দ্বারা সাধিত হয় নাই। এখন আপনার পারিতোষিক কিভাবে আমি আদায় করতে পারি তা বুঝিয়ে দিন?

তখন সে প্রত্যেক কাজের বিনিময়ে বিভিন্ন পারিতোষিক দাবী করল। ইমাম শাফেয়ী বলেন, খাদেমের মারফতে আমি তা মিটিয়ে দিয়ে বললাম, আপনার কোন পারিতোষিক বাকী নেই তো। সে বলল, এখন শুধু ঘর ভাড়া বাকী রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী বললেন, আমি তাও আদায় করে দিলাম। তখন আমি নিশ্চিত হলাম যে, ইলমে- ফেরাসাত প্রকৃত পক্ষেই একটি ইলম।

মুহাম্মদ বিন সাঈদ হতে ইমাম হাকেম রেওয়য়াত করেন, আমি রবীর নিকট শুনেছি যে, ইমাম শাফেয়ী একদিন তার নিকট এসে বললেন, এক ব্যক্তি আমার নিকট আগমন করল। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি বোধ হয়

‘ছনআন’ দেশের অধিবাসী। সে ব্যক্তি তা স্বীকার করল। আমি তাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম যে, যথাসম্ভব আপনি লোহা-লঙ্করের কাজ করেন, সে ব্যক্তি তাও স্বীকার করল।

রবী বলেন, একবার ইমাম শাফেয়ীর সম্মুখ দিয়ে আমার ভাই অতিক্রম করলেন, তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এ ব্যক্তি কি আপনার ভাই? আমি তা স্বীকার করলাম। বললাম, হ্যাঁ, এ ব্যক্তি আমার ভাই। অথচ ইমাম শাফেয়ী এর পূর্বে কোন দিন আমার ভাইকে দেখেননি।

ইমাম বায়হাকী বলেন, একবার আমি ইমাম শাফেয়ীর সাথে জামে মসজিদে উপস্থিত ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি শায়িত ব্যক্তিদের মধ্যে কারো অনুসন্ধান করছিল। ইমাম শাফেয়ী রবীকে বললেন, আপনি গিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করুন যে, সে নীল চক্ষু বিশিষ্ট তাঁর কোন হাবশী গোলামকে হারিয়েছে কিনা। রবী গিয়ে লোকটির সাথে কথা বলল। লোকটি রবীর সাথে ইমাম সাহেবের খিদমতে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার গোলাম কোথায় রয়েছে? ইমাম সাহেব বললেন, আপনি এখন তাকে জেলখানায় পাবেন। লোকটি জেলখানায় গিয়ে তাঁর গোলামটিকে দেখতে পেলেন।

রবী এর তাৎপর্য জানতে চাইলে ইমাম শাফেয়ী বললেন, অনুসন্ধানকারী ব্যক্তি এসে যখন মসজিদে প্রবেশ করল, তখন হাবভাব দেখে আমি বুঝতে পারলাম যে, লোকটি কোন পলাতক ব্যক্তিকে খোঁজ করছে। অতঃপর যখন দেখলাম যে, লোকটি শায়িত হাবশী গোলামদের মধ্যে তালাশ করছে। তখন বুঝতে পারলাম যে, সে কোন গোলামকে খোঁজ করছে। এরপর লক্ষ্য করলাম যে, লোকটি তাদের চক্ষুর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করছে। তখন বুঝলাম যে, যার অনুসন্ধান করা হচ্ছে তাঁর চোখে কোন বিশেষত্ব আছে।

ইমাম বায়হাকী বলেন, আমি এ সমস্ত কথা শুনে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কিভাবে জানতে পারলেন যে, গোলামটি জেলখানায় রয়েছে। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বললেন, অভিজ্ঞতা হতে বুঝতে পেরেছি যে, গোলামের যদি পেট ভরা থাকে তা হলে ব্যভিচার করে। আর যদি ক্ষুধার্ত হয় তবে চুরি করে। ধারণা করলাম এ দু’টির একটা তো সে অবশ্যই করবে।

বদান্যতা

যুহদ, পরমুখাপেক্ষী না হওয়া, লোকদের থেকে পৃথক থাকা, বদান্যতা, অল্পে তুষ্টি, উদারতা, প্রভৃতি গুণ সর্বকালে উলামায়ে ইসলামের বৈশিষ্ট্য ও প্রতীক হিসাবে চলে আসছে। এ বিষয়ে ইমাম সাহেব পূর্বসূরীদের প্রতিচ্ছবি ছিলেন।

ইমাম সাহেব বলেন, বদান্যতার অর্থ এই যে, নিজের কোন দাবী বা কোন বস্তু কাউকে বিনা স্বার্থে দিয়ে দেওয়া। তা কয়েক প্রকারেই হতে পারে। করো ঋণ থাকলে তা ক্ষমা করে দেওয়া, নিজের প্রয়োজনের উপর অপরের প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিয়ে মিটিয়ে দেওয়া, অপরের উপকারার্থে নিজের জ্ঞান বুদ্ধি ব্যয় করা, অপরের সাহায্যার্থে নিজকে বিপদে পতিত করা, অপরের জীবন রক্ষার্থে নিজের জীবন বিপন্ন করা।

তিনি বলেন, কাউকে কোন কিছু প্রদান করে তাঁর নিকট হতে প্রতিদান আশা করতে নাই। তাকে কোনরূপ হয়ে প্রতিপন্ন করতেও নাই। দান করার সওয়াব বিনষ্ট হয়ে ক্ষতি হবার বহু আশংকা রয়েছে।

একবার খলীফা হারুনুর রশীদ ইমাম সাহেবের খিদমতে পঞ্চাশ হাজার দেরহাম হাদিয়াস্বরূপ পেশ করলেন। সেগুলো হতে তিনি চল্লিশ হাজার দেরহামগরীব, ইয়াতীম, বিধবা এবং অভাবগ্রস্থ আলেমদের মধ্যে বন্টন করে দিলেন।

ইমাম সাহেবের নিকট যে সমস্ত হাদিয়া উপটোকন পেশ করা হত প্রায় সময়ই সেগুলোর তিন চতুর্থাংশ গরীব-দুঃখী, বিধবা, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্থ আলেমদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন। এরপরও তিনি আল্লাহর নিকট সর্বদাই দো'আ করতেন, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে দুনিয়ার লোভ-লালসা হতে মুক্ত রেখো।

ইমাম সাহেবের অন্যতম বিশিষ্ট ছাত্র ইমাম মুয়ানী (রহঃ) বলেন, আমি ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) হতে অধিক দানশীল এবং বদাণ্য ব্যক্তি আর কাউকে দেখিনি। একদা ঈদের রাত্রে আমি তাঁর সাথে মসজিদ হতে বাড়ী ফিরছিলাম। পথে পথে একটি মাসয়ালা নিয়ে আলোচনা হলো। তাঁর বাড়ীর দরজায় একটি গোলামকে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখতে পাওয়া গেল। সে সালাম জানিয়ে আরজ করল, আমার মনিব হাদিয়া স্বরূপ এ অর্থপূর্ণ থলিটি আপনার খিদমতে পাঠিয়েছেন। ইমাম সাহেব সালামের জবাব প্রদান করে সেটি গ্রহণ করলেন। এ

সময় এক ব্যক্তি এসে বলল, হযরত! আজ আমার একটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। কিন্তু আমার হাতে একটি পয়সাও নাই। ইমাম সাহেব তৎক্ষণাৎ সে খলিটি তাকে দিয়ে দিলেন।

আরেক ঈদ রজনীর ঘটনা। ঘরে প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের অভাব। ইমাম সাহেবের স্ত্রী বললেন, আপনি তো সবার মঙ্গল কামনায় আপনার সময় ব্যয় করেন। আজ ঈদের রাত্রি। ঘরে প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের অভাব। কাজেই আপনি যদি কারো নিকট হতে কিছু অর্থ না আনেন তবে অন্য কোন উপায় দেখছি না।

ইমাম সাহেব এক ব্যক্তি হতে সত্তরটি দীনার ধার করে বাড়ী ফিরছিলেন। পথিমধ্যে কয়েকজন ফকীর-মিসকীন তাকে ছেকে ধরল। পঞ্চাশটি দীনার তিনি তাদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন। অবশিষ্ট বিশ দীনার নিয়ে বাড়ী ফিরলেন। স্ত্রীর নিকট হস্তান্তর করার পূর্বেই এক কোরাইশী বিপদগ্রস্থ ব্যক্তি এসে তাঁর অভাবের কথা বলল। তিনি সেই বিশ দীনার সে ব্যক্তির সম্মুখে রেখে বললেন, ভাই! তোমার যতটুকু প্রয়োজন সে পরিমাণ এগুলো হতে নিয়ে যাও। সে ব্যক্তি সব কয়টি মুদ্রা উঠিয়ে নিয়ে বলল, আমার প্রয়োজন মিটবে না।

ইমাম সাহেব তখন তার স্ত্রীর নিকট এসে সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করলেন। তিনি উত্তরে বললেন, এটা তো আপনার জন্য সাধারণ ব্যাপার।

পরদিন ভোর বেলায় খলীফা হারুনুর রশীদের মন্ত্রী জা'ফর বিন ইয়াহয়ার একজন দূত এসে ইমাম সাহেবকে সাথে নিয়ে গেল। জা'ফর তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করলেন। অতঃপর বললেন, আজ রাতে স্বপ্নযোগে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে আমাকে আপনার দানের কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। অতঃপর তিনি এক হাজার দীনার হাদিয়া স্বরূপ ইমাম সাহেবের নিকট পেশ করে তা গ্রহণ করার জন্য বহু অনুনয় বিনয় করেন। ইমাম সাহেব তা গ্রহণ করেন।

বাগদাদে অবস্থানকালে খলীফা হারুনুর রশীদ তার দারোয়ান ফযল বিন রবীকে নির্দেশ দিলেন- এফ্ফুনি মুহাম্মদ বিন ইদ্রীস হিজায়ীকে আমার নিকট নিয়ে এস। এ সময় তিনি তার বিশেষ সহচরদের সাথে মজলিসে উপবিষ্ট ছিলেন। তাঁর সম্মুখে তলোয়ার রাখা ছিল। ফযল বর্ণনা করেন, আমি ভয়ে ভয়ে ইমাম সাহেবের মজলিসে উপস্থিত হলাম। তখন তিনি নামায পড়ছিলেন। নামায শেষ হলে আমি বললাম, আমীরুল মুমেনীন আপনাকে স্বরণ করছেন। তৎক্ষণাৎ তিনি বললেন, বিসমিল্লাহ এবং দোআ পড়তে পড়তে আমার সাথে চললেন। আমি সামনে চলছিলাম এবং তিনি আমার পিছে পিছে আসছিলেন।

প্রাসাদের দরজায় পৌঁছে আমি ভিতরে প্রবেশ করলাম। আমার ধারণা ছিল তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য হারুনুর রশীদ দরজাতেই থাকবেন। আমি ইমাম সাহেবের আগমনের সংবাদ দিলাম। তিনি বললেন, সম্ভবতঃ তুমি তাঁকে আতঙ্কিত করে দিয়েছ। ইমাম সাহেব ভিতরে প্রবেশ করলেন। তাঁকে দেখে খলীফা হারুনুর রশীদের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আগে বেড়ে মুছাফাহা, মু'আনাকা (আলিঙ্গন) করলেন এবং বললেন, হে আবু আদ্দিনা! আমাদের এ অধিকার নেই যে, দূত মারফত সংবাদ দিয়ে আপনাকে ডেকে আনার। আমাদেরই আপনার নিকট যাওয়া উচিত ছিল। আমরা ক্ষমাপ্রার্থী। আমরা আপনার জন্য চার হাজার দীনার (অন্য এক বর্ণনামতে দশ হাজার দীনার) হাদিয়া দেয়ার নির্দেশ দিয়েছি। ইমাম সাহেব তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। হারুনুর রশীদ বললেন, এগুলো গ্রহণ করার জন্য আমি আপনাকে জোর অনুরোধ জানাচ্ছি। আপনি গ্রহণ করে নিন। ফযল এ অর্থ তাঁর সাথে পাঠিয়ে দাও।

ইমাম সাহেবের দারিদ্রতা এবং অমুখাপেক্ষীতা এমন ছিল যে, বাগদাদে বিরাট অংকের অর্থ গ্রহণ করেননি। আর যখন তিনি মিশর গমন করেন সেখানে তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী এবং ভক্তরা তাত্ক্ষণিকভাবে তিন হাজার দীনার সংগ্রহ করে দেন, তিনি তা সানন্দে কবুল করেন। কারণ এটা হচ্ছে আহলে ইলম মুত্তাকীদের পক্ষ থেকে ইলমী এবং দ্বীনি সহায়তা ও সহযোগীতা আর তা ছিল রাজকীয় ইহসান বা অনুগ্রহ।

ইমাম সাহেব ইয়ামানের সরকারী চাকুরী ছেড়ে যখন মক্কায় আসেন তখন তাঁর নিকট দশ হাজার দীনার ছিল। শহরের বাইরে তাঁবু খাঁটিয়ে অবস্থানকালে বেশ লোক তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে যায়। এদের মধ্যে গরীব লোকও ছিল। তিনি তাদের মধ্যে সম্পূর্ণ অর্থ বন্টন করে দেন। এরপর মক্কায় এসে ঋণ গ্রহণ করেন।

রবী বর্ণনা করেন, ইমাম সাহেব প্রত্যেকদিনই দান করতেন। রমযানে ফকীর মিসকীনদেরকে প্রচুর অর্থ ও কাপড়-চোপড় দান করতেন।

একব্যক্তি ইমাম সাহেবের জামার বুতাম ঠিক করে দিলে তিনি তাঁকে এক দীনার দিয়ে দেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে বললেন যে, আমার নিকট এ ছাড়া আর নেই। একব্যক্তি তাঁর বেত উঠিয়ে দিল। তিনি তাকে দীনারের এক খলি দিয়ে দিলেন। আমরা মিশর শহরে অনেক দানশীল দেখেছি কিন্তু ইমাম সাহেবের মত কাউকে দেখিনি। কেউ তাঁর নিকট কিছু প্রার্থনা করলে যদি

দেওয়ার মত তাঁর নিকট কিছু না থাকত তবে লজ্জায় তাঁর চেহারা পরিবর্তন হয়ে যেত। একবার তিনি হাম্মামে গোসল করতে গেলেন। গোসল করে হাম্মামের মালিককে বেশ অর্থ দিয়ে দেন।

অপ্সেতুষ্টি

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন, বিশ বৎসর যাবৎ আমি কোনদিন পেট পুরে আহা করিনি। লোভ-লালসাকে কখনো আমি প্রশ্রয় দেইনি। এতে আমি সর্বদা প্রশান্তি অনুভব করতাম। এর ফলে কোনদিন কারো নিকট আমাকে হয় হতে হয়নি।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) সব সময়ই লোভ-লালসাকে ঘৃণার চোখে দেখতেন। লোভের বশবর্তী হয়ে মানুষ অনেক ঘৃণিত কাজও করে বসে। এর অপকার সম্বন্ধে কোরআন পাকের অনেক জায়গায় বর্ণনা রয়েছে।

খলীফা হারুনুর রশীদ একবার ইমাম সাহেবকে সবিনয়ে বললেন, আপনি যে শহর পছন্দ করেন আপনাকে সে শহরের কাজী পদে নিয়োগ করব। ইমাম সাহেব সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দেন।

সৎচরিত্রতা এবং সরলতা

ইমাম সাহেব প্রাণবন্ত বুয়ুর্গ এবং প্রফুল্ল আলেম ছিলেন। তিনি আপন শাগরেদ এবং ভক্তদের প্রতি সহৃদয় ছিলেন। তাদের সাথে অত্যন্ত স্নেহ এবং ভালবাসার আচরণ করতেন।

তিনি বলতেন,

اهين لهم نفس لاکرامهم بها + ولن تکرّم النفس التي الاتهينها

আমি তাদের (ছাত্রদের) সামনে তাদের সম্মানার্থে নিজেকে হীন করে দেই, আর যে ব্যক্তি তার নফসকে নীচু না করবে তার সম্মান করা হবে না।

একবার ছাত্ররা কোন বিষয়ে পীড়াপীড়ি করলে তিনি বললেন, তোমরা যদি এরূপ না কর তবে আমি সে কথাই বলব যা ইবনে সীরীন জর্নেক একগুঁয়ে ব্যক্তিকে বলেছিলেন,

যদি তুমি আমাকে এমন বিষয়ে বাধ্য কর যা করার ক্ষমতা আমার নেই তাহলে আমার চরিত্রের যা তোমাকে আনন্দিত করে তাই তোমাকে অসন্তুষ্ট করে দেবে।

তাঁর প্রিয় ছাত্র যা'ফরানী প্রথম প্রথম তার খানা নিজ বাড়ীতে তৈরী করাতেন। ইমাম সাহেবের পছন্দনীয় খাদ্যের তালিকা লিখে খাদেমাকে দিতেন। একদিন ইমাম সাহেব খাদেমাকে ডেকে খাদ্যের তালিকা দেখলেন। সেখানে আরও একটি পছন্দনীয় খাদ্যের নাম বৃদ্ধি করে দিলেন। দস্তুরখানের উপর যখন খানা আনা হয় তখন নতুন একটি খানা দেখে যাফরানী বিস্মিত হয়ে বললেন, আমার ইচ্ছা ব্যতীত এ খানা কিভাবে এল। খাদেমাকে ডেকে যখন খাদ্যের তালিকা দেখলেন, তখন দেখতে পেলেন সেখানে ইমাম সাহেবের কলমে লিখা নতুন একটি খাদ্যের নাম। ইমাম সাহেবের এ লৌকিকতামুক্ত কাজে যাফরানী এত খুশী হলেন যে তৎক্ষণাৎ একটি বাঁদীকে আযাদ করে দিলেন।

বুওয়াইতী বলেন,

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্মল চরিত্রের অধিকারী ছিলেন।

ইমাম সাহেব বলেন, আমি মক্কায় এক কুরাইশী রমনীকে বিয়ে করেছিলাম। তাকে কৌতুক করে বলেছিলাম,

و من البلية ان تحب + فلا تحبك من تحبه

এটা তো বড়ই বিপদের কারণ যে, তুমি কাউকে ভালবাসবে আর তুমি যাকে ভালবাসবে সে তোমাকে ভালবাসবে না। এর উত্তরে সে মহিলা বলেছিল,

و يصد عنك بوجهه + و تلح انت فا تغته

আর সে তোমাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নেবে আর তুমি পীড়াপীড়ি করবে তার সামনে থাকতে।

একবার ইমাম শাফেয়ী, ইয়াহইয়া বিন ময়ীন, এবং আহমদ বিন হাশল (রহঃ) মক্কায় গমন করেন। একই জায়গায় তাঁরা অবস্থান করেন। রাত্রে ইমাম শাফেয়ী এবং ইয়াহইয়া বিন ময়ীন শুয়ে পড়লেন। ইমাম আহমদ বিন হাশল নামাযে রত হয়ে গেলেন। সকাল বেলায় ইমাম শাফেয়ী বললেন, আজ রাত্রে আমি মুসলমানদের জন্য দু'শত মাসয়ালা সমাধা করেছি। ইয়াহইয়া বিন ময়ীনকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি করেছেন? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীছ দু'শত মিথ্যাবাদী রাবী থেকে রক্ষা করেছি। আহমদ বিন হাশলকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, নফল নামাযে আমি এক খতম কোরআন পড়েছি।

ইবাদত, রিয়াযত, যুহুদ এবং তাকওয়া

রবী বর্ণনা করেন, ইমাম সাহেব প্রতিরাতে এক খতম কোরআন পড়তেন। রমযানে রাতে দিনে দু'খতম পড়তেন। এক বর্ণনায় রয়েছে, রমযানে তিনি নামাযে ষাট খতম পড়তেন।

বাহুর বিন নছর বলেন, আমরা যখন কাঁদতে চাইতাম পরস্পরকে বলতাম, এ মুত্তালেবী যুবকের নিকট চল, সে কোরআন পড়বে। আমরা তাঁর নিকট এলে তিনি কোরআন তেলাওয়াত শুরু করতেন। তখন আমরা তাঁর কোরআন তেলাওয়াত শুনে উচ্চস্বরে কাঁদতে শুরু করতাম। এ অবস্থা দেখে ইমাম সাহেব তেলাওয়াত বন্ধ করে দিতেন। কোরআন তেলাওয়াতের মধুর আওয়াযের দরুন এরূপ হত।

হুসাইন বিন আলী কারাবেসী বলেন, ইমাম সাহেবের সাথে আমি কয়েক রাত কাটিয়েছি। তিনি রাত্রের তৃতীয়াংশ পর্যন্ত নফল নামাযে পঞ্চাশ হতে একশ আয়াত তেলাওয়াত করতেন। প্রত্যেক আয়াতে মুসলমানদের জন্য দোআ করতেন, শান্তির আয়ত্ত এলে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইতেন।

ইমাম সাহেব বর্ণনা করেন, আমি স্বপ্নে দেখতে পেলাম যে, হযরত আলী (রাঃ) আমাকে সালাম করে মুছাফাহা করলেন এবং তাঁর আংটি বের করে আমাকে পরিয়ে দিলেন। এ স্বপ্নের বৃত্তান্ত আমার চাচার নিকট উল্লেখ করলাম। তিনি বললেন, হযরত আলীর (রাঃ) সাথে মুছাফাহা করার অর্থ (আযাব) শান্তি থেকে নিরাপত্তা। আর আংটির ব্যাখ্যা এই যে, পৃথিবীর যে স্থান পর্যন্ত হযরত আলীর নাম পৌঁছেছে সে পর্যন্ত তোমার নাম পৌঁছবে।

মুহাম্মদ বিন আব্দিল্লাহ বিন আব্দিল হাকীম বলেন, আমরা পরস্পরে বসে মুত্তাকী এবং সংসার বিরাগীদের সম্বন্ধে আলোচনা করছিলাম। হযরত যুন্নুন মিসরী (রহঃ) সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা হচ্ছিল। এমন সময় জনৈক প্রখ্যাত আলেম ও বুয়ুর্গ এসে বললেন, ভাইয়েরা! আমার মতে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) সবচেয়ে বড় মুত্তাকী, ইবাদতকারী এবং সংসার বিরাগী। তিনি আত্মহার্য অবস্থায় কোরআন তেলাওয়াত করে থাকেন। সাংসারিক ঝামেলা হতে তিনি সম্পূর্ণ দূরে অবস্থান করেন। আমীর-ওমরারহর তিনি পরোয়া করেন না। একবার আমি এবং ইমাম মুয়ানীর গোলাম ইমাম শাফেয়ীর সাথে ছাফা পাহাড়ে যাচ্ছিলাম। ঘটনাক্রমে গোলামটি **هذا يوم الفصل** এ আয়াত পাঠ করলেন। ইমাম শাফেয়ী এ আয়াতটি শুনে কেঁপে উঠলেন এবং অস্থির হয়ে রোদন করতে লাগলেন। তাঁর মধ্যে খোদাভীতি অত্যন্ত প্রবল ছিল।

রবী বিন সুলাইমান বলেন, ইমাম সাহেবের সংগে আমি হজ্জু গেলাম। হজ্জের প্রতিটি কার্য পালনের সময় অধীর হয়ে ক্রন্দন করছিলেন। আর অত্যন্ত তনুয় হয়ে এ কবিতাটি পাঠ করছিলেন—

ال النبي ذريقتي + و هم اليه و سيلتي
ارجو بان اعطى هذا + بيدي اليمنى صحيفتي

রাসূলের বংশধর আমার অবলম্বন। আল্লাহর দরবারে তারা আমার নাজাতের কারণ। এ কারণেই আমি আশা করছি যে, আমার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর কোরআন তিলাওয়াত এতই মর্মস্পর্শী ছিল যে, নামাযে কিংবা কোন মজলিসে তিলাওয়াত করলে মুসল্লী এবং শ্রোতাদের মধ্যে কান্নার রোল পড়ে যেতো।

সুন্নতের পাবন্দী

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) বলেন, ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর নিয়ম ছিল তাঁর প্রদত্ত ফতোয়ার খেলাফ যদি কোন হাদীছ পাওয়া যেতো তবে তৎক্ষণাৎ প্রকাশ্যে ঘোষণা করে দিতেন যে, আমি আমার পূর্বের ফতোয়া হতে প্রত্যাবর্তন করছি।

ইমাম মুয়ানী, রবী বিন সুলাইমান এবং অপরাপর ছাত্রদের সাথে ইমাম সাহেব প্রায়শঃ বলতেন, আমি যে কয়টি কিতাব লিখেছি, সেগুলো যথাসাধ্য সতর্কতা এবং দলীল সহকারে লিখতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমি মানুষ। আমার ভুল হওয়াটাই স্বাভাবিক। কাজেই আমার প্রণীত কিতাবে যদি কোন মাসয়ালা কোরআন এবং সুন্নাহর খেলাফ হয়ে থাকে এবং তোমরা তা অনুধাবন করতে পার তবে ধরে নিবে আমি তা হতে প্রত্যাবর্তন করছি। আর একথাও স্মরণ রেখো যে, আমি যদি কোন সহীহ হাদীছ জানতে পারি এবং তদানুসারে আমল না করি তবে বুঝতে হবে আমার বুদ্ধির ক্রটি ঘটেছে।

স্বীয় অভিমতের ব্যাপারে তিনি কখনো জেদের বশবর্তী হতেন না। তাঁর কোন মাসয়ালা ভুল প্রমাণিত হলে তিনি তা সংশোধন করে নিতে বিলম্ব করতেন না। ইমাম আহমদ (রহঃ)কে বলতেন, হাদীছের ব্যাপারে আপনার দৃষ্টি আমার দৃষ্টিতে অধিক তীক্ষ্ণ। কাজেই, আমার ফতোয়ার খেলাফ কোন হাদীছ যদি আপনার পরিদৃষ্ট হয় তবে অবিলম্বে আপনি তা আমাকে জানিয়ে দিবেন। এতে আমার পক্ষে নিজেকে সংশোধন করে নেয়া সম্ভব হবে।

তাঁকে অনেক বিতর্ক সভায় যোগদান করতে হত। তিনি অত্যন্ত বিনীত ও নম্রভাবে অপর পক্ষের প্রশ্নের জবাব দিতেন। তিনি বলতেন, আমার বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য কারো সাথে কোনদিন তর্ক-বিতর্ক করি নাই। সত্য প্রচার এবং সত্যকে প্রতিষ্ঠা করাই আমার উদ্দেশ্য ছিল।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত সত্যপ্রিয়। মিথ্যাকে তিনি প্রচণ্ডভাবে ঘৃণা করতেন। তিনি বলতেন, সারা জীবনে আমি একদিনও মিথ্যা বলি নাই। মিথ্যা শপথ তো দূরের কথা, সত্য শপথও আমি কোন দিন করি নাই।

তার কিতাবাদি সম্বন্ধে তিনি বলতেন, আমি খোদার নিকট প্রার্থনা করছি যে, আমার জাতি আমার লেখা বুঝুক এবং তদানুসারে আমল করুক।

বুয়ুর্গদের প্রতি আদব শ্রদ্ধা

ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) সম্বন্ধে কোন এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বললেন, জেনে রাখুন! ফিকহবিদগণ ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর আওলাদ ও পোষ্যবর্গ।

অন্য এক ব্যক্তি সুফিয়ান বিন উয়াইনা এবং ইমাম মালেক (রহঃ) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, এ দুই ব্যক্তি না থাকলে হেজাজ হতে ইলমে হাদীছ বিলীন হয়ে যেত।

যখনই তিনি ইমাম মালেক (রহঃ)-এর কোন কথার উদ্ধৃতি দিতেন, তখনই বলতেন, এটা আমাদের উস্তাদ ইমাম মালেকের অভিমত। তিনি প্রায়ই বলতেন, ইমাম মালেকের সাথে আমাদের কোন তুলনা হতে পারে না।

ছাহাবাদের প্রসঙ্গে তিনি বলতেন, ইজতিহাদ, পরহেযগারী এবং জ্ঞানে তাঁরা আমাদের চেয়ে শত সহস্রগুণ শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

একবার এক ব্যক্তি মাসয়লা জিজ্ঞাসা করলেন যে, কোন ব্যক্তি পদব্রজে কা'বায় পৌঁছার শপথ করল। কিন্তু সে তা কার্যে পরিণত করতে পারল না। এখন তার ব্যাপারে শরীয়তের কি নির্দেশ? তিনি বললেন, তাকে কাফ্ফারা আদায় করতে হবে। আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আন্তার বিন রাবাহ এইরূপ মত পোষণ করেন।

বিনয়

ইমাম সাহেব বলেন, বিনয় প্রদর্শনের নির্দেশ এজন্য দেওয়া হয়েছে যেন কোন ব্যক্তি নিজ শক্তি এবং অর্থের অপব্যবহার না করে। আচার-আচরণে যেন

কোন দুঃখীর মনে কোন প্রকার আঘাত কিংবা ব্যাথা না আনতে পারে। রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন খোদা আমার প্রতি ওহী নাযিল করেছেন যেন তোমরা বিনয় অবলম্বন কর। কেউ কারো প্রতি যেন অবিচার না কর। কারো প্রতি যেন অহংকার প্রদর্শনের কোনরূপ প্রবৃত্তি না জন্মে।

উপযুক্ত লোককে তিনি শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতেন। কারো কোন কৃতিত্ব দেখলে তিনি তাকে পুরস্কার দ্বারা ভূষিত করতেন। একবার তিনি কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে দেখতে পেলেন যে, এক ব্যক্তি তীরন্দাজি শিক্ষা করছে। লোকটির তীর লক্ষ্যস্থল ভেদ করতে দেখে ইমাম সাহেব তাকে স্বীয় পকেট হতে তিনটি দিনার বের করে পুরস্কার স্বরূপ দিলেন। অতঃপর অনুশোচনা করে বললেন, আমার নিকট আরো দীনার থাকলে এত অল্প দীনার দ্বারা আপনাকে পুরস্কৃত করতাম না।

বন্ধু-বান্ধব এবং শাগরেদদের আপ্যায়ন করার জন্য তিনি একটি দাসীকে নিয়োজিত করে রেখেছিলেন। হালুয়া প্রস্তুত করার ব্যাপারে সে পারদর্শী ছিল। তাঁর দ্বারা হালুয়া তৈরী করিয়ে তিনি বন্ধু-বান্ধবদের প্রায়ই আপ্যায়ন করতেন। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে তিনি সদয় এবং নম্র ব্যবহার করতেন। তাদেরকে আহ্বার করাতে পেরে তিনি পরম সন্তুষ্টি লাভ করতেন।

কেউ যদি ইমাম সাহেবের সামান্য পরিমাণও উপকার করত তবে তিনি তার শতগুণ অধিক উপকার করতেন। তার প্রতি কৃতজ্ঞও থাকতেন।

হুকের আলী এবং শিয়া মতবাদ

গ্রহণের অপবাদ

হযরত আলী এবং হযরত উছমান (রাঃ) সম্বন্ধে দুটি ভিন্ন দল ছিল। একদল 'উলুবী' এবং অপর দল 'উছমানী।' ইমাম শাফেয়ীর যামানায়ও ছাহাবায়ে কিরামের মতভেদের কারণে সৃষ্ট দুটি দল 'উলুবী' এবং 'উছমানী' বাকী ছিল। প্রত্যেক মহৎ ব্যক্তিত্বের সম্পর্কে তারা এ দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবেচনা করে। সামান্য ব্যাপারে নিজের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করত। তদুপ ইমাম সাহেবের মধ্যে কতক লোকে শিয়াবাদের গন্ধ পেয়েছে। কারণ, তিনি হযরত আলী, রাসূল ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধরদেরকে ভালবাসতেন। ইমাম সাহেব হাশেমী মুত্তালেবী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাত ভাই। স্বপ্নযোগে তিনি হযরত আলীর সাথে মুছাফাহা এবং মু'আনাকা (আলিঙ্গন) এর

সৌভাগ্য অর্জন করেন এবং তাঁর আংটি পরেন। এসব কারণে তিনি হযরত আলী, আবু তালেব এবং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধরের সম্মান দেখাতেন। এ বিষয়টি কারও নিকট সন্দেহ লাগল এবং সে সময়ের সাধারণ নিয়মানুসারে ইমাম সাহেবের ব্যাপারে শিয়াবাদের ধারণা করল।

একবার ইমাম সাহেব কোন একটি মজলিসে উপস্থিত হলেন। সেখানে আবু তালেবের বংশের কয়েকজন আলেম উপস্থিত হলেন। ইমাম সাহেব বললেন, এঁদের সামনে আমি কোন কথা বলব না। এঁরা সম্মানিত ব্যক্তি। একদিন একব্যক্তি তাঁকে একটি মাসয়ালা জিজ্ঞেস করল। ইমাম সাহেব উত্তর দিলেন। প্রশ্নকারী বলল, আপনি হযরত আলীর (রাঃ) মতের বিপরীত ফতোয়া প্রদান করেছেন। ইমাম সাহেব বললেন, তুমি এ মাসয়ালাটি হযরত আলীর (রাঃ) মতানুসারে প্রমাণ কর; আমি আমার মুখমণ্ডল মাটিতে রেখে দিব এবং আমার মত থেকে প্রত্যাবর্তন করব।

কাযী আয়ায লিখেন, একবার কিছু লোক এসে ইমাম সাহেবকে বলল আপনার মধ্যে শিয়ার নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে। আপনি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধরকে মুহব্বত করেন। ইমাম সাহেব বললেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি বলেননি

لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده والده و الناس اجمعين *

তোমাদের কেউই পূর্ণ মুমিন হতে পারবে না- যদি না সে আমাকে তার পিতা-পুত্র এবং সমস্ত মানুষ থেকে অধিক ভালবাসে?

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এও বলেছেন যে, মুত্তাকী লোক আমার বন্ধু এবং আত্মীয়। আর মুত্তাকী এবং নেককার আত্মীয়দের ভালবাসার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ অবস্থায় আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেককার আত্মীয় স্বজনকে ভালবাসব না কেন? এরপর এ কবিতা পড়লেন-

يا ركبنا فم مصب من منى + و اهتف لياكن خيبتها و الناهض
سحرا اذا. فاضى الجحيع الى منى + فيضا كما تلطم الخليج الفائض
ان كان رفضا خب ار محمد + فلبشهد الثقلان انى رافض

হে সওয়ার! প্রাতে যখন হাজীগণ উপত্যকার ঢলের ন্যায় মুযদালিফা হতে মিনার দিকে গমন করে তখন তুমি মুহাছোব উপত্যকায় দাঁড়িয়ে প্রত্যেক গমনকারী এবং অবস্থানকারীকে আহ্বান করে বল যদি মুহাম্মদের (ছাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বংশধরকে ভালবাসা রফয্ (শিয়া মতবাদ) হয়ে থাকে তবে মানব এবং জিন প্রত্যেকেই সাক্ষী থাকুক যে, আমি একজন রাফেয়ী।

ইমামগণ এবং সমসাময়িকদের রায়

রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ দোয়াটি বর্ণিত রয়েছে—

اللهم اهد فریسا فان عالمها بلاء طباق الارض علما + اللهم كما اذفنه عذابا

فاذفهم نوارا

হে আল্লাহ! কুরাইশদেরকে হেদায়াত দাও। কারণ তাদের আলেম ইলম দিয়ে দুর্নিয়া পরিপূর্ণ করবে। হে আল্লাহ! যেমনি তুমি তাদেরকে শাস্তি দিয়েছ তেমনি তাদের নেয়ামতও দান কর।

আবু নযীম আব্দুল মালেক বিন মুহাম্মদ বলেন, এ হাদীছে কুরাইশ আলেম দ্বারা ইমাম শাফেয়ীকে বুঝানো হয়েছে। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বলেন, প্রত্যেক শতাব্দীর শুরুতে আল্লাহ তাআলা এমন একজন আলেমে দ্বীন সৃষ্টি করেন- যিনি লোকদেরকে সুন্নাত শিক্ষা দেন এবং রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে প্রতিরক্ষার কাজ করেন। আমরা দেখেছি যে, প্রথম শতাব্দীর শুরুতে উমর বিন আব্দিল আজীজ এবং দ্বিতীয় শতাব্দীর শুরুতে ইমাম শাফেয়ী একাজ সমাধা করেছেন।

ইসহাক বিন রাহওয়ে বলেন, ইমাম শাফেয়ীর মক্কায় অবস্থানকালে আমি তাঁর নিকট গিয়েছিলাম। আহমদ বিন হাম্বল পূর্ব থেকেই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, আবু ইয়াকুব! এ ব্যক্তির (শাফেয়ীর) দরসে বস। আমি বললাম, আমি তাঁর নিকট বসে কি করব। আমার বয়স তাঁর বয়সের কাছাকাছি। তাঁর কারণে কি আমি ইবনে উয়াইনা এবং মুকরীর দরস ছেড়ে দিব? আহমদ বিন হাম্বল বলেন, ইবনে উয়াইনার দরসী মজলিস পরেও পাওয়া যাবে। কিন্তু শাফেয়ীর মজলিস পাওয়া যাবে না।

আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর হুমাইদী বর্ণনা করেন, আহমদ বিন হাম্বল আমাদের এখানে মক্কায় সুফিয়ান বিন উয়াইনার নিকট অবস্থান করছিলেন। একদিন তিনি আমাকে বললেন, এখানে একজন কুরাইশী আলেম আছেন। আমি নাম জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, তিনি হচ্ছেন মুহাম্মদ বিন ইদ্রীস শাফেয়ী। বাগদাদে তিনি তাঁর দরসে অংশ নিয়েছিলেন। তাঁর পীড়াপিড়িতে আমরা তাঁর দরসে গেলাম। কয়েকটি মাসয়লা নিয়ে আলোচনা হল। সেখান থেকে উঠে আসার পর আহমদ বিন হাম্বল বললেন, তাকে কেমন মনে হল? কুরাইশী আলেমের

ইলমে এবং তাঁর বলার পদ্ধতিতে কি খুশী হওনি? তাঁর এ কথা আমার অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে গেল। আমি ইমাম শাফেয়ীর মজলিসে বসতে শুরু করলাম। তাঁর মজলিসের সামনে সুফিয়ান বিন উয়াইনার মজলিস নিস্তেজ হতে লাগল। এরপর আমিও ইমাম সাহেবের সাথে মিশর চলে গেলাম।

মুহাম্মদ বিন ফযল বায্বায তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, একবার আমি আহমদ বিন হাম্বলের সাথে হজ্জ্বে গেলাম। সেখানে আমরা এক স্থানেই অবস্থান করছিলাম। আমি ফজরের নামায পড়ে আহমদ বিন হাম্বলের খোঁজে মসজিদে হারামের প্রত্যেকটি দরসে গেলাম। দেখলাম তিনি এক গ্রাম্য যুবকের নিকট বসে আছেন। তাঁর নিকট গিয়ে বললাম, আবু আদিল্লাহ! আপনি সুফিয়ান বিন উয়াইনার মজলিস বাদ দিয়ে এখানে বসে আছেন অথচ সেখানে ইবনে শিহাব যুহরী, আমর বিন দীনার, যিয়াদ বিন আলাকা এবং অনেক তাবেঈন উপস্থিত রয়েছেন। আহমদ বিন হাম্বল বললেন, চুপ থাক! কোন হাদীছের যদি সনদে আলী (স্বল্প মাধ্যমের সনদ) পাওয়া না যায়' তবে তাঁর সনদে সাফেল (অধিক মাধ্যমের সনদ) পাওয়া যাবে। এতে দ্বীন অথবা আকলের (জ্ঞানের) কোন ক্ষতি হবে না। আর যদি তুমি এ যুবকের জ্ঞান (আকল) না পাও তবে আমার ধারণায় কিয়ামত পর্যন্ত তা পাবে না। আমি কিতাবুল্লাহ সম্পর্কে এর চেয়ে অধিক জ্ঞানী কাউকে দেখিনি। আমি জিজ্ঞেস করলাম ইনি কে? তিনি বললেন, ইনি মুহাম্মদ বিন ইদ্রীস শাফেয়ী।

আবু ছত্তর বলেন, আমার মতে ছত্তরী এবং নখয়ী হতে ফিকাহ সম্পর্কে শাফেয়ী অধিক অভিজ্ঞ।

জটনৈক রাবী বর্ণনা করেন, মুহাম্মদ বিন হাসান ইমাম শাফেয়ীর যে পরিমাণ সম্মান করতেন অন্য কোন আহলে ইলম তা করতেন না।

হেলাল বিন আলা বলেন, ইমাম শাফেয়ী ইলমের তালা খুলে দিয়েছেন। ইবনে হিশাম বলেন, অভিধানের বিষয়ে ইমাম শাফেয়ী হুজ্জাত (প্রমাণ) স্বরূপ।

মিশরে একবার ইমাম শাফেয়ী এবং ইবনে হিশামের মধ্যে পুরুষদের 'নস্ব' (বংশধারা) নিয়ে আলোচনা হল। কিছুক্ষণ পর ইমাম শাফেয়ী বললেন, এ বিষয় বাদ দিন। এটা আমাদের সবার জানা আছে। মেয়েদের নস্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন। এ বিষয় নিয়ে যখন আলোচনা হল ইবনে হিশাম চুপ হয়ে গেলেন এবং বললেন, আমি জানতাম না যে আল্লাহ তাআলা এমন আলেম সৃষ্টি করেছেন।

কারামত

রোমসম্রাট প্রতি বৎসর বাগদাদে খলীফা হারুনুর রশীদের নিকট কর প্রেরণ করতেন। একবার রোমের শাসনকর্তা খলীফার দরবারে এই বলে কয়েকজন পাদ্রী পাঠালেন যে, আমার রাজ্যের একজন তত্ত্ববিদ পণ্ডিতের সঙ্গে তর্ক করে যদি আপনার রাজ্যের মুসলমান পণ্ডিতগণ জয়ী হতে পারেন তবেই আমি রীতিমত কর আদায় করব। অন্যথায় আপনি আর আমার নিকট হতে কর চাইবেন না।

রোম হতে আগত পাদ্রীদের সংখ্যা ছিল চারশত। তাদের সাথে তর্ক করার জন্য খলীফা হারুনুর রশীদ দজলা নদীর তীরে আলেমদেরকে সমবেত করলেন। অতঃপর ইমাম সাহেবকে বললেন, এ ক্ষেত্রে আপনাকে সর্বপ্রথম এগিয়ে যেতে হবে।

উভয় পক্ষ নদীর তীরে উপস্থিত হলে ইমাম সাহেব একখানা মুসল্লা কাঁধে করে নিয়ে পাঁয়ে হেঁটে নদীর উপর চলে গেলেন। পানির উপর মুসল্লা বিছিয়ে দিয়ে বললেন, আমার সাথে যার বহছ করার ইচ্ছে হয় সে এখানে চলে আসুক।

এটা দেখে খৃষ্টানরা অবাক হয়ে রইল। এমনকি তাদের অনেকেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ফেলে। রোম সম্রাটের দরবারে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি বললেন, খোদার শোকর যে, তিনি এ দেশে আসেননি। তিনি যদি এ দেশে আসতেন তবে সারা রোম সাম্রাজ্যের খৃষ্টানরা মুসলমান হয়ে যেতো।

অবয়ব ও গঠন প্রকৃতি

ইমাম মুযানী বর্ণনা করেন, আমি ইমাম শাফেয়ী হতে অধিক সুন্দর মানুষ দেখিনি। তাঁর গণ্ড দুটি ছিল হালকা পাতলা। তাঁর শাশ্রু ছিল এক মুষ্টি পরিমাণ লম্বা। তিনি মেহেদীর কেঁযাব ব্যবহার করতেন। তিনি আতর এবং সুগন্ধি খুবই পছন্দ করতেন। যে স্তম্ভের উপর হেলান দিয়ে তিনি দরসে বসতেন তাতে সুগন্ধি মাখান হত। তাঁর স্বভাব ছিল কোমল এবং পবিত্র। পোষাক-পরিচ্ছদ এবং খাদ্যের প্রতি বিশেষভাবে যত্নবান ছিলেন। স্মরণ শক্তি বৃদ্ধির জন্য তিনি অধিকাংশ সময় লুবান বা গুঁগুঁল ব্যবহার করতেন। এর ফলে একবার তিনি এক বৎসর পর্যন্ত নাকসীর (নাক দিয়ে রক্ত বের হওয়া) রোগে আক্রান্ত ছিলেন।

জ্ঞানসূলভ বাণী

জ্ঞান-বুদ্ধি, হাদীছ, ফিকাহ, সাহিত্য, কাব্য, বংশ, পরম্পরা ইতিহাস এসব

বিষয়ে ইমাম সাহেবের বিশেষ দক্ষতা ছিল। কাব্য সাহিত্য, অভিধান এবং আরবীয়াতের প্রতি বিশেষ আগ্রহ ছিল। তিনি কবিতা রচনা করতেন, কিন্তু উলামাদের জন্য কবিতা বলা অনুচিত মনে করতেন। তাই তিনি সেদিকে মনোযোগ দেননি। তিনি স্বয়ং বলেন-

و لو لا الشعر بالعلماء يزيدى + لكنت اليوم اشعر من لبيد

কাব্য রচনা যদি উলামাদের জন্য দোষণীয় না হত তবে আমি এ যমানায় লবীদ বিন রবীয়া হতেও শ্রেষ্ঠ কবি হতাম।

তিনি বলতেন, আমি কাব্যরচনা, সাহিত্য এবং ভাষা দ্বীনের সহায়ক হিসেবে অর্জন করেছি। ইমাম সাহেবের জ্ঞানের বাণীতে আরবী সাহিত্য এবং রচনার স্বাদ পাওয়া যায়। সেগুলোতে জ্ঞান এবং বুদ্ধির সাথে সাথে ভাষা-অলঙ্কারের চাশনিও রয়েছে। একদিন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল- বলুন, কি অবস্থা? তিনি উত্তর দিলেন,

كيف اصبح مت يطلبه الله باقران و النبي صلى الله عليه و سلم بالسنة و
الحقظت بما ينطق و الشيطان بالمعاصى و الدهريصر و فد و النفس شهواتها العيال
باقوت و ملك الموب يقض دوحه *

তার অবস্থা কেমন হবে যার কাছে আল্লাহ তাআলা কোরআনের, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুনুতের, শয়তান, গোনাহর, যমানার বিপদ-আপদের, নফস, আপন খাহেশের, পরিবার-পরিজন, অন্ন এবং মালাকুল মউত রুহ কবজ করার দাবী জানাচ্ছে।

জনৈক ব্যক্তি তাঁর সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন,

اما و الله لقد كان مئلاً العيون جحالا و الاذان بيانا *

‘খোদার কসম! সে ব্যক্তি সৌন্দর্য দিয়ে চক্ষু পূর্ণ করে দেয় আর কথা দ্বারা কান পূর্ণ করে দেয়।’

তার এ সাহিত্যপূর্ণ কথা শুনে এক ব্যক্তি এ কথাটি আবার বলার অনুরোধ করলে তিনি বললেন,

‘আমি তোমার সামনে আবার তা বললে, খোদার কসম সেখানে আমি ভুল করব না, কাউকে চুপ করিয়েও দিব না এবং কারো সাফাই বর্ণনা করব না।’

ইলম শিক্ষার সম্পর্কে তিনি বলেন-

لا يطلب هذا العلم احد بامال و عز النفس فيفعل و لكن من طلبه بذلة النفس و

ضيق العيش و حرمة العلم افعل *

এ ইলমে দ্বীন কেউই ধন এবং নফসের মর্যাদা দিয়ে অর্জন করতে পারবে না। নফসের অসম্মান, দারিদ্রতা এবং ইলমের মর্যাদা করেই কৃতকার্য হতে পারবে।

মুফতি এবং মুজতাহিদ যদি ভুলও করে তবুও নেক নিয়তের কারণে আল্লাহর নিকট পূরঙ্কৃত হবে। ইমাম সাহেব বলেন-

যে আলেম ফতোয়া দিবে সে ছাওয়াব পাবে। কিন্তু দ্বীনের ব্যাপারে ভুল করার কারণে সে ছাওয়াব পাবে না। সে এ কারণে ছাওয়াব পাবে যে, যেখানে সে ভুল করেছে সেখানে তার নিয়ত সঠিক ছিল।

কোন এক প্রসঙ্গে তিনি বলেন-

মানুষের স্বভাব যমীন স্বরূপ এবং ইলম বীজ স্বরূপ। 'তলব' (অন্বেষণ) দ্বারাই ইলম অর্জিত হয়। স্বভাব উপযুক্ত হলে ইলমের শস্য প্রস্ফুটিত হবে এবং তার অর্থ এবং মর্ম শাখা ছড়াবে।

একবার তিনি মাসয়ালার দলীল সম্পর্কে বলেন,

احسن الاحتجاج ما الشرقت معانية و احكمت مباتة و ابتهجت له قلوب سامعيه *

উত্তম দলীল সেটাই যার অর্থ স্পষ্ট হয়, যার মূল দৃঢ় এবং মজবুত হয় এবং যা শুনে শ্রোতার অন্তর আনন্দিত হয়।

উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ইমাম সাহেবের এ দোয়াটি পরীক্ষিত

اللهم يا لطيف اسألك اللطف فيم جرت به المقادير *

এ দোয়া পাঠ করলে হারানো বস্তু পাওয়া যায়।

আল্লামা মারজানী হানাফী (রহঃ) বলেন, ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেছেন, এ ব্যাপারে সমস্ত মুসলমানগণ একমত যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীছ কারো মন্তব্যের খাতিরে কখনো পরিত্যাগ করা যাবে না।

ইমাম শাফেয়ী বলেছেন, আমার পিতা-মাতা হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কোরবান হোক। তাঁর কোন হাদীছ যদি প্রমাণিত হয়ে যায় তবে তা পরিত্যাগ করা বৈধ হবে না।

তিনি আরও বলেছেন, কেউ যদি আমার কিতাবে সুন্নতের পরিপত্তী কোন

কথা পায় তবে সুন্নতের উপরই আমল করা তার জন্য আবশ্যিক। আমার কথাকে বর্জন করতে হবে।

হযরত শাহ ওলীউল্লাহ্ ‘হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা’ নামক কিতাবে লিখেছেন, ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ)কে বলেছেন যে, সহীহ হাদীছ সম্বন্ধে আপনি আমার চেয়ে অধিক জ্ঞাত। কাজেই যদি কোন সহীহ রেওয়াজে আপনার দৃষ্টিগোচর হয় তবে আপনি তা আমাকে অবগত করবেন যেন আমি তদানুসারে আমল করতে পারি।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর জীবনে এসব কথা নিছক মুখনিঃসৃত বাণী রূপেই ছিল না; বরং তা বাস্তবে রূপায়িত করে জগদ্বাসীকে দেখিয়ে দিয়েছেন। তিনি কোন বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পরও তাঁর বিপরীত যদি কোন সহীহ রেওয়াজে পাওয়া যেতো তবে তিনি তাঁর পূর্ব সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করতেন।

সমস্ত হাদীছ বিশারদ এবং ফিকহবিদ তাঁকে পরম শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতেন। তাঁর নীতিমালা এবং সিদ্ধান্তকে মেনে নিয়েছেন। অসংখ্য মুহাদ্দিছ, ফকীহ, তফসীর-বিশারদ এবং বুয়ুর্গ তাঁকে অনুসরণও করেছেন।

ইমাম গায়যালী এবং ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী পররর্তীদের মধ্যে ভাঙ্কর স্বরূপ। তাঁরাও ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর কিতাবের প্রতি অপরিসীম আস্থাবান ছিলেন। তাঁরাও সেগুলোকে আদর্শের চোখে দেখতেন। তিনি বলেন, চতুষ্পদ জন্তুকে আদব শিক্ষা দেওয়া যতটুকু কঠিন মানুষকে রাজনীতি শিক্ষা দেওয়া তার চেয়েও অধিক কঠিন। কারণ, অজ্ঞরাও নিজদেরকে জ্ঞানী ভাবতে দ্বিধাবোধ করে না। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস তারাও জ্ঞানী। কাজেই কোন উপদেষ্টার উপদেশই তারা গ্রহণ করতে চায় না।

দৃষ্টিশক্তি যেমন এক জায়গায় গিয়ে ক্ষান্ত হয়ে যায় আর সামনের দিকে অগ্রসর হয় না তদুপ বিবেক-বুদ্ধিরও একটি সীমা রয়েছে। উক্ত সীমা পর্যন্ত গিয়ে সে থেমে যায়।

সংস্বভাব, দানশীলতা, বিনয় ও কৃতজ্ঞতা মানুষের মধ্যে এ চারটি গুণের সমাবেশ থাকা আবশ্যিক। এগুলোর সমাবেশ থাকলে মানুষ পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করতে পারে।

যে যতটুকু সম্মানপ্রাপ্য আমি যদি তাকে এর চেয়ে অধিক সম্মান প্রদর্শন করি তবে তার দৃষ্টিতে আমি ততটুকু হয়ে প্রতিপন্ন হব।

গম ব্যতীত যাঁতাকলের নিকট যাওয়া যেমন নিরর্থক, কাগজ-কলম ও দোয়াত ব্যতীত শিক্ষা মজলিসে যাওয়াও তদ্রূপ অর্থহীন। নির্লজ্জ ও মন্দকাজ কেয়ামতের দিন অনুতাপ ও অনুশোচনার কারণ হবে।

যে এমন ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে থাকে যে ব্যক্তি তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না, সে নিজেকেই সবচেয়ে বেশী অবমাননা করল।

যে ব্যক্তি আমাকে চিনে না, তার প্রশংসা করা আমার জন্য অনর্থক কাজ বৈ আর কিছুই নয়।

হালাল জীবিকা অর্জন, পরহেজগারী বা খোদাভীরুতা এবং সর্বাবস্থায় খোদার উপর ভরসা রাখা- এ সবার মধ্যে দুনিয়া ও আখেরাতের মঙ্গল নিহিত রয়েছে।

যে ব্যক্তি না বুঝে জ্ঞান অর্জন করে নেয়, সে ব্যক্তি যেন অন্ধকার রাত্রিতে লাকড়ির বোঝা বেঁধে নিল এবং সে বোঝা হতে কোন সর্প তাকে দংশন করল।

আলেমদের জন্য তাকওয়া বা খোদাভীরুতা অলংকার স্বরূপ। সংস্কার তাদের পরিচ্ছদ স্বরূপ। যে ব্যক্তির মধ্যে ইলমের প্রতি ভালবাসা নেই তার মধ্যে কোন মঙ্গল নেই। তাদের সাথে সম্পর্ক রাখা তো দূরের কথা; তাদের সাথে পরিচয়ও না থাকা চাই।

সবাইকে সন্তুষ্ট রাখা খুব কঠিন ব্যাপার। কাজেই, মানুষের কর্তব্য আল্লাহর সাথে সুগভীর সম্বন্ধ রাখা এবং অপর কারো প্রতি বিন্দুমাত্রও ভরসা না করা।

যাকে রাগান্বিত করা হয় অথচ সে রাগান্বিত হয় না সে ব্যক্তি গাধার মত আর যাকে সন্তুষ্ট করলেও সন্তুষ্ট হয় না সে শয়তান।

আল্লাহ তাআলার ইবাদত না করা একে তো চরম গোনাহ দ্বিতীয়ত: বেদ'আতও বটে। কোরআন শিক্ষা করলে মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং ফিকহ দ্বারা তার সম্মান বৃদ্ধি পায়। আর হাদীছ দ্বারা দলীল প্রমাণ শক্তিশালী হয়।

ইলম লাভ করার পরও যে ব্যক্তি পাপ হতে বিরত থাকে নাই ইলম তার কোন মঙ্গল সাধন করতে পারে নাই।

যে ব্যক্তি তোমার নিকট অপরের কুৎসা ও বদনাম রটনা করে সে ব্যক্তি অপরের নিকট তোমার বদনাম গেয়ে বেড়াবে।

যে ব্যক্তি বন্ধুত্বের সময় তোমার এমন গুণের প্রশংসা করবে যা তোমার মধ্যে নেই সে ব্যক্তি শত্রুতার সময় তোমার এমন দোষের কথা বলে বেড়াবে

যা তোমার মধ্যে নেই।

ভাল এবং মন্দের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ার পর যে ব্যক্তি সুপথ বেছে নিতে পারে সে ব্যক্তি বুদ্ধিমান।

আমি যদি কোন সত্য কথা ও দলীল কারো সম্মুখে পেশ করি তিনি যদি তা কবুল করে নেন, তবে এতেও আমার অন্তরে একটি প্রভাব পড়বে এবং তার প্রতি আমার ভালবাসা জন্মাবে।

আর কেউ যদি সত্য বিষয়েও অহেতুক আমার সাথে তর্কে লিপ্ত হয় তাহলে আমার কাছে তার মর্যাদা ও ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয়।

অভাবের সময় দান করা, নির্জনে খোদাকে ভয় করা বা যার নিকট হতে কোন কিছু আশা করা হয় কিংবা যাকে ভয় করা হয় তার সাথে অধিক সত্য কথা বলা- এ তিনটি কাজ খুবই কঠিন ব্যাপার।

ইলম মুক্ত মনিব। তালেবে-ইলম তার দাস। দাস যদি খিদমত করে তবে মনিবের মন পেতে পারে। আর দাস যদি মনিবের সাথে অভিমান করে তবে মনিবকে সে অধিক অভিমানী পাবে।

বুদ্ধিমানের পরিচয় হল তার বুদ্ধি তাকে মন্দকাজ হতে বিরত রাখে। কোন কাজ অতি দ্রুত সম্পন্ন করতে চাইলে তার সুফল হতে বঞ্চিত থাকতে হয়। সুফল আনয়নে ধীর-স্থিরতা অতি সহায়ক।

সৎ লোকের সাহচর্য সৎ কাজের প্রতি এবং মন্দ সাহচর্য মন্দ কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে থাকে।

যিনি প্রকৃতপক্ষে মানবতার দাবী আদায় করেন তিনি মন্দকাজ হতে বিমুক্ত হয়েছেন। তাঁর পাপ ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে যায়।

বুদ্ধিহীনরা স্বজাতীর চেয়ে বিজাতীদের অধিক সম্মান দেখিয়ে থাকে। কপটতা দ্বারা সে বিজাতীয় লোকদের অন্তর জয় করতে চায়। অথচ তা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

আল্লাহ তাআলা তোমাকে স্বাধীন করে সৃষ্টি করেছেন। কাজেই, স্বাধীন থাকাই তোমার কর্তব্য। স্বীয় বন্ধুকে নির্জনে উপদেশ দান করা এবং বুঝিয়ে দেয়া ভদ্রতার মধ্যে শামিল। এটাই দোষ সংশোধনের গুণ রহস্য। সকলের সম্মুখে তাকে উপদেশ দান করা তার সম্মানহানী এবং দূর্ণাম করারই নামান্তর।

বিনয় সৌজন্যের পরিচায়ক। অভিশপ্ত লোকেরাই অহঙ্কার ও গর্ব করে থাকে।

কেউ যদি আকাঙ্ক্ষা করে যে, মানুষ তার নিকট আমানত রাখুক তবে বুঝতে হবে হয়ত সে চোর না হয় বোকা।

তোমার উপর যদি অনেক কাজের দায়িত্ব অর্পিত হয় তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি আগে শুরু করবে।

যারা দুনিয়া লোভী তাদের দুনিয়াদারদের দাস বলতে হয়। অল্পে তুষ্ট লোকের কারো নিকট কিছু প্রার্থনা করতে হয় না। এজন্য তারা মানুষের কাছে বেপরোয়া ও অপ্রত্যাশী থাকে।

খোদার হিকমতের আলো যে দেখতে চায় সে যেন বোকাদের সংশ্রব ত্যাগ করে। নির্জনতা অবলম্বন করে। ঐ সমস্ত আলেম থেকেও দূরে থাকবে যারা আদব, তমীজ এবং ধর্মহীন।

সাবধান! তোমার জিহবা হতে যেন একটিও অনাবশ্যিক কথা বের না হয়। কোন একটি কথা তোমার মুখ দিয়ে বের হয়ে গেলেই তুমি তার নিকট পরাস্ত হয়ে গেলে। সে আর তোমার অধীনে থাকবে না।

জ্ঞানীদের নিকট মুর্খরা মুর্খের চেয়ে অধিক কিছু নয়। পক্ষান্তরে মুর্খদের নিকট জ্ঞানীরা মুর্খরূপে পরিগণিত হয়।

এটা কি জ্ঞানের কম বৈশিষ্ট্য যে, মুর্খরাও জ্ঞানের দাবী করে থাকে। আর মুর্খতার চেয়ে অধিক গর্হিত বিষয় আর কি হতে পারে যে মুর্খরাও মুর্খতাকে অস্বীকার করে থাকে। এজন্যই তাদেরকে মুর্খ বললে রেগে জ্বলে উঠে।

দানশীলতা তোমাকে দুনিয়া ও আখেরাতে স্বীয় বেষ্টনীতে হেফাজত করবে।

অন্তর জিহ্বার জন্য ক্ষেত স্বরূপ। এতে উত্তম কথা বপন কর। সবগুলো চারা যদি নাও জন্মায়, তবে কিছু কিছু চারারূপে অবশ্যই গজিয়ে উঠবে।

জিহবা হতে যে কথা বের হয়, তা হতে পারে পাথরের চেয়ে শক্ত সূঁচ এর চেয়ে অধিক বেদনাদায়ক, অল্পের চেয়ে অধিক তিক্ত এবং তলোয়ারের চেয়ে অধিক তীক্ষ্ণ। কাজেই অতি সতর্কতার সাথে জিহবা পরিচালনা করবে।

যদি অপরিপক্ক লোক রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালনা করতে চায় তবে তাকে পদে পদে লাঞ্চিত হতে হবে। যে ব্যক্তি এর আকাঙ্ক্ষা করে তার নিকট হতে এটা পলায়ন করে।

দীর্ঘ জীবন, স্বচ্ছলতা ও তীক্ষ্ণ মেধা এগুলো তালাবে ইলমের জন্য অপরিহার্য গুণ।

ইলম প্রকৃতপক্ষে দু'প্রকার। আত্মার ইলম এবং দেহের ইলম। ইলমে দ্বীন-আত্মার ইলম এবং চিকিৎসা শাস্ত্র দেহের ইলম। ইলম অর্জন করা নফল নামায পড়ার চেয়ে উত্তম।

কাব্যনিপুনতা

কবি হিসাবেও ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তবে তিনি খুবই সতর্কতার সাথে কবিতা রচনা করতেন। যেহেতু কাব্য ছিল আরববাসীদের প্রকৃতিগত গুণ তাই কাব্য ছিল ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর জন্য অতি সহজ ব্যাপার। তিনি অনায়াসে কবিতা রচনা করতে পারতেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে কবিসুলভ সকল গুণই দান করেছেন।

আব্বাস আজরাক নামক জনৈক কবি ইমাম সাহেবের খিদমতে এসে বলল, হে আবু আব্দিল্লাহ! আমি কবিতার কয়েকটি পংক্তি আবৃত্তি করছি। আপনিও তদনুরূপ কয়েকটি পংক্তি যদি আবৃত্তি করতে পারেন তবে আমি কবিত্ব ত্যাগ করব। এরপর কবি কয়েকটি পংক্তি আবৃত্তি করল যার সারমর্ম হচ্ছে, এই শত্রুর সাথে সংগ্রাম ব্যতীত আমার মধ্যে আর কোন সাহস বাকী নেই। যমানা পুরাতন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আমার সাহস পুরাতন হবার মত নয়। মানুষের দৃষ্টি ধনীদেহের মধ্যে সীমিত হয়ে গিয়েছে। বুদ্ধি এবং বোকামীর পার্থক্য বুঝার ক্ষমতা তাদের মধ্যে নেই। সাহসিকতা যদি সম্পদের উৎস হত তবে তা আমাকে আকাশের কিনারায় পৌঁছিয়ে দিত।

এর প্রত্যুত্তরে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) কবিতা আকারে যা বললেন, তার সারমর্ম হচ্ছে এই—

‘যাকে আল্লাহ তাআলা বিশেষ কোন ক্ষমতা দিয়েছেন সে যদি এজন্য কোন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে এবং আল্লাহ তাআলার শোকর আদায় না করে তবে সে দুর্ভাগা। হতভাগারা বন্ধ দুয়ারগুলো খুলে দেয়। আর সৌভাগ্যবানেরা তাকে প্রত্যেক দরজার নিকটে পৌঁছিয়ে দেয়। কাজেই তুমি যদি শুনতে পাও যে, কোন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি একটি গুঁড় কাঠ হাতে নিয়েছে এবং তা তার হাতের সংস্পর্শে এসে তলোয়ারে পরিণত হয়ে গেছে তবে তা বিশ্বাস করবে। আর যদি শুনতে পাও যে কোন হতভাগা পানি পান করতে গিয়ে পানিতে ডুবে মারা গেছে তবে তাও তুমি নির্দিধায় বিশ্বাস করে নিবে।

আব্বাস আজরাফ এ সমস্ত কবিতা শুনে বিশ্বয়ের সাথে বললেন, এগুলো কি কবিতা না অমৃতবাণী? অতঃপর তিনি ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর কৃতিত্ব

স্বীকার করতঃ প্রকাশ মুখর হয়ে প্রস্থান করেন।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) মিশর গমন করলে সেখানকার অধিবাসীরা তাঁকে খুব সম্মান দেখান। তারা ছিল ইমাম মালেক (রহঃ)-এর পরম ভক্ত। কোন কোন মাসয়ালায় যখন ইমাম মালেক (রহঃ)-এর সাথে তাঁর মতবিরোধ দেখা দিল তখন ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর ভক্তিতে ভাটা দেখা দিল। এতে তিনি একটি কবিতা রচনা করলেন। যার সারমর্ম হচ্ছে—

উলুবনে মুক্তো ছড়ানো বুদ্ধিমত্তার পরিচয় নয়। আল্লাহর দয়ায় কোন জ্ঞানী ব্যক্তি যদি সে পথের পথিক হন তখন হয়ত সে মুক্তা দ্বারা সমাদৃত হবে। নচেৎ নিষ্ফলে যাবে। মূর্খকে যে ইলম শিক্ষা দেওয়া হয়, সেই ইলম বিফলে যায়।

নবী পরিবারের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ করে একটি কবিতা পাঠ করেন। তার অর্থ হচ্ছে এই—

হে নবী বংশ! আপনাদের প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করা কালামুল্লাহ দ্বারা প্রমাণিত। রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যে ব্যক্তি দুরূদ পাঠ না করে তার নামায কবুল হয় না। আমি প্রকাশ্যেই বলছি যে, নবী বংশের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করলে যদি মানুষ রাফেয়ী হয়ে যায়, বিশেষ করে হযরত আলী (রাঃ)-এর প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের কারণে আমি যদি রাফেয়ী আখ্যা পাই, সিদ্দীকে আকবরের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করলে কেউ যদি আমাকে অন্য কিছু আখ্যা প্রদান করে তবে আমি এসব কিছু স্বতঃস্ফূর্ত মেনে নিলাম। আর এ বিশ্বাস নিয়ে আমি কবরে চলে যেতেও রাজী আছি। একে আমি নিজের জন্য সৌভাগ্য মনে করি।

অন্য এক কবিতায় তিনি লিখেছেন,

যিনি পরহেজগার ও বুদ্ধিমান, তাঁর নেকী তাকে মানুষের কুৎসা রটনা হতে এভাবে ফিরিয়ে রাখে যেমন কঠিন পীড়া কোন রোগীকে অন্যান্য রোগীর রোগ সম্বন্ধে উদাসীন করে রাখে। হিংসুক আমার দৃষ্টির বাইরে চলে গেলে কুৎসা ও নিন্দা বর্ণনা করতে থাকে। আর সে যখন আমার সম্মুখে আসে তখন আমার ভূয়সী প্রশংসা শুরু করে দেয়।

যে ব্যক্তি নিজের সম্মান নিজে বুঝে না আল্লাহর ভয় তার অন্তরে স্থান লাভ করে না। লোক লজ্জা যার নেই তার অধঃপতন অনিবার্য।

হে আমার মন! আমার নিকট যদি একদিনেরও জীবিকা থেকে থাকে তবে জীবিকা নির্বাহের জন্য কোন প্রকার চিন্তা করো না। আগামীকাল আমার আহার

কি হবে সে চিন্তা আমি করি না। কারণ আমি জানি, আগামীকালের জন্য নতুন জীবিকা রয়েছে। আল্লাহর মর্জিতেই আমি পরিতুষ্ট। আমার সকল ইচ্ছাকে তার ইচ্ছার সামনে বিলীন করে দিয়েছি।

সমভাবাপন্ন ভাইদের সাথে আমি মানবতা রক্ষা করে থাকি। তাদের সাথেও মানবতা রক্ষা করে থাকি যারা আমার সংকাজগুলোকে পছন্দ করে মহৎ জীবন-যাপনে আমাকে সাহায্য করে। আমার মৃত্যুর পরও আমাকে স্মরণ করে। স্বীয় স্বার্থে আমি ভাই বন্ধুদের অনুসন্ধান করেছি। কিন্তু এমন ভাই বন্ধু খুব কম পেয়েছি যারা সংকট সময়ে সাহায্য করবে। এমনটি যদি পেতাম তাহলে আমার সমস্ত সম্পদ তার জন্য উৎসর্গ করে দিতাম।

হে দুনিয়ার ধোকা ও প্ররোচনা কবলিত লোকেরা! তোমরা স্মরণ রেখো যে, বাড়ী এবং বাড়ী প্রস্তুতকারী কালে উভয়কেই ধ্বংস করে দিবে। দুনিয়ার গৌরব এবং জাঁকজমক যাদের নিকট পছন্দনীয় তাদের জেনে রাখা উচিত এ গৌরব শীঘ্রই নিঃশেষ হয়ে যাবে। স্মরণ রেখো! দুনিয়ার ভাঙার পূর্ণ হয়ে থাকে সোনা-রূপা দ্বারা কিন্তু তোমার হৃদয় ভাঙারকে ভরতে হবে ঈমান ও আমল দ্বারা।

যখন তুমি কারও সঙ্গে সফরে বের হও, তখন সফরসঙ্গীদের সাথে ভ্রাতৃসুলভ আচরণ করো। জ্ঞানী এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি নিজের দোষত্রুটির উপর কড়া দৃষ্টি রাখে। সে স্বীয় সাথীদের দোষত্রুটিও গোপন রাখতে সচেষ্ট হয়।

তুমি সবার দোষ প্রচার করে বেড়াবে তা কখনো কাম্য নয়। বরং তাদেরকে সৎপথে পরিচালনা করতে চেষ্টা করবে। তুমি যদি তাদের দোষ প্রচার করতে থাক তবে তোমার বন্ধু বান্ধবের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে যাবে। অতএব এমন সময় আসবে যখন তোমার পাশে একজন বন্ধুকেও দেখতে পাবে না। লোভকে পরাজিত করে আমি প্রশান্তি অনুভব করেছি। লোভ লালসা যতই বৃদ্ধি পেতে থাকবে লাঞ্চিত হবার আশংকাও ততই বৃদ্ধি পেতে থাকবে। অল্পে তুষ্ট মানুষের সংখ্যা অতি নগন্য। অল্পে তুষ্টিকে আমি স্বাগত জানিয়েছি। এটাই আমার জীবনকে গৌরবান্বিত করেছে। লোভ যখন মানুষের অন্তরে স্থান পেয়ে যায় তখন প্রতিদিনই লাঞ্চিত ও অপমানিত হতে থাকে।

নির্জনবাসের সময় কখনো ভেবো না যে, তুমি একাকী রয়েছ। বাস্তব সত্য হলো এই যে, প্রত্যেকের উপরই একজন পরিদর্শক রয়েছেন। মূহর্তের জন্যও অন্তরে এ কথা স্থান দেওয়া বৈধ হবে না যে, আল্লাহ তোমার সম্বন্ধে উদাসীন রয়েছেন। তাঁর নিকট কোন পাপ বা দোষ মোটেই গোপনীয় নয়।

আল্লাহর কসম! মানুষ যখন গাফেল থাকে তখন প্রতি পদে পদে পাপ তাকে পরাস্ত করে ফেলে। হায় আফসোস! আল্লাহ যদি আমার পাপকে ক্ষমা করে আমার তওবা কবুল করে নিতেন, তবে কতইনা আনন্দবোধ করতাম।

কালের বায়ু যদি তোমার অনুকূলে প্রবাহিত হতে থাকে তবে তুমি তা পরম সৌভাগ্য বলে মনে করবে। সব প্রচেষ্টারই একদিন সমাপ্তি ঘটবে। তাই ভাল কাজ করতে মোটেই অলসতা করো না। তোমার সময় কখন শেষ হয়ে যাবে তা কেউ বলতে পারে না।

তুমি নিজেও যখন কোন বিষয়ে জ্ঞাত নও, জ্ঞাত ব্যক্তিদের নিকটও জিজ্ঞাসাবাদ কর না, এমতাবস্থায় তোমার জানার বা বুঝার কোন উপায় নেই। তুমি যদি জ্ঞাত থাকতে বা জানার চেষ্টা করতে তবে জেনে শুনে কখনো জ্ঞানীদের বিরোধিতা করতে না।

সৌভাগ্যশীলদের অনেক প্রশংসা করা হয়ে থাকে। এমন কি তার মধ্যে যে গুণ নেই সেগুণের জন্যও তার প্রশংসা করা হয়। আর দুর্ভাগা ও হতভাগাদের যদি কোন দোষ পরিলক্ষিত হয়, তবে সে করে নাই এমন হাজারো দোষ তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়।

রচনাবলী

ইমামদের মধ্যে যারা অনেক কিতাব রচনা করেছেন ইমাম শাফেয়ী তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য একজন। অল্প বয়সেই তিনি 'উছুলে ফিকাহ'শাস্ত্রে 'কিতাবুল উম্ম' এর মত গুরুত্বপূর্ণ কিতাব রচনা করেন। তীর নিক্ষেপ এবং ঘোড় সওয়ারী সম্পর্কিত বিষয়েও সে সময়েই কিতাব লিখেন। অনেক বড় বড় কবি ও সাহিত্যিক তাঁর রচনামূল্যের স্বীকৃতি দিয়েছেন। অবশ্য ইমাম সাহেবের মর্যাদা এরও অনেক উর্ধ্বে। জাহেয বলেন,

আমি ইমাম শাফেয়ীর কিতাব দেখেছি। সেগুলো যেন গ্রন্থিত মোতি। এর চেয়ে সুন্দর রচনা আমি আর দেখিনি।

ইবনে নদীম লিখেন, ফিকাহ শাস্ত্রে ইমাম সাহেবের একটি বিস্তৃত কিতাব রয়েছে। এ কিতাবটি তাঁর নিকট থেকে রবী বিন সুলাইমান এবং য়াফরানী রেওয়াজেত করেছেন। এ কিতাবটিতে অমুক/অমুক অধ্যায় রয়েছে। এতে প্রায় একশ' চারটি অধ্যায়ের নাম উল্লেখ করেন। এ সবগুলোর সমষ্টির নাম 'কিতাবুল উম্ম'। এছাড়া 'মুসনাদে শাফেয়ী' এবং তাঁর রচিত আরো বহু কিতাব রয়েছে।

বিভিন্ন শাস্ত্রে ইমাম সাহেবের পাণ্ডিত্য

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) দীর্ঘ বিশ বৎসর যাবৎ ভাষা নিয়ে সাধনা করেন। মুবাররদ ছিলেন ভাষাবিদ ও সাহিত্য-বিশারদ। তিনি ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) সম্পর্কে বলেন, ভাষা-সম্বন্ধে ইমাম শাফেয়ীর জ্ঞান অপরিসীম এবং তা প্রমাণ ও দলীল স্বরূপ।

সাহিত্য-বিশারদ হাফেজ বলেন, ইমাম শাফেয়ীর লেখার চেয়ে সারগর্ভ লেখা আমি আর কারো দেখি নাই। তাঁর লেখার ধারা ছিল চমৎকার। তাকে অমৃতবাণী বললেও অত্যুক্ত হবে না।

আবুল আব্বাস বলেন, ইমাম শাফেয়ীকে শব্দকোষ বলা যেতে পারে। তাঁর লিখার ভঙ্গিমা এত চমৎকার যে তা পড়লে শব্দের মর্ম এবং উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে কোন অসুবিধা হয় না।

ইমাম আবু মনসুর যিনি ভাষারত্ন উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। তিনি বলেন, এ সম্বন্ধে ইমাম শাফেয়ীর জ্ঞানের গভীরতা প্রগাঢ়। তিনি ইমাম শাফেয়ীর প্রচলিত শব্দ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তা কিতাবরূপে পরিচিতি লাভ করেছে। তা বর্ণনা করেছেন ইমাম শাফেয়ী; যিনি ভাষা ও সাহিত্য জগতে অদ্বিতীয় লোক ছিলেন।

আইয়ামে জাহেলিয়াতের কবিতা তাঁর চেয়ে অধিক আর কেউ অবগত ছিলেন না।

আবু সুলাইমান ভাষা সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। তিনি ইমাম শাফেয়ীর একজন প্রিয় এবং প্রসিদ্ধ ছাত্র ছিলেন। তিনি বলেন, ইমাম সাহেবের ভাষা ছিল অত্যন্ত মধুর এবং লেখা ছিল হৃদয়গ্রাহী। তাঁর প্রকাশভঙ্গীও ছিল তুলনাহীন।

আরবী ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞানধারা ছিলেন আল্লামা যমখশরী। তিনি বলেন, ইমাম শাফেয়ী আলেমদের শিরোমনি ছিলেন। তিনি শরীয়তের আলেম এবং মুজতাহিদদের অনুসৃত নেতা ছিলেন। তাঁর লেখা পড়েই বুঝা যেতো যে, এটা ইমাম শাফেয়ীর লিখা। তিনি কোথা হতে কথা বলেন তা চিন্তা করেও বুঝা যেতো না। তাঁর লিখা বা বলায় কখনো কোন ভুল হতো না। আরবী ভাষায় তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। তিনি জ্ঞান-সমুদ্র। ভাষার কোন কিছু তাঁর অজানা ছিল না।

ইমাম রাযী বলেন, ভাষাবিদগণ এতে একমত যে, ইমাম শাফেয়ী এ

শাস্ত্রের নেতা। হাতেমের দানশীলতা, হযরত আলী (রাঃ)-এর বীরত্বের ন্যায় ইমাম শাফেয়ীর ভাষা, সাহিত্য ও ব্যাকরণ শাস্ত্রের জ্ঞান সর্বজন গৃহীত ও মান্য।

আরবী সাহিত্যকে যদি আরবের ইতিহাস বলা হয় তবে তা ভুল হবে না। কারণ আরবের অজ্ঞযুগের কবিতাবলী পাঠ করলে আরবের ইতিহাস জানার কিছুই বাকী থাকবে না। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) আরবী সাহিত্যে যথেষ্ট প্রজ্ঞা অর্জন করেন। এর ফলশ্রুতিতে তাঁকে নির্দিধায় একজন আরব ইতিহাসবিদ বলা যেতে পারে। জনৈক বিজ্ঞলোক বলেছেন, ইমাম শাফেয়ী আরবের ইতিহাস সম্বন্ধে সবচেয়ে অধিক জ্ঞাত ছিলেন।

ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মধ্যে তর্কযুদ্ধ হয়েছিল। খলীফা হারুনুর রশীদের নিকট সে সংবাদ পৌঁছলে তিনি ইমাম শাফেয়ীকে ডেকে কোরআন-হাদীছ সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন করেন। ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) সেগুলোর সন্তোষজনক উত্তর দিলেন। অতঃপর খলীফা তাঁকে আরবী সাহিত্য ও ভাষা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি জবাবে বললেন, আরবের মাটি থেকেই আমাদের জন্ম। এর ভাষা আমাদের রক্ত মাংসের সাথে বিজড়িত।

তিনি একজন স্বনামধন্য চিকিৎসক ছিলেন। জালিনুস এবং অন্যান্য চিকিৎসকদের বই পুস্তক অতি মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করেন। তিনি বলতেন, মানুষের দেহ ও আত্মা রয়েছে। কাজেই জ্ঞানও দু' প্রকার। ধর্মীয় জ্ঞান ও চিকিৎসা জ্ঞান।

তিনি প্রায়ই আক্ষেপ প্রকাশ করে বলতেন, মুসলমানগণ চিকিৎসাশাস্ত্র পরিত্যাগ করে দিয়েছে। তারা ধর্মীয় জ্ঞান হাতে রেখে ইয়াহুদী এবং নাসারাদের আর্ধেক জ্ঞান দিয়ে দিয়েছে।

তিনি বলতেন, যে শহরে কোন আলেম কিংবা চিকিৎসক নেই, সে শহরে বসবাস করাও পাপ। তৎকালীন সময়ে যমানায় তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক হিসাবে গন্য করা হত।

মৃত্যু

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) ১৫০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০৪ হিজরীর রজবের শেষদিন বৃহস্পতিবার (দিবাগত শুক্রবার রাত্রে) মিশরে ইস্তিকাল করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল চুয়ান্ন বৎসর। ইমাম সম্বেহের অখিয়ত অনুসারে অসুস্থতার সময় তাঁকে আব্দুল্লাহ বিন আব্দিল হাকামের বাড়ীতে রাখা হয় এবং সেখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর ছেলেরাই দাফন-কাফন করেন

এবং মিশরের আমীর তাঁর জানাযার নামায পড়ান। মুকাতাম পাহাড়ের নিকট 'কারাফায়ে ছোগরা' নামক স্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

রবী বিন সুলাইমান মুরাদী বলেন, দাফন শেষে ফিরে আসার পথে আমি শা'বানের চাঁদ দেখেছি। রাত্রে ইমাম সাহেবকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ তাআলা আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন। তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে নূরের কুর্সীতে (চেয়ারে) বসিয়েছেন।

ইমাম সাহেবের পুত্র উছমান বলেন, মৃত্যুর সময় আমার পিতার বয়স ছিল আটান্ন বৎসর।

রবী বর্ণনা করেন, ইমাম সাহেবের ইত্তিকালের পর আমরা দরসী হালকায় বসা ছিলাম। এক গ্রামীণ লোক এসে সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করল, এ হালকার চন্দ্র-সূর্য কোথায়?

আমরা বললাম, তাঁর মৃত্যু হয়ে গেছে। এ কথা শুনে সে অঝোরে কাঁদল এবং এ কথা বলে চলে গেল—

আল্লাহ তাআলা তাঁকে দয়া করুক এবং ক্ষমা করুক। কত সুন্দরভাবে দলীলের সমস্যাগুলো তাঁর বয়ান দ্বারা বিশ্লেষণ করে দিতেন। তাঁর প্রতিপক্ষকে স্পষ্ট দলীল দ্বারা পথ দেখাত। (হেদায়েত করত) লজ্জিত মুখমণ্ডল থেকে অপমান ধুয়ে ফেলতেন। ইজতেহাদ দ্বারা মাসয়ালার রুদ্ধদ্বার খুলে দিতেন।

সন্তান-সন্ততি

ইমাম সাহেবের সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে ইবনে হযম লিখেন, তাঁর দুটি পুত্র ছিল। একজন আবু হাসান মুহাম্মদ যিনি 'কুন্নাসরীন' এবং 'আওয়াছেম' এর কাযী ছিলেন। তার কোন সন্তান ছিল না। দ্বিতীয়জন উছমান। ইনি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল থেকে শিক্ষা লাভ করেন। তিনিও নিঃসন্তান ছিলেন। সুবকী 'তবাকাতে শাফেয়ীয়া' কিতাবে লিখেন, ইমাম সাহেবের দু' পুত্র ছিল। একজন কাযী আবু উছমান মুহাম্মদ, অপরজন আবুল হাসান মুহাম্মদ। আবু উছমান সবার বড় ছিলেন। ইমাম সাহেবের মৃত্যুর সময় তিনি মক্কায় ছিলেন। তিনি তার পিতা, সুফিয়ান বিন উয়াইনা, আব্দুর রায্বাক এবং আহমদ বিন হাম্বল থেকে হাদীছ রেওয়ায়েত করেন। জযীরা এবং অন্যান্য স্থানের কাযী ছিলেন। হলেবেও তিনি কাযী ছিলেন। তার তিন সন্তান ছিল। আব্বাস, আবুল হাসান বাল্যকালেই মারা যায় এবং কন্যা ফাতেমা। তার কোন সন্তান নেই। আবু উছমান ২৪০ হিজরীতে জযীরায় মৃত্যুবরণ করেন। দ্বিতীয় ছাহেবজাদা আবুল হাসান মুহাম্মদ

‘দানানীর’ নামক দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যকালেই তার পিতা অর্থাৎ ইমাম সাহেবের সাথে মিশর আগমন করেন। সেখানেই ২৩১ হিজরীর শা’বান মাসে মৃত্যুবরণ করেন। যয়নাব’ নামী ইমাম সাহেবের এক কন্যা ছিল। তার গর্ভে আবু মুহাম্মদ, আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন আদ্দিল্লাহ বিন আব্বাস, উছমান বিন শাফে জন্মগ্রহণ করেন।

তিনি তার পিতার মাধ্যমে তার নানা ইমাম শাফেয়ী থেকে হাদীছ বর্ণনা করেন। বলা হয়, শাফে’র বংশে ইমাম সাহেবের পর তার মত অন্য কোন আলেম জন্ম নেয়নি। তিনি তার নানার বরকত পেয়েছিলেন।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর জন্য

হুযুর (সাঃ)-এর শাফায়াত

আল্লামা ইবনুল জাওজী স্বীয় স্বপ্ন বর্ণনা করে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নযোগে দেখতে পেয়ে আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার চাচার বংশধরের মধ্যে মুহাম্মাদ বিন ইদ্রীস শাফেয়ী মৃত্যুবরণ করেছেন। হুযুরের শাফায়াত কি তার নসীব হয়েছে?

হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি আল্লাহর কাছে এ বলে আরজ করেছি যে, হে বিশ্ব প্রতিপালক! হে জগৎস্বামী!! মুহাম্মদ বিন ইদ্রিস শাফেয়ীকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করে দাও।

আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি তাঁর কোন আমলের বদৌলতে এরূপ শাফায়াৎ করেছেন?

হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, শাফেয়ী আমার উপর এমন দরুদ পাঠ করত যা অন্য কেউ কখনও পাঠ করে নাই। আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! এটি কোন দরুদ? হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সেটি হচ্ছে এই দরুদ-

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلِّ مَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كُلِّ مَا غَفَلَ عَنْهُ

* الْغَافِلِينَ *

হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। যখন স্মরণকারীরা তাঁকে স্মরণ করে। তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন যখন গাফেলরা তাঁর থেকে গাফেল থাকে।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল আশশায়বানী আল বাগদাদী (রহঃ) নাম ও বংশ পরিচয়

ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের (রহঃ) বংশধারা এরূপঃ ইমাম আবু আদিল্লাহ আহমদ বিন মুহাম্মদ হাম্বল বিন হেলাল বিন আসাদ বিন ইদ্রীস বিন আদিল্লাহ বিন হাইয়ান বিন আদিল্লাহ বিন আনাস বিন আউফ বিন কাসেত বিন মায়েন বিন শায়বানী বিন যাহল বিন ছালাবা বিন ইকাবা বিন ছাব বিন আলী বিন বকর বিন ওয়ায়েল আশশায়বানী আল মারওয়ায়ী আল বাগদাদী (রহঃ)। ১৪ হিজরীতে হযরত উমর (রাঃ)-এর নির্দেশ এবং পরামর্শে বছরায় বসতি স্থাপন করা হয়। এখানে আরবের বিভিন্ন গোত্র বাস করতে থাকে। এদের মধ্যে বনী শায়বান বিন যহলের একটি শাখা বনু মায়েনও ছিল। এ উপগোত্রের সাথেই ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের গোত্রীয় সম্পর্ক রয়েছে। তিনি বছরায় গমন করলে তাদের গোত্রীয় মসজিদেই অধিকাংশ সময় নামায পড়তেন।

আব্দুল্লাহ বিন রুমী বর্ণনা করেন, আমি বছরায় অধিকাংশ সময়েই দেখতাম যে, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বনী মায়েনের মসজিদে আসতেন এবং নামায পড়তেন। একবার আমি তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এটা আমার পূর্বপুরুষদের মসজিদ।

খোরাসান বিজয়ের পর সেখানকার মারভ শহরে যখন অনেক আরব গোত্র বসতি স্থাপন করে এবং সেখানে তাদেরকে অনেক জায়গীর এবং যমীন দেয়া হয় তখন ইমাম সাহেবের পরিবারও মারভ শহরে বসতি স্থাপন করে সেখানে বসবাস করতে থাকে। আবু যুরআ রাযী বর্ণনা করেন—

আহমদ বিন হাম্বল মূলতঃ বছরার। মারভে তার জমি এবং বাড়ী ছিল। ইমাম সাহেবের দাদা হাম্বল বিন হেলাল 'সরখসের' আমীর এবং হাকেম ছিলেন। তৎকালীন রাজনীতিতে তাঁর যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। একবার বোখারার আমীর মুসাইয়েব বিন যুহাইর তাঁকে এবং আবুনা জম ইসহাক বিন ঈসা সাদীকে শাস্তি দেন। কারণ তারা ষড়যন্ত্র করে সৈন্যদের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে দিয়েছিল।

ইমাম সাহেবের মাতাও বনী শাইবান গোত্রের। তার নাম ছফিয়্যা বিনতে মায়মুন বিনতে আদিল মালেক শায়বানী। তার নানা আব্দুল মালেক বিন সওয়াদা বিন হিন্দ শাইবানী গোত্রের সম্মানী এবং মর্যাদাশীল ব্যক্তি ছিলেন। মারভে তাদের নিকট আরবের গোত্র আসত। তিনি তাদেরকে দাওয়াত করতেন এবং আপ্যায়ন করতেন। ইমাম সাহেবের পিতা তার ওখানে থাকতেন। পরে

তার কন্যাকে বিবাহ করেন।

তার সম্পর্কে কিতাবে ‘জুনদী’ (সৈন্য) এবং কায়েদ (নেতা) উল্লেখ রয়েছে। এতে বুঝা যায় তিনি কোথাও কোন সেনাদলের অধিনায়ক ছিলেন।

জন্ম এবং বাল্যকাল

ইমাম সাহেবের পিতা কোন কারণে ১৬৪ হিজরীতে মারভ ত্যাগ করে বাগদাদ আগমন করেন। তখন ইমাম সাহেব মাতৃগর্ভে ছিলেন। ১৬৪ হিজরীতে রবীউল আউয়াল মাসে তার জন্ম হয়। বাগদাদ আগমনের কিছুদিন পরই তাঁর পিতা ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে পিতার বয়স ছিল ৩০ বৎসর। ইমাম সাহেব তখন ছোট শিশু ছিলেন। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে দেখিনি, দাদাকেও দেখিনি। আমার মা আমাকে প্রতিপালন করেছেন।

মা তার এ পিতৃহীন শিশুকে অতি যত্ন সহকারে আদর-স্নেহ দিয়ে শিক্ষা-দীক্ষা দেন। বালকও তার মার প্রতি খুবই সম্মান দেখিয়ে চলত। ১৮৬ হিজরীতে দজলা নদীতে ভয়াবহ বন্যা হয়। তখন ইমাম সাহেবের বয়স বাইশ বৎসর। এ সময় ‘রায়’ এর মুহাদ্দিছ জরীর বিন আব্দিল্লাহ বাগদাদ আগমন করেন। ইমাম সাহেবের সঙ্গী হাদীছ রেওয়াজেতের জন্য এ অবস্থাতেও তার নিকট গেলেন। কিন্তু ইমাম সাহেব যেতে পারেননি। কারণ তার মা তাকে অনুমতি দেননি। তদুপ ভোরের অন্ধকারে ইমাম সাহেব কোন মুহাদ্দিছের কাছে যেতে চাইলে তার মা তাকে অধিক স্নেহ এবং ভালবাসার কারণে যেতে দিতেন না। তিনি স্বয়ং বর্ণনা করেন—

‘অনেক সময় আমি অতি ভোরে হাদীছ পড়তে যেতে চাইতাম। কিন্তু আমার মা আমার কাপড় ধরে বলতেন, ভোর হতে দাও। অনেক সময় আমি অতি ভোরে আবু বকর বিন ‘আইয়াম এবং অন্যান্যদের দরসী মজলিসে যেতাম।’

এ বর্ণনা থেকে বুঝা যায় ইমাম সাহেবের মা দীর্ঘদিন বেঁচে ছিলেন এবং আপন ছেলেকে অতি সোহাগ করে শিক্ষা দিয়েছেন এবং লালন-পালন করেছেন।

প্রাথমিক শিক্ষা

বাল্যকাল থেকে ইমাম সাহেব মকতবে শিক্ষা শুরু করেন। সে সময় থেকেই তার ভদ্রতা, সততা, বুয়ুর্গী প্রসিদ্ধ ছিল। আবু আকীব রাবী বলেন,

আহমদ বিন হাম্বল মকতবে আমাদের সাথে ছিলেন তখন তিনি খুবই ছোট ছিলেন। আমরা তার বুয়ুর্গী সম্পর্কে অবগত ছিলাম।

ঐ সময় খলীফা বাগদাদের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের সাথে রক্বা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। তারা বাড়ীতে চিঠি লিখতেন। তাদের স্ত্রীরা মকতবের মুআল্লিমের নিকট খবর পাঠাতেন যে, আহমদ বিন হাম্বলকে পাঠিয়ে দিন। সে আমাদের চিঠির উত্তর লিখে দিবে। তিনি মাথা নীচু করে বাড়ী যেতেন এবং তাদের চিঠি লিখে দিতেন। কখনও কোন অসমীচীন কথা হলে তা তিনি লিখতেন না।

একবার জনৈক আমীর ইমাম সাহেবের চাচার নিকট চিঠি লিখলেন। তিনি সেটার উত্তর লিখে ইমাম সাহেবের নিকট দিয়ে বললেন, বার্তাবাহক এলে দিয়ে দিও। বার্তাবাহক এসে চিঠির উত্তর চাইলে তার চাচা বললেন, আমি উত্তর লিখে আহমদকে দিয়েছিলাম। সম্ভবতঃ সে তোমাকে দিয়ে দিয়েছে। এরপর ইমাম সাহেবকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এতে অমুক কথাটি অসমীচীন ছিল। এজন্য আমি তাকের উপর রেখে দিয়েছি।

খলীফা রক্বা অবস্থানকালে দাউদ বিন বুসতাম ইমাম সাহেবের চাচার নিকট লিখলেন, আজকাল বাগদাদের সংবাদ পাচ্ছি না। আমি খলীফার সামনে তা পেশ করতে চাই। তিনি তার উত্তর লিখে ইমাম সাহেবকে দিলেন (কিন্তু তিনি সে চিঠি দেননি) পরে যখন তাকে ডেকে জানতে চাইলেন তিনি বললেন, এমন খবর আমি সেখানে পৌঁছাব? সে চিঠি আমি পানিতে ফেলে দিয়েছি। ইবনে বুসতামের নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি বললেন—

এ ছেলেটি মুত্তাকী হবে। আমরা কি হব?

আবু সিরাজ বলেন, আমার পিতা আহমদ বিন হাম্বলের সৎ-চরিত্র এবং প্রকৃতি দেখে আশ্চর্য হয়ে বলতেন, আমি আমার ছেলেদের শিক্ষা দীক্ষার জন্য অনেক সম্পদ ব্যয় করেছি। তাদের জন্য মুআল্লিম এবং মুআদিব নিযুক্ত করেছি যেন তারা আদব শিখে। কিন্তু তাদের সফলতা দেখছি না। অথচ এ আহমদ বিন হাম্বলকে দেখ, এ পিতৃহীন ছেলেটি কত সুন্দরভাবে চলছে।

হাদীছ শিক্ষা এবং শিক্ষা সফর

প্রাথমিক শিক্ষার পর ইমাম সাহেব ১৬ বৎসর বয়সে হাদীছ শিক্ষা আরম্ভ করেন। এ বিষয়ে তাঁর সর্ব প্রথম শায়খ হচ্ছেন কাযী আবু ইউসুফ (রহঃ)। তিনি বলেন—

‘আমি সর্বপ্রথম আবু ইউসুফ থেকে হাদীছ লিখি।’

ইমাম সাহেব বর্ণনা করেন, যখন আমরা কাযী আবু ইউসুফের (রহঃ) দরসী মজলিসে যেতাম তখন বিশর মুরাইসী এসে সবার পিছনে বসে যেতেন এবং সেখান থেকে চিৎকার শুরু করতেন এবং বলতেন আবু ইউসুফ! এটা কি বলছ? এভাবে সবসময় চীৎকার করে চলতেন। আর আবু ইউসুফ ছাত্রদেরকে বলতেন একে আমার নিকট নিয়ে এস। একদিন বিশর মুরাইসী এসে আগের মত চীৎকার আরম্ভ করলেন। আবু ইউসুফ তাকে ডেকে নিজের কাছে নিলেন। আমি তাদের নিকটেই বসা ছিলাম। বিশর মুরাইসী একটি মাসয়ালা নিয়ে আবু ইউসুফের সাথে আলোচনা শুরু করলেন। কিন্তু আমি উভয়ের কথা পুরোপুরি শুনতে পাইনি। তাই পাশে বসা সাথীকে জিজ্ঞেস করলাম, আবু ইউসুফ বিশর মুরাইসীকে কি বলছেন? সে বলল, আবু ইউসুফ বলছেন যে, আপনি কার্টে অগ্নি সংযোগ করার পরই মানবেন।

ইমাম সাহেব বাগদাদের শায়খ এবং মুহাদ্দিসীনদের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ শেষে বছরা, মক্কা, মদীনা, ইয়ামান, সিরিয়া, জযীরা, আবাদানী প্রভৃতি দেশ সফর করেন এবং সেখানকার শায়খদের নিকট থেকে হাদীছ রেওয়াজেত করেন।

ইমাম সাহেবের শিক্ষা ভ্রমণ সম্পর্কে তাঁর পুত্র শাগরেদরা স্বয়ং তাঁর নিজের বক্তব্যই বর্ণনা করেছেন। তারই সার সংক্ষেপ উল্লেখ করা হচ্ছে। ইমাম সাহেব বলেন, আমি ১৭৯ হিজরীতে আলী বিন হাশেম বিন বরীদ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছি। এটা ছিল আমার হাদীছ শিক্ষার প্রথম বৎসর। ঐ বৎসরই হুশাইম বিন বশীর থেকে প্রথমবার হাদীছ শ্রবণ করি। সে বৎসরই আব্দুল্লাহ বিন মুবারক শেষবারের মত বাগদাদ আসেন। আমি তাঁর শিক্ষা মজলিসে গিয়ে জানতে পারলাম তিনি তরসুস চলে গেছেন। ১৮১ হিজরীতে তিনি ইস্তেকাল করেন। ঐ সময় আমার বয়স ছিল ১৬। আর হুশাইম বিন বশীরের ইস্তেকালের সময় আমার বয়স ছিল ২০ বৎসর। ঐ বৎসরই হাম্মাদ বিন যায়েদ এবং মালেক বিন আনাস ইস্তেকাল করেন। হুশাইমের মজলিসে আমি ১৮৩ হিজরী পর্যন্ত ছিলাম। সে বৎসরই তিনি ইস্তেকাল করেন। আমি তার নিকট থেকে ‘কিতাবুল হজ্জ’ লিখেছি। যাতে এক হাজার হাদীছ ছিল। এছাড়াও কিতাবুল কাশ্শ, তফসীর সম্বন্ধীয় কিতাব এবং আরো কয়েকটি ছোট ছোট কিতাব লিখেছি। এতে প্রায় তিন হাজার হাদীছ সংগ্রহ করেছি। হুশাইম আমাদেরকে কিতাবুল জান্নায়েয শিখাচ্ছিলেন। এর মাঝেই হাম্মাদ বিন যায়েদের মৃত্যুর খবর পৌঁছে

গেল। হুশাইমের ইস্তেকালের পূর্বে আমি আব্দুল মুমেন বিন আদ্দিলাহ বিন খালেদ ঈসা থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছি। ১৮২ হিজরীতে আমি 'রায়' এর আলেম আবু মুজাহিদ আলী বিন মুজাহিদ কাবুলী থেকে হাদীছ রেওয়ায়েত করেছি। সে বৎসরই আমি রায় সফর করেছিলাম। ১৮৬ হিজরীতে আমি বছরায় প্রথম সফর করি। ১৮৭ হিজরীতে মক্কা মুকন্নররমায় সুফিয়ান বিন উয়াইনার খিদমতে উপস্থিত হই। আমাদের মক্কায় পৌঁছার কিছুদিন পূর্বে ফুযাইল বিন আয়ায মৃত্যুবরণ করেন।

ঐ বৎসরই প্রথম বারের মত হজ্জ পালন করি। ইব্রাহীম বিন সাদ থেকেও হাদীছ লিখেছি। তাঁর পিছনে কয়েকবার নামাযও পড়েছি। ১৮৬ হিজরীর শেষ দশদিনে আমি আবাদান গিয়েছি। ঐ বৎসরই মুতামার বিন সুলাইমানের নিকট গিয়েছি। আমরা ১৯৮ হিজরীতে ইয়ামানে আব্দুর রায্বাকের নিকট ছিলাম। সেখান থেকেই সুফিয়ান বিন উয়াইনা, আব্দুর রহমান বিন মাহদী এবং ইয়াহয়া বিন সায়ীদ কাতানের মৃত্যুর সংবাদ পেয়েছি। ১৯৪ হিজরীতে বছরায় সুলাইমান বিন হরব, আবুন নোমান আরেম, আবু উমর হাউযী থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছি। আমার নিকট যদি পঞ্চাশটি দেরহাম থাকত তবে আমি 'রায়'ব্রজরীর বিন আদ্দিলাহর নিকট যেতাম। আমার কোন কোন সাথী গিয়েছে। কিন্তু আমি যেতে পারিনি। পরে কুফায় গেলাম। সেখানে এমন বাড়ীতে অবস্থান করলাম, যেখানে বালিশ হিসেবে ইট ব্যবহার করতে হয়েছে। সেখানে কঠিন জ্বরে আক্রান্ত হলে মায়ের নিকট ফিরে এলাম। মায়ের অনুমতি ছাড়াই আমি কুফা গিয়েছিলাম। আমি সর্বমোট পাঁচবার কুফা গিয়েছি। প্রথমবার ১৮৬ হিজরীর রজব মাসে। সেখানে মুতামার বিন সুলাইমান থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছি। ১৯০ হিজরীতে দ্বিতীয়বার এবং ১৯৫ হিজরীতে তৃতীয়বার সেখানে গিয়েছি। তখন 'গুনদুর' এর ইস্তেকাল হয়ে গিয়েছিল। তাই ইয়াহয়া বিন সায়ীদের নিকট ছয়মাস অবস্থান করলাম। তার এখান থেকে 'ওয়াসেতে' ইয়াযীদ বিন হারুননের খিদমতে পৌঁছলাম। তিনি যখন জানতে পারলেন যে আমি ইয়াযীদ বিন হারুননের নিকট গিয়েছি, তখন বললেন, সে ওয়াসেতে ইয়াযীদ বিন হারুননের নিকট গিয়ে কি করবে? উদ্দেশ্য এই যে, আহমদ বিন হাম্বল ইয়াযীদ বিন হারুন থেকে বড় আলেম।

ইব্রাহীম বিন হাশেম বর্ণনা করেন, জরীর বিন আব্দিল হামীদ 'রায়' হতে বাগদাদ আগমন করেন এবং বনী মুসাইয়েবে অবস্থান করেন। সেখান থেকে যখন পূর্ব বাগদাদে আসেন তখন দজলা নদীতে বড় ভয়াবহ বন্যা হয়ে গেল।

আমি আহমদ বিন হাম্বলকে বললাম, চলুন, আমরাও পাড়ে গিয়ে হাদীছ শ্রবণ করে আসি। তিনি বললেন, আমার মা আমাকে অনুমতি দিচ্ছেন না। আমি একা গিয়ে জরীর বিন আব্দিল হামীদ থেকে হাদীছ পড়েছি। এ বন্যা হয়েছিল ১৮৬ হিজরীতে। ঐ সময় হারুনুর রশীদের পক্ষ থেকে বাগদাদের হাকেম ছিলেন সিন্ধী বিন শাহেক। তিনি দজলা পারাপার বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

ইয়াকুব বিন ইসহাক বিন আবি ইসরাঈল বলেন, আমার পিতা এবং আহমদ বিন হাম্বল সমুদ্র পথে শিক্ষা সফর করেন। সমুদ্রে নৌকা ভেঙ্গে গেলে তারা একটি দ্বীপে আশ্রয় নেন।

পুত্র আব্দুল্লাহ বলেন, আমার পিতা পায়ে হেঁটে 'তরসুস' সফর করেন।

ইমাম সাহেব বলেন, ইয়ামানে আমি ইব্রাহীম বিন উকাইল এর নিকট গেলাম। তিনি কঠোর মেযাজী ছিলেন। তার নিকট পর্যন্ত পৌঁছা বড়ই কঠিন ছিল। তার দরজায় দু'একদিন পড়ে থেকে তার নিকট পৌঁছতে পেরেছি। তিনি আমাকে দুটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। অথচ তার নিকট ওহূব বিন মুনাবেহ-এর বর্ণিত জাবের বিন আব্দিল্লাহ (রাঃ)-এর অনেক হাদীছ ছিল। কিন্তু তার কঠোর মেযাজের কারণে সেগুলো তার নিকট থেকেও শুনতে পারিনি। তার শাগরেদ ইসমাঈল বিন আব্দিল করীম থেকেও শুনতে পাইনি। কারণ ইব্রাহীম বিন উকাইল তখনও জীবিত ছিলেন।

খশনাম বিন সাদ একবার ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়াহইয়া বিন ইয়াহইয়া কি ইমাম ছিলেন? তিনি বললেন, আমার মতে তিনি ইমাম ছিলেন। যদি আমার নিকট সফরের খরচ থাকত তবে আমি তার নিকট গিয়ে আসতাম।

শিক্ষা জীবনে বাধা-বিপত্তি ও অভাব-অনটন

আহমদ বিন ইব্রাহীম দাওরাকী বর্ণনা করেন, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) যখন আব্দুর রায্যাক থেকে হাদীছ শিক্ষা শেষে ইয়ামান থেকে মক্কায় আগমন করেন, তাঁকে খুবই ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। আমি তাঁকে বললাম, আবু আব্দিল্লাহ! আপনাকে খুবই ক্লান্ত দেখাচ্ছে। সফরে বেশ কষ্ট সহিতে হয়েছে নিশ্চয়। তিনি বললেন, আব্দুর রায্যাক থেকে যে জ্ঞান অর্জন করেছি তার তুলনায় কোন কষ্টই হয়নি। আমরা তাঁর নিকট থেকে এ দুটি সনদে হাদীছ শ্রবণ করেছি। প্রথমটি এরূপ

الزهرى عن سالم بن عبد الله عن أبيه *

যুহরী সালেম হতে। সালেম আপন পিতা আব্দুল্লাহ হতে।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে

الزهرى عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة *

যুহরী সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব হতে, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব আবু হোরাইরা (রাঃ) হতে।

একবার ইমাম আহমদ বিন হাম্বল এবং ইয়াহইয়া বিন ময়ীন একসাথে হজ্জ করতে গেলেন। ইমাম সাহেব ইয়াহইয়া বিন ময়ীনকে বললেন, ইনশাআল্লাহ; হজ্জ শেষে আমরা ছানআ গিয়ে আব্দুর রায্যাক থেকে হাদীছ শ্রবণ করব। এরপরে তারা তওয়াফ করছিলেন। ঘটনাক্রমে সেখানে আব্দুর রায্যাকও তওয়াফ করছিলেন। ইয়াহইয়া বিন ময়ীন তাকে দেখেই চিনে ফেললেন। কারণ পূর্ব থেকেই তাদের পরস্পরে পরিচয় ছিল। আব্দুর রায্যাক তওয়াফ এবং নামায শেষে মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে গিয়ে বসলেন।

তারাও তওয়াফ এবং নামায শেষ করলেন। পরে ইয়াহইয়া বিন ময়ীন ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে নিয়ে আব্দুর রায্যাকের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বললেন, এ হচ্ছে আপনার ভাই আহমদ বিন হাম্বল। তিনি বললেন, (এর সম্পর্কে আমি অনেক ভাল কথা শুনেছি) আমি এর অনেক প্রশংসা শুনেছি। ইবনে ময়ীন বললেন, ইনশাআল্লাহ আমরা আগামীকাল আপনার নিকট গিয়ে হাদীছ শ্রবণ করব। এরপর আব্দুর রায্যাক চলে গেলেন। আহমদ বিন হাম্বল বললেন, আপনি তাঁর সাথে ওয়াদা করে ফেললেন কেন? তিনি বললেন, আমরা তার নিকট থেকে হাদীছ শুনব। এতে আপনার ছনআ পর্যন্ত আসা-যাওয়ার দু মাস সময়ও বেঁচে যাবে। সফরের খরচও বেঁচে যাবে। আহমদ বিন হাম্বল বললেন, আল্লাহ এমন না করুন যে, আমি যে নিয়ত করেছি তা আপনার কথায় নষ্ট হয়ে গেছে। আমরা তার নিকট গিয়ে হাদীছ শুনব।

পরে হজ্জ পালন শেষে ইমাম সাহেব ছনআ গিয়ে আব্দুর রায্যাক থেকে হাদীছ পড়েন। অথচ এ সময়ে তার আর্থিক অনটন চলছিল।

ইসহাক বিন রাহওয়ে বলেন, ইমাম সাহেব ছনআ যাওয়ার পথে তাঁর রাহা খরচ শেষ হয়ে গেলে তিনি উষ্ট্র চালকদের ময়দুরী করে রাহা খরচের ব্যবস্থা করেন।

আব্দুর রায্যাক বলেন, আহমদ বিন হাম্বল আমাদের এখানে দু'বৎসর ছিলেন। ঐ সময়ে তিনি খুবই অভাব-অনটনে ছিলেন। তাই তাঁকে একদিন বললাম, হে আবু আব্দিল্লাহ! আমাদের দেশে (ইয়ামানে) ব্যবসাও সুবিধাজনক

নয়; দেশটাও তত উন্নত নয়। তাই অর্থ উপার্জন একটু কষ্টসাধ্য। আমার নিকট কিছু দীনার আছে সেগুলো কবুল করুন। কিন্তু তিনি তা নিলেন না। এ ঘটনা মনে করে আব্দুর রায্যাক প্রায়ই কাঁদতেন।

ওয়াসেতে ইমাম সাহেব ইয়াযীদ বিন হারুনের নিকট অবস্থানকালে আর্থিক অনটনের সম্মুখীন হন। তখন ছিল পূর্ণ শীতকাল। ইমাম সাহেব তার জুব্বাটি খুলে বিক্রয়ের জন্য তার এক সাথীর নিকট দিলেন। তিনি তা ইয়াযীদ বিন হারুনের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে বললে তিনি ইমাম সাহেবের নিকট দু'শ দিরহাম পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু ইমাম সাহেব তা গ্রহণ করলেন না। বললেন আমি অভাবগ্রস্ত মুসাফির বটে; কিন্তু এভাবে দান বা হাদিয়া গ্রহণে অভ্যস্ত হতে চাই না।

মক্কা মুকাররমায় সুফিয়ান বিন উয়াইনার নিকট থেকে হাদীছ শিক্ষা গ্রহণ করার সময় একবার তাঁর কাপড়-চোপড় চুরি হয়ে যায়। তিনি যখন জানতে পারলেন যে, তাঁর এ সবকিছু চুরি হয়ে গেছে। তখন শুধুমাত্র হাদীছ লিখিত কাগজগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। লোকেরা বলল, সেগুলো তাকের উপর সযত্নে রাখা আছে। এ ঘটনার পর কয়েকদিন পর্যন্ত তিনি দরসে উপস্থিত হননি। কারণ তাঁর পরনে দুটি পুরাতন কাপড় ছিল যা পরিধান করে মজলিসে আসার অনুপযোগী। পরে জনৈক সাথী থেকে একটি দীনার ধার নিয়ে কাপড় ক্রয় করলেন।

আমরগ শিক্ষা

ইমাম সাহেব তাঁর জ্ঞান-গরিমায় প্রসিদ্ধির চূড়ান্তে পৌঁছে গিয়েছিলেন। সর্বত্র তাঁর মহত্ত্ব এবং ব্যক্তিত্বের আলোচনা হচ্ছিল। একদিন তিনি জনৈক মুহাদ্দিসের মজলিসে যাচ্ছিলেন। তাঁর হাতে দোয়াত ছিল। তা দেখে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, আবু আদ্দিন্লাহ! আপনি জ্ঞানের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছেছেন এবং আপনি মুসলমানদের ইমাম। এরপরও পড়তে যাচ্ছেন। তিনি বললেন,

مع المجيرة الى المقبرة *

কবর পর্যন্ত পড়ে যাব।

মুহাম্মদ বিন ইসমাইল ছায়েগ বলেন, একবার আমি বাগদাদ গেলাম। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ)কে দেখতে পেলাম যে, তিনি জুতা হাতে নিয়ে দৌড়িয়ে যাচ্ছেন। আমার পিতা আগে বেড়ে তার কাপড় আঁকড়ে ধরে বললেন, আবু আদ্দিন্লাহ! কতদিন পর্যন্ত আর পদালেখা করবেন? এ বালকদের সাথে

দৌড়তে কি আপনার লজ্জা লাগে না। উত্তরে তিনি الى الموت (মৃত্যু পর্যন্ত) বলে চলে গেলেন।

ওকী বিন জাররাহ রাতে ইমাম সাহেবের বাড়ী এসে হাদীছ সম্পর্কে আলোচনা করতেন। একরাতে ওকী ইমাম সাহেবের বাড়ী এসে দরজার দু'কপাট ধরে দাঁড়ালেন। ভিতর থেকে ইমাম সাহেব এসে হাদীছের আলোচনা শুরু করলেন। ওকী বিন জাররাহ বললেন, আমি আপনার সামনে সুফিয়ান বিন উয়াইনার হাদীছ বর্ণনা করছি। ইমাম সাহেব বললেন, বর্ণনা করুন। এরপর ওকী এ সনদে হাদীছ বর্ণনা করলেন, সুফিয়ান হতে, তিনি সালমা বিন কুহাইল হতে। ইমাম সাহেব বললেন, এ হাদীছগুলোতো আমার মুখস্ত আছে। এরপর ওকীকে জিজ্ঞেস করলেন, সালমা বিন কুহাইলের হাদীছ আপনার মুখস্ত আছে?

এভাবে দরজায় দাঁড়িয়ে হাদীছের দুই শিক্ষার্থী সারারাত কাটিয়ে দিলেন।

হাদীছের উপর আমল

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) শিক্ষা জীবনে যত হাদীছ লিখতেন তার প্রতিটি হাদীছ অনুযায়ী আমল করতেন। তিনি যখন হাদীছে জানতে পারলেন যে, রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিংগা লাগিয়েছেন এবং এর জন্য ক্ষৌরকার আবু তাইবাকে একটি দীনার দিয়েছেন। তিনিও দেহে শিংগে পোচার করেন এবং ক্ষৌরকারকে এর বিনিময়ে একটি দীনার প্রদান করেন।

শিক্ষকদের দৃষ্টিতে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) যখন ইসমাইল বিন উলাইয়্যার নিকট পড়তে যান তখন তাঁর বয়স ছিল তিরিশেরও নীচে। ইবনে উলাইয়্যার পরিবার পরিজন এ সময়েও তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করত এবং তার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখত।

একবার উলাইয়্যার দরসী মজলিসে কোন এক ছাত্রের কথায় সবাই হেসে উঠল। উক্ত মজলিসে ইমাম সাহেব উপস্থিত ছিলেন। ইবনে উলাইয়্যার ছাত্রদের উপর খুব রাগান্বিত হয়ে, বললেন, এখানে আহমদ বিন হাম্বল উপস্থিত রয়েছে। আর তোমরা হাসছ।

ইমাম সাহেব যখন ইয়াযীদ বিন হারুনের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করতে যান তখন তিনি ইমাম সাহেবকে খুবই সম্মান দেখাতেন। একবার ইমাম সাহেব অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি তাকে দেখতে যান।

একদিন ইয়াযীদ বিন হারুন দরসী মজলিসে হাসি কৌতুকের কোন একটি কথা বললেন। ইমাম সাহেবও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি কাশি দিলেন। ইয়াযীদ বিন হারুন জিজ্ঞেস করলেন, কে? উপস্থিত ব্যক্তির বলল, আহমদ বিন হাম্বল। তিনি বললেন, আহমদ বিন হাম্বল উপস্থিত আছে জানলে আমি হাসির কথা বলতাম না।

ইমাম সাহেবের শায়খ ও উস্তাদবর্গ

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) তাঁর নিজ শহর বাগদাদের উলামায়ে কিরাম এবং মুহাদ্দিছীনদের নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণের পর শিক্ষার্থে বিভিন্ন দেশে সফর করেন। তিনি কূফা, বছরা, মক্কা, মদীনা, ইয়ামান, সিরিয়া, জযীরা, আবাদান, ওয়াসেত প্রভৃতি দেশ সফর করে সেখানকার উলামায়ে কিরাম এবং মুহাদ্দিছীনদের নিকট থেকে হাদীছ শিক্ষা লাভ করেন। এঁদের সংখ্যা অনেক। খতীব বাগদাদী তার প্রসিদ্ধ কিতাব তারিখে বাগদাদ-এ ইমাম সাহেবের নিম্নলিখিত শায়খদের নাম উল্লেখ করেছেন।

ইসমাঈল বিন উলাইয়্যা, হুশাইম বিন বশীর, হাম্মাদ বিন খালেদ খাইয়্যাভ, মনছুর বিন সালমা খুযায়ী, মুযাফ্ফর বিন মুদরিক, উছমান বিন উমর বিন ফারেস, আবু নযর হাশেম বিন কাসেম, আবু সায়ীদ মাওলা বনী হাশেম, মুহাম্মদ বিন ইয়াযীদ ওয়াসেতী, ইয়াযীদ বিন হারুন ওয়াসেতী। মুহাম্মদ বিন আবি আদী, মুহাম্মদ বিন জাফর গুনদর। ইয়াহইয়া বিন সায়ীদ কাগান। আব্দুর রহমান বিন মাহদী, বিশর বিন মুফায্য়ল, মুহাম্মদ বিন আবি বকর বুরসানী, আবু দাউদ তায়ালসী, রাউহ বিন উবাদা, ওকীহ বিন জাররাহ, আবু মুআবিয়া যারীর, আব্দুল্লাহ বিন নুমাইর, আবু উসামা, সুফিয়ান বিন উয়াইনা, ইয়াহইয়া বিন সূলাইম তায়েফী, মুহাম্মদ বিন ইদ্রীস শাফেয়ী, ইব্রাহীম বিন সাদ যুহরী, আব্দুর রায্যাক বিন হাম্মাম ছনআনী, আবু কোররা মুসা বিন তারেক, ওলীদ বিন মুসলিম, আবু মুসহির দামেক্কী, আবুল ইয়ামান আলী বিন আয়্যাশ, বিশর বিন ওআইব বিন আবি হামযা। এঁদের নাম উল্লেখ শেষে খতীব বাগদাদী লিখেন,

এঁদের ছাড়াও আরো অনেক উলামা থেকে হাদীছ শিক্ষা করেন। যাদের পরিসংখ্যান দুঃসাধ্য।

‘মানাকেবে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল’ কিতাবে এঁদের নাম তিরিশাধিক পৃষ্ঠাব্যাপী বর্ণনা করা হয়।

ইমাম শাফেয়ীর সাথে বিশেষ সম্পর্ক এবং তাঁর শিষ্যত্বঃ- ইমাম আহমদ বিন হাম্বল তাঁর শায়খদের মধ্যে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর অধিক নৈকট্য অর্জন করেছিলেন। এ সম্পর্কে ইবনে খিল্লিকান লিখেন-

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ইমাম শাফেয়ীর প্রিয় ছাত্রদের অন্যতম। ইমাম শাফেয়ীর মিশর গমন পর্যন্ত তিনি তাঁর সাথেই ছিলেন। তার সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন, আমি বাগদাদ থেকে প্রত্যাবর্তনকালে আহমদ বিন হাম্বল হতে অধিক মুক্তাকী এবং ফিকাহবিদ আর কাউকে রেখে আসিনি।

ইমাম সাহেব স্বয়ং বলেন, আমি ইমাম শাফেয়ীর মজলিসে বসার পরেই নাসেখ এবং মনসুখ হাদীছ সম্পর্কে অবগত হয়েছি।

ইমাম সাহেবের পুত্র আব্দুল্লাহ তার পিতাকে জিজ্ঞেস করলেন, এই শাফেয়ী কে? প্রায়ই দেখছি আপনি তার জন্য দোয়া করেন। তিনি বললেন বেটা! শাফেয়ী হচ্ছেন দুনিয়ার জন্য সূর্যতুল্য বা দেহের জন্য সুস্থতাতুল্য। এ দুটোর কি কোন বিকল্প থাকতে পারে? আমি তিরিশ বৎসর যাবত প্রত্যহ শাফেয়ীর জন্য দোয়া করছি। যারা ইলম অর্জন করছে তাদের প্রত্যেকের উপরই ইমাম শাফেয়ীর ইহসান রয়েছে।

ইয়াহইয়া বিন ময়ীন বলেন, আহমদ বিন হাম্বল আমাদেরকে ইমাম শাফেয়ীর মজলিসে যেতে নিষেধ করতেন। একদিন দেখলাম যে, ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) খচ্চরের উপর সওয়ার হয়ে চলছেন আর ইমাম আহমদ বিন হাম্বল তার পিছনে পিছনে হেঁটে চলছেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি আমাদেরকে ইমাম শাফেয়ীর মজলিসে যাওয়া থেকে বিরত রাখতেন আর এখন দেখছি আপনি নিজেই তার খচ্চরের পিছনে চলছেন? তিনি বললেন, চুপ থাক! তার খচ্চরের সাথে চললেও আমি উপকৃত হব।

মাহফুজ বিন আবি তওবা বলেন, একদিন আমি ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে ইমাম শাফেয়ীর মজলিসে বসা দেখে তাকে বললাম, আবু আব্দিল্লাহ! আপনি শাফেয়ীর মজলিসে বসে আছেন অথচ সুফিয়ান বিন উয়াইনা মসজিদের কোনে বসে হাদীছ পড়াচ্ছেন। তিনি বললেন-

সুফিয়ান বিন উয়াইনাকে পরেও পাওয়া যাবে। কিন্তু শাফেয়ীকে পাওয়া যাবে না।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) ১৯৫ হিজরীতে প্রথমবারের মত বাগদাদ আগমন করেন। সে সময় তিনি দু'বৎসর সেখানে অবস্থান করেন। এরপর তিনি ১৯৮

হিজরীতে দ্বিতীয়বারের মত বাগদাদ আগমন করেন। এখানে কয়েকমাস অবস্থান করে মিশর গমন করেন। ঐ সময় ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) থেকে পুরোপুরিভাবে উপকৃত হন। এ সময়ে ইমাম শাফেয়ীর নিকট কাযী হবার প্রস্তাব আসে কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

এর পূর্বেও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল হজ্ব উপলক্ষে মক্কায় গিয়ে ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) থেকে শিক্ষা লাভ করেন।

আল্লামা সুবকী ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে ইমাম শাফেয়ীর ছাত্রদের মধ্যে গণ্য করেছেন।

উস্তাদ, শায়খ এবং বড়দের সম্মান

ইয়াহইয়া বিন ময়ীন বাগদাদে একবার ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে ইমাম শাফেয়ীর সওয়ারীর সাথে চলতে দেখে তার পুত্র আব্দুল্লাহকে বললেন, শাফেয়ীর সওয়ারীর সাথে চলতে আপনার পিতার কি লজ্জা আসে না? তিনি তার পিতার নিকট এর উল্লেখ করলে তিনি বললেন, তুমি ইয়াহইয়া বিন ময়ীনকে বলে দিও যে, তুমি তার বাম পাশ দিয়ে চললেও জ্ঞান (ইলম) অর্জিত হবে।

খলফ হতে ইদ্রীস বিন আদিল করীম বর্ণনা করেন, একবার আহমদ বিন হাম্বল আবু আওয়ানার হাদীছ শুনার জন্য আমার নিকট আগমন করেন। আমি তাঁকে সম্মান প্রদর্শন করতে চাইলে তিনি বললেন,

আমি আপনার সম্মুখেই বসব। কারণ যার নিকট থেকে শিক্ষা গ্রহণ করব তার সাথে বিনয় করার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

ইসহাক শহীদ বর্ণনা করেন, আছরের নামাযের পর ইয়াহইয়া বিন সায়ীদ কাত্তান মসজিদের মিনারায় হেলান দিয়ে বসে যেতেন আর তাঁর সামনে আলী বিন মাদীনী, আমর বিন আলী, আহমদ বিন হাম্বল, ইয়াহইয়া বিন ময়ীন প্রমুখ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাদীছ শ্রবণ করতেন। তিনি কাউকে বসতেও বলতেন না। আর তাঁর সামনে বসার কারো সাহসও হত না।

কুতাইবা বিন সায়ীদ বলেন, আমি আহমদ বিন হাম্বলের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য বাগদাদ গেলাম। তিনি ইয়াহইয়া বিন ময়ীনসহ আমার নিকট আসলেন। আমরা হাদীছের আলোচনা করতে লাগলাম। যতক্ষণ আলোচনা করছিলাম আহমদ বিন হাম্বল আমার সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁকে বসতে বললে, বলতেন—

আপনি আমাকে নিয়ে ভাববেন না। আমি সঠিক পদ্ধতিতে ইলম অর্জন করতে চাই।

আমর নাকেদ বলেন, আমরা ওকী বিন জাররাহর মজলিসে বসা ছিলাম। এমন সময় আহমদ বিন হাম্বল এসে নীরবে বসে গেলেন। আমি তাকে বললাম, শায়খ আপনাকে সম্মান করেন। আপনি কথা বলছেন না কেন? তিনি বললেন-

যদিও তিনি আমাকে সম্মান করেন তবুও তাঁর মর্যাদা রক্ষা করা আমার উচিত।

হাদীছ বর্ণনা এবং ফতোয়া

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল চল্লিশ বৎসর শিক্ষা অর্জনে ব্যয় করেন। এ সময়ে তিনি শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রেই হাদীছ রেওয়াজেত করতেন কিংবা ফতোয়া দিতেন। চল্লিশ বৎসর বয়সেই তিনি নিয়মিত শিক্ষা মজলিস কয়েম করেন।

নাউহ বিন হাবীব বলেন, ১৯৮ হিজরীতে দেখতে পেলাম যে, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল মসজিদে খায়ফের মিনারায় হেলান দিয়ে ছাত্রদেরকে ফিকাহ, হাদীছ এবং হজ্ব সম্পর্কিত মাসয়ালা শিক্ষা দিচ্ছেন। তাঁর সাথে পরিচয় না থাকায় চিনতে পারিনি। এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলাম ইনি কে? সে বলল, ইনি হচ্ছেন 'আহমদ বিন হাম্বল।' তাঁর নাম শুনে সেখানে রয়ে গেলাম। ছাত্রদের ভীড় শেষ হলে আমি সালাম করে তাঁর হাত চেপে ধরলাম। তখন থেকেই আমরা পরস্পরে পরিচিত হয়ে যাই।

হাজ্জাজ বিন শায়ের বর্ণনা করেন, আমি ২০৩ হিজরীতে আহমদ বিন হাম্বলের খিদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁকে হাদীছ বর্ণনা করার জন্য অনুরোধ করলাম। কিন্তু তিনি তা করতে অস্বীকৃতি জানালেন। এরপর আমি ইয়ামানে আব্দুর রায়্বাক ছনআনীর নিকট গিয়ে হাদীছ শ্রবণ করি। ২০৪ হিজরীতে সেখান থেকে ফিরে দেখি আহমদ বিন হাম্বল নিয়মিত দরসী মজলিস শুরু করে দিয়েছেন। তাঁর দরসী মজলিসে অনেক ছাত্রের সমাগম হতো। ঐ সময় তাঁর বয়স চল্লিশে উপনীত হয়ে গিয়েছিল।

এ ঘটনা থেকে বুঝা যায়, ইমাম সাহেব নিয়মিত দরস শুরু করার আগেই সমসাময়িকদের মধ্যে তিনি শায়খদের মর্যাদায় পৌঁছে গিয়েছিলেন। আহলে ইলমগণ তার নিকট শিক্ষা গ্রহণ করতে চাইতেন, কিন্তু তিনি এতে সন্মত হতেন না।

শায়খদের জীবদ্দশায় তাঁদের বর্ণিত হাদীছ বর্ণনা না করা

মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান ছায়রাফী বলেন, একবার আমি আহমদ বিন হাম্বলের নিকট উপস্থিত ছিলাম। তিনি আব্দুর রায্যাক থেকে একটি হাদীছ বর্ণনা করলেন। আমি বললাম, আপনি হাদীছটি বলুন আমি লিখে নিচ্ছি। তিনি বললেন, এখনও আব্দুর রায্যাক জীবিত আছেন। তুমি আমার নিকট থেকে হাদীছ বর্ণনা করবে কেন? আমি বললাম, আল্লাহর কসম সত্য বলছি আপনি যদি আমার নিকট হাদীছটি বর্ণনা করেন- আর আমি আপনার দরজা অতিক্রম করেই আব্দুর রায্যাকের সাক্ষাৎ পাই তবু তাকে এ হাদীছ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করব না। ইমাম সাহেব দরসী মজলিস কায়েম করা সত্ত্বেও শায়খদের জীবদ্দশায় তাদের বর্ণিত হাদীছ রেওয়াজেত করতে পছন্দ করতেন না। হাদীছ শিক্ষার্থীদেরকে সরাসরি তাদের নিকট থেকে হাদীছ শ্রবণ করার পরমর্শ দিতেন। বলতেন, তোমরা তাঁদের নিকট গিয়ে তাঁদের হাদীছ রেওয়াজেত কর।

হামদান বিন আলী ওররাক বলেন, ২১৩ হিজরীতে আমরা আহমদ বিন হাম্বলের নিকট গিয়ে হাদীছ বর্ণনা করার অনুরোধ জানালাম। তিনি বললেন, আবু আছেমের মত বিজ্ঞ আলেম জীবিত থাকতে তোমরা আমার নিকট হাদীছ শুনবে? যাও তার নিকট গিয়ে হাদীছ শুন।

যুবাকালে প্রসিদ্ধি

যৌবনকালেই ইমাম সাহেবের ইলমের প্রসিদ্ধি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর বন্ধু-বান্ধব, সমসাময়িকগণ এবং উলামা ও মাশায়েখগণ তাঁর ব্যাপারে আশাবাদী ছিলেন। তাঁর জ্ঞান, মর্যাদা, যুহদ এবং তাকওয়া সবার নিকট স্বীকৃত ছিল। কুতাইবা বিন সায়ীদ বলেন,

আমাদের যমানার সবচেয়ে বড় আলেম হচ্ছেন ইবনুল মুবারক। এরপর এই যুবকটি অর্থাৎ আহমদ বিন হাম্বল।

একবার আবু মুসহিরকে জিজ্ঞেস করা হল, আপনার দৃষ্টিতে কি এমন কোন ব্যক্তি আছেন যিনি ধর্মীয় বিষয়গুলো হিফায়ত করতে সক্ষম? তিনি উত্তরে বললেন,

পূর্ব বাগদাদের এক যুবক অর্থাৎ আহমদ বিন হাম্বল ব্যতীত আর কাউকে একাজে সক্ষম দেখছি না।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) শেষবারের মত যখন ১৯৮ হিজরীতে বাগদাদ আগমন করেন, তখন ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের (রহঃ) বয়স ছিল চৌত্রিশ বৎসর। ইমাম শাফেয়ী সেখানে কয়েকমাস অবস্থান করে যখন মিশর গমন করেন, তখন ইমাম আহমদ বিন হাম্বল সম্পর্কে বলেছিলেন, বাগদাদে আমি ইমাম আহমদ বিন হাম্বল অপেক্ষা বড় ফকীহ, যাহেদ কিংবা আলেম কাউকে রেখে আসিনি।

ওকী বিন জাররাহ এবং হাফছ বিন গিয়াস বলতেন,

এ যুবক অর্থাৎ আহমদ বিন হাম্বলের মত কোন আলেম কুফায় আসেনি।

এ সৎ ও নেককার যুবক সবার দৃষ্টিতে একজন বরণীয় আলেম হওয়া সত্ত্বেও নবুওয়্যতের বয়স অর্থাৎ চল্লিশ বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে দরসী মজলিস কয়েম করেননি। আর যখন কয়েম করলেন তখন ইলমের জগৎ সঙ্কুচিত হয়ে তাঁর মজলিসে জড়ো হতে লাগল।

মজলিসে দরস

ইবনে জওযী প্রমুখ উল্লেখ করেন যে, চল্লিশ বৎসর বয়সের পরেই ইমাম আহমদ বিন হাম্বল হাদীছ বর্ণনা এবং ফতোয়া দানের আসনে আসীন হন। তিনি অত্যন্ত সতর্কতা, ইখলাছ সহকারে এ দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। মজলিসে অংশগ্রহণকারীদেরকে ভালবাসার মাধ্যমে শিক্ষা দিতেন। তার প্রতিটি কাজে তাদের মঙ্গল কামনার আভা ফুটে উঠত।

আবুল কাসেম বিন মনী বর্ণনা করেন, আমি সুওয়াইদ বিন সাযীদের দরসী মজলিসে অংশগ্রহণের সুযোগ দানের জন্য সুপারিশ করে চিঠি লিখে দেয়ার জন্য ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে অনুরোধ করলাম। তিনি আমার সম্পর্কে এরূপ লিখলেন;

هذا رجل يكتب الحديث

এ ব্যক্তি হাদীছ লিখে।

আমি বললাম, আমি আপনার নিকট এতদিন যাবৎ রয়েছি। আপনি যদি এ কথাটি লিখে দেন هذا الرجل من اصحاب الحديث (এ ব্যক্তি মুহাদ্দিছ) তবে ভাল হত। তিনি বললেন-

* صاحب الحديث عندنا من يستعمل الحديث

আমাদের নিকট মুহাদ্দিছ সেই, যে হাদীছ অনুযায়ী আমল করে।

তিনি তার শাগরেদদেরকে সনদে আলী (হাদীছ বর্ণনাকারী এবং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মধ্যে সম্ভাব্য কম মাধ্যম হওয়া) গ্রহণ করার পরামর্শ দিতেন এবং বলতেন এটা সলফদের সুন্নত বা রীতি। একবার তাকে সনদে আলী সন্ধানকারী শিক্ষার্থী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। তিনি বললেন, সনদে আলী তালাশ করা সলফদের সুন্নাত বা রীতি। হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ)-এর শাগরেদগণ কূফায় তাঁর নিকট থেকে হাদীছ শ্রবণ করতেন।

হাম্বল বিন ইসহাক বলেন, একবার ইমাম সাহেব আমাকে সূক্ষ্ম লেখা লিখতে দেখে বললেন, এত সূক্ষ্ম লেখা লিখ না। কারণ প্রয়োজনের সময় এটা কোন কাজে আসবে না।

শিক্ষা অন্বেষণের ক্ষেত্রে 'রিয়া' থেকে বাঁচার জন্য খুব বেশী তাকিদ দিতেন। বলতেন- দোয়াত দেখানও রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। কারণ এতে মানুষে বুঝে যে, এ লোক হাদীছ লিখে।

মজলিসে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা

ইমাম সাহেবের শিক্ষা মজলিসে আহলে ইলম এবং সাধারণ উভয় শ্রেণীর লোকের বেশ সমাগম হত। আহলে ইলমগণ হাদীছের শিক্ষা নিতেন এবং সাধারণ শ্রেণীর লোক তাঁর কাছে আদব শিখতেন।

হাসান বিন ইসমাঈল তার পিতার থেকে বর্ণনা করেন,

আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ)-এর মজলিসে পাঁচ সহস্রাধিক লোকের সমাগম হত। তন্মধ্যে পাঁচশতেরও কম সংখ্যক লোক হাদীছ লিখতেন। অন্যান্যরা তার কাছে আদব শিখতেন।

আবু বকর বিন মুতুতাবেব্বী বলেন, আমি বার বৎসর পর্যন্ত আহমদ বিন হাম্বলের দরসী মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। তিনি তার সন্তানদেরকে মুসনাদ শিক্ষা দিচ্ছিলেন। ঐ সময় আমি তার নিকট থেকে কোন হাদীছ লিখিনি। বরং তার চরিত্র এবং আদব-আখলাক প্রত্যক্ষ করেছি।

মুহাম্মদ বিন ইব্রাহীম আনমাতী বর্ণনা করেন, আমি ইমাম সাহেবের মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। আমার সামনে দোয়াত ছিল না। তাঁর সামনে দোয়াত রাখা ছিল। ইমাম সাহেব একটি হাদীছ বর্ণনা করলেন, আমি তার দোয়াত থেকে লিখার অনুমতি চাইলে তিনি এ বলে অনুমতি দিলেন-

লিখ! এটা (অনুমতি চাওয়া) অন্ধ তাকওয়া।

ছাত্রদের মর্যাদা এবং সুখ-শান্তির প্রতি লক্ষ্য

মুহাম্মদ বিন দাউদ মিস্‌সিসী বলেন, আমরা হাদীছ শিক্ষার্থীরা একবার ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের মজলিসে বসে হাদীছের আলোচনা করছিলাম। মুহাম্মদ বিন ইয়াহয়া একটি দুর্বল হাদীছ রেওয়ায়েত করলে ইমাম সাহেব বললেন, এ ধরনের হাদীছ বর্ণনা করো না। এ কথা শুনে মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া লজ্জিত হল। ইমাম সাহেব তাকে খুশী করার জন্য বললেন, আবু আদ্দিনাহ! এ কথাটি আমি তোমার মর্যাদা বজায় রাখার জন্য বলেছি।

ইমাম সাহেব তাঁর ছাত্রদের সুখ-শান্তি, আরাম-আয়েশের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। অন্যদেরকেও এ বিষয়ে তাকিদ করতেন।

হারুন বিন আদ্দিনাহ হাম্বাল বলেন, একরাতে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল আমার বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলেন। সালামের পর তাঁকে অসময়ে আগমনের কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, আপনি আজ আবার আমার মনে অশান্তি সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আমি বললাম, আবু আদ্দিনাহ! কি ব্যাপার? তিনি বললেন, আমি আপনার মজলিসের নিকট দিয়ে যাবার সময় দেখতে পেলাম যে, আপনি ছায়ায় বসে হাদীছ পড়াচ্ছেন আর ছাত্ররা কাগজ কলম নিয়ে রৌদ্রে দাঁড়িয়ে আছে। অতঃপর বললেন,

এরূপ আর করবেন না। পড়াতে বসলে শিক্ষার্থীদের সাথে বসবেন।

ছাত্রদের সাথে হাসি-কৌতুকঃ- ইমাম সাহেব তার মজলিসে অংশ গ্রহণকারীদের সাথে হাসি-কৌতুক করতেন। ইসহাক বিন হানী বর্ণনা করেন, আমরা ইমাম সাহেবের মজলিসে উপবিষ্ট ছিলাম। সেখানে আবু বকর মারওয়াযী এবং মুহান্না বিন ইয়াহইয়া শামীও উপস্থিত ছিলেন। এক ব্যক্তি এসে বাহির হতে দরজায় করাঘাত করে জিজ্ঞেস করল, মারওয়াযী এখানে আছে কি? মারওয়াযী ঐ ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করতে অনিচ্ছুক। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে মুহান্না বিন ইয়াহইয়া তার হাতের তালুতে আঙ্গুল রেখে ভিতর হতে জবাব দিলেন, মারওয়াযী এখানে (হাতের তালুতে) নেই। তাঁর এখানে কি কাজ? এ তামাশা দেখে ইমাম সাহেব হেসে উঠলেন।

ইমাম সাহেবের এক প্রতিবেশী বড়ই পাপী এবং লম্পট ছিল। একদিন সে মজলিসে এসে ইমাম সাহেবকে সালাম করল। ইমাম সাহেব সঙ্কোচ মনে উত্তর দিলেন। সে বলল, আপনি আমাকে দেখে বিরক্তি বোধ করবেন না। কারণ আমি একটি স্বপ্ন দেখে সম্পূর্ণরূপে বদলে গিয়েছি। ইমাম সাহেব জিজ্ঞেস করলেন

তুমি স্বপ্নে কি দেখেছ? সে বলল, আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পেলাম যে, তিনি একটি উঁচু জায়গায় বসে আছেন। নীচে অনেক লোক সমবেত হয়ে আছে। তাদের মধ্য হতে একজন একজন করে উঠে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বলছে আপনি আমার জন্য দোয়া করুন। তিনি তাদের জন্য দোয়া করলেন। সর্বশেষে যখন আমি উঠতে চাইলাম তখন পাপের কারণে লজ্জিত হয়ে আমি উঠতে পারিনি। তিনি আমার নাম ধরে বললেন, হে অমুক! তুমি উঠে এসে আমার নিকট দোয়া চাচ্ছেনা কেন? আমি আরয় করলাম-আমার পাপিষ্ঠ জীবনের প্রতি লক্ষ্য করে লজ্জায় আসতে পারি না। তিনি বললেন, তুমি আমার নিকট দোয়ার প্রার্থনা কর। আমি তোমার জন্য দোয়া করব। কারণ তুমি আমার কোন ছাহাবীকে মন্দ বল না। অবশেষে আমিও উঠে গিয়ে তাঁর নিকট দোয়া প্রার্থনা করলাম। তিনি আমার জন্য দোয়া করলেন। পরে স্বপ্ন থেকে জাগ্রত হয়ে আমার অতীত জীবন থেকে তওবা করে নিয়েছি।

এ স্বপ্নের বিবরণ শুনে ইমাম সাহেব উপস্থিত ব্যক্তিদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, হে জাফর! হে অমুক! হে অমুক! তোমরা এ ঘটনা স্মরণ রেখো এবং মানুষকে শুনিও। এ ঘটনা অবশ্যই উপদেশমূলক।

মানুষের অন্তরে তাঁর ভয়ভীতি

মুহাম্মদ বিন মুসলেম বলেন, আমরা ইমাম সাহেবের গাঞ্জীর্য ও তাঁর দ্বীনি এবং ইলমী প্রভাবের দরুন তাঁর কোন কথার উত্তর দিতে কিংবা কোন বিষয়ে তাঁর সাথে আলোচনা করতে ভয় পেতাম।

আরদৌস নামক জনৈক ব্যক্তি বলেন, ইমাম সাহেব একবার আমাদের হাসতে দেখেছেন। এর দরুন এখনও আমি লজ্জিত হয়ে আছি।

আবু উবাইদ কাসেম বিন সাল্লাম বলেন, আমি কাযী আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ বিন হাসান শায়বানী, ইয়াহইয়া বিন সায়ীদ কাত্তান, আব্দুর রহমান বিন মাহদী প্রমুখের মজলিসে বসেছি। কিন্তু আহমদ বিন হাম্বলের ন্যায় অন্য কারও ভয় আমার অন্তরে প্রভাব বিস্তার করেনি।

আবু দাউদ বলেন- ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ)-এর মজলিস ছিল আখেরাতের মজলিস। তাঁর মজলিসে পার্থিব কোন আলোচনাই হত না। আমি তাঁকে কখনও দুনিয়ার নাম নিতে শুনিনি। দৃশ্যতঃ মাশায়েখের সাথে আমি সাক্ষাৎ করেছি কিন্তু তার মত কাউকে পাইনি। সাধারণ লোক যে সব পার্থিব

বিষয় নিয়ে আলোচনা করে তিনি সে ধরনের আলোচনায় লিপ্ত হতেন না। অবশ্য ইলমী বিষয়ে তিনি মন খুলে আলোচনা করতেন।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন, আমি বাগদাদে এক যুবক দেখেছি। সে যখন বলে, অমুক আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেছেন' সবাই তা এক বাক্যে বিশ্বাস করে। এ যুবক হচ্ছে আহমদ বিন হাম্বল।

তার মত এবং মন্তব্য লিখায় নিষেধাজ্ঞা

ইমাম সাহেব হাদীছ ব্যতীত তার অন্য কোন মত কিংবা রায় লিখতে কঠোরভাবে নিষেধ করতেন।

হাম্বল বিন ইসহাক বলেন, ইমাম সাহেব তার ফতোয়া কিংবা রায় লিখা পছন্দ করতেন না। একবার তিনি জানতে পারলেন যে, ইসহাক নামক একব্যক্তি খোরাসানে তার ফতোয়া এবং মাসয়ালা বর্ণনা করেছে। তিনি বললেন, তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমি ঐ সমস্ত মাসয়ালা হতে প্রত্যাবর্তন করেছি।

আবু বকর মারওয়ানী বলেন, খোরাসানের এক ব্যক্তি ইমাম সাহেবকে এক খণ্ড কিতাব দিল। তাতে ইমাম সাহেবের রায় এবং মত লিখিত ছিল। তা দেখে তিনি অত্যন্ত রাগান্বিত হয়ে কিতাবটি রেখে দিলেন। ইবনে জাওয়ী বলেন, ইমাম সাহেব বিনয়ার্থে তার রায় লিখতে নিষেধ করেছেন। আর আল্লাহর রহমতে সেগুলো সব সংকলিত এবং প্রকাশিত হয়েই গেছে।

কিতাব থেকে রেওয়ায়াত

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ)-এর লক্ষ লক্ষ হাদীছ মুখস্ত ছিল। এতে কোন অতিরঞ্জন নেই। এতদসত্ত্বেও তিনি মুখস্ত কোন হাদীছ রেওয়ায়াত করতেন না। বরং সতর্কতামূলক শুধুমাত্র কিতাব দেখেই হাদীছ পড়াতেন।

তার ছেলে আব্দুল্লাহ বলেন, আমার পিতা কিতাব ব্যতীত মুখস্ত যে হাদীছ বর্ণনা করেছেন সেগুলোর সংখ্যা একশতও হবে না।

আলী বিন মাদীনী বলেন, আমাদের উস্তাদদের মধ্যে আহমদ বিন হাম্বল হতে অধিক হাদীছ কারও মুখস্ত নেই। আমি জানতে পেরেছি যে, তিনি শুধুমাত্র কিতাব দেখেই হাদীছ রেওয়ায়াত করেন। এটা আমাদের জন্য একটা আদর্শ।

ইব্রাহীম বিন জাবের মারওয়ায়ী বলেন, আমরা ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের মজলিসে বসে হাদীছের আলোচনা করতাম। সেগুলো যখন লিখতে চাইতাম তিনি বলতেন, কিতাব অধিক নিরাপদ। অতঃপর উঠে গিয়ে কিতাব আনতেন।

ইমাম সাহেব হাদীছ মুখস্ত করার চেয়ে লিখে নেয়াকে প্রাধান্য দিতেন। কারণ এতে ভুল হবার সম্ভাবনা কম থাকে। তিনি সূক্ষ্ম বা ছোট লেখা লিখতে নিষেধ করতেন। কারণ এতে ভুল হওয়ার আশংকা থাকে।

আহমদ বিন হাম্বল এবং ইয়াহইয়া বিন ময়ীনের উক্তি রয়েছে, যে ব্যক্তি হাদীছ লিখে না তার ভুল না হবার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় না।

ইসহাক বিন মনসুর বলেন, আমি ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, উলামাদের মধ্যে কারা হাদীছ লিখাটাকে অপছন্দ করেছেন? তিনি বললেন, উলামাদের মধ্যে একদল হাদীছ লিখাটাকে অপছন্দ করেছেন। অন্যদল লিখার অনুমতি দিয়েছেন। আমি বললাম, ইলম অর্থাৎ হাদীছ যদি লিখে রাখা না হত তাহলে তা শেষ হয়ে যেত। তিনি বললেন, হ্যাঁ যদি লিখে রাখা না হত তবে আমরা কিছুই পেতাম না।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল তার উস্তাদ আব্দুর রায়্যাক হতে ইমাম যুহরীর এ কথাটি বর্ণনা করেছেন-

আমরা হাদীছ লিখাটা অপছন্দ করতাম। পরে সে সব উমারাগণ (উমর বিন আব্দিল আযীয এবং তাঁর কর্মচারী) একাজে বাধ্য করে। এখন আর আমরা মুসলমানদেরকে একাজ থেকে নিষেধ করা সমীচীন মনে করি না।

ইমাম সাহেব হাদীছ লিখে নিতেন পরে সেগুলো মুখস্ত করে নিতেন। এতে একই সাথে তা সীনা (অন্তর) এবং কিতাব দু'জায়গায়ই সংরক্ষিত হয়ে যেত। আবু যরআ রাযী বলেন, ইমাম সাহেবের এক লক্ষ হাদীছ মুখস্ত ছিল। তিনি আরো বর্ণনা করেন, ইমাম সাহেবের মৃত্যুর পর তাঁর কিতাবগুলো একত্রিত করা হলে দেখা গেল যে, সেখানে বার গাঁইট পরিমাণ কিতাব রয়েছে। সেগুলো কোনটির মধ্যেই লিখা ছিল না যে, এগুলো অমুক মুহাদ্দিসের হাদীছ কিংবা অমুক শায়খ এ হাদীছগুলো বর্ণনা করেছেন। এ সবগুলো ইমাম সাহেবের হিফয বা মুখস্ত ছিল।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) হাদীছ লিখা এবং হিফয করা উভয় পদ্ধতিই অবলম্বন করেছেন। ছাত্রদেরকেও উভয় প্রকার পদ্ধতি অবলম্বন করার পরামর্শ এবং নির্দেশ দিতেন।

তার ছাত্র এবং শিষ্য

ইমাম সাহেবের ছাত্রের সংখ্যা কয়েক সহস্র। এদের মধ্যে তার অনেক শায়খও রয়েছেন। যেমন আব্দুর রায়্যাক সনআনী, ইসমাঈল বিন উলাইয়া,

ওকী বিন জাররাহ, আব্দুর রহমান বিন মাহদী, মুহাম্মদ বিন ইদ্রীস শাফেয়ী, মারুফ কারখী, আলী বিন মাদীনী প্রমুখ।

ইবনে জাওযী তার রচিত 'মানাকেবে ইমাম আহমদ' নামক কিতাবে আরবী বর্ণমালার ক্রমানুসারে কয়েক পৃষ্ঠা ব্যাপী তার শাগরেদদের নাম উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে পাঁচজন মহিলাও রয়েছে। প্রসিদ্ধ কয়েকজন শাগরেদের নাম উল্লেখ করা হচ্ছে-

ইমাম সাহেবের দুই পুত্র ছালেহ এবং আব্দুল্লাহ, তার চাচাত ভাই হাম্বল বিন ইসহাক, হাসান বিন সাব্বাহ বাযযায়, মুহাম্মদ বিন ইসহাক সাগানী, আব্বাস বিন মুহাম্মদ দুরী, মুহাম্মদ বিন উবাইদুল্লাহ মুনাদী, মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বুখারী, মুসলিম বিন হাজ্জাজ নিসাপুরী, আবু যরআ রাযী, আবু হাতেম রাযী, আবু দাউদ সিজিস্তানী, আবু বকর আছরাম, আবু বকর মারওয়ায়ী, ইয়াকুব বিন শাইবা, আহমদ বিন আবি ঋইছামা, আবু যুরআ দামেস্কী, ইব্রাহীম হরবী, মুসা বিন হারুন, আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বগবী, ইয়াহইয়া বিন আদম কুরাশী, ইয়াযীদ বিন হারুন, কুতাইবা বিন সায়ীদ, দাউদ বিন আমর, খলফ বিন হিশাম, আহমদ বিন আবি হাওয়ারী, হসাইন বিন মনছুর, যিয়াদ বিন আইউব, রহীম, আবু কুদামা সরখসী, মুহাম্মদ বিন রাফে, মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া বিন আবি সুমাইনা, হরব কিরমানী, বকী বিন মুখাল্লাদ, শাবীন বিন সুমাইদা, হুবাইশ বিন সিন্দী, আবু বকর সিন্দী খাওয়াতেমী প্রমুখ। এঁদের মধ্যে আবুল কাসেম বগবী হচ্ছেন ইমাম সাহেবের সর্বশেষ ছাত্র।

আহমদ বিন মুনাদী বলেন, ধরাপৃষ্ঠে আব্দুল্লাহ তার পিতা আহমদ বিন হাম্বল হতে সর্বাধিক হাদীছ রেওয়াজেত করেছেন। তিনি তার পিতা থেকে তিরিশ হাজার হাদীছ সম্বলিত মুসনাদ এবং বিশ হাজার হাদীছ সম্বলিত তফসীর শ্রবণ করেছেন।

সিন্দু-র এক উস্তাদ এবং দু'শাগরেদ

ইমাম সাহেবের উস্তাদদের মধ্যে ইসমাইল বিন উলাইয়্যা এবং শাগরেদদের মধ্যে হুবাইল বিন সিন্দী এবং আবু বকর সিন্দী খাওয়াতীমীর নাম পাওয়া যায়। এদের প্রত্যেকেই সিন্দ এলাকার সাথে সম্পর্কিত। ইমাম সাহেব একজন থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। আর দুজন তার নিকট থেকে শ্রবণ করেছেন। তাদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হচ্ছে।

ইবনে উলাইয়্যা বাগদাদী

ইমাম সাহেব বিশিষ্ট উস্তাদ ইমাম বাশার ইসমাঈল বিন ইব্রাহীম বিন মেকসাম আল আসাদী আল বসরী আল বাগদাদী (রহঃ)-এর দাদা মেকসাম সিন্দের অর্ন্তগত গেগান নামক এলাকার অধিবাসী ছিলেন। কোন এক যুদ্ধে বন্দী হয়ে কুফায় নীত হন। সেখানে আব্দুর রহমান বিন কুতবা আসাদীর আশ্রয়ে জীবন যাপন করতে থাকেন।

তার ছেলে ইব্রাহীম কাপড় ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি ব্যবসা উপলক্ষে বসরা আসা-যাওয়া করতেন। সেখানে তিনি উলাইয়্যা বিনতে হাস্‌সানের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তারই গর্ভে ইসমাঈল বিন ইব্রাহীমের জন্ম হয়। তিনি তৎকালীন যুগে হাদীছের ইমাম ছিলেন। ইমাম সাহেব ব্যতীতও তার নিকট থেকে ইবনে জুরাইজ, শোবা হাম্মাদ বিন যায়েদ, আব্দুর রহমান বিন মাহদী, ইয়াহইয়া বিন ময়ীন, আলী বিন মদীনী প্রমুখ হাদীছ রেওয়াজেত করেন। তিরিশ বৎসর বয়সে ইমাম সাহেব ইবনে উলাইয়্যার দরসগাহে শরীক হন। ইবনে উলাইয়্যা এবং তার পরিবারের সবাই তাঁকে সম্মান করত। তাঁর উপস্থিতিতে দরসী মজলিসের গাণ্ডীর্ষতা বজায় থাকত।

হুবাইশ বিন সিন্দী বাগবাদী

ইনি ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের বিশিষ্ট ছাত্রদের অন্যতম। খতীব বাগদাদী 'তারিখে বাগদাদ' কিতাবে এবং ইবনে জাওযী 'মানাকেবে ইমাম আহমদ' কিতাবে তার আলোচনা করেছেন। তিনি ইমাম সাহেব থেকে প্রায় বিশ হাজার হাদীছ লিখেছেন। তিনি একজন বিশিষ্ট আলেম ছিলেন। তার নিকট ইমাম সাহেবের বর্ণিত বিশেষ বিশেষ মাসয়ালার দুটি খণ্ড ছিল যা অন্যদের নিকট ছিল না। আবু খাল্লাল উল্লেখ করেন, তিনি তার নিকট সে মাসয়ালাগুলো শুনতে গেলে তিনি সেগুলো বর্ণনা করতে অস্বীকৃতি জানান। বলেন, আবু বকর মারওয়ায়ী জীবিত রয়েছেন, সেগুলো আমি বর্ণনা করতে পারি না। তিনি তার উস্তাদ ভাই আবু বকর মারওয়ায়ীকে যথেষ্ট সম্মান করতেন। তার সাথে অনেক আলোচনা করেও যখন ব্যর্থ হলেন তখন সেখান থেকে আবু বকর মারওয়ায়ী হতে সুপারিশনামা সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে বের হলেন। কিন্তু ব্যস্ততার কারণে তার নিকট যেতে পারেননি। আর সুপারিশনামাও সংগ্রহ করতে সক্ষম হননি। এর মধ্যেই তার ইন্তেকাল হয়। পরে তিনি সেগুলো মুহাম্মদ বিন হারুন ওরাকের নিকট পেয়ে সেখান থেকে শ্রবণ করেন। আবু খাল্লাল আরও উল্লেখ করেন যে, হুবাইশ বিন সিন্দী একজন মর্যাদাশীল বিজ্ঞ আলেম ছিলেন। তিনি

বাগদাদের কাতিয়া নামক স্থানে অবস্থান করতেন, সেখানে তার মত বিজ্ঞ আরেকজন ছিলেন না।

হুবাইশ বিন সিন্দী থেকে ইমাম সাহেবের কয়েকটি মতও বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন, ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, যে ব্যক্তি খলকে কোরআনের ফিতনার সময় অটল থাকেনি, আমরা কি তার নিকট থেকে হাদীছ রেওয়াজেত করব? জানতে পারলাম যে আপনি কাওয়ারেরী থেকে হাদীছ রেওয়াজেত করার অনুমতি দিচ্ছেন। তিনি বললেন, আমি নিজে তার নিকট থেকে রেওয়াজেত করিনা। অন্যকে কিভাবে নির্দেশ দিব?

হুবাইশ বিন সিন্দী থেকে আরও বর্ণিত রয়েছে যে, ইমাম সাহেবকে হামযার কিরাআত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, এ কিরাআতটা আমার মোটেই পছন্দ হয় না। কারণ হিসেবে বললেন এ কিরাআতে শুধু ইহু-আহু-ই সার। আর এ কিরাআতটি সম্পূর্ণ নতুন। অন্য কেউই এ কিরাআত পড়েনি।

ইমাম সাহেবের সাথে উলামায়ে সিন্দের দ্বীনি এবং ইলমী বিষয়ে আরও একটি সম্বন্ধ সংযোজিত হয়েছে। তা হচ্ছে ইমাম আবু হাসান বিন আদিল হাদী তাতুবী সিন্দী, মাদানী (মৃত্যু ১১৩৬ হিজরী) (রহঃ) 'মুসনাদে ইমাম আহমদ'-এর একটি উত্তম টীকা লিখেছেন। সনদ সহকারে সেটি ছেপে প্রকাশিত হয়েছে।

আবু বকর সিন্দী খাওয়াতীমী বাগদাদী

জীবনী লিখকগণ তার নাম সিন্দী আবু বকর বাগদাদী উল্লেখ করেছেন। ইবনে জাওয়ী তাকে ইমাম সাহেবের ছাত্রদের মধ্যে গণ্য করেছেন। ইবনে আবী ইয়লা আবু খাল্লাল হতে বর্ণনা করেন, তিনি আবুল হারেছের প্রতিবেশী ছিলেন। তিনি ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের সন্তানদের সাথে একত্রে বসবাস করতেন। তাদের ঘরোয়া বিষয়ে তার অধিকার ছিল।

সিন্দী আবু বকর বাগদাদী যেন ইমাম সাহেবের পরিবারের একজন সদস্য ছিলেন। আর সে হিসাবেই সেখানে তার প্রভাব খাটত। তিনি ইমাম সাহেবের অবস্থা, মত এবং মন্তব্য বর্ণনা করেছেন। তার নিকট তিনি অনেক প্রয়োজনীয় মাসালা শ্রবণ করেছেন। তন্মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করা হচ্ছে—

ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞেস করা হল যে, নাভির নীচের লোম, নখ কয়দিনের মধ্যে পরিষ্কার করা চাই? তিনি বললেন, এ বিষয়ে যে হাদীছ রয়েছে তার আলোকে দেখা যায় যে, এর জন্য সর্বাধিক সময় হচ্ছে চল্লিশ দিন। আমি

জানতে পেরেছি যে, আওয়ামী (রহঃ) মেয়েদের জন্য পনের দিন এবং পুরুষদের জন্য বিশদিন রেখেছেন। প্রতি সপ্তাহে গৌফ কাটা চাই। অন্যথায় বিশী দেখা যাবে।

এক ব্যক্তি ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞেস করল- আমার পিতা আমাকে আপন স্ত্রীকে তালাক দিতে বলছেন। আমি কি করব? তিনি বললেন, তুমি তালাক দিওনা। এতে সে বলল, হযরত উমর (রাঃ) কি তার ছেলে আব্দুল্লাহকে বলেননি- তোমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দাও? একথা শুনে ইমাম সাহেব বললেন, তোমার পিতা যখন উমরের মত হবেন তখন তুমিও তার কথা অনুযায়ী কাজ করো।

সিন্দী আবু বকর বাগদাদী বলেন, এক ব্যক্তি ইমাম সাহেবকে বসতে জায়গা দেয়ার জন্য উঠে দাঁড়াল। কিন্তু ইমাম সাহেব সেখানে বসতে অস্বীকৃতি জানালেন। বললেন, তুমি তোমার স্থানে বস। সে নিজের জায়গায় বসার পরে ইমাম সাহেব তার সামনে বসলেন।

ইমাম সাহেব 'কাইয়েম আহকামুয়যিয়া' নামক কিতাবে সিন্দী আবু বকর হতে রেওয়ায়েত করেন, ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞেস করা হল যে, উশর বা শুক্ক আদায়কারীর নিকট দিয়ে যদি কোন যিন্মী অতিক্রম করে তবে তার মাল কি পরিমাণ হলে উশর রাখা হবে? তিনি বললেন, তার ব্যবসার মালের পরিমাণ যদি মুসলমানদের উশর ওয়াজেব হওয়ার দ্বিগুণ হয় তবে তার নিকট উশর রাখা হবে। কিন্তু পরবর্তী বৎসর তার নিকট থেকে উশর নেয়া হবে না। হাদীছে এরূপই বর্ণিত রয়েছে।

উস্তাদ মাশায়েখ এবং সমসাময়িকদের

দৃষ্টিতে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল

বাল্যকাল থেকেই ইমাম সাহেব যুহদ, তাকওয়া, ইলম এবং আদব-আখলাক প্রভৃতি বিষয়ে সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন। প্রাথমিক শিক্ষা ঘরেই তাঁর প্রতিটি আচরণে মহত্বের নিদর্শন পাওয়া যেত। হাদীছ শিক্ষা গ্রহণের সময় অভাব-অনটনের মধ্যে যে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন এতে তাঁর আসাতেয়া এবং মাশায়েখদের কেবল সুদৃষ্টিই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়নি বরং তিনি তাদের নিকট সম্মানের পাত্রও হয়ে উঠেছিলেন। আর যখন তিনি শিক্ষকতা করলেন তখন তাঁর জ্ঞানগরিমা, হাদীছ এবং ফিকাহ শাস্ত্রে সূক্ষ্মদৃষ্টি, হাদীছ বর্ণনায় সতর্কতা প্রভৃতির কারণে তার সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। আর

খলকে কোরআনের ফিতনায় তিনি যে দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছিলেন, এতে তিনি সারা জগতে জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। তৎকালীন বিশ্ব তাকে সেরা মানব হিসেবে গ্রহণ করে নিল। আর তার সাথে বেয়াদবীমূলক আচরণকারীকে পথভ্রষ্ট বলে ঘোষণা দেয়া হল।

ইমাম সাহেবের ফাযায়েল বা মহত্ব বর্ণনা করতে গেলে বিরাট কলেবরে বিশিষ্ট বই হয়ে যাবে। এখানে নমুনা স্বরূপ মাত্র কয়েকটি উল্লেখ করা হচ্ছে-

হাফেজ যাহবী জনৈক ইমামের উক্তি বর্ণনা করে বলেন- ইমাম আবু দাউদ চাল-চলন, কথাবার্তা, আচার-আচরণে ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের সদৃশ, আহমদ বিন হাম্বল ওকী সদৃশ, ওকী সুফিয়ান সদৃশ, সুফিয়ান মনসুর সদৃশ, মনসুর ইব্রাহীম নখয়ী সদৃশ, ইব্রাহীম নখয়ী আলকামা সদৃশ, আলকামা হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) সদৃশ, আর আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ছিলেন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সদৃশ।

ইদ্রীস বিন আব্দিল করীম মুকরী বলেন, আমি অনেক উলামায়ে কিরাম দেখেছি। যেমন হুশাইম বিন ঋরেজা, মুসআব যুবাইরী, ইয়াহইয়া বিন ময়ীন, আবু বকর বিন আবি শাইবা, উছমান বিন আবি শাইবা, আব্দুল আলা বিন হাম্মাদ নরসী, মুহাম্মদ বিন আব্দিল মালেক বিন আবি শাওয়ারেব, আলী বিন মদীনী, উবাইদুল্লাহ বিন উমর কাওয়ারিরী, আবু খাইছামা, যুবাইর বিন হরব, আবু মামার কুতাইয়বী, মুহাম্মদ বিন জাফর ওরকানী, আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন আইয়ুব, মুহাম্মদ বিন বাককার বিন রাইয়ান, উমর বিন মুহাম্মদ নাকেদ, ইয়াহইয়া বিন আইয়ুব মাকাবেরী, গুরাইহ বিন ইউনুস, খলফ বিন হিশাম বাযযায়, আবুররবী যাহরানী প্রমুখ। এদের প্রত্যেকেই ইমাম সাহেবকে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করতেন। সালাম করার জন্য তাঁর নিকট যেতেন।

মুহাম্মদ বিন আলী বিন শুয়াইব তার পিতার এ উক্তিটি বর্ণনা করে বলেন, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণীটি ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের মধ্যে সত্য প্রমাণিত হয়েছে।

كائن في امتي ما كان في بني اسرائيل حتى ان المنشار ليوضع على فوق رأسه

لا يصرفه ذلك عن دينه *

আমার উম্মতের মধ্যে ঠিক তদ্রূপই ঘটবে যেমনটি ঘটেছিল বনী ইসরাঈলে। এমনকি বনী ইসরাইলের মতই কারও মাথায় করাচ ঢালান হবে। কিন্তু এতে কর্তেও তাকে ঘীন থেকে সরান যাবে না।

যদি খলকে কোরআনের ফিতনায় ইমাম আহমদ বিন হাম্বল অটল না থাকতেন তবে তা কিয়ামত পর্যন্ত আমাদের জন্য লজ্জার কারণ হত। এ ফিতনার অগ্নিকুণ্ডে অনেককেই বিদগ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ব্যতীত আর কেউ সে অগ্নিকুণ্ড থেকে বের হতে পারেনি।

কুতাইবা বিন সাযীদ বলেন, যদি সুফিয়ান ছাওরী না হতেন তবে 'তাকওয়ার' মৃত্যু হয়ে যেত, আর যদি আহমদ বিন হাম্বল না হতেন তবে দ্বীনের মধ্যে বিদ'আতের সৃষ্টি হত। এতে আব্দুল্লাহ বিন আহমদ বিন শাবেবায়াহ বললেন, আপনি তো আহমদ বিন হাম্বলকে একজন তাবেয়ীর স্থানে নিয়ে পৌঁছিয়েছেন। কুতাইবা বললেন, আমি তাকে কিভাবে তাবেয়ীদের সম্মুখপার্শ্বের মর্নে করি? ইমাম আহমদ বিন হাম্বল আমাদের ইমাম।

একবার ইয়াহইয়া বিন সাযীদ কাত্তানের মজলিসে কেউ ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের উল্লেখ করলে তিনি বললেন, তুমি একজন মহাজ্ঞানীর উল্লেখ করলে।

আবু আসেমের মজলিসে একবার ফিকাহ সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। তিনি বললেন, বাগদাদে এক ব্যক্তিই আছেন। অর্থাৎ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল। তিনি ব্যতীত সেখান থেকে ফিকাহ সম্পর্কে অভিজ্ঞ কোন আলেম আমাদের নিকট আসেননি। একথা ইয়াহইয়া বিন মদীনীর মজলিসে আলোচিত হলে তিনি তার সত্যতা স্বীকার করেন।

আহমদ বিন ইব্রাহীম দওরকী বলেন, তোমরা যদি কাউকে আহমদ বিন হাম্বলের বদনাম করতে দেখ, তবে মনে করো তার মুসলমান হবার বিষয়ে সন্দেহ রয়েছে।

সুফিয়ান বিন ওকী বলেন, আহমদ বিন হাম্বল আমাদের মতে সত্যের মাপকাঠি। যে ব্যক্তি তাঁর দোষ তালাশ করে আমাদের মতে সে ফাসেক।

আবু যুরআ রাযী বলেন, আহমদ বিন হাম্বলের এক লক্ষ হাদীছ মুখস্ত ছিল। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, আপনি কিভাবে জানলেন? তিনি বললেন, আমি তার সাথে বিভিন্ন অধ্যায় এবং মাসয়ালা নিয়ে আলোচনা করেছি।

আবু বকর সাগানী বলেন, একবার আমি সিহাক বিন আবি ইসরাইলকে একথা বলতে শুনলাম, এখানে কেউ কেউ দাবী করেন যে, তারা ইব্রাহীম বিন সাদ থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। একথা দ্বারা তিনি ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের দিকে ইঙ্গিত করেছেন। তখনই আমি ভেবেছি যে, আল্লাহ তাআলা ইসহাক বিন আবি ইসরাইলের পতন ঘটাবেন। পরে তাই হল। আল্লাহ তাআলা

তার মর্যাদা হ্রাস করে দিয়েছেন এবং আহমদ বিন হাম্বলের মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিয়েছেন।

আহমদ বিন সাঈদ দারেমী বলেন, এ কালো চুলওয়ালা (অর্থাৎ আহমদ বিন হাম্বল) অপেক্ষা হাদীছের হিফয এবং তার মর্ম সম্পর্কে অভিজ্ঞ অন্য কাউকে দেখিনি।

ইব্রাহীম হরবী বলেন, সাঈদ বিন মুসাইয়্যেব তৎকালীন যুগে, সুফিয়ান ছাওরী সমকালীনদের মধ্যে এবং আহমদ বিন হাম্বল সমকালীনদের মধ্যে সবচেয়ে বড় আলেম ছিলেন।

একবার আব্দুল্লাহ বিন দাউদ খুরাইবী বললেন, আওয়ামী স্বীয় যুগে সর্বোত্তম ছিলেন। অতঃপর আবু ইসহাক ফায়ারী স্বীয় যুগে সর্বোত্তম ছিলেন। একথা শ্রবনান্তে নসর বিন আলী বললেন, আর আমি বলছি আহমদ বিন হাম্বল স্বীয় যুগে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন।

মুহাম্মদ বিন হুসাইন আনমাতী বর্ণনা করেন, আমরা ইয়াহইয়া বিন ময়ীন, আবু খাইছামা, যুহাইর বিন হরব প্রমুখবিশিষ্ট উলামায়ে কিরামের মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। তারা ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের ইলম ও মর্যাদা নিয়ে আলোচনা করছিলেন। তাঁর প্রশংসা এবং গুণাবলী বর্ণনা করছিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন বলল, এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা না করা চাই। এ কথা শুনে ইয়াহইয়া বিন ময়ীন বললেন, তুমি আহমদ বিন হাম্বলের অধিক প্রশংসা পছন্দ কর না? আমরা যদি তাঁর জ্ঞান, মহত্ত্ব বর্ণনা করার জন্য পৃথকভাবে মজলিস কায়ম করি তবুও তা শেষ করা যাবে না।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন, তিন ব্যক্তি এ যমানার আশ্চর্যজনক। প্রথমজন, একজন আরবী ব্যক্তি যে সঠিকভাবে কোন শব্দ পড়তে পারে না, এ হচ্ছে আবু হুওর। দ্বিতীয়জন এক অনারব ব্যক্তি যে একটি শব্দও ভুল করে না। এ হচ্ছে হাসান যাকরানী। তৃতীয়জন হচ্ছে একজন অল্প বয়স্ক যুবক, সে যদি কোন কথা বলে বয়স্করাও তা সঠিক বলে স্বীকার করে নেয়। এ হচ্ছে আহমদ বিন হাম্বল। বাগদাদে আমি তাঁর চেয়ে বড় মুত্তাকী আলেম এবং ফকীহ কাউকে রেখে আসিনি।

আবু বকর বিন আদিল্লাহ বিন যুবাইর হুমাইদী মক্কী বলেন, যতক্ষণ আমি হিজায়ে থাকি, আহমদ বিন হাম্বল ইরাকে এবং ইসহাক বিন রাহওয়ে খোরাসানে থাকেন। আমাদের উপর কেউই জয়ী হতে পারে না।

একবার বিশর হাফী (রহঃ)কে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। তিনি বললেন, আমাকে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে? তাঁকে যেন ভাঁটিতে নিক্ষেপ করা হল আর তিনি লাল স্বর্ণে পরিণত হয়ে সেখান থেকে বের হয়ে এলেন।

ইমাম সাহেবের প্রিয় শাগরেদ আবু বকর মারওয়াযী একবার জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হলেন। লোকেরা তাকে বিদায় সংবর্ধনা জানানোর জন্য সামেরা নামক স্থান পর্যন্ত আসল। তিনি তাদেরকে ফিরে যেতে বললেও তারা সবাই ফিরে যায়নি। যারা ফিরে গিয়েছে তাদেরকে বাদ দিয়ে উপস্থিত লোকদের সংখ্যা হবে আনুমানিক পঞ্চাশ হাজার। লোকজন তাঁকে বলল, আপনি আল্লাহর শোকর আদায় করুন। এটা আপনার ইলমের প্রসিদ্ধির বরকত। তিনি কেঁদে উঠে বললেন, এটা আমার ইলম নয়। আহমদ বিন হাম্বলের ইলম।

ফিকাহ এবং ফতোয়ায় ইমাম সাহেবের উসুল বা মূলনীতিঃ- এ'লামুল মুয়াক্কেষীন নামক কিতাবে ইবনে কাইয়্যেম উল্লেখ করেন, ফিকাহ এবং ফতোয়ায় ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের পাঁচটি উসুল ছিল। প্রথম উসুল বা নীতি ছিল নসসে কাতরী বা অকাট্য নির্দেশ। এটা বিদ্যমান থাকা অবস্থায় তিনি অন্য কোন দলীল গ্রহণ করতেন না।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে সাহাবায়ে কিরামের ফতোয়া। যদি কোন ছাহাবীর এমন কোন ফতোয়া পেতেন যার বিপরীত অন্য কোন ছাহাবীর ফতোয়া নেই তবে সেটা অনুযায়ী আমল করতেন। কারও আমল, রায় কিংবা কিয়াসের প্রতি ক্রক্ষেপ করতেন না।

তৃতীয় নীতি হচ্ছে, যদি ছাহাবায়ে কিরাম থেকে পরস্পর বিরোধী মত পেতেন তবে যেটা কোরআন এবং হাদীছের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ হত, সেটাকেই গ্রহণ করতেন। আর যদি সেগুলোর কোনটিই অন্যটি অপেক্ষা অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়ে সমপর্যায়ের হত তবে কোনটিকেই অগ্রাধিকার দিতেন না। এমতাবস্থায় তিনি তাঁদের মতপার্থক্য বর্ণনা করে দিতেন।

চতুর্থতঃ যদি উপরোল্লিখিত উসুলের কোনটিতে স্পষ্ট কোন নির্দেশ না পেতেন তবে মুরসাল হাদীছ এবং যয়ীফ হাদীছ থেকে নির্দেশ গ্রহণ করতেন এবং একে কিয়াসের উপর প্রাধান্য দিতেন। যয়ীফ হাদীছ তার মতানুসারে হাদীছে 'হাসান' এর একটি প্রকার যা সহীহ হাদীছের বিপরীত। বাতিল হাদীছ কিংবা মুনকার হাদীছ অথবা যে হাদীছের রাবী সন্দেহযুক্ত সেগুলো তার মতানুসারে যয়ীফ হাদীছের অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রথম তিনটি উসুলের অবর্তমানে

এটিকে তিনি কিয়াসের উপর প্রাধান্য দিতেন।

পঞ্চমটি হচ্ছে কিয়াস। প্রথম চারটি দলিলের অবর্তমানে তিনি কিয়াস দ্বারা মাসয়ালার সমাধান বের করতেন।

ইমাম সাহেবের প্রিয় ছাত্র খাল্লাল তাঁকে কিয়াস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি বললেন, শুধুমাত্র প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই কিয়াস দ্বারা মাসয়ালার বের করা যাবে।

ইবনে হানী বলেন, আমি একবার ইমাম সাহেবকে এ হাদীছ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম—

‘যে ফতোয়া দেয়ার ব্যাপারে অধিক সাহসী সে আগুনের অর্থাৎ জাহান্নামে প্রবেশের ব্যাপারে অধিক সাহসী।’

তিনি বললেন, এ হাদীছ দ্বারা ঐ ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যে এমন বিষয়ে ফতোয়া প্রদান করে যা সে শ্রবণ করেনি। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, যে ব্যক্তি এমন বিষয়ে ফতোয়া দেয় যার মধ্যে জটিলতা রয়েছে এবং যার সমাধান করতে সে অক্ষম। তিনি বললেন, এর পাপ ফতোয়া দানকারীর উপর বর্তাবে।

আবু দাউদ বলেন, এমন অনেক মাসয়ালার রয়েছে যেগুলোতে মতভেদ রয়েছে। আমি ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে অসংখ্যবার বলতে শুনেছি ‘আমি জানি না।’ তিনি বলতেন, ‘আমি ফতোয়া দানের ব্যাপারে সুফিয়ান বিন উয়াইনা অপেক্ষা বড় আলেম আর কাউকে দেখিনি। তার জন্য ‘আমি জানি না’ বলাটা খুবই সহজ ছিল। তিনি এতে বলতেন যে, পশ্চিমা এক ব্যক্তি এসে ইমাম মালেক বিন আনাসকে একটি মাসয়ালার জিজ্ঞেস করল, তিনি বললেন, ‘আমি জানি না।’ সে বলল হে আবু আব্দুল্লাহ! আপনি বলছেন, ‘আমি জানি না?’ তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি মানুষকে বলো যে, আমি ‘আমি জানি না’ একথা বলি।

ইমাম সাহেবের পুত্র আব্দুল্লাহ বলেন, আমি আমার পিতাকে অনেক মাসয়ালারই ‘আমি জানি না’ বলতে শুনেছি। যে সমস্ত মাসয়ালার মতপার্থক্য রয়েছে সেসব মাসয়ালার তিনি নীরবতা অবলম্বন করতেন। বলতেন, অন্য কারও থেকে জেনে নাও। নির্দিষ্ট কারও নাম নিতেন না।

ইমাম সাহেবের ফতোয়া এবং মাসয়ালার সংকলন

ইমাম সাহেব কিতাব লিখাটা খুবই অপছন্দ করতেন। হাদীছ সংকলন পছন্দ করতেন। তার নিজস্ব মত, রায় কিংবা ফতোয়া লিখা থেকে তিনি ছাত্রদেরকে

কঠোরভাবে নিষেধ করতেন। এমনকি এ বিষয়ে কোন কোন ছাত্রের লিখা দেখে তিনি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বলেছিলেন, এসব মাসয়ালা থেকে আমি প্রত্যাবর্তন করলাম। একারণে ইমাম সাহেবের জীবদ্দশায় তাঁর ফতোয়া ব্যাপক হয়নি। পরে তাঁর ছাত্ররা সেগুলো সংগ্রহ করে। যেমন তাঁর বিশিষ্ট ছাত্র আবু বকর খাল্লাল 'আল-জামেউল কবীর' নামক বিশ খণ্ড বিশিষ্ট একটি কিতাবে সেগুলো সংকলন করেছেন। হুবাইশ বিন সিন্দী দু'খণ্ড বিশিষ্ট একটি কিতাবে তাঁর নাদির (দুস্তাপ্য) মাসয়ালাগুলো সংগ্রহ করেছেন।

ইমাম সাহেবের শাগরেদদের মধ্যে হাফেয আছরাম আসকাফী 'কিতাবুস সুনান ফিল ফিকহি আলা' মাযহাবে আহমদ ওয়া শাওয়াহিদুহ মিনাল হাদীছ' নামক একটি কিতাব লিখেছেন।

আবু বকর আহমদ বিন মুহাম্মদ ফকীহ মারওয়াযী বাগদাদী ইমাম সাহেবের বিশিষ্ট শাগরেদদের মধ্যে একজন। দীর্ঘদিন তিনি ইমাম সাহেবের খিদমতে থেকে ইলম অর্জন করেন। তিনি 'কিতাবুস সুনান বিশাওয়াহিদিল হাদীছ' নামক একটি কিতাব প্রণয়ন করেন।

ফকীহ আবুল হাসান মায়মুনী রাফী ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের একজন বিশিষ্ট শাগরেদ ছিলেন। তিনি স্বীয় শহরের মুফতী এবং ফকীহ ছিলেন।

হাফেয হামদান বাগদাদী ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের মেধাবী ছাত্রদের অন্যতম। জ্ঞানে-গুণে তিনি সবার নিকট সুপরিচিত ছিলেন। আবু ইসহাক ইব্রাহীম বিন ইয়াকুব 'দামেক্কের মুহাদ্দিছ' হিসেবে সুপরিচিত। তিনিও আহমদ বিন হাম্বল হতে ফিকাহর জ্ঞান অর্জন করেছেন। তিনি দামেক্কের মিসরে বসে হাদীছ বর্ণনা করতেন। ইমাম সাহেবের সাথে চিঠি পত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ ছিল। তাঁর চিঠি তিনি মিসরে বসে পড়ে সবাইকে শুনাতে। হাফেয হরব বিন ইসমাইল ইমাম সাহেবের বিশিষ্ট শাগরেদ ছিলেন।

এঁরা এবং ইমাম সাহেবের অন্য শাগরেদগণ তাঁর রায়, মত এবং মাসায়েল তাদের কিতাব এবং দরসী মজলিসের মাধ্যমে ব্যাপক করেছেন। ইমাম সাহেবের জীবদ্দশায় তাঁর মাসায়েল কিংবা ফতোয়া নিয়মিতভাবে সংকলিত হয়নি। কারণ ইমাম সাহেব এবং তাঁর শাগরেদগণ হাদীছ রেওয়ায়েত করাকে প্রাধান্য দিতেন। ফিকাহবিদগণের পদ্ধতিতে মাসয়ালা গবেষণা করার বিষয়টি তাঁদের নিকট তত ব্যাপক ছিল না।

ইমাম সাহেবের বর্ণিত মাসয়ালাসমূহ আবু বকর খাল্লালের কিতাবে সর্বাধিক সংগৃহীত হয়েছে।

হাম্বলী মাযহাব প্রসার লাভ না করার কারণ

শায়খুল ইসলাম আবুল ওফা আলী বিন আকীল বাগদাদীকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, অন্যান্য মাযহাবের তুলনায় হাম্বলী মাযহাবের উলামায়ে কিরাম মাযহাবের প্রচার প্রসারে পিছিয়ে আছেন কেন? তিনি এর উত্তরে লিখেন, হাম্বলী মাযহাবের অনুসারীগণ তুলনামূলক কঠোর প্রকৃতির, ফলে মানুষের সাথে মেলামেশা কম। বড়দের নিকট আসা-যাওয়া নেই। তারা বাস্তবপ্রিয়। যুক্তির বিপরীত হাদীছ গ্রহণ করেন। তাবীল বা ব্যাখ্যা থেকে বেঁচে থাকার জন্য তারা শব্দের কিংবা বাক্যের বাহ্যিক ও শাব্দিক অর্থ গ্রহণ করেন। যৌক্তিক জ্ঞান থেকে তারা দূরে থাকেন। আয়াত ও হাদীছের ব্যাখ্যা না করে বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করেছেন। তাই তাদের উপর তাশবীহ (আল্লাহকে মাখলুকের সাথে তুলনা করা) এর অভিযোগও আনা হয়েছে।

অন্য এক জায়গায় তিনি লিখেন, হাম্বলী মাযহাবের অনুসারীরাই তাদের মাযহাবের উপর জুলুম করেছে। আবু হানিফা এবং শাফেয়ীর শাগরেদগণ কাযী পদে এবং অন্যান্য পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। ফলে তারা শিক্ষা দেয়ার সুযোগ-সুবিধা অনেক বেশী পান। কিন্তু আহমদ বিন হাম্বলের শাগরেদদের মধ্যে সম্ভবতঃ এমন কেউ নেই যিনি শিক্ষালাভের পর সরকারী কিংবা বেসরকারী কাজে আগ্রহী হয়েছেন। তাই তাদের ইলমী ধারাবাহিকতা খুবই কম প্রসার লাভ করেছে। অধিকন্তু যুহদ এবং কঠোরতার কারণে তারা লোকালয় থেকে দূরে ছিলেন। এতদভিন্ন ইমাম আহমদের শাগরেদদের মধ্যে যারা যুবক শ্রেণীর ছিলেন তারা ফিকাহ অর্জনে আগ্রহী ছিলেন। আর বয়স্কদের মধ্যে যুহদ এবং তাকওয়ার প্রভাব ছিল।

যুহদ এবং তাকওয়া

ইমাম সাহেব ছিলেন যাহেদ, মুতাকী এবং দুনিয়ার প্রতি অনীহ। এ সবগুণে ইমাম সাহেব তাঁর সমকালীনদের অগ্রণী ছিলেন। তাঁর পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল অত্যন্ত সাদামাটা। তিনি কোন আমীর, হাকেম কিংবা পদস্থ কর্মচারীর প্রতি দ্রুতক্রোধ করতেন না। এমন কি তাদের হাদিয়া তোহফাও গ্রহণ করতেন না। তাঁর এসব দিক নিয়ে অনেকে কিতাবও রচনা করেছেন।

একবার ইমাম সাহেব তিনদিন পর্যন্ত ক্ষুধার্ত ছিলেন। ঘরে কোন খাবার ছিল না। তখন তিনি কোন প্রতিবেশীর ঘর হতে ধার হিসাবে কিছু আটা আনলেন। তিনি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ছিলেন বিধায় তার স্ত্রী তাড়াতাড়ি রুটি তৈরী

করার ব্যবস্থা করলেন। সে মুহূর্তে পুত্র সালেহের উনুন জ্বলছিল। তিনি সেখান হতে রুটি পাকিয়ে নিয়ে এলেন।

ইমাম সাহেব তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, এত তাড়াতাড়ি কিভাবে তৈরি করা হল? তিনি জবাবে বললেন, আপনাকে অত্যন্ত ক্ষুধার্ত দেখে সালেহের জ্বলন্ত তন্দুর হতে রুটি পাকিয়ে নিয়ে এসেছি।

ইমাম সাহেব বললেন, রুটিগুলো আমার সম্মুখ হতে নিয়ে যাও। আর আমার বাড়ী হতে আমার পুত্র সালেহের বাড়ীতে যাওয়ার যে দরজাটি রয়েছে তা আজ হতে বন্ধ করে দাও।

এর কারণ ছিল এই যে, ইমাম সাহেবের পুত্র সালেহ মুতাওয়াক্কিল আল্লালাহ দলস্থ লোকের অধীনে চাকুরি করতেন।

ইমাম সাহেবের পুত্র আব্দুল্লাহ বলেন একবার ইমাম সাহেব ক্রমাগত পনের-ষোলদিন খলীফার সহচররূপে ছিলেন কিন্তু একদিনও খলীফার খাদ্য হতে কিছুই গ্রহণ করেন নাই। সে কয়দিন শুধুমাত্র ছাতু খেয়ে কাটিয়ে দেন। তাও তিনি খলীফার নিকট হতে অনেক দূরে গিয়ে খেয়ে নিতেন।

এ ঘটনার পর দীর্ঘ ছয়মাস যাবৎ ইমাম সাহেব শারীরিকভাবে অসুস্থ ছিলেন।

খলীফা মামুন কিছু স্বর্ণ মুহাদ্দেছগণের মধ্যে বিতরণ করার জন্য প্রেরণ করেন। প্রত্যেকেই তা গ্রহণ করলেন। কিন্তু ইমাম সাহেব তা গ্রহণ করেননি। তিনি তা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে দেন।

বায়হাকী বর্ণনা করেন, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ)কে একবার আল্লাহর উপর ভরসা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, আল্লাহ ব্যতীত অন্য সব কিছু থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করার নাম আল্লাহর উপর ভরসা। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)কে যখন অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয় তখন জিব্রাঈল (আঃ) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার কোন প্রয়োজন আছে কি? হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বললেন, আমার প্রয়োজন আছে বটে। তবে আপনার নিকট আমার কোন প্রয়োজন নেই।

জিব্রাঈল (আঃ) বললেন, যাঁর নিকট আপনার প্রয়োজন তার নিকট চেয়ে নিন।

তিনি বললেন, আল্লাহর নিকট যা পছন্দ আমার নিকটও তাই পছন্দ।

ইমাম সাহেবের পুত্র হযরত সালাহ বলেন, ইমাম আহমদ (রহঃ) কারো নিকট থেকে অযুর পানি চেয়ে নেননি। তিনি নিজেই কূপে বালতি ফেলে পানি উত্তোলন করতেন। বালতি ভরে পানি উঠলে তিনি আল্লাহর শোকর আদায় করে বলতেন, আলহামদুলিল্লাহ।

হযরত সালাহ বলেন, আমি এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা কি পবিত্র কোরআনে বলেননি?

ان اصبح ماؤكم اقمنا بئتيكم بما مَعِين *

অর্থঃ যদি তোমাদের পানি শুকিয়ে যায় তবে কে আনবে তোমাদের জন্য প্রবাহমান পানি?

আবুল ফযল হতে বায়হাকী রেওয়ায়াত করেন, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) সেজদায় পড়ে দোয়া করতেন, হে আল্লাহ! উম্মতে মুহাম্মদীর সমস্ত পাপীকে তুমি ক্ষমা করে দাও। আর তাদের আযাব আমাকে ভোগ করতে দাও।

একবার ইমাম আহমদ বিন হাম্বল এক যিম্মির নিকট একটি বড় বর্তন বন্ধক স্বরূপ রাখেন।

তিনি যখন তা ছাড়িয়ে আনতে গেলেন, তখন সে ব্যক্তি দু'টি বড় বর্তন এনে ইমাম সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত করল। উভয়টি দেখতে একইরূপ ছিল। কাজেই ইমাম সাহেব কোনটিই গ্রহণ করলেন না।

ইমাম সাহেবের পুত্র আব্দুল্লাহ বলেন, খলীফা ওয়াছেকের খিলাফতের সময় আমরা বড়ই অভাবের মধ্যে কালাতিপাত করছিলাম। এক ব্যক্তি ইমাম সাহেবের নিকট চিঠি লিখলেন, আমার নিকট চার হাজার দিরহাম আছে; আপনি তা গ্রহণ করে আমাকে কৃতার্থ করুন। ইমাম সাহেব অস্বীকৃতি জানালেন। সে ব্যক্তি অনেক পীড়াপীড়ি করল। কিন্তু ইমাম সাহেব স্বীয় সিদ্ধান্তে অনড় রইলেন। আমি এতে আফসোস প্রকাশ করলে ইমাম সাহেব বললেন, আমি তা গ্রহণ করলেও খরচ হয়ে যেতো। আবার আমাদের পূর্বাবস্থা দেখা দিত। এ সময় এক সওদাগর এসে আব্বাজানের খিদমতে দশ হাজার দিরহাম পেশ করলেন। তিনি এ অর্থ পূর্ব থেকেই তাঁর জন্য পৃথক করে রেখে দিয়েছিলেন। আব্বাজান তাও ফিরিয়ে দিলেন। বললেন, আমরা ভাল অবস্থাতেই আছি। আল্লাহ আপনার শুভ কামনায় বরকত দান করুন।

এরপর অন্য এক ব্যবসায়ী এসে তাঁর খিদমতে ত্রিশ হাজার দিরহাম উপস্থিত করলেন। সেগুলোও প্রত্যাখ্যান করে তিনি সে স্থান ত্যাগ করলেন।

শিক্ষা সফরে ইমাম সাহেব যখন ইয়ামান ছিলেন তখন তিনি খুবই অভাব অনটনে ছিলেন। তাঁর শায়খ ছান'আনী তা অবগত হয়ে তাঁর হাতে কিছু দীনার গুঁজে দিতে চাইলেন। তিনি প্রত্যাখ্যান করে বললেন, আল্লাহ আমার প্রয়োজন মিটিয়ে থাকেন।

অর্থ সংকটের সময় এমনও দেখা গেছে যে, তাঁর পরিধানের বস্ত্র এমনভাবে ছিঁড়ে গিয়েছিল যে, তা আর পরিধানের যোগ্য রইল না। তিনি তখন ঘরের মধ্যে লুকিয়ে রইলেন। ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন। লোকজন এর কারণ জানতে চাইলে তিনি সব কথা খুলে বললেন। এক ব্যক্তি তাঁকে একটি বস্ত্র দান করলে তিনি তা নিতে অস্বীকৃতি জানান। তিনি সে ব্যক্তি হতে এ শর্তের উপর কিছু অর্থ গ্রহণ করলেন যে, সে ব্যক্তি তাঁর দ্বারা কিতাব লিখিয়ে নিবেন।

ইমাম আবু দাউদ বলেন, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) এর নিকট বসলে আখিরাতে অশেষ ফায়দা হত। তাঁকে আমি কখনো পার্থিব কোন লোভ-লালসার বশবর্তী হতে দেখিনি।

ইসমাইল বিন ইয়াকুত বর্ণনা করেন, একবার ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) তার বাড়ীতে হারেছ নামক জনৈক আলেমকে এনে দেওয়ার জন্য বললেন, আমি সানন্দে হারেছের খিদমতে গিয়ে দাওয়াত করলাম। তিনি তাঁর দল নিয়ে রাত্রি আগমন করলেন। তারা এশার নামাযের শুধুমাত্র ফরয পড়ে হযরত হারেছের চারপার্শ্বে বসে গেলেন।

ইমাম আহমদ (রহঃ)ও একপাশে বসে পড়লেন। কিন্তু তার দলবলের কেউ তা জানতে পারেনি। তারা কেউ এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদও করেন নাই।

হযরত হারেছ বৈরাগ্য (যূহদ) সম্বন্ধে ওয়ায শুরু করলেন। তা প্রত্যেকের হৃদয়কে প্রভাবান্বিত করল। প্রত্যেকে অনেক ক্রন্দন করল।

বর্ণনাকারী বলেন, আমি ইমাম সাহেবের অবস্থা জানার জন্য তার নিকট গেলাম। দেখতে পেলাম তিনি ক্রন্দন করছেন। তিনি প্রায় বেহুঁশ হয়ে পড়েছেন।

হযরত হারেছ ফযর পর্যন্ত ওয়াজ-নছীহত করলেন। আর শ্রোতারা অধীর হয়ে ক্রন্দন করতে লাগল।

ইসমাইল হযরত আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ)কে জিজ্ঞাসা করলেন, তাকে আপনার কিরূপ মনে হল?

তিনি বললেন, খোদার কসম! বৈরাগ্য এবং আনুগত্য সম্বন্ধে অনুপ্রেরণা

জাগিয়ে তোলার জন্য তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আমি আর অন্য কাউকে দেখিনি। আর তাঁর দলের চেয়ে উত্তম জামাতও আমি আর দেখিনি। তবুও আমি মানুষকে তাদের সাহচর্য থেকে দূরে থাকার জন্য অনুপ্রাণিত করব।

ইমাম বায়হাকী বলেন, এ সম্বন্ধে নিষেধ করার কারণ এই ছিল যে, যদিও হযরত হারেছ একজন ইবাদতগুজার যাহেদ ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু তিনি ইলমে কালাম সম্বন্ধে আলোচনা করতেন যা ইমাম সাহেব মোটেই পছন্দ করতেন না। অধিকন্তু তিনি এমন সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন যা সাধারণ মানুষের বোধগম্য হত না।

কেউ কেউ এরূপ ধারণা করেন যে, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) লোকদেরকে হযরত হারেছের জামাত হতে দূরে থাকার জন্য এ কারণে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাঁদের আলাপ-আলোচনা কোন কোন সময় কাশফের সীমার বাইরেও চলে যেতো। আর হযরত হারেছ নফস সম্বন্ধে এমন কঠোর বিধানের পক্ষপাতী ছিলেন- যে সম্বন্ধে শরীয়তে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এ সব কারণেই ইমাম সাহেব যখন আবু যুর'আকে হযরত হারেছের কিতাব অধ্যয়ন করতে দেখলেন, তখন তিনি বললেন, এ কিতাবে বিদ'আত রয়েছে। শরীয়তের পরিপন্থী অনেক বিষয় এখানে স্থান পেয়েছে। আর যিনি তাঁকে কিতাবটি দিয়েছিলেন তাকে বললেন, যে পথ অনুযায়ী ছওরী, মালেক আওয়ামী এবং লাইছ বিন সা'য়ীদ ছিলেন সে পথের অনুসরণ করুন। হারেছের পথ পরিহার করুন। কারণ এতে বিদ'আত রয়েছে।

ইমাম আহমদ (রহঃ) বলতেন, অভাব-অনটন সহ্য করার মধ্যে এক বিরাট মঙ্গল নিহিত রয়েছে। কিন্তু শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের পক্ষেই তা থেকে উপকৃত হওয়া সম্ভব।

তিনি বলতেন, ঐশ্বর্যের চেয়ে দারিদ্র্য শত সহস্রগুণ শ্রেয়। কারণ এতে অতি উচ্চ পর্যায়ের ধৈর্যের প্রয়োজন হয়। আর যে কোন নিয়ামত উপভোগ করে কৃতজ্ঞতা আদায় করার চেয়ে বহুগুণে উত্তম।

আখিরাতের ভয় ইমাম সাহেবের মধ্যে এরূপ প্রবল ছিল যে, এক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি যে ইলম শিক্ষা করেছেন তা কি শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করেছেন?

ইমাম সাহেব বললেন, আপনি যে প্রশ্ন করেছেন তার সদুত্তর দেয়া আমার পক্ষে বড়ই কঠিন কাজ। হ্যাঁ, কতক বিষয় আমার নিজের জন্য পছন্দ করেছি

এবং তা স্বীয় পক্ষে স্থান দিয়েছি।

ইমাম বায়হাকী বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি ইমাম সাহেবের খিদমতে এসে আরজ করল, আমার মাতা বড়ই কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত। আপনি তার রোগ মুক্তির জন্য দোয়া করুন। তিনি কিছুটা বিরক্তির স্বরে বললেন, আমিই তো দোয়া পাওয়ার অধিক উপযুক্ত পাত্র। এরপর তিনি তার জন্য দোয়া করলেন।

সে ব্যক্তি বাড়ী এসে দরজায় আওয়াজ দিলে তার মাতা দরজা খুলে দিয়ে বললেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে আমার কঠিন রোগ হতে আরোগ্য দান করেছেন।

ইমাম সাহেবের বুয়ুর্গী সম্বন্ধে এরূপ বহু ঘটনা রয়েছে।

একদা তিনি কোন এক ব্যক্তিকে খুশী হয়ে কোন একটি বস্তু দান করলেন। অপর এক ব্যক্তি অধিক মূল্য দিয়ে সেটা খরিদ করতে চাইল। এতে প্রথম ব্যক্তি বলল, শতগুণ অধিকমূল্য পেলেও আমি এটা বিক্রয় করতে রাজী নই। আপনি এটা দ্বারা যেরূপ বরকত লাভের আশা করে থাকেন আমিও সেরূপ আশা করে থাকি।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) যুহদ ও দুনিয়া বিরাগ সম্বন্ধে একটি কিতাব রচনা করেছেন। সে অতুলনীয় কিতাবের তোফায়েলে তিনি এমন উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছেন যা অতি অল্পসংখ্যক ভাগ্যবানের জন্যই জুটেছে।

জীবিকা নির্বাহ

ইমাম সাহেব উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর পিতা থেকে একটি বাড়ী এবং একটি টেক্সটাইল বা কাপড় তৈরির কারখানা লাভ করেন। তিনি সে বাড়ীতে বাস করতেন এবং কারখানা ভাড়া দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। বাড়ীর সামনে প্রশস্ত মাঠ ছিল। মাঠের উৎপাদিত ফসলে পূর্ণ বছরের খাবারের ব্যবস্থা হয়ে যেত। তা থেকে হযরত উমরের নির্ধারিত 'উশর' ইত্যাদি আদায় করতেন।

একবার কেউ একজন তাকে তাঁর বাড়ী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এটা আমি পিতা থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। কেউ যদি স্বপ্রমাণ এ বাড়ীর দাবী করে আমি তাকে তা দিয়ে দিব।

ইদ্রীস হাদ্দাদ বর্ণনা করেন, ইমাম সাহেবের মহল্লায় তাঁতীদের বসতি ছিল। দারিদ্রতার সময়ে তিনি সেখানে কাজ করতেন।

হাদিয়া তোহফা পরিহার

খলকে কোরআনের^১ ফিৎনার পরে ইমাম সাহেবের সংসারে খুবই অভাব-অনটন চলছিল। এ সময়েও তাঁকে বিরাট অংকের হাদিয়া দেয়া হলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে দেন। তাঁর চাচা ইসহাক খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন যে, সেখানে পাঁচশ দিরহাম ছিল। তিনি ইমাম সাহেবকে বললেন, সংসারে অভাব-অনটন থাকা সত্ত্বেও আপনি এ হাদিয়া ফিরিয়ে দিলেন? তিনি বললেন, চাচা! এগুলো চাইলে আসত না। এগুলো প্রত্যাখ্যান করার কারণেই এসেছে।

ইমাম সাহেবের ছেলে সালাহ বর্ণনা করেন, যখন আমাদের সংসারে খুব অভাব-অনটন চলছিল, তখন একদিন আমার পিতা আসরের নামাযের জন্য উঠে গেলে তাঁর বসার চাটাই উঠালাম। ওর নীচে এ মর্মের একটি চিঠি পেলাম- আবু আদিল্লাহ! আমি আপনার অভাব অনটন এবং ঋণের কথা জানতে পেরে অমুকের মারফতে চার হাজার দিরহাম পাঠাচ্ছি। সেগুলো দিয়ে আপনার ঋণ আদায় করে নিজেদের সংসার চালিয়ে নিবেন। এগুলো যাকাৎ কিংবা সদকা নয়। পৈতৃক সম্পত্তি থেকে এগুলো পেয়েছি। আমি এ চিঠি পড়ে সে স্থানেই রেখে দিলাম। পিতা ঘরে আসলে জিজ্ঞেস করলাম। এটা কিসের চিঠি? একথা শুনে তিনি খুবই রাগান্বিত হলেন এবং বললেন, তুমি এর উত্তর এখনি নিয়ে যাও। এরপর তার নামে লিখলেন, আপনার চিঠি পেয়েছি। আমরা সুখে শান্তিতেই আছি। আমরা যার নিকট ঋণী, তিনি আমাদেরকে বিরক্ত করছেন না। পরিবার পরিজন নিয়ে আল্লাহর রহমতে সুখেই দিন কাটাচ্ছি। ঐ ব্যক্তি আবারও পূর্বের চিঠির মর্মে একটি চিঠি সহকারে ঐ অংকের দিরহাম পাঠিয়ে দিল। পিতা এবারও আগের মত উত্তর লিখে সেগুলো ফিরিয়ে দিলেন।

হাসান বিন আদিল আজীজ এক হাজার দীনার বিশিষ্ট তিনটি থলি এই বলে ইমাম সাহেবের নিকট পাঠালেন, এগুলো উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বৈধ সম্পদ। আপনি এগুলো গ্রহণ করে পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করুন। কিন্তু ইমাম সাহেব সেগুলো প্রত্যাখ্যান করেছেন।

একবার খলীফা মামুন তার দারোয়ানকে কিছু অর্থ দিয়ে বললেন, এগুলো মুহাদ্দিসদের মধ্যে বন্টন করে দাও। তারা অভাবের মধ্যে থাকেন। যাদেরকে সে অর্থ দেয়া হয়েছে, ইমাম সাহেব ব্যতীত প্রত্যেকেই কবুল করে নিলেন।

একবার ইমাম সাহেবের উস্তাদ ইয়াযীদ বিন হারুন তাঁকে পাঁচশ দিরহাম দিতে চাইলে তিনি তা গ্রহণ করেননি। পরে তিনি সেগুলো আবু মুসলিম এবং ইয়াহইয়া বিন ময়ীনকে দিয়ে দেন।

ইমাম সাহেবের পুত্র সালেহ বর্ণনা করেন, বাগদাদের জনৈক পোদ্দারের ছেলে পিতার শিক্ষা মজলিসে বসত। তিনি একদিন তাকে কাগজ কিনে আনার জন্য একটি দিরহাম দিলেন। সে কাগজ কিনে তার ভিতর পাঁচশ দীনার রেখে ঘরে দিয়ে গেল। পিতা ঘরে এসে কাগজ খুলতেই দীনারগুলো ছড়িয়ে পড়ল। তিনি ঐ ছেলের সামনে কাগজ এবং দীনার রেখে বললেন, এগুলো নিয়ে নাও। সে বলল, কাগজ তো আপনার। বহু অনুরোধের পরও সে ইমাম সাহেবকে দীনার গ্রহণে মোটেই রাজী করাতে পারল না।

আবু বকর মারওয়াযী বলেন, আমি ইমাম সাহেবকে বলতে শুনেছি যে, দারিদ্রতার সমতুল্য অন্য কিছু নেই। সালেহীনদের এক জামাতকে আমি এ অবস্থায় দেখেছি। আব্দুল্লাহ বিন ইদ্রীসকে বৃদ্ধাবস্থায় নিম্মমানের জুব্বা পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। আবু দাউদকে ছেঁড়া জুব্বা পরিহিত অবস্থায় দেখেছি। তিনি মাগরেব এবং এশার মাঝে নামায পড়ছিলেন। ক্ষুধায় তিনি অস্থির ছিলেন। মক্কায় আবু আইয়ুব বিন নাজ্জারকে দেখেছি। তিনি দুনিয়ার আরাম আয়েশ ছেড়ে এ পথে এসেছেন। তিনি একজন আবেদ ছিলেন।

কাযীর পদ প্রত্যাখ্যান

ইমাম সাহেব যখন বাগদাদে ইমাম শাফেয়ীর নিকট শিক্ষা অর্জন করছিলেন, তখন খলীফা হারুনুর রশীদ ইমাম শাফেয়ীকে বললেন, আপনার নিকট যাদের আসা-যাওয়া আছে তাদের মধ্য হতে একজন যোগ্য ব্যক্তিকে ইয়ামানের কাযীর পদে পাঠিয়ে দিন। পরদিন দরসী মজলিসে এসে ইমাম শাফেয়ী ইমাম আহমদকে বললেন, ইয়ামানের কাযীর পদের জন্য আমার সাথে খলীফার আলোচনা হয়েছে। উপযুক্ত লোক নির্বাচন আমার মর্জির উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এ কাজের জন্য আমি আপনাকে নির্বাচিত করেছি। আমীরুল মুমেনীনের নিকট আপনার নাম প্রস্তাব করব। আপনি প্রস্তুতি নিয়ে নিন।

ইমাম সাহেব উত্তর দিলেন, আমি আপনার খিদমতে থেকে ইলম অর্জন করতে চাই। আর আপনি পরামর্শ দিচ্ছেন সম্রাটদের খুশী করানোর জন্য আমাকে কাযীর পদ গ্রহণ করতে। এ জবাব শুনে ইমাম শাফেয়ী চুপ হয়ে গেলেন।

খলীফা আমীন ইমাম শাফেয়ীকে খুবই ভক্তি করতেন। তিনি একদিন ইমাম শাফেয়ীকে বললেন, আমার এমন একজন লোকের প্রয়োজন যে বিশ্বস্ত এবং সুন্নাতের পাবন্দ। ইমাম শাফেয়ী বললেন, আমি এমন একজনকে জানি যিনি সুন্নাতের পাবন্দ, ফিকাহ এবং হাদীছ সম্পর্কে অভিজ্ঞ। খলীফা আমীন নাম

জিজ্ঞেস করলে ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের নাম উল্লেখ করলেন। ইমাম সাহেব যখন এ সম্পর্কে জানতে পারলেন, ইমাম শাফেয়ীর নিকট গিয়ে বললেন, আপনি অন্য কোন বিশ্বস্ত লোক পাঠিয়ে দিন এবং আমাকে মাফ করুন। নচেৎ আমি শহর ছেড়ে চলে যাব।

খাদ্য এবং পোশাক

ইমাম সাহেব খুবই সাধারণ খানা খেতেন। প্রয়োজন মারফিক আয়োজন করা হত। এমন পোশাক পরিধান করতেন না যা প্রসিদ্ধির কারণ হবে কিংবা দ্বীনী এবং ইলমী ভাব-গাঞ্জীর্য মারফিক হবে না।

মুহাম্মদ বিন আব্বাস বিন ওলীদ নাহবী তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, "আমি ইমাম আহমদ বিন হাম্বলকে দেখেছি। তিনি সুপুরুষ ছিলেন; মধ্যাঙ্গী ছিলেন। মেহুন্দীর খেযাব ব্যবহার করতেন। তবে দাড়ি খুব লাল করতেন না। তাঁর দাড়ির কয়েকটি চুল কালো ছিল। তাঁর কাপড় ছিল মোটা এবং সাদা। তিনি পাগড়ীও ব্যবহার করতেন। কখনও কখনও চাদরও ব্যবহার করতেন। সাধারণতঃ তাঁর কাপড় সাদা তুলার হত। তা খুব মোটা কিংবা খুব পাতলা হত না। অবশ্য পরে যখন তাঁর ছেলে বিত্তশালী হন, তখন তিনি নিজের আয় দ্বারা উত্তম পোশাক ব্যবহার করতে শুরু করেন।

একবার ইমাম সাহেব খলীফা মুতাওয়াক্কিল-এর নিকট গেলেন। তিনি তার মায়ের নিকট বললেন, তাঁর আগমন আমাদের জন্য অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়। অতঃপর ইমাম সাহেবকে জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরিধান করালেন। তখন তিনি কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'সারাজীবন এদের থেকেই দূরে ছিলাম। আর মৃত্যুর সময় এ পরীক্ষায় পতিত হলাম' সেখান থেকে বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেগুলো খুলে ফেলেন।

একবার ইমাম সাহেবের মায়ের নিকট যথাযথ কাপড় ছিল না। ঐ সময় যাকাতের মাল আসলে তিনি সেগুলো এ বলে প্রত্যাখ্যান করে দেন যে, অন্যের সম্পদের ময়লা হতে বস্ত্রহীন থাকা ভাল। পৃথিবীতে কিছু কাল থেকে পরে চলে যেতে হবে।

ইয়াহইয়া নামক জনৈক ব্যক্তি অসিয়ত করেছিলেন যে, আমার গায়ের পোশাক আহমদ বিন হাম্বলের নিকট যেন পাঠিয়ে দেয়া হয়। তাঁর নিকট পোশাক আনা হলে তিনি এ বলে ফিরিয়ে দিলেন যে, এগুলো আমার পোশাক নয়।

ইমাম সাহেবের খাদ্য নিতান্তই সাধাসিধা ছিল। তবে তা এমন হত যদ্বারা দৈহিক, ইলমী এরবং রুহানী শক্তি বজায় থাকে।

পুত্র সাহেল বর্ণনা করেন, অনেক সময় আমার পিতাকে দেখেছি যে, তিনি রুটি টুকরো টুকরো করে পানিতে ভিজিয়ে নরম করে লবন দিয়ে খেয়ে নিতেন। তাঁকে কখনও ফল কিনতে দেখিনি। তবে তরমুজ, আঙ্গুর এবং খেজুর কিনে রুটি দিয়ে খেতেন।

খলীফা মুতাওয়াক্কিলের নিকট অবস্থানকালে একবার তাঁর কয়েকজন বন্ধু এসে মেহমান হলেন। তিনি তাদের আপ্যায়ন এবং দাওয়াতে সম্পূর্ণ অর্থ ব্যয় করে ফেললেন। এরপর বাগদাদ থেকে অর্থ আসা পর্যন্ত পনের দিন তিনি সাধারণ খাদ্যের উপর নির্ভর করেন।

ইবাদত এবং রিয়াযত

সলফে সালেহীনদের নিকট ইলম এবং আমল পরস্পর সম্পূরক ছিল। এর একটা অপরটার জন্য আবশ্যিক ছিল। ইবাদত এবং রিয়াযত ছিল ইলমের পরিচায়ক। ইমাম সাহেব এসব গুণে বাল্যকাল থেকেই সুপরিচিত ছিলেন।

ইব্রাহীম বিন শাম্মান বলেন, আহমদ বিন হাম্বলকে আমি বাল্যকাল থেকেই ভালরূপে জানি। ঐ সময় থেকেই সে রাত জেগে ইবাদত করত। পুত্র আব্দুল্লাহ বলেন, আমার পিতা প্রতিদিন তিনশ' রাকাত নফল নামায পড়তেন। দোররার মারার পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। তখন রাতদিনে দেড়শ' রাকআত নামায পড়তেন। ঐ সময় তাঁর বয়স ছিল প্রায় আশি বৎসর। প্রত্যহ কোরআন মজীদেবর সপ্তমাংশ পড়তেন। ইশার নামযের পর সামান্য কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিতেন। এরপর জাগ্রত হয়ে সারারাত জেগে নামায পড়তেন।

একবার ইমাম শাফেয়ী, ইয়াহইয়া বিন ময়ীন এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বল একসাথে মক্কায় গমন করেন। সেখানে একই স্থানে তাঁরা অবস্থান করেন। রাত্রে ইমাম শাফেয়ী এবং ইয়াহইয়া বিন ময়ীন শুয়ে পড়লেন আর ইমাম আহমদ নামাযে দাঁড়িয়ে গেলেন। সকালে ইমাম শাফেয়ী বলেন, রাত্রে আমি দু'শ মাসয়ালা সমাধান করেছি। ইয়াহইয়া বিন ময়ীন বলেন, আমি দু'শ হাদীছ মিথ্যাবাদী থেকে রক্ষা করেছি। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বলেন, আমি নামযের মধ্যে কোরআন শরীফ এক খতম করেছি।

খলকে কোরআনের ফিৎনার সময় ইমাম সাহেব কিছুদিন ইব্রাহীম বিন হানীর নিকট আত্মগোপন করেছিলেন। তিনি বলেন, আমি আবু আব্দিল্লাহ হতে

বড় আবেদ এবং যাহেদ দেখিনি। দিনের বেলায় রোযা রাখতেন। ইফতার তাড়াতাড়ি সেরে নিতেন। ইশার নামাযের পর কয়েক রাকআত নফল নামায পড়ে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিতেন। এরপর জেগে অযু করে নামাযের মধ্যে সারারাত কাটিয়ে দিতেন। পরে এক রাকআত বেতেরের নামায পড়ে নিতেন। আমার নিকট যতদিন ছিলেন, ততদিন তাঁর আমল একরূপই ছিল। এর মধ্যে তিনি একদিন শিংগা লাগিয়েছিলেন। ঐ দিন রোযা রাখেননি।

আব্দুল্লাহ বলেন, একদিন আবু যুরআর পিতা আমাদের বাড়ীতে আসলেন। আমার পিতার সাথে তিনি ইলমী আলোচনা শুরু করলেন। আমার পিতা বললেন, আজ আমি শুধু ফরয নামায পড়েছি। আবু যুরআর সাথে আলোচনাকে আমার নফল নামাযের উপর প্রাধান্য দিয়েছি।

হজ্জ এবং যিয়ারত

ইমাম সাহেব পাঁচবার হজ্জ পালন করেছেন। তন্মধ্যে তিনবার পদব্রজে বাগদাদ থেকে মক্কায় যান। একবার হজ্জ মাত্র বিশ দিরহাম ব্যয় করেন। আবু বকর মারওয়ানী বলেন, একবার ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বললেন, কেউ কেউ হজ্জের সফরে মক্কা থেকে বাগদাদ পর্যন্ত মাত্র চৌদ্দ দিরহাম খরচ করেছেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হল তিনি কে? তিনি বললেন, আমি।

আব্দুল্লাহ বলেন, আমি আমার পিতাকে দেখেছি যে, তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চুল মুবারক মুখে লাগাতেন। সেগুলোকে চুমু খেতেন। দু'চোখের উপর রেখে দিতেন। সেগুলোকে পানিতে ডুবিয়ে পান করে আরোগ্য লাভ করতেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেয়লা মুবারক পানিতে ধুয়ে সে পানি পান করতেন। আমি কয়েকবার তাঁকে দেখেছি তিনি আরোগ্যের জন্য যমযমের পানি পান করেছেন এবং মুখমণ্ডল এবং দেহে ছিটিয়েছেন।

সালেহ বলেন, আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি পানি দিয়ে দো'আ পড়ে দম করতেন এবং বলতেন, এ পানি পান কর এবং হাত মুখ ধুয়ে নাও।

খলকে কোরআনের ফিৎনা এবং ইমাম আহমদ

ইরাক সর্বদাই ফিৎনার ঘাঁটি ছিল। বাগদাদ শহর পত্তনের পূর্বে কূফা এবং বসরা ছিল এর কেন্দ্রস্থল। বাগদাদ পত্তনের পর সমস্ত ফিৎনার জড় সেখানে কেন্দ্রীভূত হয়। ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের যমানায় মু'তাযিলা, জাহমিয়া, কাদরিয়া, জবরিয়া, মুরজিয়া, সিফাতিয়া, মুশাক্বিয়া, মু'আত্তিলা প্রভৃতি দল সৃষ্টি হয়েছিল।

কিন্তু খলীফা মামুন আব্বাসীর পূর্বে খিলাফতের পক্ষ হতে কোনরূপ সহযোগিতা পায়নি। বরং এদের দমন করার জন্য খিলাফত উলামাদের সহযোগিতা করেছে। ২১৮ হিজরীতে কাযী আহমদ বিন আবি দাউদ মু'তাসেলী খলীফা মামুনের সাথে ষড়যন্ত্র করে এ ফিৎনার আগুন ইসলামী বিশ্বে ছড়িয়ে দেয়। খলীফা মু'তাসিম এবং ওয়াসিকও এ আগুনের ইন্ধন যোগায়। ২৩৪ হিজরীতে খলীফা মুতাওয়াক্কিল এসে এ ফিৎনার পরিসমাপ্তি ঘটায়। এ ষোল বৎসর উলামায়ে দ্বীন অগ্নিতে দগ্ধ হতে থাকেন। ইসলামী আকীদায় দৃঢ় বিশ্বাসী হাজার হাজার লোক কারারুদ্ধ হন। নির্মম শাস্তি সহ্য করেন। অনেকে মৃত্যুবরণ করেন। এ ফিৎনার সময় ইমাম আহমদ বিন হাম্বল পূর্ণ ঈমানী শক্তি নিয়ে অটল থাকেন এবং মুসলমানদের ইয়্যত রক্ষা করেন।

ফিৎনায়ে খলকে কোরআনের পটভূমি

খলীফা মামুন, মুতাসিম এবং ওয়াছিকের শাসনামলে ফকীহ মুহাদ্দিসদের বিপরীতে মুতাকাল্লিমীন, মুতাযিলীন এবং মুনহারিফীন তথা পথভ্রষ্টদের প্রাধান্য ছিল। সরকারী সহযোগিতা তারা পাচ্ছিল। খলীফা মামুন রোম, ইরান, এবং হিন্দুস্থান প্রভৃতি দেশ থেকে মানতিক, ফালসাফা এবং অন্যান্য অনেক শাস্ত্রের বই পুস্তক সংগ্রহ করেন এবং এগুলো অনুবাদ করে প্রচার করেন। জনগণের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার দ্বিধাদ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। উলামায়ে কিরামের প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভঙ্গিমায় সেগুলোর জবাব দেন। ঠিক এ সময়েই কাযী আহমদ বিন আবি দাউদ এবং খলীফা মামুন মিলে খলকে কোরআনের ফিৎনাকে একটি আন্দোলনের রূপ দেন।

কাযী আহমদ বিন আবি দাউদ বিজ্ঞ আলেম এবং বাকচতুর ব্যক্তি ছিল। মুতাযিলাদের প্রধান ওয়াসেল বিন আতার শাগরেদ ইয়াজাজ বিন আলা সুলামীর সংশ্বে থেকে এ মতবাদের শিক্ষা গ্রহণ করে। স্বীয় যোগ্যতার কারণে মানুষের উপর তার বেশ প্রভাব ছিল। ফলে সহজেই সে খলীফা মামুনকে খলকে কোরআনের আকীদা প্রচার প্রসার করতে উদ্বুদ্ধ করে যার মূলে ছিল ইয়াহুদী এবং খৃষ্টান। সে খলকে কোরআনের আকীদা বিশর মুরাইসী হতে, সে জাহম বিন সফওয়ান হতে, সে জাদ বিন দিরহাম হতে, সে আবান বিন সামআন হতে, সে লবীদ বিন আসমের ভাগিনা এবং তালুতের জামাতা হতে শিখেছিল।

এ লবীদ বিন আসাম ইয়াহুদী রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যাদু করেছিল। তাওরাত খলফ অর্থাৎ সৃষ্ট হবার আকীদা রাখত। তালুত ছিল একজন বদদ্বীন এবং যিন্দীক ব্যক্তি। সর্বপ্রথম সেই এ বিষয়ে বই লিখেছিল।

ইমাম সাহেবের বন্দীদশা এবং তাঁর উপর অত্যাচার

ইসলামী আকীদা অনুসারে আল্লাহ তাআলার মত তাঁর কলাম অর্থাৎ কোরআনও অনাদি। কিন্তু ইবনে আবি দাউদ প্রশাসনের মাধ্যমে মুসলমানদের মধ্যে এ আকীদা প্রচার করতে চাইল যে, আল্লাহ তাআলার কলাম অর্থাৎ কোরআন অনাদি নয় বরং মখলুক। এ আকীদা প্রচারের উদ্দেশ্য হিসেবে বলল, সঠিক নির্মল তাওহীদ প্রচারই এর উদ্দেশ্য। ২১৮ হিজরীতে খলীফা মামুন ইসলামী বিশ্বে এ নির্দেশ জারী করলেন যে, প্রত্যেক হাকেম এবং আমীর নিজ নিজ এলাকার আহলে ইলম থেকে এর স্বীকারোক্তি গ্রহণ করবে। অস্বীকার করলে উপযুক্ত শাস্তি দিবে এবং বন্দীদের রাজ দরবারে পাঠিয়ে দিবে।

বাগদাদের পুলিশ অফিসার ইসহাক বিন ইব্রাহীমকে এ মর্মে একটি চিঠি লিখা হল। সে সেখানকার বিশিষ্ট উলামায়ে কিরামদেরকে ডাকল। তন্মধ্যে ইমাম সাহেবও ছিলেন। তাদের সামনে খলীফার চিঠি পড়ে কোরআন মাখলুক অর্থাৎ সৃষ্ট বা নিত্য হওয়ার স্বীকারোক্তি নিতে চাইল। বলল, আপনি কি বলেন? ইমাম সাহেব বললেন, কোরআন আল্লাহর কলাম। সে জিজ্ঞেস করল, কোরআন কি মাখলুক? ইমাম সাহেব বললেন, কোরআন আল্লাহর কলাম। এর অতিরিক্ত আমি কিছু বলতে চাই না। এ কথায় ইসহাক তাকে জেলখানায় বন্দী করল। তাঁর সাথে আরও তিনজন মুহাদ্দিছ ছিলেন। দ্বিতীয় দিন যখন তাঁদেরকে বের করে এ প্রশ্ন আবার করা হয় তখন একজন তা স্বীকার করে নিল। ইমাম সাহেব এবং তাঁর দুই সঙ্গীকে জেলে পাঠান হল। তৃতীয় দিনও এরূপ প্রশ্ন করা হল। এদিনও একজন স্বীকার করল। ইমাম সাহেব এবং তাঁর সঙ্গী মুহাম্মদ বিন নূহকে তরসুসে পাঠিয়ে দেয়া হয়। তরসুসের পথে 'রহবায়ে তোক' নামক স্থানে মুহাম্মদ বিন নূহ মারা যান। ইমাম সাহেব তার দাফন-কাফনের কাজ সম্পন্ন করেন।

ইসহাকের সামনে যারা খলকে কোরআনের স্বীকার করেছিল তাদের ব্যাপারে মামুনকে বলা হয়েছিল যে জোর করে তাদের থেকে স্বীকৃতি আদায় করা হয়েছে। মামুন তাদের প্রত্যেককে ডেকে পাঠালেন। ঐ সময় খলীফা বদন্দানী নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। মুহাদ্দিছীদের বন্দী করে যখন রিক্বা নামক স্থানে আনা হল, তখন খলীফা মামুনের মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া গেল। ঐ সময় ইমাম সাহেব রিক্বার জেলখানায় ছিলেন। মামুন মারা যাওয়ার সময় তার পরবর্তী খলীফাকে এ বিষয়ে তাগিদ দিয়ে যান।

মামুনের পর মুতাসিম খলীফা নিযুক্ত হবার পর ইমাম সাহেবকে শৃঙ্খল পরিহিত অবস্থায় বাগদাদে আনা হল। কয়েকদিন বিভিন্ন স্থানে রাখার পর কিছুদিন একটি ভাড়াটে বাড়ীতে রাখা হয়। এরপর সাধারণ জেলখানায় রাখা হয়। এখানে তিনি শৃঙ্খলিত অবস্থায় অন্যান্য কয়েদীদেরকে নামায পড়াতেন। ২১৯ হিজরীর রমযান মাসে ইসহাক বিন ইব্রাহীমের বাড়ীর নিকট স্থানান্তর করা হয়। ইমাম সাহেব প্রায় আড়াই বৎসর পর্যন্ত জেলখানায় কালাতিপাত করেছেন। ঐ সময় খলীফা মুতাসিমও ইমাম সাহেবকে রাজদরবারে এনে খলকে কোরআন সম্পর্কে তর্ক বিতর্ক করে পুনরায় জেলখানায় পাঠিয়ে দিতেন। এরপর ইমাম সাহেবকে কোড়া মারা হয়। স্বয়ং খলীফার উপস্থিতিতে তার নির্দেশে জল্লাদ ইমাম সাহেবকে কঠিন থেকে কঠিনতর শাস্তি দিত। খলীফা সদয় হয়ে ইমাম সাহেবকে রেহাই দিতে চাইল। কিন্তু এ ফিৎনার জনক কাযী আহমদ বিন আবি দাউদ উপস্থিত ছিল। সে খলীফাকে উত্তেজিত করে ইমাম সাহেবকে আরও শাস্তি দিল।

ইমাম সাহেব বর্ণনা করেন, তরসুস যাওয়ার পথে যখন আমরা রাত্রের বেলায় ‘রহবায়ে তোক’ নামক স্থানে পৌঁছলাম তখন এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করল, তোমাদের মধ্যে আহমদ বিন হাম্বল কে? লোকেরা আমার পরিচয় করিয়ে দিল। সে আমাকে লক্ষ্য করে বলল, ভয়ের কিছুই নেই। আপনাকে যদি হত্যা করা হয় তবে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। ইনি ছিলেন রবীয়া খোর্রের গ্রামীণ কবি যাবের বিন আমের। ঐ সময় আরেক গ্রাম্য ব্যক্তি এসে ইমাম সাহেবকে বলল, আহমদ! সত্যের পথে যদি মারা যাও তবে শহীদ হবে। আর যদি বেঁচে থাক তবে প্রশংসিত জীবন-যাপন করবে। ইমাম সাহেব বলেন, তার কথায় আমার অন্তর অনেক সুদৃঢ় হয়ে যায়। আবু হাতেম রাযী বলেন, ঐ গ্রাম্য লোকের কথাই ফলেছে। এ কষ্টের পরে ইমাম সাহেবের মর্যাদা অনেক বেড়ে গেছে।

যখন ইমাম সাহেবকে মুতাসিমের সামনে উপস্থিত করা হয় তখন সেখানে কাযী আহমদ বিন আবি দাউদ এবং আবু আদ্বির রহমান শাফেয়ী উপস্থিত ছিলেন। ইমাম সাহেবকে মুতাসিমের সামনে বসান হলো। দরবারে উপস্থিত ব্যক্তির ইমাম সাহেবকে ভয় দেখাল। ইতিপূর্বে দুইজনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। আবু আদ্বির রহমানকে দেখে ইমাম সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, মসাহ সম্পর্কে ইমাম শাফেয়ীর মত আপনার জানা আছে কি? এ কথা শুনে কাযী আহমদ বিন আবি দাউদ বলল, দেখ! এ ব্যক্তির গর্দান কাটার জন্য আনা হয়েছে আর সে ফিকাহর মাসয়ালা আলোচনা করছে।

ইমাম সাহেব বলেন, জেলখানায় আমার জন্য সবচেয়ে আতঙ্কের বস্তু ছিল কোড়ার শাস্তি। যত কষ্টই হোক জেলখানায় থাকা যায় আর মৃত্যু হচ্ছে সাময়িক কষ্ট। কিন্তু কোড়ার শাস্তি আমার নিকট অসহনীয় মনে হত। কিন্তু জেলখানার এক কয়েদী আমাকে বলল, এতে ভয়ের তেমন কিছু নেই। দু'কোড়ার পর আপনার অনুভবও হবে না যে, কোড়া কোথায় পড়ছে।

মুতাসিম বড়ই নির্দয়ভাবে ইমাম সাহেবকে কোড়া লাগিয়েছে। ঐ সময় ইমাম সাহেব রোযাদার ছিলেন। সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিল। এ ঘটনা ২২০ হিজরীর রমযান মাসের শেষ দশকের।

ইমাম সাহেব স্বয়ং বর্ণনা করেন, আমাকে দু'রা লাগানোর পর দীর্ঘ শাশু বিশিষ্ট ব্যক্তি এসে আপন তরবারির বাট দ্বারা আমাকে প্রহার করল। আমি ভাবলাম যে, শান্তির সময় এসে গেছে। এ কষ্ট থেকে এখন আমি নিষ্কৃতি পাব। অর্থাৎ আমাকে হত্যা করা হবে। উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্য হতে ইবনে সামাআ নামক এক ব্যক্তি মুতাসিমকে বলল, আমীরুল মুমেনীন! তার গর্দান কাটা হোক। তার খুনের দায় আমার উপর। কিন্তু ইবনে দাউদ বলল, আমীরুল মুমেনীন! এমন করবেন না। এ ব্যক্তিকে যদি এখানে হত্যা করা হয় কিংবা মারা যায় তবে জনগণ বলবে আহমদ বিন হাম্বল ধৈর্যধারণ করে মারা গিয়েছে। তাকে নিজেদের নেতা বানিয়ে তার মতবাদের উপর অটল থাকবে। এ মুহুর্তে তাকে ছেড়ে দেয়াটাই উত্তম হবে। বাইরে গিয়ে মারা গেলে তার বিষয়টা মানুষের নিকট অস্পষ্ট থাকবে। মুতাসিম এ মতানুসারে কাজ করলেন। ইমাম সাহেবের চাচাকে ডেকে আনলেন। এরপর জনতাকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি একে চিন? সবাই উত্তর দিল হ্যাঁ, ইনি হচ্ছেন আহমদ বিন হাম্বল। মুতাসিম বললেন, দেখ! এর দেহ অক্ষত আছে কিনা। সবাই বলল, হ্যাঁ তার দেহ অক্ষত। এ ঘটনার বর্ণনাকারী আবু যুরআ বলেন, মুতাসিম আশংকা করছিলেন যদি এরূপ না করা হয় তবে হয়ত গণ-আন্দোলন শুরু হয়ে যাবে। যা প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে না। এভাবে তাঁকে নিষ্কৃতি দেয়ার ফলে জনগণের উত্তেজনা প্রশমিত হবে।

ইমাম সাহেবের পক্ষ হতে ক্ষমা প্রদর্শন

ইমাম সাহেব এ বিষয়ে যে ধৈর্য এবং দৃঢ়তা প্রদর্শন করেছেন তা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য। তাঁর দ্বীন হিফায়ত করার জন্যই তিনি এসব কিছু সহ্য করেছেন। এরপর তিনি তাঁর শত্রুদের সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমার প্রহারকারীদের মধ্যে যারা মারা গিয়েছে, তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দিয়েছি।

فمن عفا واصلح فاجره على الله *

এ আয়াতের তাফসীরে আমি হাসান বসরীর এ কথা পেয়েছি যে, কিয়ামতের দিন সমস্ত উম্মতকে আল্লাহর সামনে উপস্থিত করা হবে এবং ঘোষণা দেয়া হবে যে, যার আজর বা প্রতিদান আল্লাহর জিম্মায় সে দাঁড়িয়ে যাও। তখন তারাই দন্ডায়মান হবে যারা দুনিয়াতে ক্ষমা প্রদর্শন করেছেন। এজন্য আমিও আমার প্রহারকারীদের মধ্যে যারা মারা গিয়েছে, তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছি। এরপর ইমাম সাহেব বললেন, যদি কারও কারণে আল্লাহ কাউকে শাস্তি না দেন তবে এতে তার ক্ষতি কি? মুতাসিম যে দিন বাবল অথবা উমুরিয়া বিজয় করেন সেদিন ইমাম সাহেব বলেন, তাকে আমি ক্ষমা করে দিয়েছি।

এক বর্ণনামতে ইমাম সাহেবের নিকট খলীফা ওয়াছিক তার পূর্ববর্তী খলীফা মুতাসিমের ক্ষমা প্রার্থনা চেয়ে লোক পাঠালেন। ইমাম সাহেব বললেন, আমি মুতাসিমের দরজা হতে বের হবার পূর্বেই তাকে ক্ষমা করে দিয়েছি।

মুতাসিমের পর ২২৭ হিজরীতে ওয়াছিক খলীফা নিযুক্ত হন। কাযী আহমদ বিন দাউদ একেও খলকে কোরআনের বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনিও উলামায়ে কিরাম এবং মুহাদ্দিছীনদেরকে কষ্ট দেন। কিন্তু আহমদ বিন হাম্বলকে কিছুই করেননি। কারণ তিনি আহমদ বিন হাম্বলের দৃঢ়তা এবং ধৈর্য দেখে বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাকে বিরক্ত করার ফল ভাল হবে না। অবশ্য তিনি ইমাম সাহেবের নিকট সংবাদ পাঠালেন যে, আপনি আমার শহরে থাকবেন না। এজন্য ইমাম সাহেব তার শাসনামলে বিভিন্ন শহরে আত্মগোপন করেছিলেন। পরে নিজ বাড়ীতেই নয়রবন্দী অবস্থায় কালতিপাত করেন। ওয়াছিকের মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এ অবস্থায়ই ছিলেন।

এ যুগগুলোতে ইমাম সাহেব তাঁর অবস্থা বিশেষে প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে হাদীছ শিক্ষা অব্যাহত রাখেন। এমনকি তিনি জেলখানায়ও শিক্ষা দান করেন।

ফিৎনার সমাপ্তি

ওয়াছিকের পর ২৩২ হিজরীতে মুতাওয়াক্কিল খলীফা নিযুক্ত হন। তিনি এ ফিৎনার পরিসমাপ্তি ঘটান। তিনি মুতাযিলা, জাহমিয়া প্রভৃতি বাতিল ফিরকার মোকাবিলায় উলামা, ফুকাহা, এবং মুহাদ্দিছীনদের সহযোগিতা করেন। ২৩৪ হিজরীতে ফুকাহা এবং মুহাদ্দিছীনদের জন্য ওযিফা (ভাতা) নির্ধারণ করেন। তাদেরকে পুরস্কৃত করে এ নির্দেশ জারী করেন যে, তারা প্রকাশ্যে দরসী

মজলিস কায়ম করবেন। মানুষকে হাদীছ শিক্ষা দিবেন। মুতাযিলা এবং জাহমিয়াদের রদ করবেন। ২৩৭ হিজরীতে খলীফা মুতাওয়াক্কিল ইমাম সাহেবকে ডেকে পাঠান। কারণ মুতাওয়াক্কিলের নিকট ইমাম সাহেবের শত্রুরা সংবাদ পৌঁছিয়েছে যে, খিলাফতের উলবী দাবীদাররা ইমাম সাহেবের ঘরে আত্মগোপন করে আছে। কিন্তু পরিশেষে আল্লাহ তাআলা তাঁকে এ অপবাদ থেকেও নাজাত দেন।

অভিনন্দন

এ কষ্টের পর ইমাম সাহেব 'ইমামুল মুহাদ্দিসীন' 'আন্বাসের লিদদীন' 'আসসাবের ফিল মেহনা' আন্বাসের লিসসুন্নাহ' 'শায়খুল আসাবা' 'মুকতাদাত্তায়েফা' প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত হন। তৎকালীন উলামায়ে কিরাম তাঁকে বিরাট ব্যক্তিত্ব হিসাবে চিহ্নিত করেন। আলী বিন মদীনী এমনও বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর দ্বীনের হিফায়তের জন্য আর কেউই আহমদ বিন হাম্বলের মত এগিয়ে আসেনি। মায়মুনী জিজ্ঞেস করলেন, আবু বকরও নয়? তিনি বললেন আবু বকরও নয়। আবু বকরের সাথে সাহায্যকারী-সহযোগী ছিলেন। আহমদ বিন হাম্বলের এও ছিল না।

রবী বিন সুলাইমান বলেন, মিশরে অবস্থানকালে ইমাম শাফেয়ী আমাকে একটি চিঠি দিয়ে বললেন, তুমি বাগদাদ গিয়ে আবু আদ্বিল্লাহ থেকে এ চিঠির উত্তর নিয়ে এস। আমি চিঠি নিয়ে বাগদাদ পৌঁছলাম। ফজরের সময় আহমদ বিন হাম্বলের সাথে সাক্ষাৎ করে বললাম, আপনার ভাই শাফেয়ী মিশর থেকে এ চিঠি পাঠিয়েছেন। আহমদ বিন হাম্বল জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি এ চিঠি পড়েছেন। আমি বললাম, না। এরপর তিনি চিঠি খুলে পড়লেন। তাঁর চক্ষু দুটি অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আবু আদ্বিল্লাহ! চিঠিতে কি আছে? তিনি বললেন, ইমাম শাফেয়ী লিখেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ ছালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখেছি। তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন যে, তুমি আবু আদ্বিল্লাহকে আমার সালাম লিখ। এও লিখ যে, অতি শীঘ্রই তুমি একটি পরীক্ষায় পতিত হবে। তোমাকে 'খলকে কোরআনের' তথা কোরআন সৃষ্ট হবার স্বীকার করতে বলা হবে। তুমি তা করবে না। কিয়ামত পর্যন্ত তোমার ঝগড়া সমুন্নত থাকবে।

রবী বিন সুলাইমান বলেন, চিঠি শুনে আমি বললাম, আবু আদ্বিল্লাহ মুবারক হোক। অতঃপর আহমদ বিন হাম্বল তাঁর দেহ হতে জামা খুলে আমাকে দিলেন। আমি চিঠির উত্তর নিয়ে মিশর পৌঁছলাম। ইমাম শাফেয়ীকে ইমা

আহমদের চিঠি দিলাম। ইমাম শাফেয়ী জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে কি দিয়েছে? আমি বললাম, তাঁর জামা উপহার দিয়েছে। তিনি বললেন, তা পানিতে ভিজিয়ে আমাকে পানি দাও। তদ্বারা আমি বরকত অর্জন করব।

ইত্তিকাল

ইমাম সাহেব ২৪১ হিজরীর বারই রবীউল আউয়াল ইত্তিকাল করেন। ২রা রবীউল আউয়াল বুধবার রাত থেকে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। নয়দিন তিনি অসুস্থ ছিলেন। ঐ সময় দলে দলে মানুষ তাঁকে সালাম করার জন্য এবং তাঁর অবস্থা জানার জন্য আগমন করত। তাঁর অসুস্থতার সংবাদ যতই ছড়াতে লাগল, দর্শনার্থীদের সংখ্যা ততই বৃদ্ধি পেতে লাগল। অলি-গলি এবং মসজিদে মানুষের ভিড় হতে লাগল। এমনকি সরকার দরজায় এবং গলিতে পাহারাদার বসাতে বাধ্য হল। বাগদাদের আমীর ইবনে তাহের ইমাম সাহেবের নিকট সালাম পাঠিয়ে তাঁর সাক্ষাতের অনুমতি চাইলে তিনি বললেন, আমি তা পছন্দ করি না। আমীরুল মুমেনীনও এ বিষয়ে আমাকে ক্ষমা করেছেন। বনু হাশেম গোত্রের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ আসলে তাদেরকে ভিতরে আসার অনুমতি দিতেন। কাযীদের একদল আসলে তাদের অনুমতি দেয়া হয়নি। তখন জনৈক বুয়ুর্গ বললেন, আবু আব্দুল্লাহ! আল্লাহর সামনে হাযির হবার কথা স্বরণ কর। এ কথা শুনে ইমাম সাহেব ক্রন্দন করতে লাগলেন।

মৃত্যুর একদিন কিংবা দুদিন পূর্বে ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, বাচ্চাদেরকে আমার সামনে আন। বাচ্চাদের একজন একজন করে ইমাম সাহেবের সামনে আসত। ইমাম সাহেব তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন। ঐ সময় তাঁর অশ্রু বয়ে পড়ছিল।

ইমাম সাহেবের পুত্র হযরত ছালেহ বলেন, আমার পিতাকে কোন কিছু খাওয়ার ইচ্ছা আছে কি না জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি চিরকালের মতই অনাসক্তি প্রকাশ করলেন।

হযরত সালেহ ও আব্দুল্লাহ বলেন, ইমাম সাহেবের জীবনসায়াহ ঘনিজে এসেছে। পরকালের দিকে প্রস্থান করছেন। এমতাবস্থায় তিনি বলে উঠলেন, দূর হও, দূর হও। মানুষ জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কাকে দূর হতে বলছেন? তিনি বললেন, ঘরের কোণে ইবলিস বসে আছে। মনের দুঃখে সে নিজের আঙ্গুল কামড়াচ্ছে। সে আমাকে বলছে, আহমদ ক্ষণিকের জন্য তুমি আমার দিকে খেয়াল কর। আমি বললাম, আমি তোমার কথায় কর্ণপাত করতে মোটেই রাজী নই। যে পর্যন্ত আমার রুহ ঈমান সহকারে দেহ হতে বের না হয় ততক্ষণ

পর্যন্ত আমি তোমার ব্যাপারে অসতর্ক থাকব না।

এরপর ইমাম সাহেব বললেন, আমাকে অযু করাও। অজুর সময় বললেন, দেহের অমুক অমুক অংশ অতি উত্তমরূপে ধৌত কর। আবার বললেন, পায়ের অঙ্গুলিসমূহ খেলাল কর। ঐ মুহূর্তে তিনি অবিরাম আল্লাহর যিকরে মশগুল ছিলেন।

এরপরই তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন।

তাঁর ইত্তিকালের পর খলীফার প্রতিনিধি মুহাম্মদ বিন আদ্দিল্লাহ বিন যাহের কয়েকজন গোলামসহ কাফন নিয়ে এলেন। ইমাম সাহেবের পরিবারস্থ লোকজনকে বললেন, এগুলো আমি খলীফার পক্ষ হতে এনেছি। তিনি যদি বাগদাদে থাকতেন তবে তিনি স্বয়ং এখানে উপস্থিত হতেন।

ইমাম সাহেবের পুত্র জানিয়ে দিলেন যে, ইমাম সাহেবের জীবদ্দশায় আমীরুল মুমিনীন তাঁকে অনেক কষ্ট দিয়েছেন। তিনি কখনো সেকথা ভুলতে পারেন নাই। এমতাবস্থায় খলীফার প্রদত্ত কাফন ব্যবহার করা আমি সমীচীন মনে করি না।

নাবালেগ শিশুদের বুনা কাপড় দ্বারা ইমাম সাহেবের কাফন দেওয়া হল। গোসল দেওয়ার প্রত্যেকটি বস্তু ক্রয় করে নেয়া হয়েছিল। এমনকি পানি পর্যন্ত ক্রয় করে নেয়া হয়েছিল। ইমাম সাহেবের পুত্ররা সরকারী চাকুরী করতেন বিধায় তিনি তাদের ঘরের আহাৰ্যও গ্রহণ করতেন না। তাই তাঁর ইত্তিকালের পর তাদের ঘরের পানিও ব্যবহার করা হয় নাই।

চৌ পায়ার নীচে তশতরীতে রক্ত ভরা ছিল। প্রস্রাবের নাম গন্ধও ছিল না। চিকিৎসক বললেন, চিন্তা-ভাবনার কারণে এরূপ হয়েছে। বৃহস্পতিবার দিন অসুস্থতা বেড়ে গেল। রাত্রে আরও বৃদ্ধি পেল। শুক্রবার সকালে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন। সারা বাগদাদে কান্নার রোল পড়ে গেল। জুমার নামাযের পর জানাযা বের করা হল। জানাযার নামাযে অস্বাভাবিক ভীড় হল। মাঠ ছাড়াও মানুষ দজলা নদীতে নৌকায় দাঁড়িয়ে অলিতে গলিতে বাজারে জানাযা পড়েছেন। আশে পাশে যারা ছিল তাদের বাদ দিয়ে আনুমানিক ছয় লক্ষাধিক লোক জানাযায় শরীক হয়েছিল।

মুসলমানদের মতই ইয়াহুদী, নাসারা এবং মজুসীরা ইমাম সাহেবের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছিল। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ছিল ৭৭ বৎসর। এক সপ্তাহ পর্যন্ত মানুষ তাঁর কবরের নিকট এসে জানাযা পড়েছিল।

সুসংবাদ

ইবনুল জাওয়ী (রহঃ) বলেন, একবার বিশরে হাফী (রহঃ)কে স্বপ্নে আমি দেখতে পেলাম। তাঁর আঙ্গিনে কোন একটি বস্তু নড়াচড়া করছিল। আমি তাঁকে সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, রাতের বেলায় ইমাম আহমদের উপর মুজা ও ইয়াকুত বর্ষিত হয়েছিল। তন্মধ্য হতে আমিও কয়েকটি টুকরা কুড়িয়ে নিয়েছি। সেগুলো আমার আঙ্গিনে রেখে দিয়েছি।

ইবনুল জাওয়ী (রহঃ) বলেন, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ)কে আবু বকর মারওয়াযী স্বপ্নে দেখতে পেলেন যে, তিনি একস্থানে অতি আড়ম্বরপূর্ণ অবস্থায় উপবিষ্ট রয়েছেন। তাঁর পরিধানে ছিল দুটি সবুজ রং-এর চাদর। তাঁর মাথায় এমন একটি তাজ শোভা পাচ্ছিল, যাকে একটি নূরখণ্ডের সাথে তুলনা করা যেতে পারে।

তাঁর চলাফেরাও অভিনব ধরনের। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার চলাফেরা বড় অভিনব দেখছি। তিনি বললেন, দারুস সালামের অধিবাসীদের চালচলন এরূপই হয়ে থাকে।

আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি এ তাজ কোথা হতে পেলেন? তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা অতি সদয়ভাবে আমার হিসাব গ্রহণ করে আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তার দীদার উপভোগ করার অনুমতি আমাকে দান করেছেন। আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন, হে আহমদ! এটা বড় সম্মানিত তাজ। তুমি পরম ধৈর্যের সাথে আমার কালামকে গায়রে মাখলুক (অনাদি) বলেছ। এবং পুরস্কার হিসাবে তোমাকে এ তাজটি প্রদান করা হল।

হাফেয ইবনে হাজার আল আসকালানী (রহঃ) লিখেছেন, আবুল হাসান বলেন, যখন হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ)-এর কবরপার্শ্বে শরীফ আবু জাফর বিন আলী মুসার কবর খনন করা হচ্ছিল তখন ইমাম সাহেবের কবরের পার্শ্বও খুলে গেল। তখন দেখা গেল যে, তার কাফন পূর্বের ন্যায়ই অটুট রয়েছে। তাঁর পার্শ্বদেশও দেহ অক্ষত রয়েছে।

অথচ এটি হচ্ছে ইমাম সাহেবের ইত্তিকালের দু'শ ত্রিশ বৎসর পরের ঘটনা।

ইমাম বায়হাকী (রহঃ) ইবনে মুসআবের নিকট হতে শ্রবণ করেছেন যে, তিনি বলেছেন, আমি আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ)-এর খিদমতে উপস্থিত ছিলাম। ইত্যবসরে জনৈক বৃদ্ধ ইমাম সাহেবের খিদমতে উপস্থিত হয়ে বললেন,

আপনাদের মধ্যে কার নাম আহমদ? ইমাম সাহেব বললেন, আমার নাম আহমদ। আপনার কোন প্রয়োজন আছে কি? বৃদ্ধলোকটি বললেন, আমি দীর্ঘপথ অতিক্রম করে আপনাকে সুসংবাদ প্রদান করতে এসেছি। আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখেছি। তিনি আমাকে নির্দেশ দিলেন যে, তুমি আহমদের নিকট গিয়ে বল, আরশের অধিপতি এবং ফেরেশতাগণ তার প্রতি সন্তুষ্ট। কারণ সে আল্লাহর রাস্তায় অসাধারণ এবং অতুলনীয় ধৈর্য প্রদর্শন করেছে।

আবু আদ্বিল্লাহ মুহাম্মদ ইসকান্দারানী বর্ণনা করেন, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ)-এর মৃত্যুতে আমার মনে বড়ই অনুতাপের সৃষ্টি হল। একদিন আমি তাঁকে স্বপ্নে দেখতে পেলাম তিনি বড়ই আনন্দ সহকারে কোথাও যাচ্ছেন। আমি তাঁকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন যে, শান্তি নিকেতনের অধিবাসীদের চালচলন এরূপই হয়ে থাকে। এরপর তাকে জিজ্ঞাসা করলাম আল্লাহ তাআলা তার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন? উত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। এও জানিয়ে দিয়েছেন তুমি আমার কালামকে গায়েরে মাখলুক (অনাদি) বলে প্রচার করেছ, এজন্য তোমাকে পুরস্কার স্বরূপ এসব প্রদান করা হয়েছে।

আমি তাঁকে বললাম, হে আহমদ! আপনি সুফিয়ান ছওরীর জন্য যেরূপ দোআ করেছেন আমার জন্য সেরূপ দোয়া করুন।

ইমাম আহমদ বললেন, আমি খোদা তাআলার নিকট আরজ করেছি, হে খোদা! আপনি আমার সমুদয় অপরাধ ক্ষমা করে দিন এবং আমাকে যেন কোন ঝুঁকি গ্রহণ করতে না হয়। আল্লাহ তাআলা বললেন, আহমদ! এটা বেহেশত। তুমি এতে প্রবেশ কর। আমি সেখানে গিয়ে সুফিয়ান ছাওরীকে দেখতে পেলাম। তিনি এক বৃক্ষ হতে অপরটিতে উড়ে যাচ্ছেন। সে সময়ে তিনি এ আয়াতটি পড়ছিলেন-

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَّهُ وَ أَوْثَرْنَا الْأَرْضَ نَتَّبِعُوا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنَعْمُ

أَجْرُ الْعَامِلِينَ *

এরপর আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, বিশ্বে হাফীর সাথে কিরূপ ব্যবহার করা হয়েছে? তিনি বললেন, চূপ থাকুন। কে বিশ্বের সমকক্ষ হতে পারে? তাঁকে আল্লাহ তাআলার সম্মুখে রেখে এসেছি। তাঁর সামনে বড় একটি দস্তুরখান বিছানো হয়েছে। আর আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি তাওয়াজ্জুহ দিয়ে বলেছেন, হে

আমার বান্দা। তুমি আহার কর। কারণ তুমি দুনিয়াতে পরিতুষ্টভাবে আহার কর নাই। তুমি বিশ্রাম নাও। কারণ দুনিয়াতে তুমি আরাম-আয়েশ গ্রহণ কর নাই।

মুহাম্মদ বিন মুসলিম হতে বর্ণিত রয়েছে, আবু যুরআ যখন মৃত্যুবরণ করেন, তখন একদিন আমি তাঁকে স্বপ্নে দেখতে পেলাম। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহ তাআলা আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা আদেশ করলেন যে, তাকে আবু আদ্দিল্লাহ এবং আবু আদ্দিল্লাহ-এর সাথে একত্রে বসবাস করতে দাও।

ইমাম মালেক (রহঃ), ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) এবং ইমাম আহমদ (রহঃ)-এর কুনিয়াত ছিল আবু আদ্দিল্লাহ।

উসমান বর্ণনা করেন, আমি স্বপ্নে দেখতে পেলাম যে, কিয়ামত সংঘটিত হয়ে গিয়েছে। আল্লাহ তাআলা বিচার করার জন্য সমাসীন হয়েছেন। আরশ হতে এক ঘোষক ঘোষণা করেছেন, আবু আদ্দিল্লাহ, আবু আদ্দিল্লাহ এবং আবু আদ্দিল্লাহকে বেহেশতে প্রবেশ করাও। এর বিস্তৃত বিবরণ আমার পাশে দণ্ডায়মান এক ফেরেশতা হতে জানতে পেরেছিলাম।

সন্তান-সন্ততি

ইমাম সাহেব চল্লিশ বৎসর বয়সে বিবাহ করেন। তাঁর এক স্ত্রীর নাম আয়েশা বিনতে ফযল। তার ঘরে সাহেবজাদা সালেহ জন্মগ্রহণ করেন। তার ইন্তেকালের পর দ্বিতীয় স্ত্রী রায়হানাকে বিবাহ করেন। তার একটি চক্ষু ক্ষত ছিল। তার ঘরে সাহেবজাদা আব্দুল্লাহ জন্মগ্রহণ করেন। ইমাম সাহেব এক বাঁদী ক্রয় করেন। তার নাম ছিল হুসন। তার ঘরে সাহেবজাদী যয়নাব জন্মগ্রহণ করেন। সে ঘরে হাসান-হুসাইন নামে দু'জময় সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। কিছুদিন পরেই তারা মারা যান। এরপর হাসান, মুহাম্মদ এবং সায়ীদ জন্মগ্রহণ করেন।

সাহেবজাদা সালেহ সবার বড় ছিলেন। ২০৩ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটকালেই পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তার উপর অর্পিত হয়। ইমাম সাহেব ব্যতীতও তিনি আরও কয়েকজন মুহাদ্দিছ থেকে হাদীছ রেওয়ায়েত করেন। তিনি ইম্পাহানের কাযী ছিলেন। সেখানেই ২৬৫ হিজরীর রমযান মাসে মৃত্যুবরণ করেন। তার পুত্র যুহাইর ৩০৩ হিজরীতে এবং অপর এক পুত্র আবু জাফর মুহাম্মদ ৩৩০ হিজরীতে মারা যান।

ইমাম সাহেবের দ্বিতীয় পুত্র আব্দুল্লাহ তার পিতা থেকে সর্বাধিক হাদীছ রেওয়ায়েত করেন। তার অধিকাংশ কিতাব শ্রবণ করেছেন। ২৯০ হিজরীতে

ইন্তেকাল করেন। তৃতীয় পুত্র ইমাম সাহেবের মৃত্যুর দু'মাস পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কূফার কাযী ছিলেন।

তঁার অপর দুই পুত্র হাসান এবং মুহাম্মদ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছুই জানা যায়নি।

ওরসজাত সন্তান ছাড়াও তঁার অনেক রুহানী সন্তান ছিলেন। তাঁদের মাধ্যমে তঁার ইলম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

ইমাম আহমদ (রহঃ)-এর ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্ব

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) বলেন, বাগদাদের বৃকে ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের চেয়ে ফিকাহশাস্ত্রে অধিক অভিজ্ঞ যাহেদ, মুত্তাকী এবং আলেম অপর কেউ আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

ইয়াহইয়া বিন ময়ীন বলেন, আমি যদি সারাদিন ইমাম আহমদের প্রশংসা করতে থাকি তবুও তা শেষ হবার মত নয়।

অপর একজন ইমামের উক্তি, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। তিনি রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীছ এবং সাহাবায়ে কেরামের বাণীর পূর্ণ অনুসারী ছিলেন।

ইমাম সাহেবের পুত্র আব্দুল্লাহ বলেন, আমার পিতা দিবারাত্রে তিনশত রাকাত নামায পড়তেন।

ইমাম হেলাল (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তাআলা এ সমস্ত ব্যক্তিবর্গদের সৃষ্টি করে উম্মতে মুহাম্মদীর অশেষ উপকার সাধন করেছেন।

ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) জন্মগ্রহণ করে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীছসমূহকে সহীহ ফিকাহ দ্বারা যাচাই করে দিয়েছেন।

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) জন্মগ্রহণ করে নিখুঁত সত্যের পথিক সেজে সুস্পষ্ট সুনুত পথকে দৌপ্যমান করে তুলেছেন।

ইমাম ইয়াহইয়া বিন মা'য়ীন সহীহ রেওয়ায়াতের ভিত্তি স্থাপন করে হাদীশশাস্ত্রকে সহজ করে তুলেছেন।

আলী ইবনুল মদীনী (রহঃ) যিনি ইমাম বোখারী (রহঃ)-এর শায়খ তিনি বলেন, আমাদের হাদীছ বন্ধুদের মধ্যে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) সর্বোত্তম হাফেজুল হাদীছ।

ইমাম দায়কুৎনী (রহঃ)-এর এক বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, ইমাম সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ)-এর মৃত্যুর পর সুন্নতের রাশেদার প্রচার ও প্রসারে তাঁর সমকক্ষ আর কেউ জন্মগ্রহণ করেন নাই। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ)-এর মৃত্যুর পর বিদ'আত দেশময় ছড়িয়ে পড়ে যা ইমাম সাহেবের জীবদ্দশায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি।

তিনি এক লক্ষ হাদীছ হতে বাছাই করে 'মুসনাদে আহমদ' নামক হাদীছ গ্রন্থটি রচনা করেন।

এছাড়াও তাঁর অনেক কিতাবাদি রয়েছে যেগুলো দ্বারা মুসলিম জগত বহু উপকৃত হয়েছে।

রচনাবলী

নীতিগতভাবে ইমাম সাহেব কিতাব লিখার পরিপন্থী ছিলেন। তিনি তাঁর মতামত এবং ফতোয়া শিখতে নিষেধ করতেন। তার রচনাবলী হাদীছ এবং আছর' অর্থাৎ ছাহাবাদের বাণী সম্বলিত। তিনি কিতাবুল মুসনাদ, কিতাবুত তাফসীর, কিতাবুন্নাসেখ ওয়াল মানসুখ, কিতাবুত্তারিখ, কিতাবু হাদীছে শুবা, কিতাবুল মুকাদ্দামা ওয়াল মুআখ্খার ফিল কোরআন, কিতাবু জাওয়াবাতিল কোরআন, কিতাবুল মানাসিকিল কবীর, কিতাবুল মানাসিকিসসগীর, প্রভৃতি কিতাব রচনা করেন। কিতাবুল মুসনাদ তিরিশ হাজার হাদীছ সম্বলিত। কিতাবুত তাফসীরে একলক্ষ বিশ হাজার হাদীছ ছিল।

ইমাম সাহেবের রচনাবলীর মধ্যে ইবনে নদীম নিম্নলিখিত কিতাবসমূহের নাম উল্লেখ করেন।

কিতাবুল ইলাল, কিতাবুত তাফসীর, কিতাবুন্নাসেখ ওয়াল মনসুখ, কিতাবুযযোহদ, কিতাবুল মাসায়েল, কিতাবুল ফায়ায়েল, কিতাবুল ফারায়েয, কিতাবুল মানাসেক, কিতাবুল ঈমান, কিতাবুল আশরিবা, কিতাবু তা'আতের রাসূল, কিতাবুররদে আলাল জাহমিয়া, কিতাবুল মুসনাদ, এটিতে চল্লিশ হাজারেরও অধিক হাদীছ ছিল।

মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল সম্পর্কে ইমাম সাহেব তাঁর সাহেবজাদা আব্দুল্লাহকে বলেন, তুমি মুসনাদের হিফাযত করো। এটি মুসলমানের ইমাম এবং মুকতাদা হবে। এতে চল্লিশ হাজার হাদীছ রয়েছে। তন্মধ্যে দশ হাজার হাদীছ মুকাররার (পুনরাবৃত্তি হয়েছে এরূপ) রয়েছে এগুলো বাদ দিলে তিরিশ হাজার হাদীছ হবে। এতে তিন শতাধিক ছুলাছিয়াত রয়েছে। ছুলাছিয়াত বলা

হয় এমন হাদীছকে যেখানে মাত্র তিনজন রাবী রয়েছে।

একবার ইমাম সাহেবকে একটি হাদীছ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। তিনি বললেন, দেখ এটি আমার মুসনাদে রয়েছে কিনা। যদি না থেকে থাকে তবে এটি হুজ্জত তথা প্রমাণ নয়। তবে ইমাম সাহেব থেকে এরূপ কোন উক্তি নেই যে, মুসনাদের উল্লেখিত প্রত্যেকটি হাদীছই হুজ্জাত বা প্রমাণ। কয়েকটি হাদীছ এমন রয়েছে যেগুলো সহীহাইন অর্থাৎ বুখারী ও মুসলিম শরীফে রয়েছে কিন্তু মুসনাদে নেই।

ইবনে জাওয়ী মুসনাদে আহমদের পনেরটি হাদীছ মওযু অর্থাৎ বানোয়াট হবার সম্ভাবনা প্রকাশ করেছেন। হাফিয ইরাকী এরূপ হাদীছের সংখ্যা নয়টি উল্লেখ করেছেন। হাফিয ইবনে হজর তার কিতাবে 'আলকওলুল মুসাদ্দাদ ফিযযবের আনিল মুসনাদ' এ তিন চারটি হাদীছ ভিত্তিহীন বলেছেন।

শায়খ আবু হাসান বিন আদিল হাদী সিন্দী মাদানী মুসনাদে আহমদের একটি শরাহ (ব্যাখ্যা) লিখেন। শায়খ যয়নুদ্দীন উমর বিন আহমদ শাম্মা হলবী এ শরাহটি সংক্ষিপ্ত করেছেন। এটির নামকরণ করা হয় আদদুররুল মুনাদ্দ মিন মুসনাদি। ইমাম আহমদ শয়খ সিরাজুদ্দীন উমর বিন আলী ইবনুল মুলাক্কিনও এটি আরো সংক্ষিপ্ত করেছেন। মিশরে একাধিকবার এটি ছাপা হয়েছে।

কতিপয় উক্তির বাণী

বুযুর্গদের সাদাসিধা কথা বড়ই হাকীকত সমৃদ্ধ এবং হৃদয়গ্রাহী হয়ে থাকে। সেগুলো বেশ ফলদায়ক হয়। অভিজ্ঞতা থেকে সেগুলোকে গ্রহণ করা হয়। ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের কয়েকটি বাণী নিম্নে উল্লেখ করা হল।

☆ ইলমে কালামের আলেম কখনও দ্বীন বুঝতে সক্ষম হয় না। তোমরা যদি কাউকে ইলমে কালাম সম্পর্কে আগ্রহী দেখতে পাও তবে জেনে রাখ, তার অন্তরে দ্বিধা-দন্দু এবং সন্দেহ অবশ্যই রয়েছে।

☆ আমরা কখনও সাহাবায়ে কিরামের পরস্পরের মতবিরোধ কিংবা ঝগড়া নিয়ে ভাবি না। তাদের এসব বিষয় আল্লাহর উপর সোপর্দ করি।

☆ আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক শতাব্দীর শেষভাগে মানবজাতির হিদায়াতের জন্য এমন এক ব্যক্তি সৃষ্টি করেন। যিনি তাদেরকে সুন্নত শিক্ষা দেন এবং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্তা থেকে মিথ্যা এবং অপবাদ প্রতিহত করেন। চিন্তা করে দেখলাম যে প্রথম শতাব্দীর শেষে উমর বিন

